রোকেয়া-রচনাবলী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
প্রণীত

আবদুল কাদির
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

ROKEYA RACHANAVALI (*Works of Begum Rokeya Sakhawat Hossain*) by Begum Rokeya Sakhawat Hossain. Published by Bangla Academy, Dacca-2, Bangladesh,

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮
[ডিসেম্বর, ১৯৭১]

ফজলে রাব্বি, পরিচালক, প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় ডিভিশন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩
ও

প্রসঙ্গ-কথা

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ নাম। দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিতা বেগম আর. এস. হোসেন বাংলার অধঃ-পতিতা নারী সমাজকে মুক্তির সত্য-সুন্দর পথে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যে ত্যাগের একটি উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ কেবল-মাত্র সমাজসেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না—বরং তাঁর চেতনার বিমূর্ত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই সাহিত্য-সাধনার মধ্যেও। চিন্তার গভীরতায় এবং সৃষ্টির প্রসারতায় তাঁর প্রতিটি রচনা আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। এদিক থেকে তাঁর সমগ্র রচনার নব মূল্যায়নের প্রয়ো-জনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে তাই 'রোকেয়া-রচনাবলী' প্রকাশের প্রচেষ্টা আশা করি সুধী মহলে প্রশংসিত হবে। রচনাবলীর সংকলক-সম্পাদক কবি আবদুল কাদিরের নিরলস প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। আমাদের জাতীয় জীবন-দর্শনে এই রচনাবলী সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

রোকেয়া রচনাবলীর বহুল প্রচার আমাদের একান্ত কাম্য।

মযহারুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

সম্পাদকের নিবেদন

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সমগ্র রচনাবলী এক খণ্ডে প্রকাশের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা আমি উপস্থাপন করলে পর ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ডের কার্যকর সংসদের ৩৭তম সভায় তাঁর গ্রন্থাবলী মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুসারে তাঁর মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে 'রোকেয়া-রচনাবলী' প্রকাশিত হলো।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে রংপুর জেলার অন্তঃপাতী পায়রাবন্দ গ্রামে রোকেয়ার জন্ম হয়। তাঁর পিতা জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। পায়রাবন্দ গ্রামে 'সাড়ে তিন শত বিঘা লাখেরাজ জমির মাঝখানে' ছিল তাঁর 'সুবৃহৎ' বসতবাটী। সাবের সাহেব 'বিলাসী', 'অপব্যয়ী' ও 'সংরক্ষণশীল' ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র: আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও খলীল সাবের এবং তিন কন্যা: করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হোমেরা। দুই পুত্র কলকাতা সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন,—তাঁদের মনের উপর ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচুর প্রভাব পড়ে! জ্যেষ্ঠ ইব্রাহিম সাবেরের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে করিমুন্নেসা ও রোকেয়া ইংরেজী শিক্ষায় অনেকখানি অগ্রসর হন। রোকেয়া তাঁর উপন্যাস: 'পদ্মরাগ' এই অগ্রজের নামে উৎসর্গ করতে গিয়ে বলেন: "দাদা! আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ।"

করিমুন্নেসার জন্ম ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এবং মৃত্যু ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর। বাল্যকালে বাংলা পুস্তক পাঠের প্রতি করিমুন্নেসার অত্যধিক আসক্তি দেখে তাঁর "পড়াই বন্ধ" ক'রে দেওয়া হয় এবং তাঁকে "বালিয়াদীতে মাতামহের প্রাসাদে" পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর "বিবাহের আয়োজন" হ'তে থাকে। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সেই ময়মনসিংহের দেলদুয়ারে তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। দুঃখের বিষয়, বিবাহের ৯ বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। তাঁর দুই দেশখ্যাত পুত্র: স্যার আবদুল করিম গজনভী ও স্যার আবদুল হালিম গজনভী তাঁর প্রেরণা ও তত্ত্বাবধানেই

উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই মহিয়সী মহিলার নামে রোকেয়া তাঁর 'মতিচুর' দ্বিতীয় খণ্ড উৎসর্গ করেন। তিনি উৎসর্গ-পত্রে উল্লেখ করেন যে, বাল্যে তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আনুকূল্য করেছিলেন একমাত্র করিমুন্নেসা এবং 'চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে' ও 'কলিকাতায় ১১ বৎসর উর্দু স্কুল পরিচালনা'-কালে বাংলা ভাষার পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়েও তিনি যে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন অব্যাহত রাখতে পেরেছেন তা কেবল করিমুন্নেসার প্রেরণায়।

রোকেয়া আনুমানিক ১৬ বৎসর বয়সে বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। সাখাওয়াত তখন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। তৎপূর্বে তিনি কৃষিশিক্ষার বৃত্তি নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন এবং 'অনেকগুলি প্রাইজ ও মেডেল' নিয়ে এসেছিলেন। স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশক্রমেই তিনি সেই বৃত্তিলাভ করেছিলেন,—ভূদেবের পুত্র শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন হুগলী কলেজে (১৮৭৪-৭৫) ও পাটনা কলেজে (১৮৭৭) সাখাওয়াতের সহাধ্যায়ী ও ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্। সাখাওয়াতের প্রথম বিবাহ হয়েছিল তাঁর 'মাতার পছন্দমতো' বিহারের এক আত্মীয়-ঘরে; সেই স্ত্রী অল্পবয়সেই একটি মাত্র কন্যা রেখে মারা যান। মুকুন্দদেব লিখেছেন—

> "সখাওয়াৎ সেই কন্যার একটি বি. এ. পাশ-করা ছেলের সহিত বিবাহ দিয়াছিল; সে কন্যাটিও এখন আর জীবিত নাই। [১৯১৬]
>
> "বিপত্নীক হইয়া সখাওয়াৎ দ্বিতীয়বার রংপুরে সম্রান্ত ঘরে সুশিক্ষিতা বাঙালী মুসলমান কন্যা বিবাহ করেন।...দ্বিতীয় বিবাহে কোন সন্তান জীবিত থাকে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নী ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বিশেষ ব্যুৎপন্না এবং সুগৃহিণী এবং ধীর গম্ভীর সখাওয়াৎ পারিবারিক জীবনে সুখী হইয়াছিল।...
>
> "মিতব্যয়ী সখাওয়াতের সত্তর হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি পত্নীর দ্বারা একটি মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১০ হাজার টাকা দিবেন; পত্নীকে দশ হাজার দিবেন এবং বাড়ী এবং অধিকাংশ টাকা কন্যাকে জীবদ্দশায় লিখিয়া দিবেন এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন এবং সেইরূপই অনেকটা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। কলিকাতায় চিকিৎসার্থ গিয়া সখাওয়াতের দেহান্ত হয়। সুশিক্ষিতা মিসেস্ রকেয়া হোসেন এইরূপ ইংরাজী শিখিয়াছিলেন যে, সখাওয়াতের কথামত ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার সরকারী কার্যের অনেকটাই সাহায্য করিতে পারিতেন এবং বাঙ্গালাতে মহরম সম্বন্ধে একখানি ও মতিচুর নামে আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পত্নীর সাহায্যে তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের হইয়াছিল বলিয়া তিনি মুসলমানদের বহু-বিবাহ, নাচ মুজরা প্রভৃতির প্রকৃত প্রতিষেধক ভাবে 'স্ত্রীশিক্ষার' একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

তাঁহার অসামান্যা এবং পতিব্রতা পত্নী স্বামীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া পবিত্রাত্মা স্বর্গীয় সখাওয়াতের স্মৃতির পূজা করিতেছেন।"
—[আমার দেখা লোক, ১৩-৩৪ পৃঃ]

খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন বি. এ., এম. আর. এ. এস্, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মে লোকান্তরিত হন। তার পাঁচ মাস পরে রোকেয়া মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে প্রথম সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলের ভিত্তিপত্তন করেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশীদিন থাকতে পারেননি। সাখাওয়াতের প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতা তাঁর ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তির অধিকার নিয়ে এমন অশোভন আচরণ শুরু করে যে, রোকেয়া অতিষ্ঠ হয়ে অগত্যা ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে চিরদিনের জন্য সাধের স্বামীর ভিটা ত্যাগ ক'রে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ কলকাতায় অলিউল্লাহ লেনের একটি ছোট বাড়ীতে আটজন ছাত্রী নিয়ে নূতনভাবে স্কুল আরম্ভ করেন। পরে ৮৬।এ, লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে তা স্থানান্তরিত হয়। রোকেয়ার অক্লান্ত সাধনায় স্কুলটি একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়েছে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর প্রত্যূষে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রায় ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে ; তার পূর্বরাত্রেও প্রায় এগারোটা পর্যন্ত তাঁকে স্কুলের কাগজপত্রের নথির মধ্যে কার্যনিরত দেখা গিয়েছিল।

তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা এল্‌বার্ট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন :

"সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল আজও দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু মিসেস্ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আর নাই। যে-নারী অবলীলায় সকলের আক্রোশ সহ্য করিয়া, সমাজের নানা মলিনতার কথা, নারীর নানা দুঃখের কথা তীব্র ভাষায় প্রকাশ করিবার সাহস রাখিতেন, তিনি আর নাই।......তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল, কারণ তিনি একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণা লইয়া কাজ করিতেন ; সে-কাজের ভিতরে আমরা যে সুমঙ্গল নিহিত দেখিতাম তাহার ফলেই তাঁহার দেওয়া আঘাত আমাদের তখনকার ক্ষুদ্র সাহিত্যিক-গন্ডীর প্রত্যেকের মনে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিত। মৃত্যু আজ তাঁহাকে অমর করিয়া দিয়াছে। তাঁহার স্মৃতির উপরে আজ বাংলার মুসলমান সমাজ যে-শ্রদ্ধাঞ্জলী দিতেছেন, বাংলার কোন মুসলমান পুরুষের মৃত্যুতে সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। ইহা শুধু যুগ-লক্ষণ নহে, ইহা আমাদের জাগরণের লক্ষণ।"

উক্ত সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন :

"এ যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের আসন এই তিন জনের—মিসেস আর. এস্. হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক ও লুতফর রহমান।...মিসেস্ আর. এস্. হোসেনের প্রতিভা এ কালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয়, তবে আজো ভয় কেন বাংলার মুসলমানের ঘোচে না? তবে আজো কেন নিজেকে পবিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী ব'লে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না?"

॥ ২ ॥

বেগম রোকেয়া তাঁর 'বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল' লেখাটিতে বলেছেন যে, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে Sultana's Dream রচিত হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেই তাঁর 'মতিচূর' আত্মপ্রকাশ করে। তার 'বিজ্ঞাপন'-এ বলা হয়: "মতিচূরের প্রবন্ধসমূহ পূর্বে 'নবপ্রভা', 'মহিলা' ও 'নবনূর' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।" তাতে অন্তর্ভুক্ত সাতটি প্রবন্ধের মধ্যে 'স্ত্রীজাতির অবনতি', 'নিরীহ বাঙ্গালী', 'অর্ধাঙ্গী', 'বোরকা' ও 'গৃহ' যথাক্রমে ১৩১১ ভাদ্রে, ১৩১০ মাঘে, ১৩১১ আশ্বিনে, ১৩১১ বৈশাখে ও ১৩১১ আশ্বিনে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ: 'পিপাসা' ১৩২৯ সালের ১৬ ভাদ্র তারিখে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যক (বিশেষ 'মোহররম সংখ্যা') অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ১৩১১ সনে 'নবনূরে'-র কয়েকটি সংখ্যায় 'মতিচূর' গ্রন্থের যে-বিজ্ঞাপন বের হয় তাতে বলা হয় যে, "লেখিকার প্রথম রচনা 'পিপাসা' (মোহরম)।" গ্রন্থে তার শিরোনাম: 'পিপাসা' এবং উপ-শিরোনাম: 'মহরম'। মুকুন্দদেব বলেছেন: 'মিসেস্ রোকেয়া হোসেন বাঙ্গালাতে মহরম সম্বন্ধে একখানি ও মতিচূর নামে আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন।" কিন্তু বাস্তবিকই 'মহরম' বিষয়ে রোকেয়া কোনো পৃথক পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন কি না, তা সন্ধান করা যেতে পারে।

১৩২৫ অগ্রহায়ণে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক 'সওগাত' পত্রিকায় 'বর্তমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' বিভাগে 'মিসেস্ আর. এস্.

হোসেন' প্রসঙ্গে বলা হয় :

> "ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রধানা লেখিকা। 'নবনূর', 'নবপ্রভা', 'মহিলা', 'অন্তঃপুর' প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় এক সময়ে ইঁহার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি 'মতিচুর' নামে একখানি বাঙ্গালা এবং Sultana's Dream নামে একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-সাধনায় সফলতা লাভ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত 'অন্তঃপুর' পত্রিকায় প্রকাশিত রোকেয়ার লেখা এবং ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠে ৪র্থ বর্ষের ২য় সংখ্যক 'নবনূরে' প্রকাশিত তাঁর 'আশা-জ্যোতিঃ' সংগ্রহ করা আবশ্যক।

'মতিচুর' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ : 'স্ত্রীজাতির অবনতি' ১৩১১ ভাদ্রের 'নবনূরে' প্রকাশিত হয়েছিল 'আমাদের অবনতি' শিরোনামে। মূল প্রবন্ধের ২৩শ থেকে ২৭শ পর্যন্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদ গ্রন্থে পরিবর্জিত হয়ে সে-স্থলে নূতন সাতটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে। পরিত্যক্ত অনুচ্ছেদ-পঞ্চক নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

> "আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই ; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় না, তবে অনুমানে ঐরূপ মনে হয়। আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। এখন ত অবস্থা এই যে, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই শুনিতে পাই : 'প্যাট্! তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম!' সুতরাং আমাদের আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া যায়।
>
> "শিশুকে মাতা বলপূর্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন : 'ঘুমা শিগ্‌গীর ঘুমা! ঐ দেখ জুজু!' ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। সেইরূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে : 'ঘুমাও, ঘুমাও, ঐ দেখ নরক।' মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।

"আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে। ধর্মে যে সামাজিক আইন-কানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্মিকগণ নিশ্চিন্ত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভা-বলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্বর-দিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গাম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়॥

"তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুণির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে, মুণি ঋষি হইতে পারিতেন? যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত কি না, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বর-দত্ত জলবায়ু ত সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ— সতীদাহ। (পাদটীকা : 'একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার শতাধিক পত্নী সহমৃতা হইতেন কি?') যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। এস্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।

"কেহ বলিতে পারেন যে, 'তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?' তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, 'ধর্ম্ম' শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই 'ধর্ম্ম' লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্ম্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন।"

—[নবনূর, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২১৬-২১৮ পৃ:]

বেগম রোকেয়ার 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধের প্রতিবাদ ক'রে, ১৩১১ আশ্বিনের 'নবনূরে' এস্. এ. আল্-মুসাভী লেখেন 'অবনতি প্রসঙ্গে'; তাতে বলেন—

"নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না—তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।"

১৩১১ কার্তিকের 'নবনূরে' নওশের আলী খান ইউষফজী লেখেন 'একেই কি বলে অবনতি?' তিনি বলেন—

"পাঠিকাগণ! সত্যই কি আপনারা দাসী? ...অলঙ্কারগুলি কি সত্যই আপনাদের দাসত্বের নিদর্শন?...পোশাকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিবসনা না সাজিলে কি প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না?...

"আপনাদিগকে "অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, * * * পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভা-বলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন তিনিই আপনাকে দেবতা বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, *** (পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধির সহিত) পয়গাম্বরদিগকে * * বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর (হইতে) দেখা যায়। তবেই দেখিতেছেন এই ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" এ অনাহুত গর্হিত কথাগুলি বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? এ অবান্তর কথাগুলি না লিখিলে কি আপনাদের অবনতির কারণ অনুসন্ধানে কোন বাধা জন্মিত?...

"আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।"

১৩১২ জ্যৈষ্ঠের 'নবনূরে' বেগম রোকেয়া লেখেন 'ভ্রাতা-ভগ্নী' শীর্ষক 'কথোপকথন'। তার এক স্থানে বলা হয়েছে—

> "কৃত্রিম অন্তঃপুর-বন্ধন মোচন হইলে সমাজে অবাধে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে। তখন এ শিক্ষার গতিরোধ করা অসম্ভব হইবে।"

এই বাদানুবাদ-প্রসঙ্গে ১৩১২ ভাদ্রের 'কোহিনূরে' বিবি ফাতেমা লেখেন 'দু'টি কথা।' তাতে তিনি মন্তব্য করেন—

> "গত আশ্বিন-কার্তিকের 'নবনূরে' মিঃ আল্‌-মুসাভী ও ইউসফজী সাহেবের লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের প্রতিবাদ করাই যে ভগিনী হোসেনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা 'ভ্রাতা-ভগ্নী' প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই সহজে অনুমিত হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, উহা দ্বারা আমাদের লাভ হইবে কি?··· ভগিনী হোসেনকে আমরা আমাদের সমাজের মুখপাত্র বলিয়া জানি। এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট এ-প্রকার বাহুল্য কথা শুনিতে কখনই আমরা আশা করি না।"

১৩১২ সালের নবনূরের বার্ষিক সূচীপত্রে দেখা যায় যে, তাতে 'গ্রন্থ-সমালোচনা' লেখেন মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী। ১৩১২ ভাদ্রে 'গ্রন্থ-সমালোচনা' বিভাগে 'মতিচূর' প্রসঙ্গে বলা হয়—

> "মতীচূর,— মিসেস্ আর. এস্. হোসেন প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা।···মতীচূরের প্রবন্ধগুলি যখন প্রথমে নবনূরে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল।...এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ করি এবং সেই সময় মতীচূর সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে।···লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য এবং মতীচূর প্রকৃত মতীচূরই বটে।...এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং রচনাভঙ্গি (style) অতি মনোরম। কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা শ্লাঘার বিষয়। লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভালো করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই।···
>
> "মতিচূর-রচয়িত্রীর একটি দোষের কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থে মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত

Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই আমাদের ধারণা। খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদ্‌রী সাহেবগণ যাহা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে আমাদের সবই কু, আর ইউরোপ-আমেরিকার সবই সু।...

"সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতীচুর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না।...

মতীচুরের 'পিপাসা' ও 'গৃহ' এই দুইটি নিবন্ধই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছে। ভালো লাগিয়াছে অর্থ এই যে, আমরা ইহা পড়িয়া হৃদয়ে কিছু সত্য, কিছু ধ্রুব বিষয়ের ধারণা করিতে পারিয়াছি।... 'সুগৃহিণী' সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা 'সুগৃহিণী' চাই সত্য, কিন্তু আমরা এমন গৃহিণী চাই না, যাঁহারা কেবল সারা-দিন Horticulture, Chemistry বা Physics নিয়া ব্যস্ত থাকিবেন।... 'আমাদের অবনতি' সম্বন্ধে আমাদের নূতন কিছু বলিবার নাই। পূর্বে দুই-একজন এ-বিষয়ে সোরগোল করিতে গিয়া এখনও খোঁচা খাইতেছেন দেখিয়া আমরা পূর্বাহ্নেই সাবধান হইয়াছি।"

—[নবনূর, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ২৩৮—২৪০ পৃ:]

বেগম রোকেয়া সমাজ ও সংসারের সকল ক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, পাশ্চাত্যে তার পুরোধা (the pioneer of the woman's rights movemant) ছিলেন Mary Wollstonecraft (১৭৫৯—৯৯ খ্রী:)। এই ক্ষণজন্মা মহিলা তাঁর A Vindication of the Rights of Woman (১৭৯২ খ্রী:) গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে বলেন :

Contending for the rights of woman, my main argument is built on this simple principle, that if she be not prepared by education to become the companion of man, she will stop the progress of knowledge and virtue ; for truth must be common to all, or it will be inefficacious with respect to its influence on

general practice.…They (women) may be convenient slaves, but slavery will have its constant effect, degrading the master and the abject dependent.

নারীর প্রকৃতিগত দৌর্বল্য, নমনীয়তা কমনীয়তা, প্রেমকলা, রূপচর্চা, feminine delicacy, natural frailty of woman প্রভৃতি বিষয়ে রোকেয়ার পরিচ্ছন্ন চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে উপরোক্ত গ্রন্থের বহু মন্তব্যের মিল দেখে মনে বাস্তবিকই বিস্ময় লাগে। Mary Wollstonecraft ইউরোপে যে প্রবল ভাবান্দোলনের সূচনা করেন, জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ (১৮০৬-৭৩) যুক্তিনিষ্ঠ প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ The Subjection of Woman (১৮৬৯) লিখে তাকে সার্থকভাবে প্রবাহিত করেন প্রশস্ত জন-সমর্থনের পথে। তারই ফলে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট বৃটেনে পুরুষের সমান ভিত্তিতে নারীর ভোটাধিকার লাভ মঞ্জুর হয়েছে,—যুক্তরাষ্ট্রে পাশ হয়েছে উনিশতম সংশোধনী। কিন্তু সে-তুলনায় রোকেয়ার প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে, তা সহৃদয় গবেষকেরা নিরূপণ করবেন।

॥ ৩ ॥

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে 'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। তাতে ১০টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে 'নূর-ইসলাম' ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের আল্-এস্লামে, 'সৌরজগৎ' ১৩১২ ফাল্গুন ও চৈত্রের নবনূরে, 'নারীসৃষ্টি' ১৩২৫ পৌষের ও 'নার্স নেলী' ১৩২৬ অগ্রহায়ণের সওগাতে, 'শিশুপালন' ১৩২৭ কার্তিকের, 'মুক্তিফল' ১৩২৮ শ্রাবণের ও 'সৃষ্টিতত্ত্ব' ১৩২৭ শ্রাবণের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'মতিচূর' ২য় খণ্ড সম্পর্কে ১৩২৮ অগ্রহায়ণের 'মোসলেম ভারতে' বলা হয়—

> "পুস্তকখানি পড়িলেই বোঝা যায়, গ্রন্থকর্ত্রী আত্মযশ:লিপ্সায় প্রণোদিত হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই ; পক্ষান্তরে ভূয়োদর্শনের ফলে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই তিনি নানা কথায় নানা ছলে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।…
>
> 'জ্ঞানফল' ও 'মুক্তিফল' দুইটি রূপকথা। রূপকথা রচনায় নারীজাতি যে সিদ্ধহস্ত, এ-কথা আদমের যুগ হইতে প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থেও গ্রন্থকর্ত্রী ওয়ারিশক্রমে সে হাত-যশ: হইতে বঞ্চিত

হন নাই। ইহাতে সাময়িক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ের প্রতিবিম্ব আছে। উভয় প্রবন্ধেরই মুখ্য উদ্দেশ্য: নারীজাতিকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সমাজের কী ক্ষতি হইয়াছে, তাহাই পাঠক-পাঠিকার স্মরণ করাইয়া দেওয়া। গৌণ উদ্দেশ্য: নারী-পুরুষ উভয়কে দেশের কল্যাণের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করা।…

'ডেলিশিয়া-হত্যা' ও 'নার্স নেলী'তে লেখিকার শক্তি আপন স্বাভাবিক গতি পাইয়া অতি মনোহর মূর্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। নারী না হইলে বোধ হয় নারীর কথা এমন সুন্দর করিয়া বলা যায় না। একটিতে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত নারীর হৃদয়ের মর্মস্পর্শী চিত্র; আর একটিতে নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে বন্ধ করিয়া রাখার যে কি অবিমৃষ্যকারিতা তাহাই অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে।…এই ব্যথার ছবিখানির পশ্চাতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ: 'শিশুপালন'। প্রত্যেক রমণীর এই প্রবন্ধটি পাঠ করা কর্তব্য।

মোটের উপর গ্রন্থের ভাষা অতি সুন্দর ও সরস। রচনার বিশুদ্ধিতা প্রত্যেক সুধী পাঠককে প্রীতিদান করিবে।…মুসলমান নারী-সমাজ এ গ্রন্থের জন্য যে আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা বোধ করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।"

১৩২৯ বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলা হয়—

"…লেখিকা সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক সাহিত্যের নানা বিভাগেই লেখনী চালনা করিয়াছেন। ভাব ও ভাষায় তাঁহার লেখা সহজেই পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। নারী জাতির দুঃখ-দৈন্যে ব্যথিত হইয়া লেখিকা যে সরস মধুর ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা বড়ই মর্মস্পর্শী হইয়াছে। 'মুক্তিফল' রূপকথাটি Political carricature হিসাবে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।…"

১৩২৯ বৈশাখের 'সহচরে'ও গ্রন্থখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। ১৩২৯ ভাদ্রের 'সহচরে' পুনরায় তার প্রসঙ্গে বলা হয়—

"…নারীর ব্যথা-বেদনার প্রতিচ্ছবি। অন্ধ নারী-সমাজের জাগরণ দানের বজ্রবীণা। লেখা অতি সুন্দর, রচনা-ভঙ্গী অতি চমৎকার।…"

এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ : 'সৃষ্টিতত্ত্ব' প্রথমে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় 'পুরুষ-সৃষ্টির অবতারণা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু গ্রন্থভুক্তি-কালে তার পাঠ বহুলাংশ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। এ লেখাটিকে 'নারীসৃষ্টি' প্রবন্ধের পরিপূরক বলা যেতে পারে। এ দু'টি রস-রচনায় রয়েছে যে 'স্যাটায়ার', তার সাক্ষাৎ মহিলাদের লেখায় সচরাচর পাওয়া যায় না।

১৩১৬ বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহে রোকেয়ার স্বামী লোকান্তরিত হন। মনে হয়, অতঃপর ৫/৬ বৎসর কাল রোকেয়ার লেখনী প্রায় স্তব্ধ ছিল এবং এক 'সৌর-জগৎ' ছাড়া এই গ্রন্থের অবশিষ্ট লেখাগুলি পরবর্তী পর্যায়ে রচিত। এই পর্যায়ে তাঁর রচনায় তীব্রতার হ্রাস হয়ে 'হিউমার' পেয়েছে বৃদ্ধি। এ-কথা ভাবতে আমার স্বতঃই ইচ্ছা করে যে, মার্জিতমনা স্থিতধী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের প্রশ্রয়েই রোকেয়া 'আমাদের অবনতি' ও Sultana's Dream লিখতে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং সেরূপ প্রসন্ন পরিবেশের অভাবেই তেমন মুক্তভাবদীপ্ত নির্ভীক চাঞ্চল্যকর রচনা তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনী থেকে আর নির্গত হলো না !!

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে Sultana's Dream পুস্তিকা-আকারে বের হয় ; লেখিকা-কৃত তারই বঙ্গানুবাদ : 'সুলতানার স্বপ্ন'। Sultana's Dream সম্বন্ধে ১৩২৮ মাঘের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকার 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে বলা হয়—

> "এই ছোট গল্পটি ইংরাজীতে লিখিত। 'মতিচূর'-রচয়িত্রীকে আমরা বাংলা সাহিত্যের একজন সুনিপুণ লেখিকা বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এমন সরল সুন্দর ইংরাজীও লিখিতে পারেন তাহা আমাদের জানা ছিল না। আলোচ্য বইটিতে কোন এক সুলতানার স্বপ্ন-ছলে যে গল্পটি বলা হইয়াছে তাহা খুবই কৌতুকাবহ হইয়াছে। সংসারে নারী যে পুরুষের প্রাধান্য না মানিয়াও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, এমন কি বিদেশীর আক্রমণ হইতে স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিতে পারে, তাহাই লেখিকা দেখাইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, ইংরাজী-শিক্ষিত মুসলমান সমাজে এই পুস্তকের আদর হইবে।..."

রোকেয়ার Sultana's Dream-এ স্বাধীন স্বনির্ভর নারী-সমাজের যে রম্য fantastic কল্পচ্ছবি ধ্যানদৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে পরবর্তীকালে Anthony M. Ludovici-র লেখা Lysistrata, or Woman's Future and Future Woman পুস্তকের প্রতিপাদ্য ভবিষ্যৎ নারী-

জীবনের দৃশ্যাবলী। তা থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রোকেয়া ছিলেন সুদূরদৃষ্টির অধিকারিণী। কিন্তু শুধু জ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাস্বর নয়, প্রেমের মাধুর্যেও তাঁর অন্তর ছিল সদা স্নিগ্ধ। পবিত্রতা ও মানবিকতা তাঁর মনোলোকে অনাহত রেখেছিল আনন্দ ও সৌন্দর্যের সচ্ছন্দ সঞ্চার,—তারই বলে তাঁর ব্যক্তিত্ব হ'তে পেরেছিল দৃঢ়মূল ও অনমনীয়। শুধু তাঁর রচনাবলীতেই নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল পরিচালনার ব্যাপারেও তাঁর এই প্রবল ব্যক্তিত্ব ও মধুর চরিত্রের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ ৪ ॥

বেগম রোকেয়া 'অবরোধবাসিনী' শিরোনামে 'অবরোধের' বিষয়ে তাঁর "ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার" দেন ১৩৩৫ কার্তিক, ১৩৩৬ ভাদ্র, ১৩৩৭ শ্রাবণ ও ১৩৩৭ ভাদ্রের মাসিক মোহাম্মদীতে। এই রচনাটির 'প্রতিবাদ' ক'রে ১৩৩৮ শ্রাবণের মাসিক মোহাম্মদীতে জনৈক লেখক বলেন :

> "অবরোধ-প্রথার নিন্দা করিতে যাইয়া মাননীয়া লেখিকা কতকগুলি উপকথার অবতারণা না করিলেই বোধ হয় পাঠকগণ বেশী সুখী হইতেন।"

রোকেয়া অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন ; কিন্তু নারী পর্দা—অর্থাৎ সুরুচি ও শালীনতা—বিসর্জন দিবে, এটা তিনি কোনোদিনই কাম্য মনে করেননি। অতি-আধুনিক রীতির বেলেল্লাপনা তাঁর কাছে কিরূপ শ্লেষের বিষয় ছিল, তাঁর 'উন্নতির পথে' শীর্ষক রম্যরচনাটিতেও তার অভিব্যক্তি ইঙ্গিতবহ ও তাৎপর্যময়। লেখাটি এখানে সম্পূর্ণ চয়ন করা হলো।

উন্নতির পথে

আজকাল সবাই উন্নতি করেছে—যেদিকে তাকাই কেবল দেখি উন্নতি আর উন্নতি। কেবল আমি অথর্ব্ব বুড়ো অচল হয়ে বসে আছি। তাই ভাবি আর বেশী ক'রে ভাত খাই, আর ভাবি যে কি ক'রে আমার উন্নতি হবে।

চশমাটা ভালো ক'রে মুছে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনে নজর পড়লো—'ক্রুশেন সল্ট্' খেলে সত্তর বছরের বুড়ো কুড়ি বছরের তরুণ হয়ে যায়। বাস্—এক শিশি কিনে খাওয়া আরম্ভ করলুম।

ভাই! কি বলবো—এক হপ্তা 'ক্রুশেন সল্ট' খেতে না খেতে একেবারে আঠারো বছরের তরুণের মতো গায়ে স্ফূর্তি হলো! তখন ভাবলুম, আর এ বুড়োদের সঙ্গে অথর্ব্ব হয়ে থাকা নয়—যাই তরুণদের সঙ্গে মিশ্‌তে।

লাঠি ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দেখি : মেলা তরুণ এক জায়গায় জড় হয়ে গান করছে—

"নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শত বার খসে খসে পড়ে—"

বাঃ! আমার বড় ভালো লাগ্‌লো—বিশেষতঃ আমি বাষট্টি বছর এগিয়ে এসেছি কি না—অর্থাৎ আমার বয়স আশি বছর; কিন্তু এক হপ্তা ওষুধ খেয়ে যে একেবারে আঠারো বছরের তরুণ হয়ে গেছি—তাই প্রাণে আর স্ফূর্তি ধরে না!

তরুণকে বল্লুম, "ভাই, আমি দাড়ী গোঁফ চেঁচে ফেলে (শিং কাটিয়ে) তোমাদের সঙ্গে মিশতে এসেছি। আমায় তোমার সঙ্গে উন্নতির পথে নিয়ে চল।"

সে বললে, "বেশ, এস।"

পরদিন আমি একটা মোটর নিয়ে তরুণের কাছে গেলুম। সে হেসে বল্‌লে, "এখন আর মোটর নয়। আমার এরোপ্লেনে চল। এরোপ্লেনটা ঘন্টায় ৬০,০০০ মাইল চলে।"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "ভায়া! পৃথিবীর গতি ঘন্টায় ৭২০ মাইল, আর তোমার এরোপ্লেনের গতি ঘন্টায় ৬০,০০০ মাইল?"

তরুণ বললে, "কি জান দাদা! পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে—সে আর আমাদের উন্নতির গতির সঙ্গে পেরে ওঠছে না।"

যাক, আমাদের 'প্লেন বোঁ বোঁ ক'রে রওয়ানা হলো। তাতে আরও অনেক যাত্রী ছিল— ইরানী, তুরানী, তুর্কী, আল্‌বানিয়ান, ইরাকী,

কাবুলী ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল তরুণ নয়, তরুণীরাও ছিল। সবাই নওজোয়ান,— বুড়ো (আমি ছাড়া আর) একটাও না। আমার মাথার ভিতর কেবলই গুঞ্জন করছিল—

'নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শত বার খসে খসে পড়ে—'

কখনও ঐ গানটাই উলট-পালট হ'য়ে মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল—

'পাগ্‌ড়ী নাই, টুপি নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—' ইত্যাদি।

ও বাবা! কতক্ষণ পরে দেখি কি, সত্য সত্যই তরুণদের কাছা-কোঁচা একেবারে খসে পড়ে গেছে—আর—

রোদ বৃষ্টি হিম হতে বাঁচাইতে কায়
একমাত্র হ্যাট তার রয়েছে মাথায়!

শেষে দেখি, সোবহান্ আল্লাহ্! তরুণীরাও অর্ধ দিগম্বরী॥

যাক, হ্যাট দিয়ে লজ্জা যদি না-ও নিবারণ হয়, তবু রোদ বৃষ্টি হিম হতে মাথাটা বাঁচাবে। কিন্তু তরুণীদের মাথায় যে হ্যাটও নাই। আর চেপে থাকতে না পেরে ব'লে ফেল্‌লুম,— "ভাই তরুণ, উন্নতির পথে চলেছ, তা উলঙ্গ হয়ে কেন?"

সে বল্‌লে, "আমরা এখন দেশোদ্ধার করতে চলেছি—আমাদের কি আর কাছা-কোঁচা জ্ঞান আছে? তুচ্ছ বেশ-ভূষা, তুচ্ছ বাস—সব বিসর্জন দাও স্বাধীনতা পাবার আশায়। আমরা চাই কেবল উন্নতি আর উন্নতি।"

চুপ ক'রে থাকা আমার ধাতে নেই—আমি মরণ-কালে যমের সঙ্গেও গল্প করবো। তুরানী তরুণকে বল্‌লুম, "তোমরা ত ভাই নিজের দেশেই আছ, তোমরা স্বাধীন, তবে কাপড় ছাড়লে কেন?"

সে বললে, "এ কোথাকার ওল্ড ফুল! পৃথিবী যে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে—অর্থাৎ যেখান থেকে যাত্রা করেছে, ঘুরে আবার সেইখানে এসে পৌঁছবে—এ তাও জানে না!"

পরে আমি কাবুলী তরুণকে বল্‌লুম, "ভাই! তোমরা ত চিরস্বাধীন, তবে কাপড় ছাড়লে কেন?"

সে আমাকে বুঝিয়ে বললে যে, তাদের দেশ আবর্জনায় ভ'রে গেছে, এখন তা'রা দেশের পঙ্কোদ্ধার করছে। পাগড়ী ও প্রকাণ্ড কাবুলী

পায়জামা, আর চুল, দাড়ী—এ সব নিয়ে কাজ করতে গেলে, কাদার ছিটায় (চুল, দাড়ী, পাগড়ী, পায়জামা) সব বিদিকিচ্ছি হ'য়ে যাবে যে। তাই কেবল হ্যাট ছাড়া দেশে আর কোনো আবরণই থাকবে না।

বোঁ বোঁ ক'রে 'প্লেন উন্নতির পথে ছুটেছে। এখন দেখি কি, সেই তুরানী তরুণের কথাই সত্য, অর্থাৎ 'প্লেনটা চক্রাকার পথে ঘুরে ক্রমে কালিদাসের বর্ণিত শকুন্তলার যুগে—যখন মুণি-কন্যারা গাছের বাকল পরতেন, তাও আবার সব সময় লম্বায় চওড়ায় যথেষ্ট হ'ত না ব'লে টেনে টুনে পরতে হ'ত—সেই যুগে এসে পড়েছে। তরুণীদের দিকে আর চাওয়া যায় না।

আমি মিনতি ক'রে বল্লুম, "ভায়া তরুণ। দয়া ক'রে তোমার 'প্লেনটা থামাও, আমি এইখানে নেবে পড়ি।"

ইরানী তরুণ হাসতে হাসতে বললে, "দাদা। এখনই কি হয়েছে—কোল ভীলের যুগ দেখেই ভয় পাচ্ছ? এখনও ত গায়ে রঙ মাখার যুগে এসে পৌঁছায়নি।"

আমি কাকুতি ক'রে বললুম, "দোহাই ভায়া তরুণ। আর না। আমি বুঝতে পেরেছি: তোমরা এখন আদি-মাতা হজরত হাবার যুগে এসে পড়বে। আদি-পিতা অভিশপ্ত হ'য়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে' নিয়ে—একটায় তহবন্দ্, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপী করেছিলেন। আর আদি-মাতা তাঁর লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় ত চুলও নেই—এরা কি দিয়ে গা ঢাকবে?"

—[মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৩৫]

॥ ৫ ॥

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে Everyman's Library-র ৮২৫-সংখ্যা রূপে মেরী ওল্স্টোন্ক্রাফ্টের A Vindication of the Rights of Woman এবং জন্ স্টুয়ার্ট মিলের The Subjection of Woman একত্রে প্রকাশিত হয়; তার Introduction-এ প্রফেসার George E. G. Catlin প্রতীচ্যে নারীর অধিকার-আন্দোলনের অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবধারাসমূহের বিশদ পর্যালোচনা ক'রে Vindication of the Rights of Woman বইখানির অপরিমাণ মূল্য ও দুর্নিবার

প্রভাব প্রতিপন্ন করেছেন ; অথচ তাঁর মতে বইখানি well-planned, well-presented ও well-written নয়—তা লিখ্‌তে লেখিকার মাত্র ছয় সপ্তাহ সময় লেগেছিল। নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ন্যায়ানুমোদিত রাজনৈতিক অধিকার, আর্থনীতিক স্বনির্ভরতা ও জাতীয় শিক্ষার চিন্তাই রোকেয়ার চিত্তকেও রেখেছিল সদাজাগ্রত ; অথচ তাঁর রচনায় প্রচারধর্মিতার ঊর্ধ্বে প্রতিভাত তার সাহিত্যগুণ। তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের 'সিদ্দিকা' এক চমৎকার সৃষ্টি ; এই চরিত্রে নারীর হৃদয়-রহস্যের অতলতা ও দুর্জয় অভিমান যে শান্তশ্রী ও লিপিকুশলতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে তা আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। গল্প বা কথিকার আকারে তিনি যে-সকল 'স্যাটায়ার' লিখেছেন, সেগুলি মুখ্যত: উদ্দেশ্যমূলক ও শিক্ষাত্মক (didactic) হলেও শিল্প-বিচারেও প্রায়শ: রসোত্তীর্ণ। তাঁর কোনো কোনো কথায় তীক্ষ্ণতা আছে ; কিন্তু তাকেও মহিমান্বিত করেছে একটি মমতাময়ী নারীচিত্ত,—বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ সেই চিত্তের স্পর্শ।

বেগম শামসুন নাহারের 'রোকেয়া-জীবনী'তে রোকেয়ার ৫ খানি ও বেগম মোশাফেকা মাহ্‌মুদের 'পত্রে রোকেয়া-পরিচিতি'তে তাঁর ১৩ খানি পত্র সঙ্কলিত হয়েছে। একখানি পত্রে রোকেয়া বাংলাদেশে একটি 'নারী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন' প্রসঙ্গে বলেন—

> "আমাদের বাংলাদেশ, আহা রে! আমি যদি কিছু টাকা (ধর, মাত্র দুই লক্ষ) পাইতাম, তবে কিছু করিয়া দেখাইতে পারিতাম।"

এদেশে একদিন হয়ত নারী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'বে ; কিন্তু আজ এদেশবাসী 'রোকেয়া নারী-মহাবিদ্যালয়' স্থাপন ক'রে এই দেশবরেণ্যা নারীর অমর স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেন।

তাঁর Sultana's Dream, মতিচুর, পদ্মরাগ প্রভৃতি অমূল্য পুস্তক বহুদিন থেকেই দুষ্প্রাপ্য। আজ 'রোকেয়া-রচনাবলী' প্রকাশের ফলে তাঁর চিন্তাধারা ও সাহিত্যসাধনার সঙ্গে দেশের যুব-সম্প্রদায় পরিচিত হ'য়ে যদি জাতিগঠনে প্রবুদ্ধ হন, তা হ'লেই এই উদ্যোগের সার্থকতা হ'বে সুদূরপ্রসারী।

ঢাকা
৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭২

আবদুল কাদির

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
[জন্ম : ১৮৮০ মৃত্যু : ১৯৩২]

সূচীপত্র

মতিচুর, ১ম খণ্ড	—	—	৫
মতিচুর, ২য় খণ্ড	—	—	৭৫
পুস্তকাকারে-অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী	—	—	২৪৯
রসনা-পূজা	—	—	২৫১
ঈদ-সম্মিলন	—	—	২৫৮
সিসেম ফাঁক	—	—	২৬০
চাষার দুক্ষু	—	—	২৬২
এণ্ডি শিল্প	—	—	২৬৭
রাঙ ও সোনা	—	—	২৭৫
বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি	—	—	২৭৭
লুকানো রতন	—	—	২৮৫
রাণী ভিখারিনী	—	—	২৮৯
উন্নতির পথে	—	—	(১৯)
বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ	—	—	২৯৩
সুবেহ্ সাদেক	—	—	২৯৮
ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম	—	—	৩০১
হজের ময়দানে	—	—	৩০৭
বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল	—	—	৩১১
নারীর অধিকার	—	—	৩১৪
পদ্মরাগ (উপন্যাস)	—	—	৩১৭
অবরোধবাসিনী	—	—	৪৬৯

ছোট-গল্প ও রস-রচনা — —

বাতা-ভগ্নী — — ৫১৩
তিন কুঁড়ে — — ৫২৯
পরী চিবি — — ৫৩২
বলিগর্ত্ত — — ৫৩৭
পঁয়ত্রিশ মণ খানা — — ৫৪৪
বিয়ে-পাগলা বুড়ো — — ৫৪৮

কবিতাবলী — — ৫৫৫

Sultana's Dream — — ৫৭৩

পরিশিষ্ট

রোকেয়া-পরিচিতি — — ৫৮৯

মতিচূর

১৩১২

নিবেদন

মতিচূরের কোন কোন পাঠকের সমালোচনায় জানা যায় যে, তাঁহারা মনে করেন, মতিচূরের ভাব ও ভাষা অন্যান্য খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ববর্তী কোন কোন পুস্তকের সহিত মতিচূরের সাদৃশ্য দর্শনে পাঠকদের ওরূপ প্রতীতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অপরের ভাব কিম্বা ভাষা স্বায়ত্ত করিতে যে সাহস ও নিপুণতার প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। সুতরাং তাদৃশ চেষ্টা আমার পক্ষে অসম্ভব। কালীপ্রসন্ন বাবুর 'ভ্রান্তিবিনোদ' আমি অদ্যাপি দেখি নাই, এবং বঙ্কিম বাবুর সমুদয় গ্রন্থ পাঠের সুযোগও প্রাপ্ত হই নাই। যদি অপর কোন গ্রন্থের সহিত মতিচূরের সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ দৈব ঘটনা।

আমিও কোন উর্দু মাসিক পত্রিকায় কতিপয় প্রবন্ধ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি—উক্ত প্রবন্ধাবলীর অনেক অংশ মতিচূরের অবিকল অনুবাদ বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে প্রবন্ধসমূহের লেখিকাগণ বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞা।

ইংরাজ মহিলা মেরি করেলীর 'ডেলিশিয়া-হত্যা' (The Murder of Delicia) উপন্যাসখানি মতিচূর রচনার পূর্বে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; অথচ তাহার অংশবিশেষের ভাবের সহিত মতিচূরের ভাবের ঐক্য দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কেন এরূপ হয়? বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, ডেকান (হায়দরাবাদ), বোম্বাই, ইংলণ্ড—সর্ব্বত্র হইতে একই ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, ইহার কারণ সম্ভবতঃ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অবলাবৃন্দের আধ্যাত্মিক একতা!

কতিপয় সহৃদয় পাঠক মতিচূরে লিখিত ইংরাজী শব্দ ও পদের বাঙ্গালা অর্থ না লেখার ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। এবার যথাসম্ভব ইংরাজী শব্দসমূহের মর্মানুবাদ প্রদত্ত হইল। যাঁহারা মতিচূরে যে কোন ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

মতিচূরে আর যে-সকল ত্রুটি আছে, তাহার কারণ লেখিকার বিদ্যাবুদ্ধির দৈন্য এবং বহুদর্শিতার অভাব। গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা মার্জনা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বিনীতা

গ্রন্থকর্ত্রী।

বিজ্ঞাপন

মতিচূরের প্রবন্ধসমূহ পূর্বে 'নবপ্রভা', 'মহিলা' ও 'নবনূর' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এবার প্রবন্ধগুলি সংশোধিত ও অনেক স্থলে পরিবর্তিত হইয়াছে।

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	পিপাসা : মহরম	৯
২.	স্ত্রীজাতির অবনতি	১৭
৩.	নিরীহ বাঙ্গালী	৩১
৪.	অর্ধাঙ্গী	৩৫
৫.	সুগৃহিণী	৪৫
৬.	বোরকা	৫৬
৭.	গৃহ	৬৩

পিপাসা

মহরম

কা'ল বলেছিলে প্রিয়। আমারে বিদায়
দিবে, কিন্তু দিলে আজ আপনি বিদায়!
*　　　*　　　*　　　*

দুঃখ শুধু এই—ছেড়ে গেলে অভাগায়
ডুবাইয়া চিরতরে চির পিপাসায়!
যখন যেদিকে চাই,　　　কেবলি দেখিতে পাই,—
"পিপাসা, পিপাসা" লেখা জ্বলন্ত ভাষায়।
শ্রবণে কে যেন ঐ "পিপাসা" বাজায়।

প্রাণটা সত্যই নিদারুণ তৃষানলে জ্বলিতেছে। এ জ্বালার শেষ নাই, বিরাম নাই, এ জ্বালা অনন্ত। এ তাপদগ্ধ প্রাণ যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকে নিজের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। পোড়া চক্ষে আর কিছুই দেখি না। পুষ্পময়ী শস্যশ্যামলা ধরণীর আনন্দময়ী মূর্তি আমি দেখি না। বিশ্ব জগতের মনোরম সৌন্দর্য আমি দেখি না। আমি কি দেখি, শুনিবে? যদি হৃদয়ে ফটোগ্রাফ তোলা যাইত, যদি চিত্রকরের তুলিতে হৃদয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার শক্তি থাকিত,—তবে দেখাইতে পারিতাম, এ হৃদয় কেমন! কিন্তু সে উপায় নাই।

ঐ যে মহরমের নিশান, তাজিয়া প্রভৃতি দেখা যায়, ঢাক ঢোল বাজে, লোকে ছুটাছুটি করে, ইহাই কি মহরম? ইহাতে কেবল খেলা, চর্মচক্ষে দেখিবার তামাসা। ইহাকে কে বলে মহরম? মহরম তবে কি? কি জানি, ঠিক উত্তর দিতে পারিলাম না। কথাটা ভাবিতেই পারি না,—ও-কথা মনে উদয় হইলেই আমি কেমন হইয়া যাই,—চক্ষে অন্ধকার দেখি, মাথা ঘুরিতে থাকে! সুতরাং বলিতে পারি না—মহরম কি!

আচ্ছা তাহাই হউক, ঐ নিশান তাজিয়া লইয়া খেলাই হউক; কিন্তু ঐ দৃশ্য কি একটা পুরাতন শোকস্মৃতি জাগাইয়া দেয় না? বায়ু-হিল্লোলে নিশানের কাপড় আন্দোলিত হইলে, তাহাতে কি স্পষ্ট লেখা দেখা যায় না—"পিপাসা,

পিপাসা"? উহাতে কি একটা হৃদয়-বিদারক শোকস্মৃতি জাগিয়া ওঠে না? সকল মানুষই মরে বটে—কিন্তু এমন মরণ কাহার হয়?*

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম—স্বপ্নে মাত্র, যেন সেই কারবালায় গিয়াছি। ভীষণ মরুভূমি, তপ্ত বালুকা, চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে; সমীরণ 'হায় হায়' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে! আমি কেবল শুনিতে পাইলাম—"পিপাসা, পিপাসা"! বালুকা-কণায় অঙ্কিত যেন "পিপাসা, পিপাসা"! চতুর্দিক চাহিয়া দেখিলাম, সব শূন্য, তাহার ভিতর "পিপাসা" মূর্তিমতী হইয়া ভাসিতেছে! সে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর—তথা হইতে দূরে চলিলাম। এখানে যাহা দেখিলাম, তাহা আরও ভীষণ, আরও হৃদয়বিদারক! দেখিলাম—মরুভূমি শোণিত-রঞ্জিত!‡ রক্ত-প্রবাহ বহিতে পারে নাই—যেমন রক্তপাত হইয়াছে, অমনি পিপাসু মরুভূমি তাহা শুষিয়া লইয়াছে! সেই রুধির-রেখায় লেখা—"পিপাসা, পিপাসা!"

*একদা জয়নাল আবদীন (হোসেনের পুত্র) জনৈক কসাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাগল জবেহ্ করিতে আসিয়াছ, উহাকে কিছু খাওয়াইযাছ?" কসাই উত্তর করিল, "হাঁ, ইহাকে এখনই প্রচুর জলপান করাইয়া আনিলাম।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি ছাগলটাকে প্রচুর জলপানে তৃপ্ত করিয়া জবেহ্ করিতে আনিয়াছ; আর শিমর আমার পিতাকে তিন দিন পর্যন্ত জলাভাবে পিপাসায় দগ্ধ করিয়া জবেহ্ করিয়াছে!!"

কারবালার যুদ্ধের সময় জয়নাল রোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া শহীদ (সমরশায়ী) হন নাই।

‡ধর্মগুরু মহাত্মা মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পর, ক্রমানুয়ে আবুবকর সিদ্দিক, ওমর খাত্তাব ও ওসমান গনি "খলিফা" হইলেন। চতুর্থ বারে আলী খলিফা হইবেন, কি মোয়াবীয়া খলিফা হইবেন, এই বিষয়ে মতভেদ হয়। একদল বলিল, "মোয়াবীয়া হইবেন"; এক দল বলে, আলী মোহাম্মদের (দঃ) জামাতা, তিনি সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। এইরূপে বিবাদের সূত্রপাত হয়।

অতঃপর মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ, আলীর পুত্র হাসান ও হোসেনের সর্বনাশ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল। এজিদ মহাত্মা হাসানকে কৌশলে বিষ পান করাইয়া হত্যা করে। ইহার এক বৎসর পরে মহাত্মা হোসেনকে ডাকিয়া (নিমন্ত্রণ করিয়া) কারবালায় লইয়া গিয়া যুদ্ধে বধ করে।

কেবল যুদ্ধ নহে—এজিদের দল-বল ইউফ্রেতীজ নদী ঘিরিয়া রহিল, হোসেনের পক্ষের কোন লোককে নদীর জল লইতে দেয় নাই। পানীয় জলের অভাবেই তাঁহারা আধমরা হইয়া-ছিলেন। পরে যুদ্ধের নামে একই দিন হোসেন আত্মীয় স্বজনসহ নিহত হইলেন। এ কথায় মতভেদ আছে; কেহ বলেন, তিন দিন যুদ্ধ হয়, কেহ বলেন একই দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে সমরশায়ী হইয়াছেন। নদীর জল হইতে হোসেনকে বঞ্চিত করিয়া এজিদ অশেষ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছে।

অষ্টাদশ বর্ষীয় নবীন যুবক কাসেম (হাসানের পুত্র) মৃত্যুর পূর্ব রাত্রে হোসেনের কন্যা সকিনাকে বিবাহ করেন। কারবালা যখন সকিনাকে নববধূ বেশে দেখিল, তাহার কয় ঘণ্টা

নবীন যুবক আলী আকবর (হোসেনের পুত্র) যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পিতার নিকট পিপাসা জানাইতে আসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন—"আল্‌-আৎশ! আল্‌-আৎশ!!" (পিপাসা, পিপাসা!) ঐ দেখ, মহাত্মা হোসেন স্বীয় রসনা পুত্রকে চষিতে দিলেন, যদি ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হয়। কিন্তু তৃপ্তি হইবে কি,—সে রসনা যে শুষ্ক—নিতান্ত শুষ্ক। যেন দিক দিগন্তর হইতে শব্দ আসিল,—"পিপাসা পিপাসা"।

মহাত্মা হোসেন শিশু পুত্র আলী আস্‌গরকে কোলে লইয়া জল প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার কথা কে শুনে? তিনি দীন নয়নে আকাশপানে চাহিলেন,—আকাশ মেঘশূন্য নির্ম্মল,—নিতান্তই নির্ম্মল। তিনি নিজের কষ্ট,—জল পিপাসা অম্লান বদনে সহিতেছেন। পরিজনকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়াছেন। সকিনা প্রভৃতি বালিকারা জল চাহে না—তাহারা বুঝে, জল দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আস্‌গর বুঝে না—সে দুগ্ধপোষ্য শিশু, নিতান্ত অজ্ঞান। অনাহারে জলাভাবে মাতার স্তন্য শুকাইয়া গিয়াছে—শিশু পিপাসায় কাতর।

শহরবানু (হোসেনের স্ত্রী) অনেক যন্ত্রণা নীরবে সহিয়াছেন—আজ আস্‌গরের যাতনা তাঁহার অসহ্য। তিনি অনেক বিনয় করিয়া হোসেনের কোলে শিশুকে

পরেই তাঁহাকে নববিধবা বেশে দেখিয়াছিল! যেদিন বিবাহ, সেই দিনই বৈধব্য। হায় কারবালা! এ দৃশ্য দেখার চেয়ে অন্ধ কেন হও নাই?

পুরুষগণ ত যুদ্ধ করিতেছিলেন, আর ললনাগণ কি করিতেছিলেন?—একজনের জন্য শোক করিতেছিলেন, আর একটির সমরশায়ী হওয়া সংবাদ পাইলেন!—কাসেমের জন্য কাঁদিতেছিলেন, আলী আকবরের মৃতদেহ পাইলেন! শোকোচ্ছ্বাস কাসেমকে ছাড়িয়া আকবরের দিকে ধাবিত হইল,—আকবরের মাথা কোলে লইয়া কাঁদিতেছিলেন, শিশু আস্‌গরকে শর-বিদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন! এক মাতৃ-হৃদয়—আকবরকে কোল হইতে নামাইয়া আস্‌গরকে কোলে লইল—কত সহ্য হয়? পুত্রশোকে আকুলা আছেন,—কিছুক্ষণ পরে সর্ব্বস্বধন হোসেনের ছিন্ন মস্তক (শত্রু উপহার পাঠাইল) পাইলেন, তাই দেখিতেছেন, ইতোমধ্যে (হোসেনের কন্যা) বালিকা ফাতেমা পিতার মাথা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, শহরবানু তাহার জন্য সান্ত্বনার উপায় খুঁজিতেই ছিলেন—ফাতেমার শ্বাসরোধ হইল! ক্ষুধায় পিপাসায় কাতরা বালিকা কত সহিবে? হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল! শহরবানু এখন সকিনার অশ্রু মুছাইবেন, না ফাতেমাকে কোলে লইবেন?

আহা! এত যে কেহই সহিতে পারিবে না! আমার শোকসন্তপ্তা পুত্রশোকাতুরা ভগিনীগণ তোমরা একবার শহরবানু ও জয়নবের শোকরাশির দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমরা একজনের শোকেই বিহ্বল হও—দশদিক অন্ধকার দেখ। আর এ যে শোকসমূহ! আঘাতের উপর আঘাত! তোমরা এক সময় একজনের বিরহে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পার, তাঁহাদের সে অবসর ছিল না!

দিয়া জল প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন,—"আর কেহ জল চাহে না; কেবল এই শিশুকে একটু জল পান করাইয়া আন। শত্রু যেন ইহাকে নিজ হাতে জল পান করায়,—জলপাত্রটা যেন তোমার হাতে নাই দেয়"॥

মহাত্মা হোসেন স্ত্রীর কাতরতা এবং শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া, জল প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাতরস্বরে বলিলেন, "আমি বিদেশী পথিক,

এক জয়নব কি করিবেন বল, নিজের পুত্রের জন্য কাঁদিবেন, না প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদের দিকে চাহিবেন, না সব ছাড়িয়া ভ্রাতা হোসেনের ক্ষত ললাটখানি অশ্রুধারায় ধুইবেন? সেখানে অশ্রু ব্যতীত আর জল ত ছিল না!

বীরহৃদয়! একবার হোসেনের বীরতা সহিষ্ণুতা দেখ! ঐ দেখ, তিনি নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া—আর কোন যোদ্ধা নাই, সকলে সমরশায়ী, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একা। তিনি কোন মতে পথ পরিষ্কার করিয়া নদী পর্যন্ত গিয়াছেন। ঐ দেখ অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিলেন, বুঝি পান করেন; না, পান ত করিলেন না!—যে জলের জন্য আস্‌গর তাঁহারই কোলে প্রাণ হারাইয়াছে, আকবর তাঁহার রসনা পর্যন্ত চুষিয়াছেন—সেই জল তিনি পান করিবেন? না—তিনি জল তুলিয়া দেখিলেন, ইচ্ছা করিলে পান করিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া নদীর জল নদীতেই নিক্ষেপ করিলেন। বীরের উপযুক্ত কাজ!!

* * * *

মহরমের সময় সুন্নি-সম্প্রদায় শিয়াদলে আমোদের জন্য যোগ দেয় না। এ কথা যে বলে, তাহার ভুল,—শোচনীয় ভুল। আলী ও তদীয় বংশধরগণ উভয় সম্প্রদায়েরই মান্য ও আদরণীয়। তাঁহাদের শোচনীয় মৃত্যু স্মরণ সময়ে কোন্ প্রাণে সুন্নিগণ আমোদ করিবে? আমোদ করে বালকদল, সহৃদয় সুন্নিদল মহরমকে উৎসব বলে না।

শিয়াদের বাহ্য আড়ম্বর সুন্নিগণ ভাল মনে করেন না। বক্ষে করাঘাত করিলে বা শোক-বস্ত্র পরিধান করিলেই যে শোক করা হইল, সুন্নিদের এরূপ বিশ্বাস নহে। মতভেদের কথা এই যে, শিয়াগণ হজরতা আয়ষা - ফাতেমার বিমাতা সিংহাসন আলীকে না দিয়া মোয়াবীয়াকে দিয়াছেন বলিয়া আয়ষাকে নিন্দা করে। আমরা আয়ষার (আলীর সৎশাশুড়ী হওয়া ব্যতীত আর) কোন দোষ দেখি না। চতুর্থ খলিফা কে হইবেন, ধর্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার নাম স্পষ্ট না বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি মোয়াবীয়া কিম্বা আলী তাঁহারা উভয়ে একই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাই মতভেদ হইল। কেহ বলিল "চতুর্থ খলিফা মোয়াবীয়া," কেহ বলিল "আলী"।

আয়ষা হিংসা করিয়া বলেন নাই, সিংহাসন মোয়াবীয়া পাইবেন। তিনি ঐ অনুমানের কথাই বলিয়াছিলেন মাত্র। সুন্নিগণ মাননীয়া আয়ষার নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না; শিয়া সুন্নিতে এইটুকু কথার মতভেদ। এই বিষয় লইয়াই দলাদলি।

তোমাদের অতিথি, আমার প্রতি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর, সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ শিশু তোমাদের নিকট কোন দোষে দোষী নহে। পিপাসায় ইহার প্রাণ ওষ্ঠাগত—একবিন্দু জল দাও। ইহাতে তোমাদের দয়াধর্ম্মের কিছুমাত্র অপব্যয় হইবে না।” শত্রুগণ কহিল, “বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে,—শীঘ্র কিছু দিয়া বিদায় কর।”

বিপক্ষ হইতে শিশুর প্রতি জলের পরিবর্তে তীর বৃষ্টি হইল !!
“পিয়াস লাগিয়া জলদে সাধিনু, বজর পড়িয়া গেল।”

উপযুক্ত অতিথি-অভ্যর্থনা বটে ! হোসেন শর-বিদ্ধ আসগরকে তাহার জননীর কোলে দিয়া বলিলেন, “আসগর চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হইয়াছে ! আর জল জল বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইবে না ! আর বলিবে না—‘পিপাসা, পিপাসা’! এই শেষ!” * * *

শহরবানু কি দেখিতেছেন? কোলে পিপাসু শর-বিদ্ধ আসগর, সম্মুখে রুধিরাক্ত কলেবর ‘শহীদ’ (সমরশায়ী) আকবর। অমন চাঁদ কোলে লইয়া ধরণী গরবিণী হইয়াছিল—যে আকবর ক্ষত বিক্ষত হইয়া, পিপাসায় কাতর হইয়া মৃত্যুকালে এক বিন্দু জল পায় নাই ! শোণিত-ধারায় যেন লেখা আছে “পিপাসা, পিপাসা”! শহীদের মুদ্রিত নয়ন দুটি নীরবেই বলে যেন “পিপাসা, পিপাসা” !! দৃশ্য ত এইরূপ মর্মভেদী তাহাতে আবার দর্শক জননী!—আহা !!

যে ফুল ফুটিত প্রাতে,—নিশীথেই ছিন্ন হ’ল,
শিশিরের পরিবর্তে রুধিরে আপ্লুত হ’ল।

আরও দেখিলাম,—মহাত্মা হোসেন সমরশায়ী। সমরক্ষেত্রে কেবলই পিপাসী শহীদগণ পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের শুষ্ক কণ্ঠ যেন অস্ফুট ভাষায় বলিতেছে “পিপাসা, পিপাসা”! জয়নব (হোসেনের ভগিনী) মুক্ত কেশে পাগলিনী প্রায় ভ্রাতার নিকট বিদায় চাহিতেছেন। ডাকিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতেছেন,—“ভাই! তোমাকে মরুভূমে ফেলিয়া যাইতেছি। আসিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে—যাইতেছি তোমাকে ছাড়িয়া। আসিয়াছিলাম অনেক রত্নে বিভূষিত হইয়া—যাইতেছি শূন্য হৃদয়ে! তবে এখন শেষ বিদায় দাও! একটি কথা কও, তবে যাই! একটিবার চক্ষু মেলিয়া দেখ—আমাদের দুরবস্থা দেখ, তবে যাই।” জয়নবের দুঃখে সমীরণ হায় হায় বলিল,—দূর-দূরান্তরে ঐ হায় হায় শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল! * * *

এখন আর স্বপ্ন নাই—আমি জাগিয়া উঠিয়াছি। দূরে শৃগালের কর্কশ শব্দে শুনিলাম—"পিপাসা, পিপাসা"। একি, আমি পাগল হইলাম নাকি? কেবল "পিপাসা" দেখি কেন? কেবল "পিপাসা" শুনি কেন?

আমার প্রিয়তমের সমাধিস্থানে যাইলাম। বনপথ দিয়া যাইতে শুনিলাম, তরুলতা বলে "পিপাসা, পিপাসা"। পত্রের মর্মর শব্দে শুনিলাম "পিপাসা, পিপাসা"! প্রিয়তমের গোর হইতে শব্দ আসিতেছিল—"পিপাসা, পিপাসা"। ইহা অতি অসহ্য। প্রিয়তম মৃত্যুকালে জল পায় নাই—চিকিৎসকের নিষেধ ছিল। সুতরাং পিপাসী মরিয়াছে।

আহা! এমন ডাক্তারী কে রচনা করিয়াছেন? রোগীর প্রতি (রোগ বিশেষে) জল-নিষেধ ব্যবস্থা কোন্ হৃদয়হীন পাষাণের বিধান? যখন রোগীকে বাঁচাইতে না পার, তখন প্রাণ ভরিয়া পিপাসা মিটাইয়া জল পান করিতে দিও। সে-সময় ডাক্তারের উপদেশ শুনিও না। নচেৎ আমারই মত আজীবন পিপাসায় দগ্ধ হইবে।

কোন রোগী মৃত্যুর পূর্বদিন বলিয়াছিল, "বাবাজান! তোমারই সোরাহির জল দাও।" রোগী জানে, তাহার পিতার সোরাহির জল অবশ্যই শীতল হইবে। পিতা তাহার আসন্নকাল জানিয়া স্বহস্তে সোরাহি আনিয়া দিলেন। অন্যান্য মিত্ররূপী শত্রুগণ তাহাকে প্রচুর জল সাধ মিটাইয়া পান করিতে দেয় নাই। ঐ রোগীর আত্মা কি আজ পর্যন্ত কারবালার শহীদদের মত "পিপাসা পিপাসা" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না? না; স্বর্গসুখে পিপাসা নাই! পিপাসা—যে বাঁচিয়া থাকে, তাহারই! অনন্ত শান্তি-নিদ্রায় যে নিদ্রিত হইয়াছে, পিপাসা তাহার নহে! পিপাসা—যে পোড়া স্মৃতি লইয়া জাগিয়া থাকে, তাহারই!!

কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি,—আমার হৃদয়ানন্দ মৃত্যুর পূর্বদিন গোপনে জননীর নিকট জল চাহিয়াছিল। ডাক্তারের নিষেধ ছিল বলিয়া কেহ তাহাকে জল দিত না। জননী ভয়ে ভয়ে অল্প জল দিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে সে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ও অধীর হইয়াছিল—হায়! না জানি সে কেমন পিপাসা!

হৃদয়ানন্দ জানিত, আমি তাহাকে জল দিব না। আমি চিকিৎসকের অন্ধ আজ্ঞাবহ দাস, তাহাকে জল দিব না। তাই সে আমার উপস্থিত থাকা সময় জল চাহিতে সাহস করে নাই। কি মহতী সহিষ্ণুতা! জলের পরিবর্তে চা চাহিল। শীতল জলের পিপাসায় গরম চা!! চা তখনই প্রস্তুত হইয়া আসিল। যে ব্যক্তি চা পান করাইতেছিল, সে চা'র পেয়ালার কড়া ধরিতে পারিতেছিল না—পেয়ালা এত তপ্ত ছিল। আর সেই পিপাসী সে পেয়ালাটি দুই

হস্তে (যেন কত আদরের সহিত জড়াইয়া) ধরিয়া চা পান করিতে লাগিল!! আহা! না জানি সে কেমন পিপাসা! অনলরচিত পিপাসা!! কিম্বা গরলরচিত পিপাসা!!!

সে সময় হয়ত তাহার শরীরে অনুভব শক্তি ছিল না,—নচেৎ অত গরম পেয়ালা ও কোমল হস্তে সহিবে কেন? আট বৎসরের শিশু—ননীর পুতুল, তাহার হাতে গরম পেয়ালা!—আর সেই তপ্ত চা—স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে নিশ্চয় গলায় ফোস্কা হইত! আর ঐ মাখন-গঠিত কচি হাত দুটি জ্বলিয়া গলিয়া যাইত!! সেই চা তাহার শেষ পথ্য—আর কিছু খায় নাই।

আক্ষেপ এই যে, জল কেন দিলাম না। রোগ সারিবার আশায় জল দিতাম না।—রোগ যদি না সারিল, তবে জল কেন দিলাম না? এই জন্যই ত রাত্রি দিন শুনি—,"পিপাসা, পিপাসা"! ঐ জন্যই ত এ নরকযন্ত্রণা ভোগ করি। আর সেই গরম চা'র পেয়ালা চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়ে আঘাত করে, প্রাণ দগ্ধ করে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেখি—অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে লেখা—"পিপাসা, পিপাসা"!

নিশীথ সময়ে গৃহছাদে উঠিলাম। আকাশমণ্ডল পরিষ্কার ছিল কোটী কোটী তারকা ও চন্দ্র হীরক প্রভায় জ্বলিতেছিল। আমার পোড়া চক্ষে দেখিলাম—ঐ তারকা-অক্ষরে লেখা—"পিপাসা, পিপাসা"। আমি নিজের পিপাসা লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে আবার বিশ্বচরাচর পিপাসা দেখায়—পিপাসা শুনায়! বোধ হয় নিজের পিপাসার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই মাত্র,—আর কেহ পিপাসী নহে। এ অথবা বিশ্বজগৎ সত্যই পিপাসু!

কুসুমকাননে আমি কি দেখিতে পাই? কুসুম হেলিয়া দুলিয়া বলে—"পিপাসা, পিপাসা"। লতায় পাতায় লেখা—পিপাসা, পিপাসা"! কুসুমের মনোমোহিনী মৃদু হাসি আমি দেখি না। আমি দেখি, কুমুদের সুধাংশু-পিপাসা।

বিহগ-কূজনে আমি কি শুনিতে পাই? ঐ "পিপাসা, পিপাসা"। ঐ একই শব্দ নানাসুরে নানারাগে শুনি,-প্রভাতে ভৈরবী, নিশীথে বেহাগ-কিন্তু কথা একই। চাতক পিপাসায় কাতর হইয়া ডাকে-"ফটিক জল"। কোকিল ডাকিয়া উঠে "কুহু", ঐ কুহুস্বরে শত প্রাণের বেদনা ও হৃদয়ের পিপাসা ঝরে! এ কি, সকলে আমাকে পিপাসার ভাষা শুনায় কেন? আহা! আমি কোথায় যাই? কোথায় যাইলে "পিপাসা" শুনিব না?

চল হৃদয়, তবে নদী তীরে যাই,-সেইখানে হয় ত 'পিপাসা' নাই। কিন্তু ঐ শুন। স্নিগ্ধসলিলা গঙ্গা কুলকুল স্বরে গাহিতেছে। "পিপাসা, পিপাসা" আপন মনে গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে! একি তুমি স্বয়ং জল, তোমার আবার পিপাসা কেমন? উত্তর পাইলাম, 'সাগর-পিপাসা'। আহা! তাই ত, সংসারে তবে

সকলেই পিপাসু? হইতে পারে, সাগরের—যাহার চরণে, জাহ্নবি! তুমি আপনার প্রাণ ঢালিতে যাইতেছ, তাহার পিপাসা নাই। তবে দেখা যাউক।

একদিন সিন্ধুতটে সিক্ত বালুকার উপর বসিয়া সাগরের তরঙ্গ গণনা করিতেছিলাম। উর্মিমালা কি যেন যাতনায়, কি যেন বেদনায় ছটফট করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল। এ অস্থিরতা, এ আকুলতা কিসের জন্য? সবিস্ময়ে সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

তব ওই সচঞ্চল লহরীমালায়
কিসের বেদনা লেখা?—পিপাসা জানায়।
পিপাসা নিবৃত্ত হয় সলিল-কৃপায়,
বলহে জলধি! তব পিপাসা কোথায়?

আবার তাহার গভীর গর্জনে শুনিলাম, "পিপাসা, পিপাসা"! হায়! এই পোড়া পিপাসার জ্বালায় আমি দেশান্তরে পলাইয়া আসিলাম, এখানেও ঐ নিষ্ঠুর কথাই শুনিতে পাই। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম—ঐ তরঙ্গে তরঙ্গে আর পিপাসা দেখিতে ইচ্ছা ছিল না। সমুদ্র আবার গম্ভীর গর্জন করিল। এবারও তাহার ভাষা বুঝিলাম,—স্পষ্ট শুনিলাম,—"পিপাসা, পিপাসা"!!

"পিপাসা পিপাসা"—মূর্খ মানব! জান না এ কিসের পিপাসা? কোথায় শুনিয়াছ সাগরের পিপাসা নাই? এ হৃদয়ের দুর্দান্ত পিপাসা কেমন করিয়া দেখাইব? আমার হৃদয় যত গভীর, পিপাসাও তত প্রবল! এ সংসারে কাহার পিপাসা নাই? পিপাসা পিপাসা—এইটুকু বুঝিতে পার না? ধনীর ধন-পিপাসা, মানীর মান-পিপাসা, সংসারীর সংসার-পিপাসা। নলিনীর তপন-পিপাসা, চকোরীর চন্দ্রিকা-পিপাসা! অনলেরও তীব্র পিপাসা আছে! আহা! এই মোটা কথা বুঝ না? পিপাসা না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিত কি লক্ষ্য করিয়া? আমার হৃদয়ে অনন্ত প্রণয়-পিপাসা,—যতদিন আছি, পিপাসাও থাকিবে। প্রেমিকের প্রেম-পিপাসা,—প্রকৃতির ঈশ্বর-পিপাসা! এইটুকু কি বুঝিতে পার না? * * *"

তাই বটে, এত দিনে বুঝিলাম, আমার হৃদয় কেন সদা হু হু করে, কেন সদা কাতর হয়। এ হৃদয়ের পিপাসা তুচ্ছ বারি পিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম-পিপাসা। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকলে পিপাসী—ঐ বাঞ্ছনীয় প্রেমময়ের প্রেম-পিপাসী!!

আমি তবে বাতুল নহি। আমি যে পিপাসা দেখি, তাহা সত্য—কল্পিত নহে। আমি যে পিপাসা শুনি, তাহাও সত্য—কল্পনা নহে। ঈশ্বর প্রেম, এ বিশ্বজগৎ প্রেম-পিপাসু।

স্ত্রীজাতির অবনতি

পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? না। আমরা দাসী কেন?—কারণ আছে।*

আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা-বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্ম্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবতঃ সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষ-পক্ষ হইতে যতই বেশী সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছেন, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা বাড়িতেছে। ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপ-জীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জা-জনক বোধ করে না।

ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের,—প্রকারান্তরে পুরুষের—দাসী হইয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের মন পর্য্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং

*কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত—তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাঁহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত নারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ স্থলে আমরা ধর্ম্মগ্রন্থের কোন মতামত লইয়া আলোচনা করিব না—কেবল সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিব। অর্থাৎ স্বকীয় মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

আমরা বহু কাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বার বার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন; "The five worst maladies that afflict the female mind are: indocility, discontent, slander, jealousy and silliness. * * * Such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and to obey her husband." (Japan, the Land of the Rising Sun.)

(ভাবার্থ— স্ত্রীজাতীর অন্ত:করণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই—[কোন বিষয় শিক্ষার] অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা। * * * নির্বোধ স্ত্রীলোকের কর্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে)।

তারপর কেহ বলেন "অতিরঞ্জন ও মিথ্যা বচন রমণী-জিহ্বার অলঙ্কার।" আমাদিগকে কেহ "নাকেস-উল্-আকেল" এবং কেহ "জ্ঞানহীন" (unreasonable) বলিয়া থাকেন। আমাদের ঐ সকল দোষ আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দেখুন। এদেশে জামাতা খুব আদরণীয়—এমন কি ডাইনীও জামাই ভালবাসে। তবু "ঘরজামাইয়ের" সেরূপ আদর হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের "স্বামী" হইয়া উঠিলেন।* আর আমরা ক্রমশ:

* "Although the Japanese wife is considered only the *first servant of her husband*, she is usually addressed in the house as the honorable mistress. Aacquaintance with European customs has awakened among the more educated classes in Japan a desire to raise the position of women" (Japan.)

ভাবার্থ—(যদিও জাপানে স্ত্রীকে স্বামীর প্রধানা সেবিকা মনে করা হয় কিন্তু সচরাচর তাহাকে গৃহস্থিত অপর সকলে মাননীয়া গৃহিণী বলিয়া ডাকে। যাহা হউক আশা ও সুখের বিষয় এই যে, এখন ইউরোপীয় রীতি-নীতির সহিত পরিচিত শিক্ষিত সমাজে ক্রমশ: রমণীর অবস্থা উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে।)

"দাসী" শব্দে অনেক শ্রীমতী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "স্বামী" শব্দের অর্থ কি? দানকর্তাকে "দাতা" বলিলে যেমন গ্রহণ কর্তাকে "গ্রহীতা" বলিতেই হয়,

তাঁহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান্ সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।

সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের সৃষ্টি হইলে পর সামাজিক নিয়মগুলি অবশ্য সমাজপতিদের মনোমত হইল। ইহাও স্বাভাবিক। "জোর যার মুলুক তার"। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অবনতির জন্য কে দোষী?

আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য

সেইরূপ একজনকে "স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর" বলিলে অপরকে "দাসী" না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন? যদি বলেন স্ত্রী পতি-প্রেম-পাশে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সেবিকা হইয়াছেন, তবে ওরূপ সেবাব্রত গ্রহণে অবশ্য কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষও কি ঐরূপ পারিবারিক প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতিপালনরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই? দরিদ্রতম মজুরটিও সমস্ত দিন অনশনে পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় দুই এক আনা পয়সা পারিশ্রমিক পাইলে বাজারে গিয়া প্রথমে নিজের উদর-সেবার জন্য দুই পয়সার মুড়ি মুড়কীর শ্রাদ্ধ করে না। বরং তদ্দ্বারা চাউল ডাউল কিনিয়া পত্নীকে আনিয়া দেয়। পত্নীটি রন্ধনের পর "স্বামী"কে যে 'একমুঠা,-আধপেটা অন্নদান করে, পতি বেচারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। কি চমৎকার আত্মত্যাগ। সমাজ তবু বিবাহিত পুরুষকে "প্রেম-দাস" না বলিয়া স্বামী বলে কেন?

হাঁ, আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িল; যে সকল দেবী স্ত্রীকে "দাসী" বলায় আপত্তি করেন এবং কথায় কথায় সীতা সাবিত্রীর দোহাই দেন তাঁহারা কি জানেন না যে, হিন্দুসমাজেই এমন এক (বা ততোধিক) শ্রেণীর কুলীন আছেন, যাঁহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন? যাহাকে অর্থ দ্বারা "ক্রয়" করা হয়, তাহাকে "ক্রীতদাসী" ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? এস্থলে বরদিগের পাণবিক্রয়ের কথা কেহ উল্লেখ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণে "বর বিক্রয় হয়" এরূপ বলে না। বিশেষতঃ বরের পাণই বিক্রয় হয়, স্বয়ং বর বিক্রীত হন না। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের কথায় এ যুক্তি খাটে না; কারণ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার এমন বিশেষ কোন গুণ বা 'পাণ' থাকে না, যাহা বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং বালিকা স্বয়ং বিক্রীতা হয়!! একদা কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণীর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে ঐ কথা উঠায়, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কেন ওঁদের সমকক্ষ কুলীন কি পাওয়া যায় না যে মেয়ে কিনতে হয়?" তদুত্তরে মহিলাটি বলিয়াছিলেন, "পাওয়া যাবে না কেন? ওদের ঐ কেনা-বেচাই নিয়ম। এ যেমন ওর বোন কিনে বিয়ে ক'রলে, আবার এর বোনকে আর একজনে কিনে নিয়ে বিয়ে ক'রবে।"

ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল।* তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ-নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না। কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dog-collar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে। অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কন্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি "হার পরিয়াছি"। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ী" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে "স্বামী"র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনী! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আবার মজা দেখুন, যাঁহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যা গণ্যা!

এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে! তাই দরিদ্রা কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ি না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন সার্থক করে। যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মত হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই! অভ্যাসের কি অপার মহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভাল লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদক দ্রব্যে যতই সর্বনাশ হউক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না। সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়াও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি—গর্বে স্ফীতা হই।

অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন কোন ভগ্নী আমাকে পুরুষ-পক্ষেরই গুপ্তচর মনে করিতে পারেন। অর্থাৎ ভাবিবেন যে, আমি পুরুষদের টাকা স্বর্ণকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হয়ত এরূপ কৌশলে ভগ্নী-

---

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম বা বিশেষ কোন লোকের উল্লেখ করিবার আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কুতার্কিকদিগের কুতর্ক নিবারণের নিমিত্ত এইরূপ ক্রীতদাসী ওরফে দেবীর প্রমাণ দিতে বাধ্য হইলাম। এইজন্য আমরা নিজেই দুঃখিত। কিন্তু কর্তব্য অবশ্যপালনীয়।

* পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক শমস্-উল-ওলামা (জাকাউল্লা সাহেব) বলেন "নথ নাকেল এর (নাকাদড়ীর)-ই রূপান্তর।"

দিগকে অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহা নয়, আমি আপনাদের জন্যই দু'কথা বলিতে চাই। যদি অলঙ্কারের উদ্দেশ্য পুরুষদের টাকার শ্রাদ্ধ করাই হয়, তবে টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে। দুই একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

আপনার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ীর আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যান, তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য হার পরাইতে পারেন! বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পর্দার কড়া (drawing room-এর curtain ring) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই "স্বামী" নামধারী নরবরের টাকার বেশ শ্রাদ্ধ হইবে!! অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্য দেখান বইত নয়। ঐরূপে ঐশ্বর্য্য দেখাইবেন। নিজের শরীরে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিবেন কেন? উক্ত প্রকারে গহনার সদ্ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম লোকে আপনাকে পাগল বলিবে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিলেই চলিবে।* এ পোড়া সংসারে কোন্ ভাল কাজটা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে? "পৃথিবীর গতি আছে"এই কথা বলাতে মহাত্মা গ্যালিলিও (Galileo)কে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধুলোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভাল কথা বা ভাল কাজের বর্ত্তমানে আদর হয় না।

বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্যবর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক্ দুর্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোন বিষয়ে তর্ক কবিতে গেলে বলেন, "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব"! কবিবর সা'দী পুরুষদের উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, "আয় মরদাঁ বকুশিদ্, জামা-এ-জানাঁ ন পুষিদ"। অর্থাৎ 'হে বীরগণ! (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীর পোষাক পরিও না।' আমাদের পোষাক পরিলে তাহাদের অপমান হয়। দেখা যাউক সে পোষাকটা কি—কাপড় ত তাঁহাদের ও আমাদের প্রায় একই প্রকার। একখণ্ড ধুতি ও একখণ্ড সাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুমাত্র তারতম্য আছে কি? যে দেশে পুরুষ পা-জামা পরে, সে দেশে নারীও পা-জামা

* অলঙ্কার পরা ও উক্তরূপে টাকার শ্রাদ্ধ করা একই কথা। কিন্তু আশা করা যায় যে উক্ত প্রকারে টাকার শ্রাদ্ধ না করিয়া টাকার সদ্ব্যয় করাই অনেকে ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন।

পরে। "Ladies's jacket" শুনা যায়, "Gentlemen's jacket"ও শুনিতে পাই! তবে "জামা-এ-জানা" বলিলে কাপড় না বুঝাইয়া সম্ভবতঃ রমণীসুলভ দুর্বলতা বুঝায়।

পুরুষজাতি বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া-ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলতঃ তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্য্য-লোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি। তাঁহারা আরও বলেন, "তাহাদের সুখের সামগ্রী, আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব—আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন?" আমরা ঐ শ্রেণীর বক্তাকে তাঁহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই; কিন্তু ভ্রাতঃ! পোড়া সংসারটা কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে—ইহা জটিল কুটিল কঠোর সংসার! সত্য বস্তু—কবিতা নহে—

"কাব্য উপন্যাস নহে—এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে—ইহা প্রকৃত ভবন—"

তাই যা কিছু মুস্কিল!! নতুবা আপনাদের কৃপায় আমাদের কোন অভাব হইত না। বঙ্গবালা আপনাদের কল্পিত বর্ণনা অনুসারে "ক্ষীণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, অবলা, ভয়-বিহ্বলা—" ইত্যাদি হইতে হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর (Aerial body) প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পরূপে অনায়াসে আকাশে বিলীন হইতে পারিতেন!! কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ সুখের নহে; তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই—

"অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।"

বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা উই-এর ভোগ্য হয়। কবি বেশ বলিয়াছেন—

"কেন নিবে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে,
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি,

সুতরাং দেখা যায়, তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্বনাশের কারণ।

বিপৎসঙ্কুল সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভর ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী

হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদে রোদন করিয়া থাকি!! ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের "নাকি কান্নার" কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।*

ব্যাঘ্র ভল্লুক ত দূরে থাকুক, আরসুলা জলৌকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই! এমন কি অনেকে মূর্চ্ছিতা হন। একটি ৯।১০ বৎসরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়ীশুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চীৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি

* সেদিন (গত ৯ই এপ্রিলের) একখানা উর্দু কাগজে দেখিলাম:—

তুরস্কের স্ত্রীলোকেরা সুলতান-সমীপে আবেদন করিয়াছেন যে, "চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা ব্যতীত আমাদের আর কোন কাজ নাই। আমাদিগকে অন্ততঃ এ পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হউক, যাহার সাহায্যে যুদ্ধের সময় আমরা আপন আপন বাটি এবং নগর পুরুষদের মত বন্দুক কামান দ্বারা রক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা ঐ আবেদনে নিম্নলিখিত উপকারগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন:—

(১) প্রধান উপকার এই যে, নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ায় যে ক্ষতি হয়, তাহা আর হইবে না। (যেহেতু "অবলা"গণ নগর রক্ষা করিবেন।)

(২) সন্তানসন্ততিবর্গ শৈশব হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হইবে। পিতামাতা উভয়ে সেপাহী হইলে শিশুগণ ভীরু, কাপুরুষ হইবে না।

(৩) তাঁহারা বিশেষ এক নমুনার উর্দি (uniform) প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশ এবং সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিবে।

(৪) অবরোধপ্রথার সম্মান রক্ষার্থে এই স্থির হইয়াছে যে, অন্ততঃ তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরিবারের সৈনিক পুরুষেরা আপন আপন আত্মীয় রমণীদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য ঘরে ঘরে দেখা দিবেন। উক্ত মহিলাগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমরা উর্দির (uniform-এর) খরচের জন্য গবর্ণমেণ্টকে কষ্ট দিব না। কেবল বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সরকার হইতে পাইতে আশা করি।" দেখা যাউক, সুলতান মহোদয় এ দরখাস্তের কি উত্তর দেন।

উপরোক্ত সংবাদ সত্য কি না, সেজন্য সেই পত্রিকাখানি দায়ী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তুরস্ক-রমণীদের ওরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। ইতিহাসে শুনা যায়, পূর্ব্বে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। একটা যেমন তেমন "মুসলমানী পুঁথির" পাতা উল্টাইলেও আমরা দেখিতে

সহাস্যে বোতল হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাসা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি—আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় বরং আমোদ বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।

ভীরুতার চিত্র ত দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় "অচেতন পদার্থ" হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing room-এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা! আপনি কখন বেহারের কোন ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝি নামধেয় জড়পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটি বধূবেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইহাঁকে কোন প্রসিদ্ধ যাদুঘরে (museum-এ) বসাইয়া রাখিলে রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে (পর্দার অনুরোধে?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরীতে পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বানাত মণ্ডিত তক্তপোষ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উঁহাই দুলহিন্ বেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)। ইহার সর্বাঙ্গে ১০২৪০৲ টাকার অলঙ্কার! শরীরের কোন্ অংশে কত ভরি সোনা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

১। মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্ধ সের (৪০ ভরি)।
২। কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি)।
৩। কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা)।
৪। সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের [১৫০ ভরি]।

পাই—(যুদ্ধ করিতে যাইয়া)—

"জয়গুন নামে বাদশাহ্জাদী কয়েদ হইল যদি,
আর যত আরবা সওয়ার" ইত্যাদি।

বলি, এদেশের যে সমাজপতিগণ "লেডীকেরানী" হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked হন)—যাঁহারা অবলার হস্তে পুতুল সাজান ও ফুলের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যের ভার দেওয়ার কল্পনাই করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ লেডীযোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কি করিবেন? মূর্ছা যাইবেন না ত?

৫। কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)।

৬। চরণযুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা!!

বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাস সার্দ্ধ চারি ইঞ্চি।* পরিহিত পা-জামা বেচারা সল্মা চুম্‌কির কারুকার্য ও বিবিধ প্রকারের (গোটা পাটার) ভারে অবনত! আর পা-জামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভারে বেচারী বধূ ক্লান্ত!

ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়পদার্থ না হইয়া কি করিবেন? সর্বদাই তাঁহার মাথা ধরে; ইহার কারণ ত্রিবিধ—(১) সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কষিয়া বেশবিন্যাস, (২) বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, (৩) অর্দ্ধেক মাথায় আটা-সংযোগে আফ্‌শাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুম্‌কি বসান হইয়াছে, ভ্রূযুগ চুম্‌কি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙ্গের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা-সংযোগে বসান হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।

এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটি হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ তাঁহার চির সহচর। শরীরে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্ত্তি থাকে না। সুতরাং ইঁহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চির-রোগী। এমন স্বাস্থ্য লইয়া চিররোগী জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কি মনে হয়? আমরা নিজের ও অপরের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিলে যে শিক্ষালাভ করি, ইহাই প্রকৃত ধর্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাখী শাখী হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটি আতার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালিন কোন পুস্তকে ছিল না। ঐ বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইলাম। যাহা হউক, আমি উক্ত বধূবেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, "অভাগীর ইহলোক-পরলোক—উভয়ই নষ্ট।" যদি ঈশ্বর হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, "তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" তাহার উত্তরে বেগম কি বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ীর একটি মেয়েকে বলিলাম, "তুমি যে হস্ত পদ দ্বারা কোন পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কি জওয়াবদিহি

---

*কোন কোন নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চি এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৯ ইঞ্চি হয়। তখন এক হাতে

(explanation) দিবে ?" সে বলিল, 'আপ্‌কা কহ্‌না ঠিক হ্যায়'—এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলা-ফেরা করে, আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, "শুধু ঘুরা-ফেরা করিলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্ততঃ আধ ঘন্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।" দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে হাসির একটা গর্‌রা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম, "উল্টা বুঝ্‌লি রাম!" কোন বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূরে—ভরসা কেবল পতিতপাবন।

আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে-না-পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"।

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরী গ্রহণ অসম্ভব; সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফাঁকা তর্কের অনুরোধে আবার কোন নেটীভ খ্রীস্টিয়ান হয় ত মনে করিবেন যে, রমণীর জ্ঞান-পিপাসাই মানবজাতির অধঃপাতের কারণ। যেহেতু শাস্ত্রে (Genesis-এ) দেখা যায়, আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন।*

*পরন্তু ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের বিশ্বাস যে, Eve অভিশপ্তা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যীশু-খ্রীস্ট আসিয়া নারীজাতিকে সে অভিশাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "Through woman came curse and sin; and through woman came blessing and salvation also." ভাবার্থ—নারীর দোষে জগতে অভিশাপ ও পাপ আসিয়াছে এবং নারীর কল্যাণেই আশীর্বাদ এবং মুক্তিও আসিয়াছে। পুরুষ খ্রীস্টের পিতা হয় নাই, কিন্তু রমণী যীশু খ্রীস্টের মাতৃপদ প্রাপ্তে গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

যাহা হউক "শিক্ষার" অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের "অন্ধ অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষুদ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি—তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশ করা বিদ্যা"-কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তি বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি:

যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ্ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা—বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal); কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন, ভগিনি! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা-মাণিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব?

মনে করুন, আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জনী দিয়া বলিলেন, "যা, আমার অমুক বাড়ী পরিষ্কার রাখিস্।" দাসী সম্মার্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল—কোন কালে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ী ক্রমে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল! অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ীর দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কি হইবে? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ী পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুশী হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে—এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিতপাবন"; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that help themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।* ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাই:

"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি।"

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে, জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি।** (এবং

* বঙ্গীয় কোন কোন সমাজের স্ত্রীলোক যে স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে—ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

** সমাজের সবজান্তা (reasonable) পুরুষেরা প্রাণদণ্ডের বিধান নাও দিতে পারেন, কিন্তু "unreasonable" অবলাসরলাগণ (যাঁহারা যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না,: তাঁহারা) শতমুখী ও আঁইস-বঁটির ব্যবস্থা নিশ্চয় দিবেন, জানি!!

ভগ্নীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি।) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত, কোন ভালো কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে ["but nevertheless it (Earth) does move"]!! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পার্সী নারীদের একটি উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি এক খণ্ড উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনূদিত হইল:

এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সী মহিলাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্বে ইহার নাম মাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দায় (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন!! গাড়ীর ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজিকালি পার্সী মহিলাগণ পর্দা ছাড়িয়াছেন! খোলা গাড়ীতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পর্দার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংস-কাল উপস্থিত হইল"!

কই পৃথিবী ত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও,—সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা* লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়,

*আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ। একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র,

তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্ট্রার, লেডী-জজ—সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রানী" করিয়া ফেলিব!! উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?**

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশী, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২৲ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১৲ পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩৲ আর চাকরাণীর খোরাকী ২৲। অবশ্য কখন কখন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশী পাইতেও দেখা যায়।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীন বুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার

আমরা সমাজের কন্যা! আমরা ইহা বলি না যে, "কুমারের মাথায় যেমন উষ্ণীষ দিয়াছেন, কুমারীর মাথায়ও তাহাই দিবেন।" বরং এই বলি, কুমারের মস্তক শিরস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয় করা হয়, কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়নাখানা প্রস্তুতের নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।"

**কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে কেন? কৃষক-প্রজা থাকিতে জমীদার কাঁধে লাঙ্গল লইবেন কেন? শুধু রাজার চাকর ছাড়া আর কিছু উচ্চদরের কার্য কি আমরা করিতে পারি না? কেরানী ইত্যাদির কথা কেবল উদাহরণ স্বরূপ বলা হইল। যেমন স্বর্গের বর্ণনায় বলিতে হয়—সেখানে শীত নাই,—গ্রীষ্ম নাই, কেবল চির বসন্ত বিরাজমান থাকে। স্বর্গোদ্যানে মরকত-লতিকায় হীরক-প্রসূন ফোটে!! তাই আমাদের উচ্চ আশা বুঝাইবার নিমিত্ত লেডী-ভাইসরয় হইবার কথা না বলিলে কিসের সহিত আমাদের সে উচ্চদরের কার্যের উপমা দিব?

আবার ইহাও বলি, লেডী-কেরানী হওয়ার কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয় না। আমেরিকায় লেডী-কেরানী বা লেডী-ব্যারিষ্টার প্রভৃতি বিরল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল, যখন অন্যান্য দেশের মুসলমান সমাজে "স্ত্রী-কবি, স্ত্রী-দার্শনিক, স্ত্রী-ঐতিহাসিক, স্ত্রী-বৈজ্ঞানিক, স্ত্রী-বক্তা, স্ত্রী-চিকিৎসক, স্ত্রী-রাজনীতিবিদ্" প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোসলেম-সমাজে ওরূপ রমণীরত্ন নাই।

জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

ভরসা করি আমাদের সুযোগ্যা ভগ্নীগণ এবিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

নিরীহ বাঙ্গালী

আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙ্গালী কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা—এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালী গঠিত হইয়াছে, আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্তিমতী কবিতা—যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজী ধরনের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা (drawing room) এবং বাঙ্গালী তাহাতে সাজসজ্জা (drawing room suit) ! যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহাতে পদ্মিনী ! যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহার নায়িকা ! ভারতের পুরুষসমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা !!* অতএব আমরা মূর্তিমান কাব্য ।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি,—পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল—অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি—ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত, ক্ষীর সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা—অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁঠাল—রসাল এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক—সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেহে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন পোষাক-পরিচ্ছদের কথা বলি।

আমাদের বর অঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনিগঠিত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধুতি ও চাদর। ইহাতে বায়ুসঞ্চলনের (Ventilation-এর) কোন বাধা-বিঘ্ন হয় না! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোট শার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্ধাঙ্গী—হেমাঙ্গী, কৃশাঙ্গিগণ তদনুকরণে ইংরাজ-ললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম "হাওয়ার শাড়ী" পরেন। বাঙ্গালীর সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলভ্য।

বাঙ্গালীর গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসী, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুই চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়, বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্দবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত

*"নায়িকা" বলিয়া আমি ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ করি নাই। কারণ, অনেকে বাঙ্গালী পুরুষকে "বেচারী" বলে। উর্দু ভাষায় পুরুষকে "বেচারা" ও স্ত্রীলোককে "বেচারী" বলে। যদি আমরা "বেচারী" হইতে পারি, তবে "পদ্মিনী", "নায়িকা ও পুরুষিকা" হইলে দোষ কি?

অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াস-সাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জন করিয়াছি। এই জন্য আমাদের দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিস নাই, শুধু বিলাস-দ্রব্য—নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার রোগবর্দ্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিত্তলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটি, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটি সোনা-রূপা ব হীরা-জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষতঃ আজি কালি কোন্ জিনিসটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক "দীর্ঘকেশী" তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে "হ্রস্বকেশী" তৈল আবিষ্কার করি। যদি কেহ "কৃষ্ণকেশী" তৈল বিক্রয় করেন, তবে আমরা "শুভ্রকেশী" বাহির করি। "কুন্তলীনের" সঙ্গে "কেশলীন" বিক্রয় হয়। বাজারে "মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী" ঔষধ আছে, "মস্তিষ্ক উষ্ণকারী" দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়—পাশ বিক্রয়। এই পাশ বিক্রেতার নাম "বর" এবং ক্রেতাকে "শ্বশুর" বলে। এক একটি পাশের মূল্য কত জান? "অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এম, এ, পাশ অমূল্যরত্ন, ইহা যে সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য—এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কিনা, তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুন্ঠন করা সহজ।

এখন কৃষিকার্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্ন বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কৃষিবিভাগের কার্য (Agriculture) করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্বর (Brain culture) করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থ বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ। এবং কৃষিকার্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M. R. A. C. পাশ করা সহজ। আইনচর্চা করা অপেক্ষা কৃষি-বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া দুর্ভিক্ষ

সমাচার (Famine Report) পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না। দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তা'তে আমাদের কি?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকি। যথা—

(১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা "রাজা" উপাধি লাভ সহজ।

(২) শিল্পকার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B. Sc. ও D. Sc. পাশ করা সহজ।

(৩) অল্পবিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভ জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।

(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক-দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা, বিদেশীয় বড় লোকদের মৃত্যুদুঃখে "শোক সভার" সভ্য হওয়া সহজ।

(৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা, আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।

(৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য বর্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্ক গণ্ডে!) কালিডোর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, Milk of Rose ও Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।

(৮) কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্তিমান আলস্য—আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নির উত্তাপ সহিবেন? আমরা কোমলাঙ্গ—তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা; আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিব্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে (১) তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর (২) জবেহ্ কর, তারপর (৩) ফাঁসী দাও!!

আমরা সকলেই কবি—আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশী। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশী। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশী বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন বিষয়টা বাদ দিই? "ভগ্ন শূর্প", "জীর্ণ কাঁথা", "পুরাতন চটিজুতা"—কিছুই পরিত্যজ্য নহে। আমরা আবার কত নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি; যথা—"অতি শুভ্রনীলাম্বর", "সাশ্রুসজল নয়ন" ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপ-প্রলাপপূর্ণ পদ্যের "অশ্রুজলের" বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে! সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।*

অর্ধাঙ্গী

কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক। তাই অবলাজাতির উন্নতির পথ আবিষ্কার করিবার পূর্বে তাহাদের অবনতির চিত্র দেখাইতে হয়। আমি "স্ত্রীজাতির অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধে ভগিনীদিগকে জানাইয়াছি যে, আমাদের একটা রোগ আছে—দাসত্ব। সে রোগের কারণ এবং অবস্থা কতক পরিমাণে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, সেই রোগ হওয়ায় আমাদের সামাজিক অবস্থা কেমন বিকৃত হইয়াছে। ঔষধ পথ্যের বিধান স্থানান্তরে দেওয়া হইবে।

এইখানে গোঁড়া পর্দাপ্রিয় ভগ্নীদের অবগতির জন্য দু একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে পর্দা-বিদ্বেষ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে, আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই।

*গত ১৩১০ সালে "নিরীহ বাঙ্গালী" লিখিত হইয়াছে। সুখের বিষয় বর্তমান সালে আর বাঙ্গালী "পুরুষিকা" নহেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন শুভ পরিবর্তন হইবে, ইহা কে জানিত? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমরা সাহসী বাঙ্গালী।

সে প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারীজাতির উল্লেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধে বন্দিনী থাকেন? অথবা তাঁহারা পর্দানশীন নহেন বলিয়া কি আমি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি? আমি মানসিক দাসত্বের (enslaved মনের) আলোচনা করিয়াছি।

কোন একটা নূতন কাজ করিতে গেলে সমাজ প্রথমতঃ গোলযোগ উপস্থিত করে, এবং পরে সেই নূতন চালচলন সহিয়া লয়, তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ পার্সী মহিলাদের পরিবর্তিত অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বে তাঁহারা ছত্র ব্যবহারেরও অধিকারিণী ছিলেন না, তারপর তাঁহাদের বাড়াবাড়িটা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তবু ত পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই। এখন পার্সী মহিলাদের পর্দামোচন হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধি-বিবেচনার ত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পার্শী পুরুষগণ কেবল অন্ধভাবে বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ত্রীদিগকে পর্দার বাহিরে আনিয়াছে, ইহাতে অবলাদের জীবনীশক্তির ত কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—তাঁহারা যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরুষ যখন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখিতেন, তাঁহারা তখন সেইখানে থাকিতেন। আবার পুরুষ যখন তাঁহাদের "নাকের দড়ী" ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা পর্দার বাহির হইয়াছেন! ইহাতে রমণীকুলের বাহাদুরী কি? ঐরূপ পর্দা-বিরোধ কখনই প্রশংসনীয় নহে।

কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন লোকে তাঁহাকে বাতুল বলে নাই কি? নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, ইহাও বাতুলতা বই আর কি?

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না। লোকে কালী, শীতলা প্রভৃতি রাক্ষস-প্রকৃতির দেবীকে ভয় করে, পূজা করে, সত্য। কিন্তু সেইরূপ বাঘিনী, নাগিনী, সিংহী প্রভৃতি "দেবী"ও কি ভয় ও পূজা লাভ করে না? তবেই দেখা যায় পূজাটা কে পাইতেছেন,—রমণী কালী, না রাক্ষসী নৃমুণ্ডমালিনী?

নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পর্দানশীন ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী, রানী, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক,—সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি

পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে-সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালোবাসিতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়গহস্ত হইতে পারে; হারান পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলিয়া দিতে পারে,—কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ, হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ। বালক তাহার পতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে!!

রামচন্দ্র "স্বামিত্বের" ষোল আনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা?—কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব-শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেননা, বুঝিয়া কার্য করিতে গেলে স্বামিত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যাইত না;—সীতার অমন পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের পদাঘাতে দলিত ও চূর্ণ করিতে পারা যাইত না!

আচ্ছা, দেশ কালের নিয়মানুসারে কবির ভাষায় স্বর মিলাইয়া না হয় মানিয়া লই যে, আমরা স্বামীর দাসী নহি—অর্ধাঙ্গী। আমরা তাঁহাদের গৃহে গৃহিণী, মরণে (না হয়, অন্ততঃ তাঁহাদের চাকুরী উপলক্ষে যথা তথা) অনুগামিনী, সুখ-দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্যা সহচরী ইত্যাদি।

কিন্তু কলিযুগে আমাদের ন্যায় অর্ধাঙ্গী লইয়া পুরুষগণ কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছেন, তাহা কি কেহ একটু চিন্তাচক্ষে দেখিয়াছেন? আক্ষেপের (অথবা "প্রভু"দের সৌভাগ্যের) বিষয় যে, আমি চিত্রকর নহি—নতুবা এই নারীরূপ অর্ধাঙ্গ লইয়া তাঁহাদের কেমন অপরূপ মূর্তি হইয়াছে, তাহা আঁকিয়া দেখাইতাম।

শুক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ বলেন যে, আমাদের সাংসারিক জীবনটা দ্বিচক্র শকটের ন্যায়—ঐ শকটের এক চক্র পতি, অপরটি পত্নী। তাই ইংরাজী ভাষায় কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিনী ("partner"), উত্তমার্ধ ("better half") ইত্যাদি বলে। জীবনের কর্তব্য অতি গুরুতর, সহজ নহে—

"সুকঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার
সুশৃঙ্খলে কে পারে চালাতে?
রাজ্যশাসনের রীতি নীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।"

বোধ হয় এই গার্হস্থ্য ব্যাপারটাকে মস্তকস্বরূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে তাহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়াছেন। তবে দেখা যাউক বর্তমান যুগে সমাজের মূর্তিটা কেমন।

মনে করুন, কোন স্থানে পূর্বদিকে একটি বৃহৎ দর্পণ আছে, যাহাতে আপনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আপনার দক্ষিণাঙ্গভাগ পুরুষ এবং বামাঙ্গভাগ স্ত্রী। এই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখুন—

আপনার দক্ষিণ বাহু দীর্ঘ (ত্রিশ ইঞ্চি) এব স্থূল, বামবাহু দৈর্ঘ্যে চব্বিশ ইঞ্চি এবং ক্ষীণ। দক্ষিণ চরণ দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি, বাম চরণ অতিশয় ক্ষুদ্র। দক্ষিণ স্কন্ধ উচ্চতায় পাঁচ ফিট, বাম স্কন্ধ উচ্চতায় চারি ফিট। (তবেই মাথাটা সোজা থাকিতে পারে না, বাম দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছে। কিন্তু আবার দক্ষিণ কর্ণ-ভারে বিপরীত দিকেও একটু ঝুকিয়াছে।) দক্ষিণ কর্ণ হস্তিকর্ণের ন্যায় বৃহৎ, বাম কর্ণ রাসভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ। দেখুন!—ভাল করিয়া দেখুন, আপনার মূর্তিটা কেমন!! যদি এ মূর্তিটা অনেকের মনোমত না হয়, তবে দ্বিচক্র শটকের গতি দেখাই। যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না;—সে কেবল একই স্থানে (গৃহ-কোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

সমাজের বিধি-ব্যবস্থা আমাদিগকে তাঁহাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়াছে; তাঁহাদের সুখ-দুঃখ এক প্রকার, আমাদের সুখ-দুঃখ অন্য প্রকার। এস্থলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নবদম্পতীর প্রেমালাপ" কবিতার দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম:

"বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া?
"কনে। পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

* * *

"বর। কি করিছ বনে কুঞ্জভবনে?
"কনে। খেতেছি বসিয়া টোপা কুল।

* * *

"বর। জগৎ ছানিয়া, কি দিব আনিয়া জীবন করি ক্ষয়?
তোমা তরে সখি, বল করিব কি?
"কনে। আরো কুল পাড় গোটা ছয়।

* * *

"বর। বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?
"কনে। দেব পুতুলের বিয়ে।"

সুতরাং দেখা যায় কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্যা সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর "বোধোদয়" পর্যন্ত।

স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা-বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্মিনী কই? বোধ হয়, গৃহিণী যদি আপনার সঙ্গে সূর্যমণ্ডলে যান, তবে তথায় পঁহুছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন। তবে সেখানে গৃহিণীর না যাওয়াই ভাল!!

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্য-চোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই-চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশী আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ. এ., বি. এ. পাশ হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে! তাহাদের বিদ্যা পরীক্ষায় এ কথার সত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে।*

* "দাসী" পত্রিকা হইতে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না—

প্রশ্ন। When was Cromwell born (ক্রমওয়েলের জন্ম কখন হইয়াছিল)?

উত্তর। In the year 1649 when he was fourteen years old ১৬৪৯ সালে যখন তিনি চৌদ্দ বৎসরের ছিলেন)।

প্রশ্ন। Describe his continental policy (তাঁহার রাষ্ট্রীয় নীতি বর্ণনা কর)।

উত্তর। He was honest and truthful and he had nine children (তিনি সাধু প্রকৃতি এবং সত্যবাদী ছিলেন এবং তাঁহার নয়জন সন্তানসন্ততি ছিল)।

আমার অনৈক বন্ধু তাঁহার ছাত্রকে উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিঙ্‌নির্ণয়ের কথা (cardinal points) বুঝাইতেছিলেন। শেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন, যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত পশ্চিমে এবং বাম হস্ত পূর্বে থাকে, তবে তোমার মুখ কোন্‌ দিকে হইবে?" উত্তর পাইলেন, "আমার পশ্চাৎ দিকে।"

যাঁহারা কন্যাব ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট "পাহল-ওয়ান" দেখিতে চাহেন কি না? তাঁহাদের দৌহিত্র ঘুষিটা খাইয়া থাপড়টা মারিতে পারে, এরূপ ইচ্ছা করেন কি না? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁহাবা সুকুমারী গোলাপ-লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!! আর যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে দৌহিত্রও বলিষ্ঠ না হয়, বরং পয়জার পেটা হইয়া নত মস্তকে উচৈচঃস্বরে বলে, "মাৎ মারো! চোট্‌ লাগ্‌তা হায়!!" এবং পয়জার লাভ শেষ হইলে দূরে গিয়া প্রহারকর্তাকে শাসাইয়া বলে যে, "কায় মারতা থা? হাম নালিশ করেগা।" তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আমাব বক্তব্য বুঝাইতে অক্ষম।

খ্রীস্টিয়ান-সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদেব মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্দ্ধই (Better half) তাঁহার অংশীর (Partner-এর) জীবনে আপন জীবন মিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া যান না। স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নূতন টুপীর (bonnet-এব) চিন্তা করিতেছেন। কারণ তাঁহাকে কেবল মূর্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য (prosaic) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

প্রশ্ন। What is the adjective of ass (গর্দভের বিশেষণ কি)?

উত্তর। Assansole (আসানসোল)।

প্রশ্ন। Who was Chandra Gupta (চন্দ্রগুপ্ত কে)?

উত্তর। Chandra Gupta was the grand daughter of Asoka (চন্দ্রগুপ্ত অশোকের দৌহিত্রী)।

"পরীক্ষারহস্য। 'কলা ঝলসাইতে লাগিল' ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, 'roasted some plantations'? আর একজন লিখিয়াছেন, 'roasted some plantagenets'; অপর একজন লিখিয়াছেন, 'roasted some plaintiffs' কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা কল্পিত উত্তর। সত্য সত্যই এরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে।"

এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক : মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের "অর্দ্ধেক", অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্যা। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা "আড়াই জন" হই। আপনারা "মহম্মদীয় আইনে" দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমীদারী পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন, কার্যতঃ কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।

আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশী। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্দ্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারি জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি. এ. পর্যন্ত) পাশ করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাশ (এণ্ট্রান্স পাশ ও এফ. এ. ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না। যেস্থলে ভ্রাতা "শমস্-উল-ওলামা"* সেস্থলে ভগিনী "নজম্-উল্-ওলামা" হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্তঃপুর-গগনে অসংখ্য "নজমন্নেসা" "শামসন্নেসা" শোভা পাইতেছেন বটে। কিন্তু আমরা সাহিত্য-গগনে "নজম্-উল্-ওলামা" দেখিতে চাই।

আমাদের জন্য এ দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ—প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরআন শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখীর মত আবৃত্তি কর। কোন পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে "হাফেজা" করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কোরআনখানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই "হাফেজ"। আমাদের আরবী শিক্ষা ঐ পর্যন্ত। পারস্য এবং উর্দু শিখিতে হইলে, প্রথমেই "করিমা ববখশা এ বরহালে মা" এবং একেবারে (উর্দু) "বানাতন্ নাস্" পড়।** একে আকার

* "শমস্-উল্-ওলামা", পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ঐ শব্দগুলির অনুবাদ এইরূপ হয়—শমস্, Sun ; ওলামা, ("আলম" শব্দের বহুবচন) learned men. এইরূপ নজম্-উল্-ওলামা অর্থে the "star" of the learned men (বা women) বুঝিতে হইবে।

**এইখানে একটি দশম বর্ষের বালিকার গল্প মনে পড়িল। পল্লীগ্রামে অনেকের বাড়ী ধান ভানিবার জন্য "ভানানী" নিযুক্ত হয়। সেই বালিকা "বানাতন্ নাস্" পড়িতে যাইয়া হোসেন-

ইকার নাই, তাতে আবার আর কোন সহজ পাঠ্যপুস্তক পূর্বে পড়া হয় নাই, সুতরাং পাঠের গতি দ্রুতগামী হয় না। অনেকের ঐ কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই কন্যা-জীবন শেষ হয়। বিবাহ হইলে বালিকা ভাবে, "যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল।" কোন কোন বালিকা রন্ধন ও সূচীকর্মে সুনিপুণা হয়। বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সলমা চুমকির কারুকার্য, উলের জুতা-মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্যন্ত।

যদি ধর্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) আপনাদের হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, "তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ?" তবে আপনারা কি বলিবেন?

পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশী অত্যাচার-অনাচার করিয়াছে, তখনই এক-একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল; আরববাসিগণ কন্যাহত্যা করিতেছিল, তখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কন্যাকুলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমা-ময় করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।

আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা। তবে আইস ভগিনীগণ! আমরা সকলে সমস্বরে বলি:

"করিমা ববখ্শা-এ বরহালে মা।" করিম (ঈশ্বর) অবশ্যই কৃপা করিবেন। যেহেতু "সাধনায় সিদ্ধি।" আমরা 'করিমের' অনুগ্রহ লাভের জন্য যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব। আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের "অর্ধেক নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশমাস

আরার মেজাজের বর্ণনাটা হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষা ভানানীদের ধানভানা কাজটা সহজ মনে করিত। তাই সুযোগ পাইলেই সে ঢেঁকিশালে গিয়া দুই এক সের ধান্যের শ্রাদ্ধ করিত। সে ধান্য হইতে তণ্ডুল পরিষ্কার পাওয়া যাইত না—তাহা "whole meal" ময়দার ন্যায় ধান্য-তুষ-তণ্ডুল মিশ্রিত এক প্রকার অদ্ভুত সামগ্রী হইত। যে রোগীদের জন্য হোলমিল ময়দার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাঁহাদের জন্য উক্ত হোল-মিল-তণ্ডুলচূর্ণ অবশ্যই উপকারী খাদ্য, সন্দেহ নাই।

স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে. পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানী হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক। সেরূপ ত নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহ-মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃ-হৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী ? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন ?

আমি এবার রন্ধন ও সূচীকার্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আবার যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি সূচীকর্ম ও রন্ধনশিক্ষার বিরোধী। জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না। কারণ, জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন-না-কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্যপ্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদম্বিনীর "স্বামী", না কাদম্বিনী তরঙ্গিনীর "স্বামী" ? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি।

কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্য-প্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী ? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে "স্বামী" বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমান-দিগকে "স্বামী" ভাবিবেন কেন ?

আমরা উত্তমার্ধ (better halves) তাঁহারা নিকৃষ্টার্ধ (worse halves), আমরা অর্ধাঙ্গী, তাঁহারা অর্ধাঙ্গ। অবলার হাতেও সমাজের জীবন-মরণের কাঠি আছে, যেহেতু "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা কিম্বা তেজস্বিতা জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃমহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী না করেন।

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে

পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি। অনেক সময় "হাজার হোক ব্যাটা ছেলে" বলিয়া ব্যাটা ছেলেদের দোষ ক্ষমা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি। এই ত ভুল।*

আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রীস্টানকে খ্রীস্টানী ছাড়িতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

অনেকে হয়ত ভয় পাইয়াছেন যে, বোধ হয় একটা পত্নী-বিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন—শামলা, চোগা, আইন-কানুনের পাঁজি-পুঁথি লুঠিয়া লইবেন। অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে—নিশ্চিন্ত থাকুন।

পরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছি। ভারতে ভিক্ষু ও ধনবান—এই দুই দল লোক অলস; এবং ভদ্রমহিলার দল কর্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে। আমাদের আরাম-প্রিয়তা খুব বাড়িয়াছে। আমাদের হস্ত, মন, পদ, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। দশজন রমণীরত্ন একত্র হইলে ইহার উহার—বিশেষতঃ আপন আপন অর্ধাঙ্গের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাকপটুতা দেখায়। আবশ্যক হইলে কোন্দলও চলে।

আশা করি এখন "স্বামী" স্থলে "অর্ধাঙ্গ" শব্দ প্রচলিত হইবে।

---

*এস্থলে জনৈক নারীহিতৈষী মহাত্মার উদ্দু গাথা মনে পড়িল। তিনি (১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের কোন নাসিক পত্রিকায়) লিখিয়াছেন:

"জগতের তোমাদের নিন্দাগীতি এতদূর উচ্চরাগে গাওয়া গিয়াছে যে, শেষে তোমরাও জগতের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিলে যে, 'আমরা বাস্তবিক বিদ্যালাভের উপযুক্ত নহি।' সুতরাং মূর্খতার কুফল ভোগের নিমিত্ত তোমরা নত মস্তকে প্রস্তুত হইলে।"

কি চমৎকার সত্য কথা। জগদীশ্বর উক্ত কবিকে দীর্ঘজীবী করুন।

সুগৃহিণী

ইতিঃপূর্ব্বে আমি "স্ত্রী-জাতির অবনতি" প্রবন্ধে আমাদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু সত্য কথা সর্বদাই কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু বলিয়া অনেকে উহা পছন্দ করেন নাই।* অতঃপর "অর্ধাঙ্গী" প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নারী ও নর উভয়ে একই বস্তুর অঙ্গবিশেষ। যেমন একজনের দুইটি হাত কিংবা কোন শকটের দুইটি চক্র, সুতরাং উভয়ে সমতুল্য, অথবা উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি-লাভ করিতে পারিবে না। এক চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে লোকে কানা বলে।

যাহা হউক, আধ্যাত্মিক সমকক্ষতার ভাষা যদি স্ত্রীলোকেরা না বুঝেন, তবে উচ্চ আকাঙ্খা বা উচ্চভাবের কথায় কাজ নাই। আজি আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় আপনারা সমস্বরে বলিবেন,

"সুগৃহিণী হওয়া"

বেশ কথা। আশা করি, আপনারা সকলেই সুগৃহিণী হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সুগৃহিণী হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই। কারণ, আমাদের বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা আমরা লাভ করিতে পারি না। সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করেন। পুরুষ বিদ্যালাভ করেন অন্ন উপার্জনের আশায়, আমরা বিদ্যা-লাভ করিব কিসের আশায়? অনেকের মতে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমাদিগকে অন্ন-চিন্তা করিতে হয় না, সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকদ্দমা করিতে হয় না, চাকরীলাভের জন্য সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে হয় না, "নবাব "রাজা" উপাধিলাভের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খোসামোদ করিতে হয় না, কিংবা

---

* কেহ আবার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া সগর্বে বলিয়াছেন, "ভারতে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী, তাঁহারা নারীরই উপাসক।" বেশ। বলি, হিন্দুর আরাধ্য দেবতা কোন্ জিনিসটি নহে? পূজনীয় বস্তু বলিতে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ ইহার কোন্ পদার্থটিকে বাদ দেওয়া যায়? হনুমান এবং গো-জাতিও কি উপাস্য দেবতা নহে? তাই বলিয়া কি ঐ সকল পশুকে তাঁহাদের "উপাসক মানুষ" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে?

কোন সময়ে দেশরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইতে হইবে না। তবে আমরা উচচশিক্ষা লাভ (অথবা Mental culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental culture) আবশ্যক।

এই যে গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কার্যগুলি, ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্যও ত বিশেষ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্রী, কর্ত্রী ও বিধাত্রী, তাঁহারাই সমাজের গৃহলক্ষ্মী, ভগিনী এবং জননী।

ঘরকন্নার কাজগুলি প্রধানতঃ এই:

(ক) গৃহ এবং গৃহসামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা।
(খ) পরিমিত ব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহস্থালী সম্পন্ন করা।
(গ) রন্ধন ও পরিবেশন।
(ঘ) সূচিকর্ম।
(ঙ) পরিজনদিগকে যত্ন করা।
(চ) সন্তানপালন করা।

এখন দেখা যাউক, ঐ কার্যগুলি এদেশে কিরূপ হইয়া থাকে এবং কিরূপ হওয়া উচিত। আমরা ধনবান এবং নিঃস্বদিগকে ছাড়িয়া মধ্যম অবস্থার লোকের কথা বলিব।

গৃহখানা পরিষ্কার ও অল্পব্যয়ে সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিতে হইলে বুদ্ধির দরকার। প্রথমে গৃহনির্মাণের সময়ই গৃহিণীকে স্বীয় সলিকা * (taste) দেখাইতে হইবে। কোথায় একটি বাগান হইবে, কোন স্থানে রন্ধনশালা হইবে ইত্যাদি তাঁহারই পসন্দ অনুসারে হওয়া চাই। ভাড়াটে বাড়ী হইলে তাহার কোন্ কামরা কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে বিষয়ে সলিকা চাই। যেহেতু তিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু বলি, কয় জন গৃহিণীর এ জ্ঞান আছে? আমরা এমন গৃহিণী যে গৃহ-ব্যাপারই বুঝি না। আমাদের বিসমেল্লায়ই গলৎ।

*উর্দু ভাষায় "সলিকা" manner, taste, নিপুণতা, যোগ্যতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সলিকা শব্দের ন্যায় মেয়েলী ভাষায় "কাজের ছিরি" কথা চলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সলিকার সমুদয় ভাব প্রকাশ হয় না। তাই সুবিধার নিমিত্ত এ শব্দটাকে বাঙ্গালায় প্রবেশ করাইতে চাই। "আরজী" "তহবিল" "মাহসুল" (মাশুল) ইত্যাদি শব্দ বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। "সলিকা"ও চলুক। "সাহেবে সলিকা" অর্থে যাহার সলিকা আছে (Person of taste) বুঝায়।

গৃহ নির্ম্মাণের পর গৃহসামগ্রী চাই। তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার জন্যও সলিকা চাই। কোথায় কোন্ জিনিসটা থাকিলে মানায় ভাল, কোথায় কি মানায় না, এ সব বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। একটা মেয়েলী প্রবাদ আছে, "সেই ধান সেই চাউল, গিন্নী গুণে আউল ঝাউল" (এলো মেলো)। ভাঁড়ার ঘরে সচরাচর দেখা যায়, মাকড়সার জাল চাঁদোয়ারূপে শোভা পাইতেছে। তেঁতুলে তণ্ডুলে বেশ মেশামিশি হইয়া আছে, কোথাও ধনের সহিত মৌরী মিশিয়াছে। চিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। চারি দিক বন্ধ থাকে বলিয়া ভাড়ার ঘরের দ্বার খোলা মাত্র বদ্ধ বায়ুর এক প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। অভ্যাসের কৃপায় এ দুর্গন্ধ গিন্নিদের অপ্রিয় বোধ হয় না।

অনেক শ্রীমতী পান সাজিতে বসিয়া যাঁতির খোঁজ করেন; যাঁতি পাওয়া গেলে দেখেন পানগুলি ধোওয়া হয় নাই। পানের ডিবে কোন ছেলে কোথায় রাখে তার ঠিক নাই। কখন বা খয়ের ও চূণের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পান থাকে ঘটিতে, সুপারি থাকে একটা সাজিতে, খয়ের হয়ত থাকে কাপড়ের বাক্সে। অবশ্য 'সাহেবে সলিকা'গণ এরূপ করেন না। তাঁহাদের পানের সমস্ত জিনিস যথাস্থানে সুসজ্জিত থাকে।

কেহ বা চা'র পাত্র (tea-pot) মৎস্যাধাররূপে ব্যবহার করেন, ময়দা চালিবার চালনীতে পটল, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি কুটিয়া রাখা হয়। পিতলের বাটিতে তেঁতুলের আচার থাকে। পূর্ব্বে মুসলমানেরা "মোকাবা" (পাত্র বিশেষ, যাহাতে চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম থাকে) রাখিতেন, আজিকালি অনেকে toilet table রাখেন। ইঁহাদের "মোকাবায়" কিংবা টেবিলের উপর চিরুনী তৈল (toilet সামগ্রী) ছাড়া আরও অনেক জিনিস থাকে, যাহার সহিত কেশবিন্যাস সামগ্রীর (toilet-এর) কোন সম্পর্ক নাই।

পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগা পুরুষেরা টাকা উপার্জ্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এক একটি পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জ্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটুকাটব্য বলিবেন, কিন্তু একটু সহানুভূতি করেন কই? ঐ শ্রমার্জ্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পত্রের অন্নপ্রাশনে কেবল সাধ (আমোদ) আহ্লাদে ব্যয় করিবেন, অথবা অলঙ্কার গড়াইতে ঐ টাকা দ্বারা স্বর্ণকারের উদরপূর্ত্তি করিবেন। স্বামী বেচারা এক সময় চাকরীর আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, বহু আয়াসে সামান্য বেতনের চাকরী প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ-

পণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নূপুরের বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুনু ঝুনু রবে কাঁদিতে থাকে। হায় বালিকে! তোমার চরণশোভন সেই মল গড়াইতে তোমার পিতার হৃদয়ের কতখানি রক্ত শোষিত হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝ না।

স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করাই অর্থের সদ্ব্যবহার। ইউরোপীয় মহিলাদের কথার মূল্য বেশী, তাই একজন কাউনটেসের (Countess) উক্তি উদ্ধৃত করা গেল:

"The first point necessary to consider in the arrangement and ordering of a lady's household, is that everything should be on a scale exactly proportionate to her husband's income". (ভাবার্থ—বাড়ীঘর সাজাইবার সময় গৃহিণী সর্বপ্রথমে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন যে, তাঁহার গৃহস্থালীর যাবতীয় সামগ্রী যেন তাঁহার স্বামীর আয় অনুসারে প্রস্তুত হয়। তাঁহার গৃহসজ্জা দেখিয়া যেন তাঁহার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ঠিক অনুমান করা যাইতে পারে)।

সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আমরা টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে? গৃহিণীরা যে স্বামীকে ভালোবাসেন না, আমি ইহা বলিতেছি না। তাঁহারা স্বামীকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন, কিন্তু বুদ্ধি না থাকা বশতঃ প্রকৃত সহানুভূতি করিতে পারেন না। কবিবর সাদী বুদ্ধিহীন বন্ধু অপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বাস্তবিক স্ত্রীদের অন্ধপ্রেমে অনেক সময় পুরুষদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট সাধিত হয়।

কেহ আবার পরিমিত ব্যয় করিতে যাইয়া একেবারে কৃপণ হইয়া পড়েন, ইহাও উচিত নহে।

গৃহিণীর রন্ধন শিক্ষা করা উচিত, এ কথা কে অস্বীকার করেন? একটা প্রবাদ আছে যে, স্ত্রীদের রান্না তাঁহাদের স্বামীর রুচি অনুসারে হয়। গৃহিণী যে খাদ্য প্রস্তুত করেন, তাহার উপর পরিবারস্থ সকলের জীবনধারণ নির্ভর করে। মূর্খ রাঁধুনীরা প্রায়ই "কালাই"* রহিত তাম্রপাত্রে দধি মিশ্রিত করিয়া যে কোর্মা প্রস্তুত করে, তাহা বিষ ভিন্ন আর কিছু নহে; মুসলমানেরা প্রায়ই অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকেন, তাহার কারণ খাদ্যের দোষ ছাড়া আর কি হইতে পারে? এ সম্বন্ধেও সেই কাউনটেসের (Countess) উক্তি শুনুন:

*"কালাই" শব্দের বাঙ্গালা কি হইবে? ইংরেজীতে Tinning বলে।

"Bad food, ill-cooked food, monotonous food, insufficient food, injure the physique and ruin the temper. No lady should turn to the more tempting occupations or amusements of the day till she has gone into every detail of the family commissariat and assured herself that it is as good as her purse, her cook, and the season can make it." (ভাবার্থ—কোন মহিলাই প্রথমে স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের আহারের সুবন্দোবস্ত এবং রন্ধনশালা পরিদর্শন না করিয়া যেন অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ না করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থানুসারে খাদ্য-সামগ্রী যথাসাধ্য সুরুচিকর হইয়া থাকে কি না, এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ষড় ঋতুর পরিবর্তনের সহিত আহার্যবস্তুরও পরিবর্তন করা আবশ্যক। ভোজ্য-দ্রব্য যথাবিধি রন্ধন না হইলে কিম্বা সর্বদা একই প্রকার খাদ্য এবং অখাদ্য ভোজন করিলে শরীর দুর্বল এবং নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে)।

সুতরাং রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর ডাক্তারী ও রসায়ন (Chemistry) বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, কোন্ বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্য প্রয়োজন, এ সব বিষয়ে গৃহিণীর জ্ঞান চাই। যদি আহারই যথাবিধি না হয়, তবে শরীরের পুষ্টি হইবে কিসের দ্বারা? অযোগ্যা ধাত্রীর হস্তে কেহ সন্তান-পালনের ভার দেয় না, তদ্রূপ অযোগ্যা রাঁধুনীর হাতে খাদ্য দ্রব্যের ভার দেওয়া কি কর্তব্য? রন্ধনশালার চতুর্দিকে কাদা হইলে সেই স্থান হইতে সতত দূষিত বাষ্প উঠিতে থাকে; বাড়ীর লোকেরা দুগ্ধ এবং অন্যান্য খাদ্যের সহিত ঐ বাষ্প আত্মসাৎ করে। কেবল আহারের স্থান পরিষ্কৃত হইলেই চলিবে না; যে-স্থানে আহার করা হয়, সে জায়গায় বায়ু (Atmosphere) পর্যন্ত যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে, গৃহিণী সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

অনেকে শাকসব্জী খাইতে ভালোবাসেন। বাজারের তরকারি অপেক্ষা গৃহজাত তরকারী অবশ্য ভালো হয়। গৃহিণী প্রায়ই শিম, লাউ, শশা, কুষ্মাণ্ড স্বহস্তে বপন করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা উদ্যান প্রস্তুত-প্রণালী (Horti-culture) অবগত থাকেন, তবে ঐ লাউ কুমড়ার কি সমধিক উন্নতি হইবে না? অন্ততঃ কোন্ স্থানের মাটি কিরূপ, কোথায় শশা ভালো ফলিবে, কোথায় লঙ্কা ভালো হইবে, গৃহিণীর এ জ্ঞানটুকু ত থাকা চাই।

অনেকেই ছাগল, কুক্কুট, হংস, পারাবত ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু সেই সকল জন্তু পালন করিবার রীতি অনেকেই জানেন না। উহাদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থান না থাকায় উহারা বাড়ীর মধ্যেই ঘুরিয়া চরিয়া বেড়ায়। কাজেই বাড়ী-খানাকে পশুশালা বা পশুপক্ষীদের "ময়লার ঘর" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাতে এই জন্তুগুলি রুগ্ন না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট থাকে এবং গৃহ নোঙ্গরা করিতে না পারে, তৎপ্রতি গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উহাদের বাসস্থানও পরিষ্কৃত এবং হাওয়াদার (airy) হওয়া উচিত। নচেৎ রুগ্ন পশুপক্ষীর মাংস খাওয়ায় অনিষ্ট বই উপকার নাই। তবেই দেখা যায়, এক রন্ধন শিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপতত্ত্ব (Horticulture, Chemistry ও Theory of Heat) শিখিতে হয়।

অন্নের পরই বস্ত্র—না, মানুষ বস্ত্রকে অন্ন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করে। শীতগ্রীষ্মানুযায়ী বস্ত্র প্রস্তুত কিংবা সেলাই করা গৃহিণীর কর্তব্য। পূর্বে তাঁহারা চরখা কাটিয়া সূতা প্রস্তুত করিতেন। এখন কলকারখানার অনুগ্রহে কাপড় সুলভ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ নিজ taste (পসন্দ) অনুসারে সেলাই করিতে হয়। এজন্যও সুশিক্ষা লাভ আবশ্যক। আপনারা হয়ত মনে করিবেন যে, আমার সব কথাই সৃষ্টিছাড়া। এতকাল হইতে নিরক্ষর দরজীরা ভালোই সেলাই করিয়া আসিতেছে, সেলাই-এর সঙ্গে সুশিক্ষার সম্বন্ধ কি? সেলাই-এর সহিত পড়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু আনুষঙ্গিক (indirect) সম্বন্ধ আছে। পড়িতে (বিশেষতঃ ইংরাজী) না জানিলে সেলাইয়ের কল (sewing machine-এর) ব্যবস্থাপত্র পাঠ করা যায় না। ব্যবস্থা না বুঝিলে মেশিন (machine) দ্বারা ভালো সেলাই করা যায় না। কেবল হাতে সেলাই করিলে লেখাপড়া শিখিতে হয় না, সত্য। কিন্তু হাতের সেলাই-এর সহিত মেশিন-এর সেলাইয়ের তুলনা করিয়া দেখিবেন ত কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? তাহা ছাড়া মেশিন দ্বারা অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে অধিক সেলাই হয়। অতএব, মেশিন চালনা শিক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। এতদ্ব্যতীত ক্যানভাস (Canvas)-এর জুতা, পশমের মোজা, শাল প্রভৃতি কে না ব্যবহার করিতে চাহেন? এই প্রকারের সূচিকার্য ইংরাজী (Knitting ও Crochet সম্বন্ধীয়) ব্যবস্থাপত্রের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে হয় না। ঐ ব্যবস্থাপুস্তক পাঠে শিক্ষয়িত্রীর বিনা সাহায্যে সূচিকর্মে সুনিপুণা হওয়া যায়; কাপড়ের ছাঁটকাট সবই উৎকৃষ্ট হয়। কাপড়ের কাটছাঁটের জন্যও ত বুদ্ধির দরকার। কাপড়, পশম, জুতা ইত্যাদির পরিমাণ জানা থাকিলে, একজোড়া মোজার জন্য তিন জোড়ার পশম কিনিয়া অনর্থক অপব্যয় করিতেও হয় না।

পরিবারভুক্ত লোকদের সেবাযত্ন করা গৃহিণীর অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার নিমিত্ত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করা রমণী-জীবনের ধর্ম। এ কার্যের জন্যও সুশিক্ষা (training) চাই। সচরাচর গৃহিণীরা পরিজনকে সুখ দিবেন ত দূরের কথা, তাঁহাদের সহিত ছোট ছোট বিষয় লইয়া কোঁদল-কলহে সময় কাটাইয়া থাকেন। শাশুড়ীর নিন্দা ননদিনীর নিকট, আবার ননদের কুৎসা যারতার নিকট করেন, এইভাবে দিন যায়।

কেহ পীড়িত হইলে তাহার যথোচিত সেবা করা গৃহিণীর কর্তব্য, রোগীর সেবা অতি গুরুতর কার্য। যথারীতি শুশ্রূষা-প্রণালী (nursing) অবগত না হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া যায় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগী ঔষধ-পথ্যের অভাব না হইলেও শুশ্রূষার অভাবে মাঁরা যায়। অনেক স্থানে নিরক্ষর সেবিকা রোগীকে মালিশের ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। কেহ বা অসাবধানতা-বশতঃ বিষাক্ত ঔষধ যেখানে-সেখানে রাখে, তাহাতে অবোধ শিশুরা সেই ঔষধ খাইয়া ফেলে। এইরূপ ভ্রমের জন্য চিরজীবন অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। কেহ বা রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া পথ্য দান করে, কেহ অত্যধিক স্নেহবশতঃ তিন চারি বারের ঔষধ একবারে সেবন করায়। এরূপ ঘটনা এদেশে বিরল নহে। ডাক্তারী বিষয়ে সেবিকার উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক, একথা কেহ অস্বীকার করেন কি? ডাক্তারী না জানিয়া শুশ্রূষা করিতে যাওয়া যা, আর স্বর্ণকারের কাজ শিখিয়া চর্মকারের কাজ করিতে যাওয়াও তাই!

কিন্তু ডাক্তারী জান বা না জান, রোগীর সেবা সকলকেই করিতে হয়। এমন দুহিতা কে আছেন, যিনি অশ্রুধারায় জননীর পদ প্রক্ষালন করিতে করিতে ভাবেন না যে, "এত যত্ন পরিশ্রম সব ব্যর্থ হ'ল; আমার নিজের পরমায়ু দিয়াও যদি মাকে বাঁচাইতে পারিতাম।" এমন ভগিনী কে আছেন, যিনি পীড়িত ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া অনাহারে দিন যাপন করেন না? এমন পত্নী কে, যিনি স্বামীর পীড়ার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া নিজে আধমরা হন না? এমন জননী কে আছেন, যিনি জীবনে কখনও পীড়িত শিশু কোলে লইয়া অনিদ্রায় রজনী যাপন করেন নাই? যিনি কখনও এরূপ রোগীর সেবা করেন নাই, তিনি প্রেম শিখেন নাই। না কাঁদিলে প্রেম শিক্ষা হয় না।

বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রক্ষা করা অতি আবশ্যক। এই গুণটা আমাদের অনেকেরই নাই। আমরা কেবল হায়! হায়! করিয়া কাঁদিতে জানি। বোধহয় আশা থাকে যে, অবলার চক্ষের জল দেখিয়া শমনদেব সদয় হইবেন। অনেক সময় দেখা যায়, রোগী এ দিকে পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন,

সেবিকা ওদিকে বিলাপ করিয়া (নানা ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া) কাঁদিতেছেন। হায় সেবিকে, এ সময় রোগীর মুখে কি একটু দুধ দেওয়ার দরকার ছিল না? এ সময়টুকু যে দুধ না খাওয়াইয়া রোদনে অপব্যয়িত হইল, ইহার ফলে রোগীর অবস্থা বেশী মন্দ হইল।

এ স্থলে একটি পতিপ্রাণা গৃহিণীর কথা মনে পড়িল। একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বামীদেবের বুকে ব্যথা হইয়াছিল; সেজন্য তিনি দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছিলেন। পরদিন প্রভাতে কবিরাজ আসিয়া বলেন, "এখন অবস্থা মন্দ, রাত্রেই বুকে একটুকু সর্ষের তৈল মালিশ করিলে এরূপ হইত না।" গৃহিণী অনিদ্রায় নিশি যাপন করিলেন, একটু তৈলমর্দন করিলেন না। কারণ, এ জ্ঞানটুকু তাঁহার ছিল না। ঐ অজ্ঞানতার ফলে ত্রিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইল, (১) স্বামীর স্বাস্থ্য বেশী খারাপ হইল; (২) নিজে অনর্থক রাত্রি জাগরণে অসুস্থ হইলেন; (৩) চিকিৎসকের জন্য টাকার অপব্যয় হইল। কারণ, রাত্রে তৈল মাখিলেই ব্যথা সরিয়া যাইত, চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইত না।'

এখন যদি আমি বলি যে, গৃহিণীদের জন্য একটা "জেনানা মেডিকেল কলেজ" চাই, তবে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সন্তান পালন—ইহা সর্বপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। সন্তান-পালনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের শিক্ষা হইয়া থাকে। একজন ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, "মাতা হইবার পূর্বেই সন্তানপালন শিক্ষা করা উচিত। মাতৃকর্তব্য অবগত না হইয়া যেন কেহ মাতা না হন।" যে বেচারীকে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে মাতা, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মাতামহী এবং চল্লিশ বৎসরে প্রমাতামহী হইতে হয়, সে মাতৃ-জীবনের কর্তব্য কখন শিখিবে?

শিশু মাতার রোগ, দোষ, গুণ, সংস্কার সকল বিষয়েরই উত্তরাধিকারী হয়। ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। অবশ্য অনেক স্থলে সুমাতার কুপুত্র অথবা কুমাতারও সুপুত্র হয়। বিশেষ কোন কারণে ওরূপ হয়। স্বভাবতঃ দেখা যায়, আতার গাছে আতাই ফলে, জাম ফলে না। শিশু স্বভাবতঃ মাতাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে, তাঁহার কথা সহজে বিশ্বাস করে। মাতার প্রতি কার্য, প্রতি কথা শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রতি ফোঁটা দুগ্ধের সহিত মাতার মনোগত ভাব শিশুর মনে প্রবেশ করে। কবি কি চমৎকার ভাষায় বলিতেছেন:

"—দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর-গুণগাথা বিক্রম-কাহিনী,
বীরগর্বে তার নাচুক ধমনী।"

তাই বটে, বীরাঙ্গনাই বীর-জননী হয়। মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারেন। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ, জুয়াচোর হয়। অযোগ্যা মাতা কারণে-অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে, ভবিষ্যতে তাহারা শ্বেতাঙ্গের অর্ধচন্দ্র ও সবুট পদাঘাত নীরবে—অক্লেশে সহ্য করে। কোন মজুরের পৃষ্ঠে জনৈক গৌরাঙ্গ নূতন পাদুকা ভাঙ্গিয়া ভগ্ন জুতার মূল্য আদায় না করায় সেই কুলী 'নৌতুন জুতা দিয়া মারলো—দাম ভী লইল না" বলিয়া সাহেবের প্রশংসা করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, অনেক 'ভদ্রলোকের' অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অতএব, সন্তান পালনের নিমিত্ত বিদ্যা-বুদ্ধি চাই, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে হইলে প্রথমে মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে।

কেবল কাজ লইয়াই ১৬।১৭ ঘণ্টা সময় কাটান কষ্টকর। মাঝে মাঝে বিশ্রামও চাই। সেই অবসর সময়টুকু পরনিন্দায়, বৃথা কোঁদলে কিংবা তাস খেলায় না কাটাইয়া নির্দোষ আমোদে কাটাইলে ভালো হয় না কি? সে জন্য চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। যিনি এ বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে চাহেন, তাঁহাকেও বর্ণমালার সহিত পরিচয় করিতে হইবে। চিত্রের বর্ণ, তুলির বর্ণনা, সঙ্গীতের স্বরলিপি সবই পুস্তকে আবদ্ধ। অথবা সুপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে কিংবা কবিতা প্রভৃতি রচনায় অবসর সময় যাপন করা শ্রেয়ঃ।

প্রতিবেশীর প্রতি গৃহিণীর কর্তব্য সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে দুই চারিকথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। অতিথি সৎকার ও প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য এক কালে আরব জাতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, আরবীয় কোন ভদ্রলোকের আবাসে ইঁদুরের বড় উৎপাত ছিল। তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বিড়াল পুষিতে উপদেশ দেওয়ায় তিনি বলিলেন যে, বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরগুলি তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার প্রতিবেশীদিগকে উৎপীড়ন করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি বিড়াল পোষেণ না।

আর আমরা শুধু নিজের সুখ-সুবিধার চিন্তায় ব্যস্ত থাকি, অপরের অসুবিধার বিষয় আমাদের মনে উদয়ই হয় না। বরং কাহারও বিপদের দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে কি-না, সেই কথাই পূর্বে মনে উদয় হয়। কেহ দুঃসময়ে কোন জিনিস বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ক্রেতা ভাবেন এই সুযোগে

জিনিসটি বেশ সুলভ পাওয়া যাইবে। ঈদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে দৃষ্টি রাখা শিক্ষিত সমাজের শোভা পায় না। অথবা এক জনে হয়ত ক্ষণিক ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাঁহার ভালো চাকরাণীটাকে বিদায় দিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ অপর একজন গৃহিণী সেই বিতাড়িতা চাকরাণীকে হাত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আদর্শ গৃহিণী সে স্থলে সেই পরিচারিকাকে পুনরায় তাহার প্রভুর বাড়ী নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন। প্রতিবেশিনীর বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করা উচিত।

আর প্রতিবেশীর পরিধি বৃহৎ হওয়া চাই—অর্থাৎ প্রতিবেশী বলিলে যেন কেবল আমাদের দ্বারস্থিত গৃহস্থ না বুঝায়। বঙ্গদেশের প্রতিবেশী বলিতে পাঞ্জাব, অযোধ্যা, 'উড়িষ্যা—এ-সবই যেন বুঝায়। হইতে পারে পাঞ্জাবের একদল ভদ্রলোক কোন কারখানায় কাজ করেন, সেই কারখানার কর্তৃপক্ষকে তাঁহারা বিশেষ কোন অভাবের বিষয় জানাইতে বারম্বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ ধর্মঘটকে যেন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজের লোক নিজেদের কার্যপ্রাপ্তির সুযোগ ভাবিয়া আহ্লাদিত না হন। সুগৃহিণী আপন পতি পুত্রকে তাদৃশ ধর্মঘট স্থলে কার্য গ্রহণে বাধা দিবেন। আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা পারসী বা খ্রীস্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি--আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী—তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থ হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেব-ভবন সদৃশ ও পরিজন দেবতুল্য হইবে। এমন ভারত-মহিলা কে, যিনি আপন ভবনকে আদর্শ দেবালয় করিতে না চাহিবেন?

দরিদ্রা প্রতিবেশিনীদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করাও আমাদের অন্যতম কর্তব্য। তাহাদের সূচিশিল্প এবং চরকায় প্রস্তুত সূত্রের বস্ত্রাদি উচিত মূল্যে ক্রয় করিলে তাহাদের পরম উপকার করা হয়। এইরূপে এবং আরও অনেক প্রকারে তাহাদের সাহায্য করা যাইতে পারে; বিস্তারিত বলা বাহুল্য মাত্র।

আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বালক-বালিকাদিগকে ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর দেখা যায়, বড় ঘরের বালকেরা ভারী দাম্ভিক হয়, তাহারা চাকরকে নিতান্ত নগণ্য কি-যেন-কি মনে করে। বেতনভোগী হইলেও ভৃত্যবর্গ যে মানুষ এবং তাহাদেরও স্বীয় পদানুসারে মান-অপমান জ্ঞান আছে, সুকুমারমতি শিশুদিগকে একথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অনেক গৃহিণী নিজের পুত্রকন্যার দোষ বুঝেন না, তাঁহারা চাকরকেই অযথা শাসন করেন। ওরূপে শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়।

উর্দ্দু "বানাতন্ নাস্" গ্রন্থে বর্ণিত নবাব-নন্দিনী হোসেন-আরা অন্যায় আদরে এমন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার দৌরাত্ম্যে দাসী, পাচিকা প্রভৃতি সেবিকাবৃন্দ ত্রাহি ত্রাহি করিত !* যাহাতে বালিকারা বিনয়ী এবং শিষ্টশান্ত হয়, এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

*হোসেন-আরার বাল-সুলভ ঔদ্ধত্যের বর্ণনা বেশ আমোদপ্রদ। পাঠিকাদিগকে একটু নমুনা উপহার দিই :

হোসেন-আরা পিতা-মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী—কাহাকেই ভয় করিত না। সমস্ত বাড়ি সে মাথায় তুলিয়া রাখিত। একদিন তাহার বড় মাসী শাহজামানী বেগম তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন। পরিচারিকার দল হয় ত ভাবিল, ছোট বেগমের (হোসেন-আরার মাতার) নিকট অভিযোগে বিশেষ কোন ফল হয় না; বড় বেগম নবাগতা, তাঁহাকে দেখিয়া হোসেন-আরার চপলতা কিঞ্চিৎ দমিয়া যাইবে। শাহজামানী বেগম শিবিকা হইতে অবতরণ করিবা মাত্র ক্রমান্বয়ে দুই চারি অভিযোগ উপস্থিত হইল।

নরগেস কাঁদিয়া আসিয়া বলিল, "দেখুন, ছোট সাহেবজাদী (হোসেন-আরা) এমন পাথর ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন ভাগ্যক্রমে আমার চক্ষু নষ্ট হয় নাই।"

সোসন আসিয়া বলিল, "দেখুন, ছোট সাহেবজাদী আমায় বলিলেন, 'দেখি সোসন তোর জিহ্বা, যেই আমি জিহ্বা বাহির করিলাম অমনি তিনি আমার চিবুকে এমন জোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, আমার সমস্ত দাঁত রসনায় বিদ্ধ হইয়াছিল।"

গোলাপ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "হায়, আমার কান রক্তাক্ত করিয়া দিলেন।"

রন্ধনশালা হইতে পাচিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এই দেখুন, ছোট সাহেবজাদী তরকারির হাঁড়িতে মুঠা ভরিয়া ছাই দিতেছে! ঐ সব শুনিয়া বড় বেগম ডাকিলেন, "হোসনা! এখানে আইস।" হোসনা তৎক্ষণাৎ আসিল ত; কিন্তু আসিয়া মাসীকে নমস্কার করিবে ত দূরের কথা,—হাতে ছাই, পায় কাদা—এই অবস্থায় সে হঠাৎ মাসীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তিনি সাদরে বলিলেন, "হোসনা! তুমি বড় দুষ্ট হইয়াছ।"

হোসনা তখন উপস্থিত দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই সম্বেল পেত্নী বুঝি কোন কথা আপনাকে লাগাইয়াছে?" এই বলিয়াই সে মাসীর ক্রোড় হইতে লাফাইয়া উঠিয়া নির্দ্দোষ সম্বেলের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার আরম্ভ করিল। "আঁ! ও কি কর! কি কর!" বলিয়া বড় বেগম বারম্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না।

পরে হোসেনা আরা জেনানা মক্তবে (পাঠশালায়) প্রেরিত হইয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা লেখক মহোদয় দেখাইয়াছেন যে, অমন অবাধ্য অনম্য বালিকাও শিক্ষার গুণে ভাল হয়। আমাদের বিশ্বাস সুশিক্ষা স্পর্শমণি, যাহাকে স্পর্শ করে সেই সুবর্ণ হয়।

পরিশেষে বলি প্রেমিক হও, ধার্মিক হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও তাহাতেই মানসিক উন্নতির (mental culture-এর) প্রয়োজন। প্রেমিক হইতে গেলে নিভর, ন্যায়পরতা, মাশুকের* নিমিত্ত আত্মবিসর্জন ইত্যাদি শিক্ষণীয়। নতুবা নির্বোধ বন্ধু হইলে কাহারই উপকার করিতে পারিবে না। ধর্মসাধনের নিমিত্ত শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন, কারণ, "কে বে-ইল্‌মে নাতওয়াঁ খোদারা শেনাখ্‌ত'—অর্থাৎ জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরকে চেনা যায় না। অন্যত্র প্রবাদ আছে, "মূর্খের উপসনা ও বিদ্বানের শয়নাবস্থা সমান।" অতএব দেখা যায় যে, রমণীর জন্য আজ পর্যন্ত যে সব কর্তব্য নির্ধারিত আছে, তাহা সাধন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন। অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত পুরুষদের যেমন মানসিক শিক্ষা (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালীর জন্য গৃহিণীদেরও তদ্রূপ মানসিক শিক্ষা (mental culture) প্রয়োজনীয়।

ইতর শ্রেণীর লোকদের মত যেমন-তেমন ভাবে গৃহস্থালী করিলেও সংসার চলে বটে, কিন্তু সেরূপ গৃহিণীকে সুগৃহিণী বলা যায় না; এবং ঐ সব ডোম-চামারের পুত্রগণ যে কালে "বিদ্যাসাগর", "বিদ্যাভূষণ" বা "তর্কালঙ্কার' হইবে এরূপ আশাও বোধ হয় কেহ করেন না।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এখন সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা আপনাদের কর্তব্য। যদি সুগৃহিনী হওয়া আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রীলোকের জন্য সুশিক্ষার আয়োজন করিবেন।

বোরকা

আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, আমাদের "জঘন্য অবরোধ-প্রথা"ই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে "বোরকা" ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝিবে যে জেলেনী, চামারনী, কি ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে?

*মাশুক—যাহাকে ভালোবাসা যায়; beloved object.

আমাদের ত বিশ্বাস যে, অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নাই। উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইলে এফ. এ. বি. এ. পরীক্ষার জন্য পর্দা ছাড়িয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (University Hall-এ) উপস্থিত হইতে হইবে। এ যুক্তি মন্দ নহে। কেন? আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (University) হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব? যতদিন এইরূপ বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন আমাদের পাশ করা বিদ্যা না হইলেও চলিবে।

অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে—নৈতিক। কেন-না, পশুদের মধ্যে এ নিয়ম নাই। মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া অনেক অস্বাভাবিক কাজ করিতে শিখিয়াছে। যথা—পদব্রজে ভ্রমণ করা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষে সুবিধার জন্য গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি নানাপ্রকার যানবাহন প্রস্তুত করিয়াছে। সাঁতার দিয়া জলাশয় পার হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু মানুষে নানাবিধ জলযান প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার সাহায্যে সাঁতার না জানিলেও অনায়াসে সমুদ্র পার হওয়া যায়। ঐরূপ মানুষের "অস্বাভাবিক" সভ্যতার ফলেই অন্তঃপুরের সৃষ্টি।

পৃথিবীর অসভ্য জাতিরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। ইতিহাসে জানা যায়, পূর্বে অসভ্য ব্রিটনেরা অর্দ্ধনগ্ন থাকিত। ঐ অর্দ্ধনগ্ন অবস্থার পূর্বে গায় রঙ মাখিত। ক্রমে সভ্য হইয়া তাহারা পোষাক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

এখন সভ্যতাভিমানিনী (civilized) ইউরোপীয়া এবং ব্রাহ্ম-সমাজের ভগ্নী-গণ মুখ ব্যতীত সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া হাটে-মাঠে বাহির হন। আর অন্যান্য দেশের মসলমানেরা (ঘরের বাহির হইবার সময়) মহিলাদের মুখের উপর আরও একখণ্ড বস্ত্রাবরণ (বোরকা) দিয়া ঐ অঙ্গাবরণকে সম্পূর্ণ উন্নত (perfect) করিয়াছেন! যাঁহারা বোরকা ব্যবহার করেন না, তাঁহারা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকেন।

কেহ কেহ বোরকা ভারী বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে ইংরাজ মহিলাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারী নহে।

পর্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন হওয়া, বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি—কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই "বে-পর্দা" বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমত পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়।

বর্তমান যুগে ইউরোপীয়া ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন; তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে? তাঁহাদের শয়নকক্ষে, এমন কি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে না। এ প্রথা কি দোষণীয়? অবশ্য নহে। কিন্তু এদেশের যে ভগ্নীরা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের না আছে ইউরোপীয়াদের মত শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র্য (bed-room privacy), না আছে আমাদের মত বোরকা।

কেহ বলিয়াছেন যে, "সুন্দর দেহকে বোরকা জাতীয় এক কদর্য ঘোমটা দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া এক কিম্ভূতকিমাকার জীব সাজা যে কি হাস্যকর ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন"—ইত্যাদি। তাহা ঠিক। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোন ক্ষতি নাই। বরং কুলকামিনীগণ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য দেখাইয়া সাধারণ দর্শকমণ্ডলীকে আকর্ষণ করাই দোষণীয় মনে করিবেন।

ইংরাজী আদব-কায়দাও (etiquette) আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বর-রহিত (simple) পোষাক ব্যবহার করিবেন—বিশেষতঃ পদব্রজে ভ্রমণ কালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক-বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত নহে।*

নিমন্ত্রণ ইত্যাদি রক্ষা করিতে যাইলে মহিলাগণ সচরাচর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাড়ি হইতে নামিবার সময় ঐ পরিচ্ছদ রূপ আভরণ কোচম্যান্ দ্বারবান প্রভৃতির দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার জন্য একটা সাদাসিধা (simple) বোরকার আবশ্যক হয়। রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি (public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিম্বা বোরকার দরকার হয়।

সময় সময় ইউরোপীয়া ভগ্নীগণও বলিয়া থাকেন, "আপনি কেন পর্দা ছাড়েন না (Why don't you break off purdah)?" কি জ্বালা! মানুষে

---

*ঐ উপদেশে আমরা কোরান শরীফের অষ্টাদশ "পারার" "সুরা নূরের" একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। যথা—"বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নীচের দিকে রাখে (অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে ইতস্ততঃ না দেখে।) এবং তাহারা যেন আভরণ (বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত) অন্য লোককে না দেখায়।"

নাকি পর্দা ছাড়িতে পারে ? ইঁহাদের মতে পর্দা অর্থে কেবল অন্তঃপুরে থাকা বুঝায়। নচেৎ তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে, তাঁহারা নিজেও পর্দার (অর্থাৎ privacy-র) হাত এড়াইতে পারেন না, তবে ওরূপ বলিতেন না। যদিও তাঁহাদের পোষাকেও সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা হয় না, বিশেষতঃ সান্ধ্য-পরিধেয় (evening dress) ত নিতান্তই আপত্তিজনক। তবু তাহা বহু কামিনীর একহারা মিহি শাড়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তারপর অন্তঃপুর ত্যাগের কথা—অন্তঃপুর ছাড়িলে যে কি উন্নতি হয়, তাহা আমরা ত বুঝি না। প্রকারান্তরে উক্ত স্বাধীনা রমণীদেরও ত শয়নকক্ষরূপ অন্তঃপুর আছে।

মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্য জাতিদেরই কোন-না-কোন রূপ অবরোধ-প্রথা আছে। এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ-প্রথাকে যিনি "জঘন্য" বলেন, তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।

সভ্যতা (civilization)-ই জগতে পর্দা বৃদ্ধি করিতেছে। যেমন পূর্বে লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্য (civilized) লোকে চিঠির উপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকে না; অপেক্ষাকৃত সভ্যলোকে খাদ্য-সামগ্রীর তিন চারি পাত্র একখানা বড় থালায় (tray-তে) রাখিয়া উপরে একটা "খানপোষ" বা "সরপোষ" ঢাকা দেন; যাঁহারা আরও বেশী সভ্য তাঁহাদের খাদ্যবস্তুর প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র আবরণ থাকে। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি।

আজিকালি যে সকল ভগ্নী নগ্নপদে বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদেরই আত্মীয়া সুশিক্ষিতা (enlightened) ভগ্নীগণ আবার সভ্যতার পরিচায়ক মোজা জুতার ভিতর পদযুগল আবৃত করেন। ক্রমে হাত ঢাকিবার জন্য দস্তানার সৃষ্টি হইয়াছে। তবেই দেখা যায়—সভ্যতার (civilization-এর) সহিত অবরোধ-প্রথার বিরোধ নাই।

তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এদেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন। কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের

সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। যেহেতু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না, তবে শিখিবে কাহার নিকট? নববধূদের অন্যায় পর্দাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিবাহের পর প্রথম দুই চারি মাস কেবল "জড় পুত্তলিকা" সাজিয়া থাকিতে বাধ্য হন। ঐরূপ কৃত্রিম অন্ধ ও বোবা হইয়া থাকায় কেমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা যে সশরীরে ভোগ করে, সেই জানে! কথিত আছে, কোন সময় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নব বধূর পৃষ্ঠে ঘটনা ক্রমে বৃশ্চিক দংশন করে—তিনি সে যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিবস "চৌথী"র স্নানের সময় অন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পৃষ্ঠে ক্ষত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিল। আজিকালি বৃদ্ধাগণ খুব প্রশংসার সহিত ঐ বধূটির উপমা দিয়া থাকেন! বোধ হয় বৃশ্চিকটা খুব বিষাক্ত ছিল না!

যাহা হউক, ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে। অনেক পরিবারে মহিলাগণ ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ব্যতীত অপর কাহারও বাটী যাতায়াত করেন না। ইহাতে পাঁচ রকমের স্ত্রীলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা একেবারে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকেন! অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখাশুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত। অবশ্য যাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র-শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাঁহাদের সঙ্গে মিশিব,—তাঁহারা যে-কোন ধর্মাবলম্বিনী (য়িহুদী, নাসারা, বুৎপরস্ত বা যা'ই) হউন, ক্ষতি নাই। এই যে "গয়ের মজহব" বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের সহিত পর্দা করা হয়, ইহা ছাড়িতে হইবে। আমাদের ধর্ম ত ভঙ্গপ্রবণ নহে, তবে অন্য ধর্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইলে ধর্ম নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয় না! তবে সে জন্য সামান্য রকমের একটু অভ্যাস (practice) চাই; বিনা অভ্যাসে কোন্ কাজটা হয়?

সচারাচর বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse) হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন (fine) করিতে হইবে। জুতা কাপড় প্রভৃতি যেমন ক্রমশঃ

উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ বোরকারও উন্নতি প্রার্থনীয়। যে বেচারা (বোরকা) সুদূর আরব হইতে এদেশে আসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ নির্বাসিত করিলেই কি আমরা উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিব?

সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই—শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সঙ্কুচিত হইয়াছে। ললনাকুলের ভীরুতা ক্রমে বালকদের হৃদয়ে সংক্রমিত হইতেছে। পঞ্চম বর্ষীয় বালক যখন দেখে যে, তাহার মাতা পতঙ্গ দর্শনে মূর্ছিতা হন, তখন কি সে ভাবে না যে, পতঙ্গ বাস্তবিকই ভয়ানক কোন বস্তু?

এইখানে বলিয়া রাখি যে, কীট-পতঙ্গ দেখিয়া মূর্ছা যাওয়ার দোষে কেবল আমরা দোষী নহি। সুসভ্যা ইংরাজ রমণীও এ অপবাদ হইতে মুক্তি পান না। "গালিভারের ভ্রমণ" নামক পুস্তকে ("Gullivers' Travels"-এ) দেখা যায়, যখন ডাক্তার গালিভার "ব্রবডিঙ্গন্যাগ" (Brobdingnag)-দের দেশে গিয়া শস্যক্ষেত্রে সভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন একজন ব্রবডিঙ্গন্যাগ তাঁহাকে হাতে তুলিয়া লইয়া আপন স্ত্রীকে দেখাইতে গেল। ইংরাজ-ললনা যেমন কীট-পতঙ্গ বা মাকড়সা দেখিয়া ভীত হন, ব্রবডিঙ্গন্যাগ রমণীও তদ্রূপ ডাক্তার গালিভারকে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। কারণ, দীর্ঘকায়া ব্রবডিঙ্গন্যাগ রমণী ডাক্তারকে একটি ক্ষুদ্র কীট-বিশেষ মনে করিয়াছিল!! তাই বলি, পর্দা ছাড়িলেও পতঙ্গ-ভীতি দূর হয় না।

পতঙ্গ-ভীতি দূর করিবার জন্য প্রকৃত সুশিক্ষা চাই—যাহাতে মস্তিষ্ক মন উন্নত (brain ও mind cultured) হয়। আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক-জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।

শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি ইতঃপূর্বেও বলিয়াছি যে, "নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে

ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।" এখনও তাহাই বলি এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।

এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই,—তাহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ-মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান-ভূষণে অলঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব শরীর-শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ অমূল্য অলঙ্কার—

"চোরে নাহি নিতে পারে করিয়া হরণ,
জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বণ্টন,
দান কৈলে ক্ষয় নাহি হয় কদাচন,
এ কারণে বলে লোকে বিদ্যা মহাধন।"

আমি আরো দুই চারি পংক্তি বাড়াইয়া বলি:

অনলে না পারে ইহা করিতে দহন,
সলিলে না পারে ইহা করিতে মগন,
অনন্ত অক্ষয় ইহা অমূল্য রতন,—
এই ভূষা সঙ্গে থাকে যাবত জীবন!

তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা "জেনানা স্কুলের" আয়োজন করা হউক। কিন্তু ভগ্নীগণ যে স্কুল লাভের জন্য সহজে গহনা ত্যাগ করিবেন, এরূপ ভরসা হয় না। দুঃখের কথা কি বলিব,—আমার ভগ্নীদিগকে বোধ হয় এক প্রকার গৃহ সামগ্রীর মধ্যে গণনা করা হয়। তাই টেবিলটা যেমন ফুল-পাতা দিয়া সাজান হয়; জানালার পর্দাটা যেমন ফুলের মালা, পুঁতির মালা বা তদ্রূপ অন্য কিছু দ্বারা সাজান হয়, সেইরূপ গৃহিণী আপন পুত্রবধূটিকেও একরাশি অলঙ্কার দ্বারা সাজান আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন। সময় সময় ভ্রাতাগণ আমাদিগকে "সোনা-রূপা রাখিবার স্তম্ভ (stand) বিশেষ" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন না। কিন্তু "চোরা না শুনে ধরম কাহিনী।"

যাহা হউক, পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব আছে। এই অভাবটি পূরণ হইলে এবং স্বতন্ত্র স্কুল-কলেজ হইলে যথাবিধি পর্দা রক্ষা করিয়াও উচচশিক্ষা লাভ হইতে পারে।

প্রয়োজনীয় পর্দা কম করিয়া কোন মুসলমানই বোধ হয় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন না।*

আশা করি, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তা ভগ্নীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।

গৃহ

গৃহ বলিলে একটা আরাম-বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়—যেখানে দিবা-শেষে গৃহী কর্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। গৃহ গৃহীকে রৌদ্র-বৃষ্টি-হিম হইতে রক্ষা করে। পশু-পক্ষীদেরও গৃহ আছে। তাহারাও স্ব স্ব গৃহে আপনাকে নিরাপদ মনে করে। ইংরাজ কবি মনের আবেগে গাহিয়াছেন:

"Home, sweet home;
There is no place like home.
Sweet sweet home."

পিপাসা না থাকিলে জল যেমন উপাদেয় বোধ হয় না, সম্ভবতঃ সেইরূপ গৃহ ছাড়িয়া কতকদিন বিদেশে না থাকিলে গৃহ-সুখ মিষ্ট বোধ হয় না। বিরহ

*এই সন্দর্ভটি লিখিত হইবার পর বর্তমান ছোটলাট Sir Andrew Fraser-এর "The purdah of ignorance" শীর্ষক বক্তৃতার অংশবিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বলিয়াছেন: Let the efforts of educationists be first directed to the instruction of our girls *within the purdah*, and let woman begin to exercise her chastening influence on society in spite of the system of seclusion, which only time can modify and violent efforts to shake which can only arouse opposition to female education, instead of doing any immediate practical good in the direction, of emancipation of women" (গত ৮ই মার্চের "Telegraph" সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত হইল।)

আমাদের মতের সহিত ছোটলাট বাহাদুরের মতের কি আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

না হইলে মিলনে সুখ নাই। পুরুষেরা যদিও সর্বদা বিদেশে যায় না, তবু সমস্ত দিন বাহিরে সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য উৎসুক হয়—বাড়ী আসিলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

আবাস বিশ্লেষণ করিলে দুই অংশ দেখা যায়—এক অংশ আশ্রয়স্থান, অপরাংশ পারিবারিক জীবন (অর্থাৎ Home)। গৃহরচনা স্বাভাবিক; বিহগ-বিহগী পরস্পরে মিলিয়া নীড় নির্মাণ করে, শৃগালেরও বাসযোগ্য গর্ত প্রস্তুত হয়! ঐ নিলয় ও গর্তকে আলয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত "গৃহ" নয়। সে যাহা হউক,—পশুদের "গৃহ" আছে কি না, এস্থলে তাহা আলোচ্য নয়।

এখন আমাদের গৃহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাটীকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবনে যে সুখী নহে, যে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য (member) বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে, তাহার নিকট গৃহ শান্তি-নিকেতন বোধ হইতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা —সকল শ্রেণীর অবলার অবস্থাই শোচনীয়। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি অন্তঃপুরের একটু একটু নমুনা দিতেছি। এরূপে অন্তঃপুরের পর্দা উঠাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখাইলে আমার ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি—নালীঘায় অস্ত্র-চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে রোগীর অতীব যন্ত্রণা হইলেও তাহা রোগীর সহ্য করা উচিত। উপরের চর্মাবরণ খানিকটা না কাটিলে ভিতরের ক্ষত দেখাইব কিরূপে? তাই ভ্রাতাদের নিকট অন্তঃপুরের কোন কোন অংশের পর্দা তুলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমি ইহা বলি না যে, আমাদের সমাজের গুণ মোটেই নাই। গুণ অনেক আছে, দোষও বিস্তর আছে। মনে করুন, একজনের এক হাত ভালো আছে, অন্য হাতে নালীঘা হইয়াছে। এক হাত ভালো আছে বলিয়া কি অন্য হাতের চিকিৎসা করা উচিত নহে? চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক।

অদ্য আমরা সমাজ-অঙ্গের ক্ষতস্থলের আলোচনা করিব। সমাজের সুস্থ অংশ নিশ্চিন্ত থাকুক। আমাদের সমাজে অনেক সুখী পরিবার আছেন, তাঁহাদের বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে—তাঁহারা সুখে-শান্তিতে ঘুমাইতে থাকুন। আসুন পাঠিকা। আমরা লৌহ-প্রাচীর-বেষ্টিত অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষগুলি পরিদর্শন করি।

১। বলিয়াছি ত, কখন বিদেশে না গেলে গৃহ-আগমন সুখ অনুভব করা যায় না। আমরা একবার (বেহারে) জামালপুরের নিকটবর্তী কোন শহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের জনৈক বন্ধুর বাড়ী আছে। সে বাটীর পুরুষদের সহিত আমাদের আত্মীয় পুরুষদের বন্ধুত্ব আছে বলিয়া শরাফত* উকিলের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে আমাদের আগ্রহ হয়। দেখিলাম, মহিলা কয়টি অতিশয় শান্তশিষ্ট মিষ্টভাষিণী, যদিও কূপমণ্ডুক। তাঁহারা আমাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে শরাফতের পত্নী হসিনা, ভগ্নী জমিলা, জমিলার কন্যা ও পুত্রবধূ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর জমিলাকে যখন আমাদের বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলাম, তখন তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা কোন কালে বাড়ীর বাহির হন না, ইহাই তাঁহাদের বংশগৌরব। কখনও ঘোড়ার গাড়ী বা অন্য কোন যান-বাহনে আরোহণ করেন নাই। শিবিকা-আরোহণের কথায় "হাঁ" কি "না" বলিয়াছিলেন, তাহা আমার ঠিক মনে নাই। আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তবে আপনারা বিবাহ করিয়া শ্বশুর বাড়ী যান কিরূপে? আপনার ভ্রাতৃবধূ আসিলেন কি করিয়া?" জমিলা উত্তর দিলেন, "ইঁনি আমাদের আত্মীয়-কন্যা —এ পাড়ায় কেবল আমাদেরই গোষ্ঠীর বাড়ী পাশাপাশি দেখিবে।" এই বলিয়া তিনি আমাকে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই আমার কন্যার বাড়ী; এখন আমার বাড়ী চল।" তিনি আমাকে একটা অপ্রশস্ত গলির (ইহার একদিকে ঘরবাড়ী, অন্যদিকে উচ্চ প্রাচীর) ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার সকল কক্ষ দেখাইলেন। কক্ষগুলি "অসূর্য্যম্পশ্য" বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর একটি দ্বার খুলিলে দেখিলাম, অপরদিকে হসিনার পুত্রবধূ আছে।—জমিলা বলিলেন, "দেখিলে, এই দ্বারের ওপার্শ্বে আমার ভাইএর বাড়ী, এপার্শ্বে আমার বাড়ী। ও-কক্ষে বধূ থাকেন বলিয়া এ দ্বারটি বন্ধ রাখি। আমাদের সওয়ারীর দরকার হয় না কেন, তাহা এখন বুঝিলে?" ঐরূপে সকল বাড়ীই প্রদক্ষিণ করা যায়। সমস্ত মহাল্লাটা পর্যটন করা আমার অভিপ্রেত না থাকায়, আমরা গৃহতুল্য বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। জমিলা বলিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই মক্কা শরীফ যাইবেন,—এ পাপদেশে তাঁহার আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। আমরা আশা করি, তিনি মক্কা শরীফ হইতে ফিরিয়া আসিলে গৃহ-আগমন সুখটা অনুভব করিবেন।

*এ প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নামগুলি কল্পিত। বর্ণনার সুবিধার নিমিত্ত এরূপ নাম দেওয়া হইল।

পাঠিকা কি মনে করেন যে, হসিনা বা জমিলা গৃহে আছেন? অবশ্য না; কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না। এদেশে বাসরঘরকে "কোহ্‌বর" বলে, কিন্তু "কবর" বলা উচিত। বাড়ীখানা ত শরাফতের, সেখানে যেমন এক পাল ছাগল আছে, হংস কুক্কুট আছে, সেইরূপ একদল স্ত্রীলোকও আছেন। অথবা স্ত্রীলোকদের "বন্দিনী" বলা যাইতে পারে। যেহেতু তাঁহাদের পারিবারিক জীবন নাই। আপনার নিজের বাড়ীর কথা মনে করুন। তাহা হইলে হসিনার অবস্থা বুঝিবেন।

২। অনেক পরিবারের গৃহিণীদের সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে—"বাহার মিঁয়া হফ্‌ত্‌ হাজারী, ঘরমে বিবি কাহাৎ কি মারী"—অর্থাৎ বাহিরে ত যথেষ্ট জাকজমক—যেন স্বামী সাত হাজার সেনার অধিনায়ক; আর অন্তঃপুরে গৃহিণী দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতা!! বাহিরে বৈঠকখানা আছে, আস্তাবল আছে—অনেক কিছু আছে, আর ভিতরে গহিণীর নমাজের উপযুক্ত স্থান নাই!

৩। এখন আমরা অন্তঃপুরের ক্ষতস্থল দেখাইব। সাধারণতঃ পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন, গৃহখানা কেবল "আমার বাটী"—পরিবারস্থ অন্যান্য লোকেরা তাঁহার আশ্রিতা।* মালদহে কয়েকবার আমরা একজনের বাটীতে যাতায়াত করিয়াছি। গৃহস্বামী কলিমের স্ত্রীকে আমরা কখনও প্রফুল্লমুখী দেখি নাই। তাঁহার ম্লান মুখখানি নীরবে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করিত। ইহার কারণ এই—কয় বৎসর অতীত হইল, কলিম স্বীয় ভায়রাভাই-এর সহিত বিবাদ করিয়াছেন; তাহার ফলে কলিমের পত্নী স্বীয় ভগ্নীর সহিত দেখা করিতে পান না। তিনি এতটুকু ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না, "আমার ভগ্নী আমার নিকট অবশ্য আসিবেন।" হায়! বাটী যে কলিমের! তিনি যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন, যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন না। আবার ওদিকে ও বাটীখানা সলিমের! সেখানে কলিমের পত্নীর প্রবেশ নিষেধ!

বলা বাহুল্য, কলিমের স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র বা অলঙ্কারের অভাব নাই। বলি, অলঙ্কার কি পিতৃমাতৃহীনা অবলার একমাত্র ভগ্নীর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভুলাইতে পারে? শুনিলাম, তিনি সপত্নী-কন্টক হইতেও বিমুক্ত নহেন! এরূপ অবস্থায়

---

*কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ কোন ঘটনা আমাদের লক্ষ্য নহে। এদিক ওদিককার সত্য ঘটনাসমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটা সাধারণ চিত্র অঙ্কিত হইল মাত্র। ইহাতে কোন নদীর একধারে নবমুকুলিত আম্রকানন অন্য তীরে (আমেরিকার) নায়েগারা ফলস-এর তটস্থিত নীহারাবৃত পত্রহীন তরুরাজি দেখিয়া কেহ চিত্রকরকে আনাড়ী মনে করিবেন না—যেহেতু নদী, আম্রকানন, তুষারাবৃত তরু—এ সবই সত্য।

তাঁহার নিকট গৃহ কি শান্তি-নিকেতন (sweet home) বলিয়া বোধ হয়? তিনি কি নিভৃতে নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন না, "আমার মত হতভাগী নিরাশ্রয়া আর নাই।"

৪। একস্থলে দুই ভ্রাতায় কলহ হইল—মনে করুন, বড় ভাইটির নাম "হাম", ছোট ভাইটির নাম "সাম"। ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া হাম স্বীয় কন্যাকে বলিলেন, "হামিদা! তুমি যতদিন আমার বাটীতে আছ, ততদিন জোবেদাকে (সামের কন্যা) পত্র লিখিতে পাইবে না।" পিতৃ-আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য। কিন্তু হামিদা আশৈশব যে পিতৃব্য-তনয়াকে ভালোবাসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ ভুলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।—যে দুইটি বালিকার শৈশবের ধূলাখেলার স্মৃতি উভয়ের জীবনে বিজড়িত রহিয়াছে—দূরে থাকিয়াও যাহারা পত্রসূত্রে একত্র গ্রথিতা ছিল, আজ সেই একবৃন্তের কুসুম দুইটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হাম গৃহস্বামিত্বের পরিচয় দিলেন। দুইটি অসহায়া অক্ষমা বালিকার কোমল হৃদয় দলিত ও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গৃহস্বামী স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন! বলা বাহুল্য, জোবেদাও হামিদাকে পত্র লিখিতে অক্ষম! যদি তাহারা কোন প্রকারে পরস্পরকে চিঠি পাঠায়—তবে হামিদার পত্র সাম আটক (intercept) করেন, জোবেদার পত্র হামের কবলে পড়িয়া মারা যায়! বালিকাদ্বয়ের রুদ্ধ-অশ্রু, হৃদয়বিদারী দীর্ঘনিঃশ্বাস যবনিকার অন্তরালেই বিলীন হয়! শুনা যায়, আইন অনুসারে ১৮ (কিম্বা ২২) বর্ষীয়া কন্যার চিঠিপত্র আটক (intercept) করিতে পিতা অধিকারী নহেন। সে আইন কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পায় না। কবি বেশ বলিয়াছেন:

"তোমরা বসিয়া থাক ধরা-প্রান্তভাগে,
শুধু ভালোবাস। জান না বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার"—

তাইত; আইন আছে, থাকুক, তাহাতে হামিদা বা জোবেদার লাভ কি? ঐরূপ কত পত্র দেবর-ভাসুর প্রভৃতি কর্তৃক অবরুদ্ধ (intercepted) হয়, কে তাহার সংখ্যা করে? বিধবা ভ্রাতৃবধূটি স্বীয় ভ্রাতা-ভগিনীর চিঠিপত্র লইয়া কোনমতে কালক্ষেপ করেন—যদি আশ্রয়দাতা দেবরটি বিরক্ত হন, তবে আর তাঁহার ভ্রাতা-ভগ্নীর পত্র পাইবার উপায় নাই! অসহায়া অন্তঃপুরিকাদিগকে ঈশ্বর ব্যতীত আর কে সাহায্য করিবে?

৫। আমরা রমাসুন্দরীকে অনেকদিন হইতে জানি। তিনি বিধবা; সন্তান সন্ততিও নাই। তাঁহার স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি আছে, দুই চারিটি পাকা বাড়ীও আছে। তাঁহার দেবর এখন সে-সকল সম্পত্তির অধীশ্বর। দেবরটি কিন্তু রমাকে একমুঠা অন্ন এবং আশ্রয়দানেও কুন্ঠিত। আমরা বলিলাম, "ইনি হয়ত দেবর-পত্নীর সহিত কোঁদল করেন।" এ কথার উত্তরে একজন (যিনি রমাকে ১৪।১৫ বৎসর হইতে জানেন) বলিলেন, "রমা সব করিতে জানে, কেবল কোঁদল জানে না। রমা বেশ জানে, কি করিয়া পরকে আপন করিতে হয়; কেবল আপনাকে পর করিতে জানে না।"

"এতগুণ সত্তেও দেবরের বাড়ী থাকিতে পান না কেন?"

"কপালের দোষ।"

হায় অসহায়া অবলা! তোমরা নিজের দোষকে "কপালের" দোষ বল বটে, কিন্তু ভুগিবার বেলা তোমরাই স্বকীয় কর্ম্মফল ভুগিতে থাক। তোমাদের দোষ মূর্খতা, অক্ষমতা, দুর্বলতা ইত্যাদি। রমাসুন্দরী বলিলেন, "বেঁচে থাকতে বাধ্য ব'লে বেঁচে আছি; খেতে হয় ব'লে খাই—আমাদের সেই সহমরণ-প্রথাই বেশ ছিল! গবর্নমেণ্ট সহমরণ-প্রথা তুলে দিয়ে বিধবার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করেছেন!" ঈশ্বর কি রমার কথাগুলি শুনিতে পান না? তিনি কেমন দয়াময়?

৬। আমরা একটি রাজবাটী দেখিতে গিয়াছিলাম। অবশ্য রাজার অনুপস্থিতি সময় যাওয়া হইয়াছিল। তিনি উপাধিপ্রাপ্ত রাজা—রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৫,০০,০০০৲ টাকা।

বাড়ীখানি কবি-বর্ণিত অমরাবতীর ন্যায় মনোহর। বৈঠকখানা বিবিধ মূল্যবান সাজসজ্জায় ঝলমল করিতেছে; এদিকে-সেদিকে ৫।৭ খানা রজত-আসন শূন্য হৃদয়ে রাজাকে আহ্বান করিতেছে! এক কোণ হইতে রবির একটু ক্ষীণরশ্মি একটি দর্পণে পড়িয়াছিল; তাহার প্রতিরশ্মি চারিদিকে বেল্লুরের ঝাড়ে প্রতিভাত হইয়া এক অভিনব আলোকরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে! এক কক্ষে রাজার রৌপ্যনির্মিত পর্য্যঙ্কখানা মশারী ও শয্যায় পরিশোভিত হইয়া প্রবাসী রাজার অপেক্ষা করিতেছে। পাঠিকা হয়ত বলিবেন, "খাটখানা রানী ব্যবহার করেন না কেন?" তাহা হইলে সমাগত লোকেরাও লক্ষ-টাকার পর্য্যঙ্কখানা দেখিতে পাইত না যে! বহির্বাটী পরিদর্শন করিয়া আমরা রাণীর মহলে গেলাম।

রানীর ঘরকন্নখানাতেও টেবিল, টিপাই, চেয়ার ইত্যাদি সাজসজ্জা আছে। কিন্তু তাহার উপর ধূলার স্তর পড়িয়াছে। রাজা কোন কালে এসব কক্ষে

পদার্পণ করেন বলিয়া বোধ হইল না। রানীর শয্যাপার্শ্বে কয়েকখানা বাঙ্গালা পুস্তক এলোমেলো ভাবে ছড়ান রহিয়াছে।

রানীকে দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। কারণ, বৈঠকখানা দেখিয়া আমি রানীর যেরূপ মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, এ মূর্তি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পরমা সুন্দরী (১৬।১৭ বৎসরের) বালিকা—পরিধানে সামান্য লালপেড়ে বিলাতি ধুতি; অলঙ্কার বলিতে হাতে তিন তিন গাছি বেল্লুরের চুড়ি, মাথায় রুক্ষ কেশের জটা—অনুমান পনের দিন হইতে তৈলের সহিত চুলগুলির সাক্ষাৎ হয় নাই। মুখাখানি এমনই করুণভাবে পূর্ণ যে, রানীকে মূর্তিমতী "বিষাদ" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকের মতে চক্ষু মনের দর্পণ স্বরূপ। রানীর নয়ন দুইটিতে কি কি হৃদয়-বিদারক ভাব ছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

রাজা সর্বদা বিদেশে—বেশীর ভাগে কলিকাতায় থাকেন। সেখানে তাঁহার অপ্সরা, বিদ্যাধরীর অভাব হয় না, এখানে রানী বেচারী চিরবিরহিনী! বাড়ীতে দাস-দাসী, ঠাকুর-দেবতা, পুরোহিত ইত্যাদি সবই আছে; আনন্দ-কোলাহলও যথেষ্ট আছে, কেবল রানীর হৃদয়ে আনন্দ নাই। গৃহখানা তাঁহার নিকট কারাগার স্বরূপ বোধ হইতেছে। রানী যেন একদল দাসীসহ নির্জন কারাবাসে দণ্ডভোগ করিতেছেন। আমাদের সঙ্গীয়া একটি মহিলা জনান্তিকে বলিলেন, "এমন চমৎকার বাড়ী, আর ঘরে এমন পরী যাঁর, তিনি কি সুখে বিদেশে থাকেন!"

রানী বাঙ্গালা বেশ জানেন; তিনি কেবল বই পড়িয়া দুর্বহ সময় কাটান। তিনি—মিতভাষিণী, বেশী কিছু বলিলেন না, কিন্তু যে দুই একটি কথা বলিলেন, তাহা অতি চমৎকার। আমাদের একটি বর্ষীয়সী সঙ্গিনী বলিলেন, "তুমি রাজার রানী, তোমার এ বেশ কেন? এস আমি চুল বেঁধে দিই!" রানী উত্তর দিলেন, "জানি না কি পাপে রানী হয়েছি!" ঠিক কথা! অথচ লোকে এই রানীর পদ কেমন বাঞ্ছনীয় বোধ করে!

অন্তঃপুরের ঐ সকল ক্ষতকে নালীঘা না বলিয়া আর কি বলিব? এ রোগের কি ঔষধ নাই? বিধবা ত সহমরণ-আকাঙক্ষা করে; সধবা কি করিবে?

৭। "মহম্মদীয় আইন" অনুসারে আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হই—"আমাদের বাড়ী"ও হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—বাড়ীর প্রকৃত কর্তা স্বামী, পুত্র, জামাতা, দেবর ইত্যাদি হ'ন। তাঁহাদের অভাবে বড় আমলা বা নায়েবটি বাড়ীর মালিক! গৃহকর্ত্রীটি ঐ নায়েবের ক্রীড়াপুত্তুল মাত্র। নায়েব কর্ত্রীকে যাহা বুঝায়, অবোধ নিরক্ষর কর্ত্রী তাহাই বুঝেন।

গৃহকর্ত্রী মোহ্‌সেনা স্বীয় জামাতার সহিত কলহ করিয়া দুই-এক দিনের জন্য কোন দূর সম্পর্কীয় দেবর কাসেমের বাড়ী যান। এ বাড়ীখানা মোহসেনার পৈতৃক সম্পত্তি—সুতরাং ইহা তাঁহার একান্ত 'আপন' বস্তু। কর্ত্রীর একমাত্র দুহিতাও মারা গিয়াছেন; তবু তিনি জামাতাকে (দুই-চারিজন দৌহিত্রী ইত্যাদি সহ) বাড়ীতে রাখিয়াছেন। এরূপ স্থলে জামাতা জামালকে শাশুড়ীর আশ্রিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু তামাসা দেখুন,—মোহ্‌সেনা গৃহে ফিরিয়া আসিলে, দ্বারবান তাঁহাকে জানাইল, এ বাড়ীতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন—"কি? আমার বাড়ীতে আমারই প্রবেশ নিষেধ? পর্দা কর আমি (শিবিকা হইতে) নামিব।"

দ্বারবান—পর্দা করিতে পারি না, মালিকের হুকুম নাই।

কর্ত্রী—কে তোর মালিক? একমাত্র মালিক ত আমি।

দ্বারবান—বে-আদবী মাফ হউক; হুজুর কি আমাকে তাঁহার পয়জার হইতে রক্ষা করিতে পারেন? হুজুর ত পর্দায় থাকেন, আমরা জামাল মিয়াঁকেই জানি। আপনি মালিক, তাহা ত দুনিয়া জানে;—কিন্তু আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি ফিরিয়া যান। আপনি এখানে নামিলে গোলামের উপর জুলুম হবে। হুজুরেরও অপমান হওয়ার সম্ভাবনা।

যাহা হউক, হুজুর ফিরিয়া গেলেন। তিনি কাসেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি কোন আইন নাই, যাহার দ্বারা আমার বাড়ী আমি দখল করিতে পারি?" কাসেম বলিলেন, "আছে। আপনি নালিশ করুন, আমরা সাহায্য করিব।" ওদিকে জামাল এই নালিশের বিষয় জানিতে পারিয়া কাসেমের নিকট আসিলেন। সবিনয়ে মিষ্ট ভাষায় কাসেমকে বুঝাইলেন, "আজ আপনি যদি আমার শাশুড়ীর সাহায্য করেন, তবে ত অন্তঃপুরিকাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যদি কখন আপনার এরূপ বিপদ ঘটে, তবে কেহ আপনার পরিবারের স্ত্রীলোকদের সাহায্য করিবে, আপনি কি তাহা পসন্দ করিবেন? ভাবিয়া দেখুন, এরূপ হওয়া কি ভাল? মিছামিছি শত্রুতা পাতাইবেন কেন?"

কাসেম অন্তঃপুরে আসিয়া মোহ্‌সেনাকে বুঝাইলেন যে, মামলা মোকদ্দমায় অনেক হেঙ্গাম; ওসব গোলমাল না করাই ভাল। অভাগিনী ক্রোধে, অভিমানে নীরবে দগ্ধ হইতে থাকিলেন।

ঐরূপ আরও কত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খদিজা প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাঁহার স্বামী হাশেম দরিদ্র কিন্তু কুলীন বিদ্বান। হাশেম ছলে কৌশলে সমস্ত জমিজমা আত্মসাৎ করিয়া লইলেন; খদিজার হাতে এক পয়সা

নাই। খদিজার পৈত্রিক বাড়ীতে বসিয়াই হাশেম আর দুই তিনটা বিবাহ (?) করিয়া তাঁহাকে সতিনী জ্বালায় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এরূপ না করিলে আর ক্ষমতাশালী পুরুষের বাহাদুরী কি? ইহাতে যদি খদিজা সামান্য বিরক্ত প্রকাশ করেন, তবে প্রবীণা মহিলাগণ তাঁহার হৃদয়ে স্বামী-ভক্তির অভাব দেখিয়া নিন্দা করেন, কেহ দুই-একটা জীর্ণ পুঁথি (মসলামসায়েলের বঙ্গানুবাদ) দেখাইয়া বলেন, "স্বামী মাথা কাটিলে 'আহ্' বলিতে নাই।" কেহ সুরযোগে আবৃত্তি করিলেন,—

"নারীর মোর্শেদ[1] স্বামী সের্তাজ[2] জানিবে,
মোর্শেদের সম নারী পতিকে ভজিবে।"

যাহা হউক, খদিজার দুঃখে সহানুভূতি করিবে, এমন লোকটি পর্যন্ত নাই। ইহাকে নরক-যন্ত্রণা ভিন্ন আর কি বলিব? কোন মৌলভী বক্তৃতা (ওয়াজ) করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকে বেশী গুণা (দোষ) করে; হজরত মেরা-রাজ গিয়া দেখিয়াছেন, নরকে বেশীর ভাগে স্ত্রীলোক শাস্তি পাইতেছে।" আমরা কিন্তু এই পৃথিবীতেই দেখিতেছি—কুলকামিনীরা অসহ্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন!

৮। পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কি কি জঘন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে? কোন ভ্রাতা তাহা মুখ ফটিয়া বলেন না—বলিলে অবলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে যে![3] সুতরাং সে শোচনীয় কথা আমাদিগকেই বলিতে হইতেছে। কোন স্থলে আফিং-খোর, গাঁজাখোর, নিষ্কর, চিররোগী বৃদ্ধ—যে মোকদ্দমা করিয়া জমিদারীর অংশ বাহির করিতে অক্ষম এইরূপ লোককে কন্যাদান করা হয়। অথবা ভগ্নীর দ্বারা বিবাহের পূর্বেই লা-দাবী লিখাইয়া লওয়া হয় কিম্বা ভগ্নীদিগকে চিরকুমারী রাখা হয়; এবং ভ্রাতৃবধূ ননদদিগকে দাসীর মত ভাবেন! আর যদি কোন পরিবারে পুত্র মোটেই না থাকে, কেবল ডজন, অর্ধ ডজন কন্যাই থাকে,—

১। মোর্শেদ—গুরু।

২। সের্তাজ—(সের—তাজ) মাথায় মুকুট, অর্থাৎ মুকুটতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ।

৩। স্ত্রীলোকদের দুঃখ-কাহিনীপূর্ণ একটি প্রবন্ধ কোন উর্দু সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছিল। সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই—লিখিলেন যে, এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলে সাধারণ পুরুষসমাজ চটিবেন। সুখের বিষয়, বাঙ্গালা কাগজগুলির যথেষ্ট সৎসাহস আছে, তাই রক্ষা। নচেৎ আমাদের দুঃখের কান্না কাঁদিবার উপায়ও থাকিত না।

তবে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ভাগ্যবান স্বামীটি অবশিষ্ট শ্যালিকা কয়টিকে চিরকুমারী রাখিতে চেষ্টা করেন। ইহাই সমাজের নালীঘা। হায় পিতা মোহাম্মদ (দঃ)! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারিণী করিয়াছ, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে! আহা! "মহম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি-রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নহে।

৯। নববিধবা সৌদামিনি দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ ভ্রাতার আলয়ে আশ্রয় লইয়াছে। ৯।১০ মাস পরে তাঁহার (১৫ ও ১২ বৎসর) পুত্র দুইটি দশ দিনের ভিতর মারা যায়। সৌদামিনী নিকট ১০,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল।

যে সময় বিধবা সৌদামিনী পুত্রশোকে পাগলপ্রায় ছিলেন, সেই সুযোগে (অর্থাৎ বালকদ্বয়ের মৃত্যুর একমাস পরেই) ভ্রাতা নগেন্দ্র ঐ টাকাগুলি তাঁহারই নামে গচ্ছিত রাখিতে ভগ্নীকে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের নামে টাকা জমা থাকলে গোলমাল হ'তে পারে। আমি ত আর তোমার পর নই।" ভগ্নীর মাথা ঠিক ছিল না, নগেন্দ্র যাহা লিখাইলেন তিনি তাহাই লিখিলেন। ভাবিলেন "অমন চাঁদ যদি গিয়াছে, তবে আর পোড়ার টাকা থেকে কি হবে? প্রতিভার বিয়ে ত নগেন্দ্র দিবেই। আমি এখন ম'লে বাঁচি।" নগেন্দ্র ক্রমে দুই তিনটা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু প্রতিভার বিবাহের জন্য মোটেই ভাবেন না। তাহার বয়স ১২ বৎসর হইলে সৌদামিনী তাহায় বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি যত তাড়া করেন, নগেন্দ্র ততই বলেন, "বর পাওয়া যায় না।"

প্রতিভা ১৫ বৎসরের হইল—বিবাহ হইল না। ১০,০০০৲ টাকা দিয়া বর পাওয়া যায় না, একথা কি পাঠিকা বিশ্বাস করেন? প্রতিবেশিনীরা নিন্দা করে, অভিশাপ দেয়, "ছি ছি, কেমন মামা।" বলে, তাহাতে নগেন্দ্রের কি ক্ষতি হয়? পল্লীগ্রামে নিন্দা অপবাদ চতুপার্শ্বস্থিত শস্যক্ষেত্রেই বিলীন হয়। প্রকাণ্ড পাটক্ষেতে বড় বড় শূকর লক্কায়িত থাকিতে পারে, আর ঐ নিন্দাটুকু লুকাইতে পারিবে না?

এখন সৌদামিনী দেখিলেন তাঁহার স্বামীর কষ্টে উপার্জিত টাকা দ্বারা নগেন্দ্রের অবস্থা ভাল হইল, কন্যাদের বিবাহ হইল—কেবল তাঁহারই একমাত্র প্রতিভা কুমারী রহিল।।

ভগ্নী মানকুমারী বলিয়াছেন,—

"কাঁদ তোরা অভাগিনী। আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি, ক' ফোঁটা নয়ন-বারি,
ভগিনী! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব।
যখন দেখিব চেয়ে' অনূঢ়া, "প্রাচীনা মেয়ে"
কপালে জোটেনি বিয়ে—তখনি কাঁদিব।
যখন দেখিব বালা সহিছে সতিনী-জ্বালা,
তখনি নয়ন-জলে বুক ভাসাইব।
সধবা বিধবা-প্রায় পরান্ন মাগিয়া খায়—
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব,
এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ দিতে পারি বলিদান—
তোদেরি কল্যাণে, বোন্! কিন্তু কি করিব?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।"

আমি কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইয়া কাঁদিবার সুরে সুর মিলাইতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি কেবল "কাঁদিয়া মরিতে" ব্যয় করিলেন! ব্যস! ঐরূপ অশ্রু ঢালিয়া ঢালিয়াই ত আমরা এমন অবলা হইয়া পড়িয়াছি।

আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীগণ হয়ত মনে করিবেন যে, আমি কেবল ভ্রাতৃবৃন্দকে নরাকারে পিশাচরূপে অঙ্কিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি। তাহা নয়। আমি ত কোথাও ভ্রাতাদের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার করি নাই—কাহাকেও পাপিষ্ঠ, পিশাচ বলিয়াছি কি? কেবল রমণীহৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে, "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়", এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে—ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে ভ্রাতৃনিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।

সুখের বিষয়, আমাদের অনেক ভ্রাতা এরূপ আছেন, যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে যথেষ্ট শান্তিতে গৃহসুখে রাখেন। কিন্তু দুঃখের সহিত আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, অনেক ভ্রাতা আপন আপন বাটীতে অন্যায় স্বামীত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।

এখন বোধ হয়, সুযোগ্য ভ্রাতৃগণ বুঝিবেন যে, "এত বড় সংসারে আমরা নিরাশ্রয়া" বলিয়া আমি ভুল করি নাই—ঐ কথার প্রতি বর্ণ সত্য। আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, অভিভাবকের বাটীতে থাকি। প্রভুদের বাটী যে আমাদিগকে সর্বদাই রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে রক্ষা করে, তাহা নহে। তবু—

যখন আমাদের চালের উপর খড় থাকে না, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটীরের শেষ

চালখানা ঝঞ্ঝানীলে উড়িয়া যায়,—টুপ-টাপ বৃষ্টিধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজিতে থাকি,—চপলা-চমকে নয়নে ধাঁধা লাগে,—বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে, এবং আমাদের বুক কাঁপে,—প্রতি মুহূর্তে ভাবি, বুঝি বজ্রপাতে মারা যাই—তখনও আমরা অভিভাবকের বাটীতেই থাকি।

যখন আমরা রাজকন্যা, রাজবধূ-রূপে প্রাসাদে থাকি, তখনও প্রভু-গৃহে থাকি। আবার যখন ঐ প্রাসাদতুল্য ত্রিতল অট্টালিকা ভূমিকম্পে চূর্ণ হয়,—সোপান অতিক্রম করিয়া অবতরণ-কালে আমাদের মাথা ভাঙ্গে, হাত পা ভাঙ্গে—রক্তাক্ত কলেবরে হতজ্ঞান-প্রায় অবস্থায় গোশালায় গিয়া আশ্রয় লই,—তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি!!

অথবা গৃহস্থের বৌ-ঝি রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি; আর যখন চৈত্র মাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটীতে দুষ্টলোক কর্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়,—সব জিনিসপত্রসহ ঘরগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে,—আমরা এক বসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনমতে দৌড়াইয়া গিয়া দূরস্থিত একটা কুলগাছতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি,—তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি!!! (জানি না, কবরের ভিতরও অভিভাবকের বাটীতে থাকা হয় কি না!!)

ইংরাজীতে Home বলিলে যাহা বুঝায়, গৃহ শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই। উপরে যে রানী, রমা, হামিদা, জোবেদা প্রভৃতির অবস্থা বলা হইয়াছে, তাঁহারা কি গৃহসুখ ভোগ করিতেছেন? শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তি-নিকেতন যাহা, তাহাই গৃহ। বিধবা হইলে স্বামীগৃহ একরূপ বাসের অযোগ্য হয়; হতভাগিনী তখন পিতা, ভ্রাতার শরণাপন্ন হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার যে দশা হয়, সৌদামিনী-চিত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। একটা হিন্দি প্রবাদ আছে—

"ঘর কি জলি বন মেঁ গেয়ী—বন মেঁ লাগি আগ
বন বেচারা কেয়া করে, করম্ মেঁ লাগি আগ।"

অর্থাৎ "গৃহে দগ্ধ হইয়া বনে গেলাম, বনে লাগিল আগুন; বন বেচারা কি করিবে, (আমারও) কপালেই লাগিয়াছে আগুন।"

তাই বলি, গৃহ বলিতে আমাদের একটি পর্ণকুটীর নাই। প্রাণি-জগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে—নাই কেবল আমাদের।*

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

* আমাদের যে-সকল ভগ্নী গৃহসুখ ভোগ করেন, এ-সন্দর্ভটি তাঁহাদের জন্য লিখা হয় নাই - ইহা গৃহহীনাদের জন্য।

মতিচূর

দ্বিতীয় খণ্ড

১৩২৮

উৎসর্গ-পত্র

আপাজান !

আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণ-পরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দূ ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা-পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া বঙ্গভাষায় কথাবার্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্বাদে। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া ১১ বৎসর যাবৎ এই উর্দূ স্কুল পরিচালনা করিতেছি ; এখানেও পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দূ-ভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উর্দূ ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আশীর্বাদের কল্যাণে। স্নেহ-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করিলে ধন্য হইব। এ-পুস্তকে তোমার বড় সাধের "ডেলিশিয়া-হত্যা"ও দেওয়া হইয়াছে।

নিবেদন

মতিচূরের প্রথম খণ্ড পাঠক ও পাঠিকা সমাজে অতিশয় আদৃত হওয়ায় এবং পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা গেল। প্রথম খণ্ডে যে সকল দোষ ছিল, তাহা যথাসাধ্য সংশোধন করা গিয়াছে। আর যে সকল ত্রুটি আছে, তাহার কারণ লেখিকার বিদ্যাবুদ্ধির দৈন্য · এবং বহুদর্শিতার অভাব। গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাগণ এবারও তাহা মার্জনা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী

বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয় খণ্ড মতিচূরের রচনাসমূহ পূর্বে "নবনূর," "ভারত-মহিলা", "আল্ এসলাম", "সওগাত" এবং "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় অতি সাদরে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখাগুলির বিরুদ্ধে পাঠক পাঠিকা সমাজের কোন উচ্চবাচ্য শ্রুতিগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

এবার কোন কোন রচনা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। "ডেলিশিয়া-হত্যা" ইংরাজী হইতে এবং "নূর-ইসলাম" উর্দু হইতে অনূদিত হইয়াছে। "নারী-সৃষ্টি"ও ইংরাজীর আংশিক অনুবাদ। "সুলতানার স্বপ্ন" পূর্বে ইংরাজীতে রচিত হইয়াছিল। ইংরাজী-অনভিজ্ঞা পাঠিকা ভগিনীদের আগ্রহাতিশয্যে উহার বাংলা করা গিয়াছে। "মুক্তিফল" বিগত ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেস-ভঙ্গের পর রচিত হইয়াছিল; এবার কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন করা গিয়াছে।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নূর-ইসলাম	৮১
সৌরজগৎ	১০৬
সুলতানার স্বপ্ন	১৩৩
ডেলিশিয়া-হত্যা	১৫৩
জ্ঞানফল	১৮০
নারী-সৃষ্টি	১৮৯
নার্স নেলী	১৯৩
শিশু-পালন	২১০
মুক্তিফল	২১৮
সৃষ্টি-তত্ত্ব	২৪৩

নূর-ইসলাম

মিসেস এ্যানি বেশান্তের "ইসলাম" শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়। "ইসলাম" শব্দের সমভিব্যাহারে মিসেস বেশান্তের নাম শুনিয়া আপনারা কেহ ভীত হইবেন না। প্রথমে আমারও আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তিনি হয়ত তাঁহার 'থিয়োসফী' ধর্মের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া আমাদের একমাত্র সম্বল ইসলামের উপর খানিকটা হাত সাফ্ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমার সে-ভ্রান্তি দূর হইল। হাত সাফ্ করা ত অতি দূরে—ইহার প্রতি পত্র—প্রতি ছত্র সুপক্ক আঙ্গুরের ন্যায় অতি মিষ্ট ভক্তিরসে পরিপূর্ণ! তিনি নূর-ইসলাম (বা ইসলাম-জ্যোতির) এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না।—এমন কি, প্রিয় বঙ্গভাষায় ইহার মর্মোদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

তবে কথা এই যে, অনুবাদ করিবার মত ক্ষমতা ও বিদ্যাবুদ্ধি সকলের থাকে না—বিশেষতঃ আমার ন্যায় লোকের তাদৃশ চেষ্টা! তাহাতে আবার আমি বহু চেষ্টা করিয়াও মিসেস এ্যানি বেশান্তের মূল ইংরেজী বক্তৃতা-পুস্তিকাখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমাকে উহার উর্দু অনুবাদের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। অনুবাদক মহোদয় অতি উচ্চ (সুফি ধর্মভাবপূর্ণ) ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন! সুতরাং আমি যদি ঐ অনুবাদের অনুবাদ করিতে গিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিজের ভাব ব্যক্ত এবং বিকৃত ভাষা ব্যবহার করিয়া ফেলি, সে ত্রুটি মার্জনীয় বলিয়া ভরসা করি।

আর একটি কথা,—মিসেস এ্যানি বেশান্ত যেমন হজরতের নাম উল্লেখ করিতে অত্যধিক সম্মানের ভাষা ব্যবহার না করিয়া, ভক্তের সরল ভাবপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, অনুবাদক মৌঃ হাসেনউদ্দীন সাহেবও তদ্রূপ করিয়াছেন; যথা "আব ওহ মহম্মদ সিরফ্ মহম্মদ হি না রহা বালকে ওহ পয়গম্বরে আরব হুয়া" ইত্যাদি। ভাব ও ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে আমিও অনুবাদক মহাশয়ের প্রথা অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আর দিবাকরের সমুজ্জ্বল কান্তি দেখাইবার জন্য, অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না; পুষ্পের সৌন্দর্য-বর্ধনের নিমিত্ত অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক, আশা করি, আমি আড়ম্বরপূর্ণ সম্মানসূচক শব্দের বহুল প্রয়োগ বর্জন করায় দোষী হই নাই।

এখন আপনারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন. মিসেস বেশান্ত কি বলিতেছেন :

ভদ্র মহোদয়গণ!

প্রত্যেক দেশের জাতীয় উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতির যাবতীয় কারণসমূহের মধ্যে প্রধান কারণ হইতেছে—ধর্ম। ধর্ম ব্যতিরেকে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি কিম্বা সভ্যতা লাভ করিতে পারে না। যে দেশের সমুদয় অধিবাসী একই ধর্মাবলম্বী, যে দেশে সকলে একই ভাবে একই ঈশ্বরের পূজা করে—তাঁহাকে সকলে একই নামে ডাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মনোভাব একই সূত্রে গ্রথিত থাকে, সে দেশ অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মতে যে দেশে এক ঈশ্বরকে লোকে বিভিন্ন নামে ডাকে; একই ঈশ্বরের উপাসনা বিবিধ প্রণালীতে হয়; একই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট লোকে বিভিন্ন ভাষায় প্রার্থনা করে, তথাপি সকলে ইহাই মনে করে যে, আমরা সকলে একই গন্তব্যস্থানে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়াছি, এবং এইরূপ পার্থক্যের মধ্যে একতা থাকে; যদি কোন দেশের ঐ অবস্থা হইত, (কিন্তু অদ্যাপি এমন কোন ভাগ্যবতী দেশের বিষয় জানা যায় নাই।)—আমার মতে সে দেশ নিশ্চয়ই ধর্মে প্রধান হইত।

অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন ধর্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী লোক আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এই আদর্শের অদ্বিতীয় দেশ -ইহার তুলনা এ ভারত নিজেই। এ দেশে এত স্বতন্ত্র ধর্ম এবং এত পৃথক বিশ্বাসের লোক বাস করে যে, মনে হয় যেন ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম-মতসমূহের প্রদর্শনী-ক্ষেত্র। এবং এই দেশই সেইস্থান, যেখানে পরস্পরের একতা, মিত্রতা এবং সহানুভূতির মধ্যে ধর্মের সেই আদর্শ—যাহাকে আমি ইতঃপূর্বে বাঞ্ছনীয় বলিয়াছি—পাওয়া যাইতে পারে।

আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, তিন চারি বৎসর পূর্বে আমি আপনাদিগকে চারিটি প্রধান ধর্মের, অর্থাৎ বৌদ্ধ, খ্রীস্টীয়, হিন্দু এবং অনল-পূজার বিষয় বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনটি শ্রেষ্ঠ ধর্মের, অর্থাৎ ইসলাম, জৈনমত, এবং শিখধর্মের আলোচনা রহিয়া গিয়াছিল। এই তিন ধর্ম—যাহা ভারতবর্ষের প্রধান সাতটি ধর্মের অন্তর্গত—ইহাদের পরস্পরের এত অনৈক্য দেখা যায় যে, ইহারা একে অপরের রক্ত-পিপাসু হইয়া উঠে এবং দুইজনের মনের মিলনের পক্ষে এই ধর্ম-পার্থক্য এক বিষম অন্তরায় হইয়া আছে।

আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, ভারতবর্ষ হেন দেশে যদি সকলে চক্ষু হইতে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করতঃ

চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, "আমরা প্রকৃতপক্ষে একই প্রভুর উপাসনা বিভিন্ন প্রণালীতে করিতেছি—একই প্রভুকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতেছি।"

"পুরাও পুরাও মনস্কাম,—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা?"

—ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"সকলে তাঁরেই ডাকে, আমি যাঁরে ডাকি,
রাঙ্গা রবি নিয়া বুকে উষা ডাকে সোনামুখে
গোধূলি বালিকা ডাকে শ্যাম ছটা মাখি'।"

—মানকুমারী বসু

আর, একই স্থান হইতে আমরা আসিয়াছি এবং সেইখানে পুনরায় যাইতেছি। ইহার ফল এই হইবে যে, একে অপরের সহিত নিতান্ত আন্তরিক ও প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে মিশিতে পারিবে। একের দুঃখে অপরে দুঃখিত হইবে—সমুদয় ভারতবাসী একই জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্ত জগতের বড় বড় শক্তিপুঞ্জ ভারতসন্তানকে একজাতি বলিয়া স্বীকার করিবে। যখন হিন্দু-মুসলমানে, পারসী-খ্রীস্টানে, জৈন-য়ীহুদীতে এবং বৌদ্ধ-শিখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আলিঙ্গন হইবে, তখন আমি মনে করিব যে, ধর্মের জয় এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পবিত্র নাম শান্তিপ্রদ হইয়াছে।

অদ্য আমি ইসলাম-সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব এবং আগামীকল্য ও পরশ্ব অবশিষ্ট দুই ধর্ম সম্বন্ধে, এবং অনন্তর সমুদয় ধর্মের প্রকৃত মর্ম-সারতত্ত্ব অর্থাৎ সেই থিয়োসফী (ব্রহ্মজ্ঞান বা "এলমে-ইলাহী") সম্বন্ধে আলোচনা করিব, যাহাতে প্রত্যেক ধর্ম বিশ্বাসের সারভাগ আছে এবং যাহা সকলের উপর একই প্রকার অধিকার রাখে—যাহাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি তাহার নিজস্ব বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম বলিতে পারে না, বরং তদ্বিপরীত যে কোন ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী বলিতে পারে যে, ইহাই আমারও ধর্ম। অদ্য সমিতির সাম্বৎসরিক অধিবেশন দিনে আমার এই প্রার্থনা যে, বিশ্ব-সংসারের সমুদয় ধর্মগুরুদের পবিত্র-আত্মা আমাদের ও আমাদের কার্যকলাপের প্রতি তাঁহাদের আশীর্বাদপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন—যেন তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী একজন অপরকে ভালোবাসিতে পারেন। আমীন!

ইসলাম

কোন ধর্ম পরীক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে চারিটি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। সর্বপ্রথম সেই ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস, যাহার প্রভাব তাহাতে (সেই ধর্মে) লুক্কায়িত থাকে। দ্বিতীয়, তাহার প্রকাশ্য বা বাহ্যিক মত অথবা শাখা পল্লব, যাহার সহিত সাধারণে সম্পর্ক রাখে। তৃতীয়, ধর্মের দর্শন, যাহা বিদ্বান এবং সুশিক্ষিত লোকদের জন্য। চতুর্থ, ধর্মের গূঢ় রহস্য, যাহাতে সাধারণতঃ মানবের আপন অহং বা অস্তিত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারের সহিত মিশিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমি এই কষ্টিপাথরে ইসলামকে পরীক্ষা করিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে চাই যে, সর্বপ্রথমে আরব ও শামদেশের অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখুন, সে দেশের কি দশা ছিল।

খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন আরব, শাম ও আজমদেশে অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে কুসংস্কারের প্রবল ঝঞ্ঝানিল বহিতেছিল; যুদ্ধ-কলহ ও পরস্পরের রক্তারক্তি এক দলকে অন্য দল হইতে পৃথক করিতেছিল; হিংসা-দ্বেষ এমন প্রবল ছিল যে, একই বিষয়ের ঝগড়া কয় পুরুষ পর্যন্ত চলিত[১]; যথা এক ব্যক্তি কোন বিষয় লইয়া অন্য একজনের সহিত বিবাদ করিল, অনন্তর শত বৎসর পরে একের পৌত্র অপরের পৌত্রকে শুধু এই অজুহাতে হত্যা করিত যে, "ইহার পিতামহ আমার পিতামহের শত্রু ছিল!" ইহা সেই আরব দেশ—যেখানে কেবল এই কথায় যুদ্ধ আরম্ভ হইত যে, "তোমার উষ্ট্র আমার উষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল কেন?" বাস, এই সামান্য কারণে রক্তনদী প্রবাহিত হইত—শবরাশি স্তূপীকৃত হইত! এ সেই আরব দেশ—যেখানে নিষ্ঠুর পিতা, মাতার ক্রোড় হইতে শিশু কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া গর্ত খনন করিয়া তাহাতে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া আসিত। আর হতভাগিনী নিরুপায় মাতা আপন স্বাভাবিক মাতৃস্নেহপূর্ণ হৃদয়ের অসহ্য বেদনা লইয়া মরমে মরিয়া থাকিত। স্ত্রীলোক হওয়ার দরুন পাষণ্ড স্বামীর ঐ নির্মম অত্যাচারে আপত্তি করিতে পারে, এতটুকু ক্ষমতাও তাহার ছিল না। কাহাকেও জামাতা বলিতে না হয়, এইজন্য কন্যাহত্যা করা হইত। ইহা সেই দেশ, যেখানে ঘৃণিত পৌত্তলিকতা বিরাজমান ছিল—ঘরে ঘরে নূতন দেবতা; এক ঠাকুর আবারঅন্য ঠাকুরের প্রাণের শত্রু! প্রতিমার

১. আশ্চর্যের বিষয়, এই সভ্যযুগেও বঙ্গীয় মুসলমানদের ঘরে ঐরূপ বংশানুক্রমে চিরস্থায়ী বিবাদ দেখা যায়। এইজন্য আমরা কলিকাতা হাইকোর্টে "Hereditary enemy" শব্দ শুনিতে পাই। আহা! কবে আমাদের প্রতি খোদাতালার রহমত হইবে।

সম্মুখে নরবলিদান'ত নিত্য ক্রীড়া ছিল; যেখানে মানবজাতির প্রতি স্নেহ-মমতার পরিবর্তে বিলাসিতা ও আত্মপরায়ণতা পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিত। যে কোন প্রবল ব্যক্তি আপন দুর্বল প্রতিবেশীকে বিনা কারণে কিম্বা অতি সামান্য কারণে হত্যা করিয়া ফেলিত; তাহার ঐ দুষ্ক্রিয়ায় বাধা দিবার লোক 'ত দূরে থাকুক, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবারও কেহ ছিল না।

তদানীন্তন আরবে বিলাসিতার ও অন্যান্য "মকারাদি" কুক্রিয়ার অন্ত ছিল না; এক স্বামী ভেড়া-ছাগল প্রভৃতি পশুর ন্যায় অসংখ্য ভার্যা গ্রহণ করিত; আর এই বিষয়ে গৌরব করা হইত যে, অমুক ধনী ব্যক্তি এত অসংখ্য স্ত্রীর স্বামী। ঈশ্বরের সৃষ্টি—স্ত্রীজাতি এমন জঘন্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা ছিল যে, তাহারা নিতান্ত অসহায় গৃহপালিত পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিত। মোটের উপর এমন কোন নিকৃষ্ট পাপ ও জঘন্য দোষ নাই, যাহা তৎকালীন আরবে না ছিল।

সেই স্বার্থ, অত্যাচার ও আত্মপরতার পূঁতিগন্ধময় জলবায়ু পরিবেষ্টিত এক কোরেশ-গৃহে একটি শিশু (সে পবিত্র শিশুরত্নের উদ্দেশে সহস্র দরুদ!) জন্ম-গ্রহণ করিলেন, যাঁহার পিতা তাঁহার জন্মের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই ইহধাম পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর তিনিও সেইরূপ পিতা ছিলেন, যিনি তদীয় পিতৃ-কর্তৃক কোন প্রতিমার সম্মুখে নরবলিরূপে আনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ দেবালয়ের সেবিকার কৃপায়—সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।[২] এই শিশু এমন একটি হতভাগিনী দুঃখিনী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ইনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই বিধবা হইয়াছিলেন,— আর দারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কয়েক মাস পরেই এ অবোধ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া স্বামীর অনুগমন করেন। ইহার ফলে এই পিতৃমাতৃহীন শিশু কিছুদিন স্বীয় পিতামহ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার পিতামহও

---

২. হজরতের পিতামহ আবদুল মুত্তালিব যে স্বীয় পুত্র হজরত আবদুল্লাকে প্রস্তরমূর্তির নিকট বলিদান করিতে গিয়াছিলেন, এ কথার সত্যতায় আমার একটু দ্বিধা বোধ হয়। আলেম ফাজেলগণ দয়া করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিলে বিশেষ বাধিত হইব। বাঙ্গালা "আমির হামজা" পুঁথিতে দেখিয়াছি,—(হজরত আব্দুল মুত্তালিবের অন্য পুত্র হজরত আমির হামজা পিতাকে বলিলেন)—

"কাফেরে খাজানা দিবে মোসলমান হৈয়া।
আমি এয়ছা বেটা ভবে কিসের লাগিয়া।।"

কয়েক বৎসর পরে দেহত্যাগ করিলেন। তখন সেই অসহায় বালক বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, স্বীয় পিতৃব্য আবু তালেবের আশ্রয়ে রহিলেন। ইহা ত অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এইরূপ বিপদগ্রস্ত পিতৃমাতৃহীন সহায়-সম্পদ শূন্য একটি অজ্ঞান বালক যে শিক্ষাদীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। বাস্তবিক কার্যতঃও তাহাই হইয়াছিল। শিক্ষা, বা অধ্যয়ন বলিতে একটি অক্ষরের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হয় নাই, নীতি বা আচার-নিয়মের অনুশাসনের বাতাস পর্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তথাপি তাঁহার শৈশবকাল, অতি পবিত্র জীবনের উচচ আদর্শ ছিল। তাঁহার নির্মল জীবনে মানবের বাঞ্ছনীয় যাবতীয় সদ্‌গুণরাজি—যথা, দয়া, সৌজন্য, প্রেম, ধৈর্য, নম্রতা, বিনয়, শান্তিপ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি স্বভাবতঃ বিরাজমান ছিল। তিনি নানা গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া তিনি কৈশোরে উপনীত হইলেন। এখন জীবিকা-অর্জনের নিমিত্ত তিনি আপন কোন বিধবা আত্মীয়ার গৃহে কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। উক্ত বিধবা খদিজা বিবি তাঁহাকে পণ্যদ্রব্যসহ বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশে প্রেরণ করিতেন। এই বিষয়কর্মে খদিজা বিবি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার এই নূতন কর্মচারী অতিশয় ধর্মভীরু, ন্যায়পরায়ণ, মিতব্যয়ী এবং অতি বিশ্বাসী। অতঃপর তিনি ইহার সহিত পরিণীতা হন।

ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই নবীন যুবক যাঁহার নাম মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম) ছিল, সে সময়ে পয়গম্বর হন নাই। আর তাঁহার পত্নী হজরত খদিজাও তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের অনুবর্তিনী ছিলেন না; তিনি স্বয়ং অল্প-বয়স্ক তরুণ এবং তাঁহার জায়া তদপেক্ষা দ্বিগুণ বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর তাঁহারা এমন সুখের দাম্পত্য-জীবন ভোগ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে তেমন মধুর দাম্পত্য-জীবনের উচচ আদর্শ আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ—আর তেমনই ভাবে তাঁহাদের বিবাহ জীবনের পূর্ণ ২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার পর হজরত খদিজার মৃত্যু হইল। অতঃপর পয়গম্বর সাহেবের স্বভাব-চরিত্র ও কার্যকলাপ সর্বদাই অতি প্রশংসনীয় ছিল। যখন তিনি মক্কার সঙ্কীর্ণ গলিকুচাতে যাতায়াত করিতেন, সে সময় তত্রত্য ক্রীড়ারত অবোধ শিশুগণ তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিত, আর তিনি সততই তাহাদের সহিত স্নেহসিক্ত মিষ্টভাষায় কথা বলিতেন, তাহাদের মস্তকে হস্তামর্শন করিতেন। কেহ কখনও শুনে নাই যে, তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি সর্বদা বিপদ-

গ্রস্তের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন; বিধবা ও পিতৃহীন শিশুদের সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল। প্রতিবেশীবর্গ তাঁহাকে "আমীন" (বিশ্বস্ত) বলিয়া ডাকিত। "আমীন" শব্দের অর্থ বিশ্বাসভাজন—এমন উচ্চ ভাবপূর্ণ উপাধি কেবল শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিই বিশ্বজগতের নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন। এখন আপনারা একটু চিন্তা করিয়া দেখুন'ত; যে ব্যক্তির বাহ্যিক জীবন জগতের পক্ষে এমন উপকারী এবং সুখ-শান্তিপ্রদ ছিল, তাঁহার আভ্যন্তরীণ জীবন কেমন হইতে পারে। অহো! (সত্য তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত) তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার বন্যাস্রোতের তাড়না তাঁহাকে বনে বনে ও জনপ্রাণীশূন্য মরুভূমে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি কতবার দিবানিশি অনশনে অনিদ্রায় বিপৎসঙ্কুল পর্বতকন্দরে বাস করিতেন। তিনি যে ভাবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ঈশ্বর-অনুসন্ধান করিতেন, তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা দুর্লভ; অথবা ইহার মর্ম কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, যাঁহারা একাগ্রচিত্তে খোদার পথে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রমে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) এই প্রকার ধ্যান-আরাধনা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি লোকালয় পরিত্যাগ পূর্বক দূরে—অতি দূরে—ঘোর অরণ্যে চলিয়া যাইতেন; দুর্গম ও ভয়ঙ্কর গিরিগুহায় মাসাধিককাল পর্যন্ত বাস করিতেন—সেখানে শুধু সিজদায় (নতশিরে) পড়িয়া অনবরত রোদন ও বিলাপ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কাজ ছিল না। এমন কি, তিনি অন্যূন পঞ্চদশ বর্ষ এইভাবে যাপন করিলেন—অবশেষে সেই শুভ মুহূর্ত আসিল, যখন দৈববাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "উঠ! খোদায় পাকের (পবিত্র ঈশ্বরের) নাম উচ্চারণ কর।" কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না, সে শব্দ কাহার; অথবা ঐ আকাশবাণী বাস্তবিকই বিশ্বাসযোগ্য দৈববাণী কি না? কারণ, তিনি বেশ জানিতেন যে, তিনি নিরক্ষর লোক ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইত যে, ইহা হয়ত তাঁহার ভ্রম বা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র—কিম্বা তাঁহার অহংজ্ঞান তাঁহাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত ঐরূপ শব্দ করিতেছে; এবং সম্ভবতঃ ইহা সেই দৈববাণী নহে, যাহা স্বয়ং খোদাতালার নিকট হইতে পয়গম্বরগণ শুনিতে পাইতেন, যাহাকে "এলহাম" কিম্বা "অহি" বলে।

অবশেষে আর একবার যখন তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় অত্যন্ত আকুল ছিলেন, সহসা তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব এক অলৌকিক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আর সেই আলোকরাশির মধ্যে একটি জ্যোতিষ্মান মূর্তি দেখা দিয়া বলিলেন, "যাও, সত্য নাম উচ্চারণ কর!" একবার সাহসে ভর করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কাহাকে ডাকিব?" ইহার উত্তরে স্বর্গদূত তাঁহাকে ঈশ্বরের

একত্ব, ফেরেশ্‌তাদের রহস্য, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং মানবজাতির অস্তিত্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করিলেন এবং তাঁহাকে সেই দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কর্মভারের (পয়গম্বরীর) কথাও বলিলেন, যে জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছে। অর্থাৎ দেবদূত বলিয়া দিলেন যে, তাঁহাকে বিশ্বজগতের ধর্মপথ প্রদর্শক এবং উপদেষ্টার কার্যভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

এদিকে দেবদূত অদৃশ্য হইলেন, ওদিকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যিনি এখন হইতে আরব দেশের পয়গম্বর নামে অভিহিত হইবেন, অত্যন্ত অস্থির ও ভীতি-বিহ্বল চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা সতী হজরত খদিজা উপযুক্ত শুশ্রূষা সহকারে তাঁহার তাদৃশ বিহ্বলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে পয়গম্বর সাহেব আনুপূর্বিক সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বোধহয় ইহা আমার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ।" ইহাতে পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণী অতিশয় সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বচনে তাঁহার নিস্তেজ হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া বলিলেন, "না, না, তুমি সত্যবাদী—বিশ্বাসী—আমীন; প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান; পিতৃহীনের প্রতি স্নেহবর্ষণ কর; দরিদ্র, আতুর ও বিধবার প্রতি দয়া করিয়া থাক—এমন লোককে বিশ্বপাতা কখনই অকালে নষ্ট করিবেন না। প্রভু খোদাতালা কখনও বিশ্বাসী ভক্তদিগকে প্রবঞ্চনা করেন না। উঠ, এখন সেই দৈববাণী—প্রকৃত সত্য দৈববাণীর প্রত্যাদেশ অনুসারে কার্য কর।"

সেই পুণ্যবতী মহিলা, যিনি সর্বপ্রথমে পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন—এমনই সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে? তিনি—যিনি নিজের দুর্বলতায় জড়ীভূত ও নিরুদ্যম হইয়া সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া বসিয়া ছিলেন৩, এখন পূর্ণ সাহসে ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! আর সে মোহাম্মদ কেবল মোহাম্মদ মাত্রই রহিলেন না—বরং প্রবল প্রতাপশালী পয়গম্বর হইয়া গেলেন! তিনি একটা অসভ্য, অরাজক দেশকে শান্তিপূর্ণ এবং একটা জনপ্রাণীবিরল নগণ্য উপদ্বীপকে এক মহাসাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ইউরোপে ধর্ম ও জ্ঞানের আলোক লইয়া গেলেন, এই দুইটি বস্তু সেখানে প্রায় ছিলই না। তাঁহার অনুবর্তিগণ পৃথিবীতে বড় বড় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহার সমবিশ্বাসীগণ এমন নিষ্ঠার সহিত ইলাহীর ধ্যান ও স্মরণে নিমগ্ন হইলেন যে, তাহার আদর্শ অন্য

৩। ইহা মিসেস বেশান্তের অতিশয়োক্তি।—(আল-এসলাম সম্পাদক)

কোন ধর্মে পাওয়া সম্ভবপর কি না সন্দেহ। কারণ, আপনারা একটু চিন্তা করিলে এবং ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্য কোন ধর্ম এমন নাই, যাহাতে এমন অকপট হৃদয় সত্যবিশ্বাসী লোক পাওয়া যায়। এই জ্ঞান-বিশ্বাস তাহারা (মুসলমানেরা) আরবের পয়গম্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদি বেন সাহেবের কথামত ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় যে, সাধারণ আচার-ব্যবহার হইতে ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনার ঐ ধর্মের অনুবর্তিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং ভাবিয়া দেখুন, তাঁহার (হজরতের) বাক্যসমূহ তাঁহার শিষ্যবর্গের হৃদয়ে কেমন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। মুসলমানেরা আরবের পয়গম্বর হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস এমন সুদৃঢ় যে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ স্থান পায় না।

একজন মুসলমান—যদ্যপি এমন কোন স্থানে এমন কতকগুলি লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, যাহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছুরিকায় খণ্ড খণ্ড করে এবং তাহার পয়গম্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে—নমাজে মস্তক অবনত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না।[৪]

আপনারা আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, পয়গম্বরের সুপারিশের (শাফা'আতের) প্রতি তাহাদের বিশ্বাস কেমন অটল যে, তাহারা মৃত্যুভয় একেবারে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। আফ্রিকার দরবেশবৃন্দের সৎসাহসের তুলনা কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন কি?—যাঁহারা ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু তোপ-কামানের সম্মুখে স্থির-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার জন্য এমনই আনন্দের সহিত অগ্রসর হইতেন, যেন বরযাত্রীরূপে কোন বিবাহ সভায় যাইতেছেন! এবং যে পর্যন্ত তাঁহাদের দলের কয়েক ব্যক্তি শত্রুসেনা পর্যন্ত পোঁছিতে না পারিতেন, সে পর্যন্ত দলে দলে কামানে ধ্বংস হইতেন। সে কোন্ উদ্দীপনা ছিল, যাহা তাঁহাদিগকে এমন ভীষণ মৃত্যুমুখে লইয়া যাইত? তাহা কেবল পয়গম্বরের—কোরআনের মহিমা এবং ইসলাম-প্রেম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, (তাঁহাদের) এই ভক্তি পৃথিবীতে ভবিষ্যতেও অটল রহিবে, বরং বর্তমান যুগ অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিবে। (আমীন!)

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রমাণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাহা এই যে:-পয়গম্বরের "নবুয়তে" সর্বপ্রথমে বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী—যিনি তাঁহার

৪. মিসেস এ্যানি বেশান্তের বর্ণিত মুসলমান কি আমরাই? ছি। ছি! ধিক্ আমাদের! আমরা মুসলমান নামের কলঙ্ক। বঙ্গদেশে দড়ি ও কলসী একেবারে নাই কি?

গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় রহস্য অবগত ছিলেন, আর তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার আশৈশব জীবনের স্বভাব-চরিত্র সমুদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এই যদি আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে, পয়গম্বরের সত্য-পরায়ণতা সম্বন্ধে অতি জলন্ত প্রমাণ পাইবেন। আপনারা নিজেরাই বেশ জানেন যে, কোন বিজ্ঞ বক্তৃতানিপুণ ব্যক্তি কোন সভা-সমিতিতে গিয়া বেশ আড়া দুই ঘণ্টা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রভাবে শ্রোতৃবর্গকে মোহিত ও চমৎকৃত করিয়া স্বমতে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে—যেহেতু সে সময় লোকে তাহাকে কেবল বক্তৃতা-মঞ্চেই দেখে; তাহার আভ্যন্তরীণ জীবনের অবস্থা কিছু জানে না। কিন্তু ইহা বড় কঠিন, এমন কি অসম্ভব যে নিজের স্ত্রী, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি অতি নিকটবর্তী আত্মীয়গণ তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে—যদি সে ব্যক্তি বাস্তবিক তদ্রূপ নির্মল ও সত্যপর না হয়। আমাদের মতে ইহারই নাম "পয়গম্বরী" এবং সত্য বলিতে কি এমন বিশ্বব্যাপী জয়লাভ হজরত মসিহের (যীশুর) ভাগ্যেও ঘটে নাই।[৫]

আরবীয় পয়গম্বরের সমুদয় আত্মীয়-বান্ধবদের মধ্যে কেবল তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবই (?) এমন ছিলেন, যিনি কেবল নিজের একগুঁয়ে গোঁড়ামীর জন্য তাঁহার ধর্মমতে (প্রকাশ্যে) বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের দলপতি ছিলেন বলিয়া আপন পুরাতন পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দেওয়া নিজের পক্ষে মানহানিকর বোধ করিতেন; নতুবা তাঁহার কার্যকলাপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত যে, তিনি পয়গম্বরের ধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ, তিনি রসুলোল্লাহ্‌কে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন, "হে পিতৃব্য-প্রাণ! তুমি অসঙ্কোচে আপন কর্তব্য পালন করিতে থাক; আমার জীবদ্দশায় কাহার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কটাক্ষপাত করে?" একদিন আবু-

৫। অল্পদিন হইল—মুসলমান গ্রন্থকারগণ ইংরাজী ভাষায় এসলাম-সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার পূর্বে ইউরোপে এসলাম সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্যই খ্রীস্টান মিশনের এজেন্সী হইতে সংগ্রহ করা হইত—কাজেই অজ্ঞ ইউরোপ এসলামের নামে একেবারে শিহরিয়া উঠিত। এই অল্পদিনের চেষ্টায় কিরূপ ফল হইয়াছে, এই বক্তৃতা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। লর্ড হেডলী, খাজা কামালুদ্দীন, মিঃ এহ্যা-উন-নাসর পর্কিনসন প্রভৃতি মুসলমান লেখকগণের চেষ্টায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কিরূপ মত পরিবর্তন হইতেছে, "Islamic Review" পত্র পাঠ করিলে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে। —(আল-এসলাম,—সম্পাদক)

তালেব স্বীয় পুত্র হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ধর্ম বিশ্বাস কি? আর তুই মহম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে কি মনে করিস?" হজরত আলী অত্যন্ত সম্মান অথচ উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, "পিতৃদেব! আমি একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহকেই পূজনীয় মনে করি, এবং মোহম্মদকে আল্লাহতালার প্রকৃত প্রেরিত বলিয়া মানি। আর এই জন্য পয়ম্বরের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইব না।"

ঈদৃশ উত্তর শ্রবণে অসন্তুষ্টি হইবারই সম্ভবনা ছিল ; কিন্তু তাহা ত হইল না! বরং তিনি বলিলেন, "পিতৃ-প্রাণ-পুত্তলি! আমি তোমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অনুমতি দিতেছি। যেহেতু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি তোমাকে সুপথ ছাড়া কুপথে পরিচালিত করিবেন না।"

নবুয়তের (পয়গম্বরী প্রাপ্তির) তিন বৎসর পর্যন্ত পয়গম্বর সাহেব নীরবে বিনা আড়ম্বরে আপন মিশনের কার্য করিতেছিলেন। সে সময় তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা মাত্র ৩০ জন ছিল। অতঃপর তিনি প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে আল্লাহতালার একত্বের বিষয় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং নরবলিদান, বিলাসিতা ও সুরাপান যে অতি কদর্য, তাহাও বিষদরূপে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতার গুণে অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি প্রদীপ্ত হইল এবং তাঁহার শিষ্য সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবন্ধকতা-বহ্নিও পয়গম্বর সাহেবের বিরুদ্ধে দেশময় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বিরোধী দলের হস্তে পয়গম্বর সাহেব যত প্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও নিগ্রহ ভোগ করেন, সাধারণ মানব তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

বিধর্মী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেবের ভক্ত, বিশ্বাসী লোককে যখন যেখানে দেখিতে পাইত, তন্মুহূর্তেই হত্যা করিত। কাহারও প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করিত। কাহাকে বা হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালুকার উপর শয়ান করাইয়া তাঁহার বক্ষের উপর প্রস্তর চাপা দিয়া বলিত, "তুই মোহাম্মদ ও তাহার আল্লাহকে অস্বীকার কর!" কিন্তু এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁহারা মোহাম্মদের কলেমা পড়িতে পড়িতে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতেন!

একদা কোন দুরাত্মা জনৈক মুসলমানকে ধরিয়া তাঁহার দেহ হইতে খণ্ড খণ্ড মাংস কাটিয়া ফেলিতেছিল, আর বলিতেছিল, "এ সময় তুই যদি নিজের

পুত্র পরিবারের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ঘরে থাকিতিস, আর তোর স্থলে তোর মোহাম্মদ এইরূপ ছিন্নদেহে ভূমে লুটাইয়া ছট্‌ফট্ করিত তবেই বেশ ভালো হইত!" কিন্তু সেই সত্যধর্মপ্রাণ মুসলমান মৃত্যু পর্যন্ত এই একই উত্তর দিতেছিলেন, "আমার গৃহ, পুত্র-কলত্র—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সমুদয় হজরত রসুলের পদতলে উৎসর্গ হউক। আমার সম্মুখে যেন তাঁহার চরণ-কমলে একটি কণ্টকও বিদ্ধ না হয়।"[৬]

অবশেষে বিরোধী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যবর্গকে এত অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল যে, তাঁহারা শেষে রসুলের ইঙ্গিতে দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পয়গম্বর সাহেবের একদল অনুবর্তী যখন শত্রু-তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া হাবশ (আবিসিনীয়া) দেশে গেলেন, তখন শত্রুগণও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সে দেশে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য খ্রীস্টান রাজাকে অনুরোধ করিল যে, মুসলমানদিগকে উহাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক। রাজা তখন হতভাগ্য প্রবাসীদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "রাজন! আমরা অজ্ঞতা ও মূর্খতার সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম, আমরা ঘৃণিত পৌত্তলিক ছিলাম; আমাদের জীবন দুর্দান্ত পশু-প্রকৃতি নর-পিশাচের ন্যায় নীচ ও জঘন্য ছিল; নরহত্যা আমাদের দৈনন্দিন ক্রীড়া ছিল; আমরা জ্ঞানান্ধ, ঈশ্বরদ্রোহী ও ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত ছিলাম; পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতি বা মনুষ্যত্বের নামগন্ধ আমাদের মধ্যে ছিল না; অতিথি সেবা কিম্বা প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম; আমরা 'জোর যার মুলুক তার' ব্যতীত অন্য বিধিনিয়ম জানিতাম না। আমাদের এই ঘোর দুরবস্থার সময় আল্লাহ্ তালা আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ সৃষ্টি করিলেন—যাঁহার সত্যতা, (صل اقبت) সাধুতা এবং সরলতার উজ্জ্বল চিত্র আমাদের হৃদয়-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই ব্যক্তি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, "আল্লাহ্ এক, সর্ব কলঙ্ক হইতে পবিত্র, কেবল তাঁহারই উপাসনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; আমাদিগকে সত্য অবলম্বন এবং মিথ্যা বর্জন করিতে হইবে; প্রতিজ্ঞা পালনে, বিশ্বজগতের প্রাণিবৃন্দের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শনে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনে যেন বিমুখ না হই; যেন স্ত্রীজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার করি, পিতৃহীনের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করি, নিয়ম মত দৈনিক উপাসনা ও উপবাস

৬. মিসেস বেশান্ত এখানে দুইটি ঘটনা ভ্রমক্রমে এক বর্ণনার ভিতর ফেলিয়াছেন। অমুসলমানের পক্ষে এইরূপ ভ্রম মার্জনীয়—(আল-এসলাম,—সম্পাদক।)

(রোজা) ব্রত পালনে অবহেলা না করি।' রাজন্! আমরা এই ধর্মে বিশ্বাস রাখি এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি।"

ভদ্র মহোদয়গণ! পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের বিশ্বাস এবং ধর্মমত এমনই উচ্চ ছিল যে, তাঁহারা প্রাণ হেন প্রিয় বস্তু করতলে লইয়া বেড়াইতেন! আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যতা ও অকপট হৃদয়ের প্রমাণ স্বরূপ আর একটি বিষয় আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি।

একদা পয়গম্বর সাহেব আরবের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় একজন অন্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "হে খোদার রসুল! আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, আমি সত্য পথ লাভ করিবার আশায় আসিয়াছি।" পয়গম্বর সাহেব বাক্যালাপে অন্যমনস্ক থাকা বশতঃ তাহার উক্তি শ্রবণ করেন নাই। সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, "হে রসুলুল্লাহ! আমার কথা শুন, ধর্মপথ দেখাও!" তদুত্তরে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত তাহাকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে সে অন্ধ ক্ষুন্নচিত্তে চলিয়া গেল। পর দিবস পয়গম্বরের প্রতি যে "অহি" (দৈবাদেশ) আসিয়াছিল, যাহা অদ্যাপি কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে এবং চিরকাল থাকিবে, তাহার মর্ম এই: "রসুলের নিকট এক অন্ধ আসিল, কিন্তু সে (রসুল) অবজ্ঞা করিল ও তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না। তুমি কি করিয়া জান যে, সে পাপমুক্ত হইবে না, উপদেশ গ্রহণ করিবে না এবং সেই উপদেশে সে উপকৃত হইবে না? যে ব্যক্তি ধনী, তাহার সহিতই তুমি সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিতেছ, যদ্যপি সে বিশ্বাসী (ইমানদার) না হইত, তজ্জন্য তুমি অপরাধী হইতে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং সরল হৃদয়ে সত্য ও মুক্তির অন্বেষণে আসিল, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে না। (ভবিষ্যতে যেন আর কখনও এরূপ না হয়)।"

ঐ দৈবাদেশ পয়গম্বর সাহেবের মনে অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়াছিল। তদবধি যখনই তিনি উক্ত অন্ধকে দেখিতেন, তখনই বলিতেন, ইহার আগমন শুভ। যেহেতু, ইহারই উপলক্ষে আল্লাহ্ আমাকে শাসন করিয়াছেন। পয়গম্বর সাহেব উক্ত অন্ধকে অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন এবং দুইবার তাঁহাকে মদীনায় কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, পয়গম্বর সাহেব কেবল অপরকেই উপদেশ দিতেন না, বরং নিজের আত্মাকে উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সর্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত রাখিতেন।

সচরাচর যেরূপ প্রত্যেক পয়গম্বরের সহিত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ আরবীয় পয়গম্বরের বিরুদ্ধেও সাধারণের বৈরিতারূপ ঝঞ্ঝানিল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

পাইতে লাগিল। ধর্ম-সংক্রান্ত শত্রুতা সাধনের নিমিত্ত পয়গম্বর সাহেবও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর বিরুদ্ধে নূতন বিপদের সূত্রপাত হইতে লাগিল! অবশেষে অবস্থা এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল যে, পয়গম্বর সাহেব সমুদয় মুসলমানকে আপন আপন প্রাণ লইয়া যত্রতত্র পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন হজরতের নিকট মাত্র একজন ব্যতীত আর কেহই রহিল না। কিন্তু পয়গম্বর সাহেব স্বীয় কর্তব্য তেমনই নির্ভীক চিত্তে পালন করিতে থাকিলেন। এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার অরিকুল তাঁহার প্রাণ বিনাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেব আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, "হে পিতৃব্য-প্রাণ! কথা শুন, অমূল্য প্রাণ এমন অবহেলায় হারাইস না। আরবের রক্ত-পিপাসু খঞ্জরসমূহ তোরই জন্য শাণিত হইতেছে। তুই নিবৃত্ত হ', তোর বক্তৃতা বন্ধ কর।"

তাঁহার কথায় পয়গম্বর সাহেব অতি সাহসের সহিত যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিবার উপযুক্ত বটে। তিনি বলিলেন:

"পিতৃব্যদেব! আমি নিরুপায়। আমি ত কিছুই করি না, কে যেন আমার দ্বারা করাইতেছে। যদি বিধর্মীগণ আমাকে এক হস্তে সূর্য অপর হস্তে চন্দ্র দান করিয়া বলে, 'তুমি আপন কার্য পরিত্যাগ কর, তবু নিশ্চয় জানিবেন, আমি এ কার্য হইতে বিরত হইব না—যে পর্যন্ত ঈশ্বরের সেরূপ ইচ্ছা না হয়। অথবা আমি আমার এই সাধনার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিব। তবে যদি আপনি নিজের জন্য ভয় করেন ত' বলুন, আমি এই মুহূর্তে আপনাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই—আমার আল্লাহ্ আমার সঙ্গে থাকিবেন।" এই বলিয়া পয়গম্বর সাহেব সাশ্রুনয়নে গমনোদ্যত হইলেন।

কিন্তু পিতৃব্যের স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "প্রাণাধিক! আমি তোকে কিছুতেই ছাড়িব না। তোর অরিকুল হইতে তোকে রক্ষা করিব। তুই নির্ভয়ে আপন কাজ কর।"

কিন্তু ভদ্র মহোদয়গণ! আরবীয় পয়গম্বরের এই স্নেহময় পিতৃব্য আর অধিক দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারেন নাই। সেই ঘোর দুর্দিনে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। আর এই বৎসরই তাঁহার পতিপ্রাণা বণিতা খাদিজা বিবিও প্রেম-পাশ ছিন্ন করিয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন। এই সময় বাস্তবিক পয়গম্বর সাহেবের পক্ষে অতি কঠোর শোক ও বিপদাকীর্ণ পরীক্ষার সময় ছিল! রসুলের

শত্রুপক্ষ এই সময় প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। (আহা! বিপদ কখনও একা আইসে না)।

ক্রমে অবস্থা এমন ভয়ানক হইল যে, পয়গম্বর সাহেব মক্কা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন হজরত আলী এবং আবুবকর সিদ্দীক—মাত্র এই দুইজন ব্যতীত, তাঁহার নিকট আর কেহই ছিল না। তমোময়ী নিশীথে পয়গম্বর সাহেব ত আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এদিকে হজরত আলী তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, যাহাতে শত্রুগণ নিশ্চিন্ত থাকে। মোহাম্মদ সাহেবের অরাতিকুল যথাকালে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তথায় উপস্থিত হইল; বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিল, একি! এ'ত মোহাম্মদ (দঃ) নহেন! এ যে আলী শয়ান রহিয়াছেন! উঁহারা তাঁহাকে কিছু না বলিয়া পয়গম্বর সাহেবের মস্তক আনয়নের নিমিত্ত বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করিল।

পয়গম্বর সাহেব যৎকালে একমাত্র সঙ্গী আবুবকর সিদ্দীক সহ গমন করিতেছিলেন, তখন আবুবকর অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে কহিলেন, "হে হজরত! আমরা ত মাত্র দুইজন!" তিনি উত্তর করিলেন, "না, না! আমরা তিন জন—ইঁহাদের একজন অতিশয় প্রতাপশালী—সমুদয় বিশ্বজগৎ এক দিকে, আর তিনি একা এক দিকে।" আবুবকর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "হজরত! সে তৃতীয় জন দ্বারা আপনি কাহাকে বুঝাইতে চাহেন?" উত্তর হইল, "সেই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের রক্ষণা-বেক্ষণের নিমিত্ত সঙ্গে আছেন।" এ-কথায় আবুবকর নিশ্চিত হইলেন।

পয়গম্বর সাহেব মদীনা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি আশাতীত যত্ন ও সমাদরে গৃহীত হইলেন। শত শত সমাজ-নেতা অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইতে আসিলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। হজরতের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অনুচরবর্গও ক্রমে ক্রমে মদীনায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পয়গম্বরের বিপক্ষগণ সেখানেও তাঁহাকে নিশ্চিত মনে তিষ্ঠিতে দিল না। তাহারা এবার সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া পয়গম্বর সাহেবকে আক্রমণ করিল। তখন পয়গম্বর সাহেবও কেবল আত্মরক্ষা কল্পে স্বীয় ক্ষুদ্র যোদ্ধৃদল লইয়া বাহিরে আসিয়া উচ্চৈ:স্বরে প্রার্থনা করিলেন:

"জগৎ-পাতা! তুমি সমস্তই দেখিতেছ এবং সবিশেষ অবগত আছ। অদ্য যদি আমার ক্ষুদ্র সেনাদল বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তোমার সত্য নাম প্রচার করিবার লোক আর কেহ থাকিবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, তুমি সত্যের সহায় হইবে।"

অবশেষে এই প্রথম রক্ত-প্রবাহিনী যুদ্ধ—যাহা বদরের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত হইয়া গেল। ওদিকে ত সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল, এদিকে একশত বীরও ক্ষয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কার্যতঃ ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, মুসলমানদের পক্ষে কোন অদৃশ্য শক্তি যুদ্ধ করিতেছিল, তাই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মোসলেমগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। পয়গম্বর সাহেবের জীবনে এই প্রথম রক্তপাত—যাহা তিনি অনন্যোপায় হইয়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা তিনি এমন দয়ার্দ্রহৃদয় ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন যে, দুর্ধর্ষ লোকেরা তাঁহাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিত। এইরূপে কয়েকবার আরবের মোসলেম-বিদ্বেষিগণ মহা সমারোহে যুদ্ধায়োজন লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং পয়গম্বর সাহেব শুধু আত্মরক্ষা—শিষ্যমণ্ডলীর প্রাণ নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। পরন্তু সর্বদা সত্য ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার সঙ্গে থাকায় বিজয়ের উপর বিজয় লাভ করিতে থাকিলেন এবং অযাচিত প্রভুত্ব লাভ করিলেন। এমন কি তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই সময় পয়গম্বরের অতীত ও বর্তমান জীবনে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইল। পূর্বে লোকে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলে তিনি তাহার প্রতিশোধ না লইয়া তাহাদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করিতেন। এখন তিনি সৈন্য সেনানী ও যথাবিধি সমরায়োজন রাখিতে বাধ্য হইলেন—যাহা একজন সম্রাটকে করিতে হয় এবং অপরাধীকে শাস্তিদান করিতেও হইত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও তিনি অতি উচ্চ আদর্শের দয়া ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

পয়গম্বর সাহেবের জন্মের পূর্বের অর্থাৎ যে সময়কে আরবীয় মুসলমানদের মূর্খতার যুগ বলা হয়, যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণের প্রতি এমন নৃশংস নির্যাতন করা হইত যে, তাহার তুলনা নিতান্ত অসভ্য বর্বর জাতির মধ্যেও পাওয়া কঠিন। কিন্তু পয়গম্বর সাহেবের সময়ে যুদ্ধে ধৃত বন্দীদিগের প্রতি যেরূপ সদয়, সুভদ্র ব্যবহার করা হইত, তাহার আদর্শ অদ্যাপি কোন অতি সভ্য দেশ ও সমাজে পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। একদা রণযাত্রা-কালে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে এক দল বন্দী ছিল। খাদ্য সামগ্রীতে (রসদে) আটা অল্প ছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল; তচ্ছ্রবণে রসুলোল্লাহ্ আদেশ দিলেন যে, বন্দীদিগকে রুটি দান করা হউক, আর স্বাধীনেরা খর্জুর ভক্ষণ করুক। (কি মহত্ত্ব!)

আর এক বারের ঘটনা এই যে, যুদ্ধ জয়ের পর, লুণ্ঠিত দ্রব্য যখন বণ্টন করা হইল, তখন পয়গম্বর সাহেব স্বীয় নিকটবর্তী প্রিয় সহচরবৃন্দকে ভাগ লইতে

দিলেন না। ইহাতে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। পয়গম্বর সাহেব তাহা অবগত হইয়া সহচরদের ডাকিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! তোমরা জান, পূর্বে তোমরা কিরূপ বিপন্ন ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদের বিপন্মুক্ত করিয়াছেন; তোমরা একে অপরের রক্তপিপাসু ছিলে, প্রভু তোমাদিগকে এখন ভ্রাতৃপ্রেম দান করিয়াছেন; তোমরা কোফরের (অধর্মের) অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিলে, তিনি বিশ্বাসের নির্মল জ্যোতিতে তোমাদের মন আলোকিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল অনুগ্রহ পুরস্কার কি তোমরা প্রাপ্ত হও নাই?" তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ আমাদের অবস্থা বাস্তবিক এইরূপই ছিল এবং এখন যে সুখ-সম্পদ ভোগ করিতেছি, আল্লাহ্তালারই অনুগ্রহে এবং আপনার দয়ায় আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।" তিনি উহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না, বল যে কেবল খোদার অনুকম্পা ছিল। আর যদি তোমরা এইরূপ বলিতে ত আমিও সাক্ষ্য দিতাম। আমার সম্বন্ধে তোমরা ইহা বলিতে পার যে, তুমি এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ, আমরা তোমায় আশ্রয় দিয়াছি; তুমি দুঃখ-চিন্তা-ভারাক্রান্ত ছিলে, আমরা তোমায় সান্ত্বনা দিয়াছি" (এ কথায় তাঁহারা কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া) পুনরায় পয়গম্বর সাহেব বলিলেন, "হে প্রিয় সহচরবৃন্দ! লুণ্ঠিত-দ্রব্যের বিনিময়ে কি তোমরা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর না? খোদার কসম! খোদার সমস্ত রাজ্য বিপক্ষে দাঁড়াইলেও মোহাম্মদ আপন সহচরদের পক্ষে থাকিবে, যেহেতু তাঁহারা বিনা স্বার্থে—শুধু ঈশ্বরোদ্দেশে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।"

পয়গম্বর সাহেবের এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সুফল এমন হইল যে, উক্ত সহচরগণ—যাঁহারা মরিতে ও মারিতে নির্ভীক, শৌর্য-বীর্যে সিংহ-তুল্য জাতি ছিলেন, এক্ষণে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হে রসুলুল্লাহ্! আমাদের বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি।'

আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আপনারা বাস্তবিক আরবীয় পয়গম্বরের অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহেন। আপনারা এ অলৌকিক ঐশিক শক্তি দেখিতে সক্ষম নহেন, যাহা তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যকে কষ্ট স্বীকার ত তুচ্ছ—মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে; যাহা কোটি কোটি লোকের অন্তরে ঈশ্বর-প্রেম অঙ্কিত করিয়াছে। আপনারা আরবীয় পয়গম্বরের নিরহঙ্কার ভাব ও আত্মত্যাগের বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন ত। তিনি অনুবর্তীগণকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন কেহ দেবতা কিম্বা অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান না করে। তিনি বারম্বার

বলিয়াছেন, "আমি তোমাদেরই মত মানুষ, এইমাত্র প্রভেদ যে, আমি তাঁহার (খোদার) দূত, তাঁহার সংবাদ তোমাদিগকে পৌঁছাই।" পয়গম্বর সাহেবের নিরভিমান ও সরলতার প্রমাণ এতদপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে। যে সময় তিনি রাজাধিরাজ সম্রাট ছিলেন, তখন স্বহস্তে আপন জীর্ণ বস্ত্রে চীরসংলগ্ন করিতেন-ছিন্ন পাদুকা স্বহস্তে সেলাই করিতেন। তাঁহার শান্ত স্বভাব সম্বন্ধে তদীয় ভৃত্য আনাস বলিয়াছিলেন, "আমি দশ বৎসর তাঁহার নিকট ছিলাম, তিনি কদাচ অপ্রিয় বচন কহিবেন দূরে থাকুক, আমাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেন নাই।" (হাদীস শরীফে তুই শব্দের উল্লেখ নাই), ভ্রাতৃগণ! এমনই আড়ম্বরশূন্য জীবন ছিল সেই সম্রাটের, যিনি ইচ্ছা করিলে পরিচর্যার জন্য সহস্রাধিক দাসদাসী রাখিতে পারিতেন!

আরবীয় পয়গম্বর যে 'মিশনের' জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা করিলে পর সেই (দারুণ) সময় আসিল, যখন একদিন (মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে) রোগক্লিষ্ট অবস্থায় তিনি বহু কষ্টে নমাজের নিমিত্ত মসজিদে আনীত হইলেন। (নামাজ শেষ হইলে) তিনি আপন পীড়িত ক্ষীণ কণ্ঠ যথাশক্তি উচ্চ করিয়া বলিলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা সাধারণে ঘোষণা করিয়া দাও, যদি আমি এ জীবনে কাহারও প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়া থাকি, তবে সে অদ্য আমা হইতে প্রতিশোধ লউক, পরলোকের জন্য যেন স্থগিত না রাখে। যদি কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, সে ঋণ শোধের নিমিত্ত আমার ঘরবার তাহাকে সমর্পণ করিতেছি। অদ্য আমি সকল প্রকার জবাবদিহির জন্য উপস্থিত আছি।"

একজন বলিল, হজরতের নিকট তাহার ত্রিশ, 'দেরেম' পাওনা আছে, তাহা রসুলোল্লাহ্ তন্মুহূর্তে শোধ করিলেন।* এই তাঁহার মসজিদে শেষ আগমন।

---

*মিসেস এনি বেশান্ত এস্থলে "আক্কাসের তাজিয়ানার" বিষয় উল্লেখ করেন নাই; আমার মনে হয় এজন্য "প্রতিশোধ" বিষয়টি অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। সে তাজিয়ানার কথা এই:

কোন এক দিন হজরত কোন কারণে আক্কাস নামে এক ব্যক্তিকে এক ঘা কোড়া মারিয়াছিলেন। অদ্য সেই আক্কাস মসজিদে আসিয়া সেই কোড়ার প্রতিশোধ পাইবার দাবী করিল, তখন রসুল তাহার হস্তে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সহচরবৃন্দ ও আত্মীয় বান্ধবগণ অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, যেহেতু হজরত এমন পীড়িত অবস্থায় কোড়ার আঘাত কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহারা অনুনয়-বিনয় করিয়া আক্কাসকে নিবৃত্ত হইতে, অথবা রসুলের পরিবর্তে তাঁহাদের গাত্রে একাধিক কোড়া মারিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আক্কাস তাঁহাদের কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন তাঁহারা অতিশয় অধীর হইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন,—নিষ্ঠুর আক্কাস করে কি! হায় হায়, রসুল হত্যা করিবে! হজরত কিন্তু অবিচলিত চিত্তে আক্কাসকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত প্রতিশোধ লইতে ইঙ্গিত করিলেন।

অতঃপর ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে ৮ই জুন আরবীয় পয়গম্বর নশ্বর মৃন্ময় দেহত্যাগ করিলেন, যাহাতে অতি উচ্চ অনন্তধামে গিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন। এই জীবন অতি উচ্চ, পবিত্র, বিস্ময়কর এবং বাস্তবিক খোদার পয়-গম্বরেরই যোগ্য ছিল (অবশ্য, সাধারণ মানবের জীবন এরূপ হওয়া অসম্ভব)।

ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি আপনাদিগকে আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি যে সব অন্যায় দোষারোপ করা হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি। অনভিজ্ঞতা ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞানাভাবে, অথবা, শুধু কুসংস্কার বশতঃ রসুলের প্রতি ঐসব দোষারোপ করা হইয়া থাকে। তাঁহার একতম দোষ এই বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সর্বশুদ্ধ ৯জন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আপনারা কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, সেই ব্যক্তি, যিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কোন প্রকার "মকারাদি" কু অবগত ছিলেন না, পরে নিজের অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স্কা একটি বিধবার পাণি গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহিত অতি সুখে জীবনের ২৬টি বৎসর যাপন করিলেন; তিনি শেষ বয়সে যখন মানুষের জীবনীশক্তি নির্বাপিত প্রায় হয়, শুধু আত্মসুখের জন্যই যে কতকগুলি বিবাহ করিবেন, তাহা কি সম্ভব? যদি ন্যায় বিচারের সহিত বিবেচনা করেন, তবে আপনারা বেশ জানিতে পারিবেন—সে বিবাহের উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রথমে দেখিতে হইবে, তাঁহারা (হজরতের পত্নিগণ) কোন শ্রেণীর কুলবালা ছিলেন, আর কেনই বা তাঁহাদের রসুলের প্রয়োজন ছিল।—কতিপয় নারী এরূপ ছিলেন যে, তাঁহাদের বিবাহের ফলে রসুলের পক্ষে 'নূর-ইসলাম' প্রচারের সুবিধা হইল। আর কয়েকজন এরূপ ছিলেন যে, বিবাহ ব্যতীত তাঁহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোন উপায় ছিল না।

আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি আর একটি দোষারোপ এই করা হয় যে, তিনি রক্তপাতের প্রশ্রয় দিতেন এবং কারণে-অকারণে কাফের হত্যা করিতে আদেশ

সে বলিল, "হজরত আমি নগ্ন পৃষ্ঠে আপনার কোড়ার আঘাত পাইয়াছিলাম।" এতচ্ছ্রবণে রসুলে করিম তৎক্ষণাৎ গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া নগ্নদেহে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন!!!

বলি, আজ পর্যন্ত জগতে কেহ ঐরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে কি? আমার বিশ্বাস রসুলকে গাত্র বস্ত্র মোচন করিতে দেখিয়া স্বর্গদূত (ফেরেশ্‌তা) পর্যন্ত কম্পিত হইয়াছিলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আরও কোন মহাপুরুষ দেখাইতে পারিয়াছেন কি?

আক্কাস অবশ্য রসুলকে কোড়া মারিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল না, তাহার উদ্দেশ্য ছিল হজরতের পবিত্র পৃষ্ঠ চুম্বন করা। সে উদ্দেশ্য সফল হইল—ক্রন্দনের রোলের মধ্যে ভক্তির জয়-জয়কার ঘোষিত হইল।

—লেখিকা

দিতেন। এখন এ-সম্বন্ধে আপনারা আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। যখন আইনের দুই দফা প্রায় একই প্রকার হয় অর্থাৎ একটি কোন শর্তের অধীন এবং অপরটি শর্তবিহীন তখন শর্তহীন ধারাও সর্বদা শর্তাধীন ধারা বলিয়াই মানিতে হয়। মুসলমানদের শাস্ত্রকারগণ সর্বদা এ-বিষয়ের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং কোরআনের বচনসমূহেও একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা একস্থলে বলা হইয়াছে, "কাফেরকে হত্যা কর," এবং অপর স্থলে বলা হইয়াছে, "হত্যা কর, যদি তাহারা তোমাদের ধর্মকর্মে বাধা দেয়।" এখন আমি আপনাদিগকে সেই মূলবচনসমূহের—যাহা রসুলের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, শাব্দিক অনুবাদ শুনাই-তেছি। আমি নিজের ভাষায় বলিব না, কারণ যদি আপনারা মনে করেন যে, আমি তাঁহাদের (মুসলমানদের) ধর্মপ্রচার করিতেছি। তবে শ্রবণ করুন: "যদি তাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে যাহা হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা করা যাউক। কিন্তু যদি তাহারা তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তবে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্ত যেরূপ শাস্তি দেওয়া গিয়াছে সেইরূপ শাস্তি ভোগ করিবে। এজন্য উহাদের সহিত যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত উহারা পৌত্তলিকতা রক্ষার নিমিত্ত তোমাদের বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত না হয় এবং অদ্বিতীয় খোদার ধর্মকে অমান্য করে, যুদ্ধ করিতে থাকে। আর যদি তাহারা মানে তবে, নিশ্চয় জানিও আল্লাহ তাহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু যদি তাহারা সত্যধর্মের বিরোধী হয়, তবে আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হইবেন। তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভিভাবক এবং সাহায্যকর্তা।"

আর একটি বিষয়, যাহা পয়গম্বরকে উপদেশ দানের নিমিত্ত কোরআনে অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি:

"মনুষ্যদিগকে নম্র মৃদু ভাষায় যুক্তি সহকারে উপদেশ দিয়া আল্লাহ্ তালার ধর্মপথে আহ্বান কর; তাহাদের সহিত অতিশয় ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সহিত সদয়ভাবে তর্ক কর, কেননা উহাদের কে সত্য পথ ভুলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে এবং কে সত্য পথে আছে—তাহা আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন। যদি তুমি প্রতিশোধ লও, তবে লক্ষ্য রাখিও যে, তাহা তোমার প্রতি যে অত্যাচার অনাচার হইয়াছে (ন্যায়বিচার অনুসারে) তাহার সমান হয়; আর যদি তুমি প্রতিশোধ না লইয়া সহ্য কর, তবে সাবের (সহিষ্ণু) ব্যক্তির পক্ষে আরও ভালো কথা। সুতরাং ভাল হয়, যদি শত্রুদের প্রপীড়ন ধীরতার সহিত সহ্য কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও তোমার কার্যকলাপ তবেই সফল হইবে, যখন তাহার সহিত আল্লাহ্ তালার অনুগ্রহ মিশ্রিত থাকিবে। কাফেরদের ব্যবহারে দুঃখিত হইও না, এবং উহাদের

চাতুরী শঠতায়ও ব্যতিবস্ত হইও না, কারণ আল্লাহ তাহাদেরই সাহায্য করেন যাহারা সাধু ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং তাহাকে ভয় করে।”

আর একটি উপদেশ শ্রবণ করুন;—“ধর্মকর্ম ব্যাপারে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না, যদি সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবে বুঝিও আল্লাহ তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আর যদি ধর্ম স্বীকার না করে, তবে আর কি করা—তোমার কাজ ত কেবল উপদেশ দান ও প্রচার করাই ছিল।”

আরও শ্রবণ করুন,—পয়গম্বর সাহেব কাফেরের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, “কাফের তাহারাই যাহারা ন্যায় বিচারের বিপরীত কার্য করে; পাপী কেবল তাহারাই যাহারা ঈসলাম ধর্মের বাহিরে।” ইহাতে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ধর্মের বৃত্তি (دائرہ) তত সঙ্কীর্ণ নহে যে. কেবল পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

আর একস্থলে (প্রত্যাদেশে) আসিয়াছে যে, “যদি তাহারা তোমাদের বিরোধী হইয়া যায় কিন্তু তোমাদের সহিত যুদ্ধ-কলহ না করে আর তোমাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে, তবে তাহাদিগকে হত্যা করা কিম্বা তাহাদের বশীভূত করিতে চেষ্টা করা ঈশ্বরাদেশের বিরুদ্ধ।”

উপস্থিত মহোদয়গণ, আপনারা কি বলিতে পারেন যে, ইহা ন্যায়বিচারের কথা হইবে যে, আমরা পয়গম্বর সাহেবের তাদৃশ মিলন প্রয়াসী শান্তিসূচক বচন-সমূহের প্রতি—যাহা সেরূপ যুদ্ধ কলহ এবং অত্যাচারের যুগে বলা হইয়াছিল, একটু মনোযোগ না করি, আর কেবল ঐ সকল বচন, যাহা তিনি কোন এক ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইবার সময় উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, সেগুলিকে ধরিয়া লই ? আর আমার মতে যে কোন সেনাপতি এরূপ স্থলে থাকিতেন, তিনি এতদপেক্ষা অধিক যোগ্যতার কাজ আর কি করিতেন ?

বেশ, এখন আপনারা সেই শান্তিপ্রিয়তা শিক্ষার আর একটি দৃষ্টান্ত, যাহা পয়গম্বর সাহেবের স্বকীয় ব্যবহারে দেখা যায়, একটু সমালোচনা করিয়া দেখুন'ত অত্যাচার এমন কোন ছিল না, যাহা পয়গম্বরের প্রতি করা হয় নাই,—আর তিনি তাহা ক্ষমা না করিয়াছেন; কোন নির্যাতন এমন হয় নাই, যাহা তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত না ছিলেন। হে ভ্রাতৃগণ! কোন ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে দেখুন, যে অবস্থায় তিনি বাস্তবিক থাকেন, কুসংস্কারের চশমা পরিয়া দেখিবেন না।

প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু দোষ জন্মিয়াই থাকে; সমস্ত সাধু-প্রকৃতি লোকের কার্যকলাপে কোন-না-কোন দোষ থাকেই, বিধর্মী এবং মূর্খ শিষ্য একে

আর বুঝিয়া থাকে। কোন ধর্ম দেখিতে হইলে সেই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে দেখা উচিত; তাহা না করিয়া কোন নরাধমকে দেখিয়া তাহাকেই দৃষ্টান্ত বলিয়া ধারণা করা অন্যায়। তবেই আমরা একে অপরকে ভ্রাতার ন্যায় ভালোবাসিতে শিখিব এবং বন্য অসভ্যদের মত একে অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব না।

আমার দুঃখ হইতেছে যে, সময়াভাবে আমি ইসলামের শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। যদিও সে বিষয়টিও আপনাদের ভালো লাগিত কিন্তু তাহা তত প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া আমি এস্থলে সে বিষয় পরিত্যাগ করিলাম।

প্রত্যেক ধর্মেই বাহ্যিক অবস্থার পরে দর্শন থাকে। যদি এ-সময় ইসলামের বর্তমান অবস্থায় আমরা তাহার স্বল্পতা দেখিতেছি, (তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই) কারণ, আমরা যখন সেই সময়ে—যখন ইসলামের জ্যোতিঃ আরম্ভ হইয়াছিল, দৃষ্টিপাত করি তাহার গুণ ব্যাখ্যার উপযুক্ত ভাষা ও শব্দ পাই না।

এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, আরবীয় পয়গম্বর তের শত (১৩০০) বৎসর পূর্বে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন;—"বিদ্যা শিক্ষা কর; যে বিদ্যা শিক্ষা করে সে নির্মল চরিত্র হয়; যে বিদ্যার চর্চা করে সে ঈশ্বরের স্তব করে; যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে উপাসনা (এবাদত) করে; যে উহা শিক্ষা দেয় সেও উপাসনা করে; বিদ্যাই মানবকে ভালো ও মন্দ (সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ) জ্ঞান শিক্ষা দান করে; শিক্ষাই সুপথ প্রদর্শন করে; শিক্ষাই নির্জনে নির্বাসনে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করে; বনবাসে সান্ত্বনা প্রদান করে; বিদ্যা আমাদিগকে উন্নতি-মার্গে লইয়া যায় এবং দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। বন্ধু-সভায় বিদ্যা আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ; শত্রু সম্মুখে অস্ত্র স্বরূপ।* বিদ্যার দ্বারা আল্লাহ্-তায়ালার বিপন্ন দাস পুণ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ত হয়।"

পয়গম্বর সাহেবের নিম্নোক্ত বচনসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি ভক্তি-প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি। তিনি বলিয়াছেন, "বিদ্বানের (লিখিবার) মসী শহীদ (ধর্মার্থ সমরশায়ী)-দের রক্তাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।" ভ্রাতৃগণ! বিদ্যার গৌরব বর্ণনা এতদপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে?

*সুশিক্ষার কল্যাণে শত্রু জয় করা যায় একথা ধ্রুব সত্য। ঐ কারণেই বোধ হয় নারী-বিদ্বেষী মহাশয়গণ স্ত্রীশিক্ষায় আপত্তি করেন। যেহেতু তাহা হইলে স্ত্রীলোকের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়। শুনিয়াছি, করটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মরহুমা জমরদন্নেসা খানম সাহেবা নাকি বলিয়াছিলেন, "এখন মরদের হাতে কলম; একবার জানানার হাতে কলম দিয়া দেখ।" ইংরাজী প্রবচন বলে "pen is mightier than sword". —লেখিকা

হজরত আলী যিনি পয়গম্বর সাহেবের প্রিয় জামাতা ছিলেন, আর যাঁহার সম্বন্ধে পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন যে, "আলী ইসলামে বিদ্যা জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ।" মুসলমানদের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে এলমে-এলাহী প্রচার আরম্ভ করেন। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হজরত আলীর যে সকল বক্তৃতা আছে তাহা পাঠের উপযুক্ত। তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ও (যুদ্ধক্ষেত্রে) ধর্ম বক্তৃতা (খুতবা) পাঠ করিতেন।

বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে হজরত আলীর রচনাবলী হইতে কয়েকটি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

"অন্তর আলোকিত করিবার জন্য সুশিক্ষা উজ্জ্বল রত্ন; সত্য তাহার (বিদ্যার) লক্ষ্য; ঈশ্বরতত্ত্ব (এলহাম) তাহার পথ-প্রদর্শক; বুদ্ধি (সুবোধ?) তাহাকে গ্রহণ করে; মানবের ভাষায় বিদ্যার যথোচিত প্রশংসা হইতে পারে না।"

ওদিকে মুসলমানেরা দেশ-সংক্রান্ত কর্তব্যসাধনে মগ্ন ছিলেন, এদিকে হজরত আলীর শিষ্যবর্গ শিক্ষা বিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা যেখানেই যাইতেন শিক্ষার মশাল সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহার ফলে এই হইল যে, খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের শিশুদের হস্তে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রদীপ দেওয়া হইয়াছিল। যেখানে তাঁহারা দেশ জয় করিতেন, সেইখানেই পাঠশালা ও বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ কাহেরা, বাগদাদ, হিসপানিয়া এবং কার্ডোভার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রদর্শন করিতেছি।*

ইংলণ্ডের লোকদিগকে মুসলমানেরাই তাহাদের বিস্মৃত বিদ্যার বর্ণমালার পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পুস্তকের অনুবাদ করাইয়াছেন; রসায়ন এবং অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তকাবলী রচনা করিয়াছেন।

জনৈক পোপ (দ্বিতীয় মিসলউটিয়র) যিনি খ্রীস্টীয় ধর্মের অতি উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ও গুরু ছিলেন, তিনি মুসলমানদেরই কর্ডোভা মাদ্রাসায় অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে লোকে তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া জনসমাজে অপদস্থ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে "শয়তানের বাচ্চা" বলিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায়, সে সময়

---

* আমাদের সদাশয় বৃটিশ প্রভুরা দাবী করেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন বলিয়াই আমরা (বর্বরেরা) শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছি। আর আমরাও নত মস্তকে স্বীকার করিয়া বলি যে,—' ইয়ে হয় আহলে মগরেবকে বরকৎ কদমকী" (ইহা পশ্চিম দেশবাসী দিগের শ্রীচরণের প্রসাদ)। কিন্তু মিসেস বেশান্ত ত বলেন যে, শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে মুসলমানেরাই ইউরোপের শিক্ষা-গুরু।

ইউরোপের খ্রীস্টীয় বিভাগ কেমন ঘোর মূর্খতায় তমসাচ্ছন্ন ছিল, আর কেবল ইসালমের অনুবর্তিগণই তাঁহাদিগকে (ইউরোপীয়দিগকে) জ্ঞানের আলোক-রশ্মি দেখাইতেছিলেন।

মুসলমানেরা শিল্প এবং আবিষ্কারেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র তাঁহারাই নির্মাণ করেন; পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ তাঁহারাই স্থির করেন। গ্রীকদের নিকট হইতে তাঁহারা অঙ্কবিদ্যা লাভ করেন; সঙ্গীত ও কৃষিবিদ্যাকে তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই পর্যন্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, বরং ধর্মের দর্শন-তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া "ফানাফিল্লাহ"র গূঢ় তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রচার করিলেন যে, আল্লাহ অদ্বিতীয় এবং সমুদয় মানবজাতি এক জাতীয় (মানবের মধ্যে জাতিভেদ নাই)। আর এই বিধান তাঁহারা অতি মনোরম ভাষায় বুঝাইয়াছেন।

হে হিন্দু ভ্রাতৃগণ। আপনারা যদি ঐ শাস্ত্রবিধানসমূহের বিষয় চিন্তা করেন, ত আপনারা উহাকে প্রকৃত (আসল) বেদান্ত স্বরূপ পাইবেন; মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ ছয় শত বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। অদ্য যদি আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণ নিজেদের ঐ সকল জগন্মান্য পূর্ব-পুরুষদের রচিত শিক্ষা-সংক্রান্ত পুস্তকাবলী আধুনিক প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়েন এবং সর্বসাধারণে ঐ শিক্ষা প্রচার করেন, তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহারা ইসলামী দর্শনকে সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানে তুলিতে সক্ষম হইবেন। আর ইসলামের আবাল-বৃদ্ধবণিতা (কচি কচি শিশুগণ)ও ইসলামী দর্শন কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে (যেমন হিন্দুগণ এখন আপন বেদান্ত প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন)। আপনারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, তাঁহারা ইসলামের প্রকৃত গৌরব সৃষ্ট জগৎকে দেখাইবার জন্য কিরূপে ধর্মের সেবা করিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ, হযরত ঈসা, রজদশ্ত, মুসা, মহর্ষি বুদ্ধদেব - সকলে একই অট্টালিকায় আছেন। তাঁহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতিকে ভিন্ন মনে করেন না। আর আমরা যে তাঁহাদের সামান্য শিষ্য, তাঁহাদের শিশু সন্তান—আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমের সারতত্ত্ব লাভ করি। প্রেম দ্বারাই তাঁহারা আমাদের নিকটবর্তী হন। পয়গম্বর মোহাম্মদ সাহেব স্বেচ্ছায় স্বীয় শিষ্যের নিকট-বর্তী হন না, যে পর্যন্ত শিষ্য মনের কঠোরতা দূর না করে এবং তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার না হয়।

হে আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! পয়গম্বর সাহেব যেমন আপনাদের সেইরূপ আমাদেরও আপন। যত পয়গম্বর মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলের উপরই আমাদের দাবী (হক) আছে। আমরা

তাঁহাদিগকে ভালবাসি, তাঁহাদের সম্মান করি এবং তাঁহাদের সম্মুখে অতি নম্রভাবে ভক্তি-সহকারে মস্তক অবনত করি।

খোদার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি সকলেরই আল্লাহ ;—তিনি আমাদিগকে এইরূপ বুঝিবার শক্তি দান করুন যে তাঁহার নামের জন্য যেন আমরা পরস্পরে ঝগড়া না করি—আমাদের শিশু-সুলভ দুর্বল অধরে যে নামই উচ্চারিত হউক না কেন—কিন্তু তিনিই ত অদ্বিতীয় এবং সকলেরই উদ্দেশ্য (উপাস্য) একমাত্র তিনিই।*

---

*এই সকল বিষয়ের সহিত আমাদের মতানৈক্য নাই। মিসেস এনি বেশান্ত মহোদয়া থিওসোফীর একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রচারক ও শিক্ষা-গুরু। তিনি নিজের শিক্ষা ও ধর্মের দিক দিয়া এসলামের সমালোচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সব কথার সহিত আমাদের মতের মিল থাকিতে পারে না। এসলামের প্রকৃত স্বরূপ এখনও বহুস্থলে অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা যদি যথাযথা-ভাবে ঐ স্বরূপটি জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে প্রত্যেক ন্যায়দর্শী ও সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয়ই তাহার নিকট আত্মদান করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লার প্রেরিত সমস্ত ধর্ম-প্রচারক যাহারা মানবজাতির কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, মুসলমান মাত্রেরই মান্য ও নমস্য। তাহাদিগের উপর বিশ্বাস না করিলে কেহ, মুসলমানই হইতে পারে না। আর আমাদের ধর্ম-শাস্ত্রে যে সকল পয়গম্বরের নামোল্লেখ হইয়াছে তাহা বাদে আরও অনেক পয়গম্বর আছেন, যাঁহাদের নাম হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-কে জ্ঞাত করা হয় নাই। অধিকন্তু প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির নিকট প্রেরিত পুরুষগণ আসিয়াছেন ও স্বর্গের বাণী শুনাইয়াছেন, এই সমস্ত কথার প্রত্যেকটিই কোরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াৎ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা মিসেস মহোদয়ার মন্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করিতেছি।

(আল-এসলাম-সম্পাদক।)

সৌরজগৎ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কারসিয়ঙ্গ পর্বতের একটি দ্বিতল গৃহে অপরাহ্ণে গওহর আলী স্ত্রী ও কন্যা-দলে পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়াছেন। তাঁহার নয়টি কন্যা যে যে ভাবে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছে, তাহা দেখিয়া স্বতঃই এ পরি-বারটিকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে হয়। সর্বকনিষ্ঠা দুহিতা মাসুমা তাহার সর্বজ্যেষ্ঠা সহোদরা কওসরের ক্রোড়ে এবং অবশিষ্ট শিশুগুলি পিতা-মাতার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট পাদপীঠে বসিয়াছে।

এইরূপে ভাগ্যবান গওহর আলী তারকাবেষ্টিত সুধাংশুর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

কওসর পিতামহের অতি আদরের পৌত্রী। তিনি সাধ করিয়া ইহার নাম "কওসর" রাখিয়াছেন। কওসর শব্দের অর্থ স্বর্গীয় জলাশয়, যেমন মন্দাকিনী।*

যে কক্ষে তাঁহারা উপবেশন করিয়াছেন, সেটি কতক মুসলমানী ও কতক ইংরাজী ধরনে সজ্জিত; নবাবী ও বিলাতী ধরণের সংমিশ্রণে ঘরখানি মানাইয়াছে বেশ। ত্রীপদীর (টিপায়ের) উপর একটি ট্রেতে কিছু জলখাবার এবং চা-দুগ্ধ ইত্যাদি যেন কাহার অপেক্ষায় রাখা হইয়াছে।

গওহর আলীর হস্তে একখানি পুস্তক; তিনি তাহা পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের আলোচ্য-বিষয় ছিল বায়ু। বায়ুর শৈত্য, উষ্ণতা, লঘুত্ব, গুরুত্ব, বায়ুতে কয় প্রকার গ্যাস আছে; কিরূপে বায়ু ক্রমান্বয়ে বাষ্প, মেঘ, সলিল এবং শীতল তুষারে পরিণত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রোতৃবর্গ বেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছে; কেবল সপ্তমা দুহিতা সুরেয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন দ্বারা পিতার ধৈর্যগুণ পরীক্ষা করিতেছে। কখনও ছবি দেখিবার জন্য পিতার হস্ত হইতে পুস্তক কাড়িয়া লইতেছে। পিতা কিন্তু ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং আমোদ বোধ করিয়া হাসিতেছেন।

গৃহিনী নূরজাহাঁ একবার ঐ ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ভাই এখনও আসিলেন না; চা ত ঠাণ্ডা হইতে চলিল।"

*বালিকাদের নাম ও বয়স জানিয়া রাখিলে পাঠিকার বেশ সুবিধা হইবে। কওসরের ১৮, আখ্‌তরের ১৬, বদরের ১৪, রাবেয়ার ১২, মুশ্‌তরীর ১০, জোহ্‌রার ৮, সুরেয়ার ৬, নয়িমার ৪ এবং মাসুমার বয়স ২ বৎসর।

গওহর। তোমার ভাই হয় ত পথে লেপ্ চাদরের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

বালিকা রাবেয়া বলিল, "আমরা তাঁহাকে দ্বিতীয় বেঞ্চের নিকট অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এইটুকু পথ তিনি এখনও আসিতে পারিলেন না?"

সুরেয়া। বাব্বা! বেন্ কি অল্প পথ? আমি ত হাঁটিতে না পারিয়া আয়ার কোলে চড়িয়া আসিলাম।

রাবেয়া। ঈশ্! আমি একদৌড়ে দ্বিতীয় বেঞ্চ হইতে এখানে আসিতে পারি।

গওহরও কন্যাদের কথোপকথনে যোগ দিয়া বলিলেন, "আগে এক দৌড়ে আসিতে পারিয়া দেখাও, পরে বড়াই করিও। কোন কাজ করিতে পারার পূর্বে 'পারি' বলা উচিত নহে!"

কওসর। এখান হইতে দ্বিতীয় বেঞ্চ প্রায় দুই মাইল হইবে, না আব্বা?

গও। কিছু বেশী হইবে। যাহা হউক, রাবু যখন বলিয়াছে, তখন তাহাকে অন্ততঃ একবার একদৌড়ে সে পর্যন্ত যাইতেই হইবে।

আখ্তর। রাবু একদৌড়ে যাইবে, না পথে বিশ্রাম করিবে, তাহা জানিবার উপায় কি?

গও। (বিস্ফারিত নেত্রে) জানিবার উপায়? রাবু যতদূর পর্যন্ত গিয়া ক্লান্তি বোধ করিবে, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পরাজয় স্বীকার করিবে। সে নিজেই বলিবে, সে কতদূর গিয়াছিল। আমার কন্যা কি মিথ্যা বলিবে?

রাবু। (সোৎসাহে) না আব্বা! আমি মিথ্যা বলি না—বলিবও না।

আখ্। আমি বেশ জানি, তুমি মিথ্যা বল না; তবে যদি মিথ্যা বাহাদুরির লোভে একটি ছোট মিথ্যা বলিয়া ফেলিতে!

রাবু। (সগর্বে) মিথ্যা বলার পূর্বে মরিয়া যাওয়া ভাল!

গও। ঠিক! তোমরা কেহ একটি মিথ্যা বলিলে আমার মর্মে বড়ই ব্যথা লাগিবে। আশা করি, তোমরা কেহ আমাকে কখন এরূপ কষ্ট দিবে না।

কতিপয় বালিকা সমস্বরে বলিয়া উঠিল :—"আমরা মিথ্যা না,"—"আমরা কষ্ট না"; অথবা কি বলিল ঠিক শুনা গেল না।

এমন সময় সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। কওসর ও মাসুমা ব্যতীত অপর বালিকা কয়টি "মাম্মা আসিলেন" বলিয়া পলায়ন তৎপরা হইল। গওহর নয়িমাকে ধরিয়া বলিলেন, "সেজন্য পলাইস কেন মা?"

নয়িমা। ও বাব্বা! আমি না—মাম্মা! (অর্থাৎ আমি থাকিব না—মাম্মা বকিবেন)।

ইতঃমধ্যে জাফর আলী গৃহে প্রবেশ করিলেন। পলায়মানা বালিকাদের দেখিয়া তিনি গওহরকে সহাস্যে বলিলেন, 'Solar system (সৌরজগৎ)টা ভাঙ্গিয়া গেল কেন?"*

গও। তুমি 'ধূমকেতু' আসিলে যে!

নূরজাহাঁ ভ্রাতার নিমিত্ত চা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইয়া গওহরকে বলিলেন, "তুমি একটু সর, ভাইকে অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিতে দাও।"

জাফর। না আমি অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিব না। যে ক্লান্ত হইয়াছি, আমার সর্বাঙ্গ ঘর্মসিক্ত হইয়াছে। আমি এইখানেই বসি।

কওসর জলখাবারের ট্রেটা আনিয়া জাফরের সম্মুখে রাখিল, এবং তাঁহার ললাটে ঘর্মবিন্দু দেখিয়া স্বীয় বসনাঞ্চলে মুছিয়া দিল।

জাফর এক পেয়ালা চা শেষ করিয়া ভগিনীর হস্তে পেয়ালা দিয়া বলিলেন, "নূরু! আর এক পেয়ালা চা দে!"

গও। তোমার ভুল হইল। পেয়ালাটি লইবার জন্য তাঁহাকে এতদূর আসিতে হইল, ইহা অন্যায়! তুমি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে পেয়ালা দিতে পারিতে।

নূরজাহাঁ অধোমুখে মৃদুহাস্য করিলেন। কওসরের খুব জোরে হাসি পাইল বলিয়া সে প্রস্থান করিল, এবং মাতার সাহায্যের নিমিত্ত বদরকে তথায় পাঠাইয়া দিল।

জাফ। দেখ ভাই! তোমার সাহেবীটা আমার সহ্য হয় না। তুমিই কি একমাত্র বিলাত ফেরতা?

গও। না, তুমিও বিলাত ফেরতা! তোমার গালি শুনিয়া আমোদ হয়, সেইজন্য সাহেবীভূতের দোহাই দিই! সে যাহা হউক, তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? পথে পাহাড়ীদের সহিত গল্প করিতেছিলে না কি?

জাফ। ভুটিয়াদের সহিত গল্প করিব কি, উহাদের ভাষাই বুঝি না; যে ছাই "কানছু যানছু" বলে।

বদর তাহার পাহাড়ী ভাষার অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বলিল, "যানছু মানে যাওয়া।" নূরজাহাঁ তাহাকে বলিলেন, "ইঁহাদের গল্পে যোগ দিয়া তোমার কাজ নাই মা! যাও তুমি কওসরের নিকট।"

গও। তবে কেন বিলম্ব হইল?

---

* পুরুষদের কথোপকথনে দুই-একটি ইংরাজি শব্দের ব্যবহার পাঠিকারা ক্ষমা করিবেন। ব্র্যাকেটের ভিতর শব্দগুলির অনুবাদ দেওয়া গেল।

জাফ। প্রথম বেঞ্চে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। তথা হইতে সমস্ত কারসিয়ঙ্গ শহরটা ত বেশ দেখা যায়। বাজার ষ্টেশন, কিছুই বাদ পড়ে না।

নূরজাহাঁ। হ্যাঁ, ঐখানে বসিলে ধরা খানা সরা তুল্য বোধ হয়!

গও। আর যেদিন ইঁহারা পদব্রজে 'চিমনী সাইড' * পর্যন্ত আরোহণ ও তথা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেদিন ইঁহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল!—সম্ভবতঃ পোর্ট আর্থার এবং বালটিক ফ্লীট জয় করিয়াও জাপানীদের তত উল্লাস হয় নাই!!

নূর। জাপানীরা তত উল্লসিত হইবে কি রূপে? তাহাদের কার্য এখনও যে শেষ হয় নাই। আর আমরা ত পদব্রজে ১২ মাইল ভ্রমণের পর গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছিলাম!

জাফ। এখন বাকী আছে শ্রীমতীদের বেলুন আরোহণ করা!

গও। সময়ে তাহাও বাকী থাকিবে না!

জাফ। তুমি সপরিবারে ইংলণ্ড যাইবে কবে?

গও। যখন সুবিধা হইবে।

জাফ। হুঁ—কন্যাগুলি অক্স্‌ফোর্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হইবে! সাধে কি তোমাদের সৌরজগৎ বলি? তোমার দুহিতা কয়টি গ্রহ, আর তুমি সূর্য! উহাদের নামও ত এক একটি তারকার নাম—মুশ্‌তরী, জোহ্‌রা, সুরেয়া!* তবে কেবল মঙ্গল, বুধ, শনি এ নামগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে কেন?

নূর। ভাই! তোমার নিজেরা ঝগড়া করিতে বসিয়া মেয়েদের নাম লইয়া বিদ্রূপ কর কেন? আর এ নাম ত আমরা রাখি নাই, স্বয়ং কর্তা রাখিয়াছেন। তাঁহার পৌত্রীদের নাম, তিনি যেরূপ ইচ্ছা রাখিবেন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার অধিকার কি?

জাফরকে আরও অধিক ক্ষেপাইবার জন্য গওহর বলিলেন, "কেবল ইংলণ্ড কেন, আমেরিকা যাইবারও ইচ্ছা আছে,—কওসর 'নায়েগারা ফলস্‌' দেখিতে চাহে।"

জাফ। তোমার এ সাধ অপূর্ণ থাকিবে। কওসরকে আর 'নায়েগারা' প্রপাত দেখাইতে হইবে না।

---

* চিম্‌নী সাইড, স্থান বিশেষ; তথায় চায়ের কারখানায় এক প্রকাণ্ড চিমনী নির্মিত হইয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস সেই চিমনীর নিকটবর্তী স্থানই কারসিয়ঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান।

* অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও কৃত্তিকা নক্ষত্র।

গও। কেন?

জাফ। আগামী বৎসর সে তোমার ক্ষমতার বাহির হইবে।

গও। আমার হাতের বাহির হইলেই বা কি, জামাতাসহ যাইব।

জাফ। জামাতা তোমারই মত কাণ্ডজ্ঞান হীন মূর্খ হইলে ত?

গও। তুমি তাঁহাকে অধিক জান, না আমি?

জাফ। আমি সিদ্দিককে যতদূর জানি, তাহাতে আশা রাখি তিনি তোমার মত forward (অগ্রগামী) নহেন।

গও। আমিও আশা রাখি তিনি তোমার মত backward (পশ্চাদগামী) নহেন। তিনি নিশ্চয়ই কওসরকে নায়েগারা প্রপাত দেখাইবেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"আম্মা আব্বার সহিত তর্জন-গর্জন করিতেছেন, চল আমরা শুনি গিয়া," এই বলিয়া বদর আখতরকে টানিতে লাগিল।

আখ্‌তর। আমরা সেখানে গেলে আম্মা গর্জন ছাড়িয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিবেন!

বদর। আমরা তাঁহার সম্মুখে যাইব না—পার্শ্বের ঘরে লুকাইয়া শুনিব।

কওসর। ছি বদু! লুকাইয়া কিছু শুনা উচিত নহে; সাবধান!

বদর। (ব্যগ্রভাবে) তবে আমি যে দুই একটি কথা শুনিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপায় কি?

কও। যাহা হইবার হইয়াছে। আর কখন এরূপ দোষ করিও না।

আখ্‌। আম্মা ত ঘুমাইয়াছে; যাও নয়িমু! তুমিও ঘুমাও গিয়া।

নয়িমা। না, আমি ধুম্‌না।—*

আখ্‌। তবে আমি আর তোমায় কোলে রাখিব না।

কও। চল এখন আমরা পড়াশুনা করি গিয়া। যাওত বোন মুশ্‌তরী, তুমি দেখিয়া আইস, আমাদের পড়িবার ঘরে অগ্নিকুণ্ডে কয়লা, আগুন—সব ঠিক আছে কি না।

* তিন চারি বৎসরের শিশুরা প্রায় ক-বর্গ স্থলে ত-বর্গ উচ্চারণ করে। গল্পের স্বাভাবিক ভাব রক্ষার্থে আমরাও নয়িমার ভাষায় ত-বর্গ ব্যবহার করিলাম।

জোহ্‌রা। আমরা ডাউহিল স্কুলে পড়িতে গেলে খুব ছুটি পাইব, না।

আখ্‌। আরে! আগে যা ত ডাউহিল স্কুলে, তারপর ছুটি লইস।

বদর। আগে পাগলা ঝোরার* জলে ভাল করিয়া মুখখানা ধো!

রাবু। কেন আপা! আমাদের স্কুলে যাওয়া হইবে না কেন? তোমরাই তিনজনে যাইবে না—তোমরা বড় হইয়াছ। আমরা কেন যাইব না?

কও। ওরে, মাম্মা যাইতে দিলে হয়!

রাবু। মাম্মাটা ভালো লোক নহেন,—তাঁহার চক্ষু দেখিলে আমার যে ভয় হয়! এখন তিনি আসিয়াছেন, কেবল আমাদের স্কুলে যাওয়ায় বাধা দিতে!

সুরেয়া। আমি ত স্কুলে যাইবই—

জোহ্‌। হাঁ, তুই একাই যাইবি—তুই বড় সোহাগের মেয়ে কি না!

বদ। রাবু। তোরা পাগলা ঝোরার সুশীতল নির্মল জলে বেশ ভালো করিয়া মুখ ধুইস! আমরা তিনজন টেক্‌নিকাল স্কুলে ভর্তি হইব।

রাবু। তোমাদের মাম্মা বাধা দিবেন না?

কও। বাধা দিয়াছিলেন; এখন রাজী হইয়াছেন।

জোহ্‌। আপা! সেখানে কেবল 'নান' আছে, নানা, নাই?

বদ। না, সে স্কুলে 'নানা' নাই—কেবল একদল 'নানী আছেন।

এখানে 'নানা' অর্থে নান্‌ শব্দের পুংলিঙ্গ বুঝিতে হইবে। দুষ্ট বালিকারা সেণ্ট হেলেন্‌'স টেকনিকাল স্কুলের নান্‌দিগকে "নানী" বলে! তা তাহাদের সাত খুন মাফ! এই স্কুলে বালিকাদিগকে রন্ধন, সূচিকর্ম ও নানা-প্রকার বুনন গাঁথন (যাবতীয় ফ্যান্‌সী ওয়ার্ক) শিক্ষা দেওয়া হয়।

জোহ্‌রা সাদরে আখ্‌তরের হাত ধরিয়া বলিল, "আপা! তুমি আমার পুতুলেরজন্য খুব সুন্দর শাল তৈয়ার করিয়া দিও?

সুরেয়া কওসরের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "আর তুমি অনেক মিঠাই তৈয়ার করিও।"

রাবু। হাঁ, তাহা হইলে তুমি খুব মিঠাই খাও! (সকলের হাস্য)।

মুশ্‌তরী আসিয়া জানাইল পাঠগৃহে সব প্রস্তুত। অতঃপর সকলে সেই কক্ষে গেল।

কওসর শিক্ষয়িত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া গম্ভীর ভাবে সকলকে সম্বোধন করতঃ বলিল, "আব্বা যে সন্ধ্যার সময় আমাদিগকে বায়ুর বিষয় বলিলেন, তাহার

* পাগলা ঝোরা কারসিয়ঙ্গের বৃহত্তম ঝরণা।

কোন কথা তোমরা কে বুঝিতে পার নাই? যে না বুঝিয়া থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি বুঝাইয়া বলি।"

মুশ্। আব্বা হওয়ার কথা বলিয়াছেন। ইন্দ্রধনুর বিষয় ত কিছু বলেন নাই। আমি কালি তাঁহাকে ইন্দ্রধনুর কথা জিজ্ঞাসা করিব।

জোহ্। আমি আব্বাকে বলিব, আমায় একটা ইন্দ্রধনু আনিয়া দিতে।

সুরে। আমিও ইন্দ্রধনু লইব।

বয়োজ্যেষ্ঠারা হাসিল। মুশ্‌তরী বলিল, "ওরে, ইন্দ্রধনু কি ধরা যায়?"

রাবু। ইন্দ্রধনু ধরা যায় না সত্য—কিন্তু যে উপায়ে বায়ু ধরিয়া কাচের নলে বদ্ধ করা যায়, পরীক্ষা করা যায়, সেইরূপে ইন্দ্রধনুকে ধরাও অসম্ভব নহে।

কও। এ অকাট্য যুক্তি! (সকলের হাস্য)।

রাবু। কেন, মন্দটা কি বলিলাম?

আখ্। না রাবু! কিছু মন্দ বল নাই। টেলিফোন, গ্রামোফোন—ফনোগ্রাফ ইত্যাদিতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা গিয়াছে ও ধরা যায়, তবে ইন্দ্রধনু ধরা আর শক্তটা কি?

আবার হাসির গর্‌রা উঠিল।

কও। চুপ! চুপ! মাম্মা শুনিলে বলিবেন, "এইরূপে বুঝি পড়া হইতেছে?"

মুশ্। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ) আব্বা ত আমরা হাসিলে কিছু বলেন না?

রাবু। না, বরং তিনিও হাসেন।

বদ। তোরা আর এক কথা শুনিয়াছিস? জাহেদ ভাই ও হুরন বুবুকে মাম্মা প্রহার করিয়া থাকেন!

জোহ্। সত্য নাকি? বাবা! তবে আর আমি মাম্মার বাড়ী যাইব না। যখন নিজের ছেলে মেয়েকে মারেন, তখন আমাদের ত আরও মারিবেন।

সুরে। আব্বা ত আমাদের কখনও মারেন না।

রাবু। আমাদের আব্বা ভালো, মাও ভালো, কেবল মাম্মাটি ভাল নহেন।

বদ। দাঁড়া! আমি মাম্মাকে বলিয়া দিব।

আখ্। রাবু তাঁহার মুখের উপর বলিতে ভয় করে কবে?

কওসর। বাস্! এখন চুপ কর!

বদ বায়ুর বিষয় ভালরূপ বুঝিলাম কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন কর না, বড় আপা?

কও। আমি কাল দিনের বেলায় মেঘমালা দেখিয়া ও দেখাইয়া প্রশ্ন করিব।

তোমরা এখন আমাকে প্রশ্ন করিয়া ভালো করিয়া বুঝিয়া লও।

রাবু। আমি কাল পোটাশিয়াম জলে ফেলিয়া তামাসা দেখিব।

মুশ্। পোটাশিয়াম জলে ফেলিলে কি তামাসা হইবে?

বদ। কেন তোমার মনে নাই?—উহা জলে ফেলিবামাত্র আগুন জ্বলিয়া উঠিবে!

মুশ্। হাঁ, মনে পড়িল। আমি খেলা করিব, সোডিয়াম ও গরমজল লইয়া।

নয়িমা। (নিদ্রাবেশে চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে) আল আমি? আমি তি খেলিব?

আখ্। (সহাস্যে) তোমার এখন 'খেলিয়া' কাজ নাই। চল, তোমায় শয্যায় রাখিয়া আসি।

রাবু। মুশ্তরী! তোমার আগুন অপেক্ষা আমার আগুনের রঙ বেশী সুন্দর হইবে!

মুশ্। কেন? সোডিয়াম গরম জলে ফেলিলে বেশী সুন্দর হলদে রঙের আগুন বাহির হইবে।

কও। তোমরা ঝগড়া ছাড়া আর কিছু জান না? রাবুই বড় দুষ্ট—ওই ঝগড়া আরম্ভ করে।

রাবু। ক্ষমা কর, বড় আপা! এখন কাজের কথা বলি। আমরা যে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার তুষার দেখি, উহাও কি পূর্ব অবস্থায় বায়ু ছিল?

কও। হাঁ; এবং এখন আবার উপযুক্ত উত্তাপে বাষ্পীভূত হইতে পারে।

রাবু। তবে সূর্যোত্তাপে গলিয়া যায় না কেন?

কও। গলে বই কি? ঐ বরফ অল্প উত্তাপে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নদীর মত বহিয়া যায়; তাহাকে ইংরাজীতে "গ্লেসিয়ার" বলে। আব্বা উহার নাম দিয়াছেন "নীহারনদী"।

রাবু। বাঃ! বরফের নদীতে বড় সুন্দর দেখাইবে! চল আমরা একদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার নিকট নীহারনদী দেখিয়া আসি।

বদ। বটে? কাঞ্চনজঙ্ঘা বুঝি খুব নিকট?

রাবু। নিকট না হউক, আমরা কি পথ চলিতে ভয় করি? একদিন চিম্নী সাইডে উঠিয়াছিলাম—তাহা কি অল্প পথ ছিল? পাঁচ ছয় মাইল আরোহণ ও অবতরণ কি সামান্য ব্যাপার? আবার সেদিন ডাউহিল ও ঈগেলস্ ক্রেগের সন্ধিস্থলে নামিয়াছিলাম।

৮—

বদ। ডাউহিলের সন্নিস্থলে অবতরণ করিয়া কেমন ক্লান্ত হইয়াছিলে, মনে নাই ?

কও। রাবু ত বলিয়াছিল, আমি আর হাটিতে পারি না ; আমাকে ফেলিয়া যাও। আমায় ভল্লুকে খায় খাইবে।

রাবু। ডাণ্ডিটা * সময়ে না পাওয়া গেলে আসিতেই পারিতাম না।

কও। আব্বাই ডাণ্ডির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, অর্ধপথে বদু ও রাবুর বীরত্ব প্রকাশ পাইবে।

বদ। আমি ত ভাই রাবুর মত অহঙ্কার করি না যে কাঞ্চনজঙঘা পর্যন্ত পদব্রজে যাইতে পারিব, একদৌড়ে দ্বিতীয় বেঞ্চ অতিক্রম করিব। হাঁ, ভাল কথা! আমি যে সেই ঈগেল্‌স ক্রেগের সন্নিস্থলের বিজন অরণ্য হইতে ফুল আনিয়াছিলাম, তাহা কোথায় রাখিয়াছি? মনে ত পড়ে না।

কও। ফুলগুলি বনে ফিরিয়া গিয়া থাকিবে।

বদ। তবে তুমি তুলিয়া রাখিয়াছ। আর ভাবনা নাই।

কও। তোমার ফুল কিরূপ ছিল? আমার সংগৃহীত কুসুমরাজি হইতে তাহা বাছিয়া লইতে পার?

বদ। বেশ পারি,—সে ফুল বকুল ফুলের মত ; গন্ধ ও আকৃতি বকুলের, কেবল বর্ণ পীত।

রাবু। আর কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর ক্রেপের ওড়নার মত পাতলা মেঘের গাঢ়-গোলাপী বেগুনী চাদর দেখিতে পাই, তাহা কোথা হইতে আইসে?

কও। সূর্যের উত্তাপে ঐ জমাট তুষার হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই মেঘের ওড়না রূপে কাঞ্চনের চূড়া বেষ্টন করিয়া থাকে।

আখ্‌। আমি ভাবিয়াছিলাম, কাঞ্চনের ওড়নাগুলি বানারস হইতে আইসে!

সুরেয়া ধীরে ধীরে কওসরের নিকট আসিয়া বলিল, "বড় আপা! আমাকে ইন্দ্রধনু দিবে না?"

কও। (সুরেয়ার মুখ চুম্বন করিয়া) আমি কাল তোমায় ইন্দ্রধনু দিব।

বদ। সে কি! তুমি ইন্দ্রধনু ধরিবে কেমন করিয়া?

কও। ঝাড়ের কলমে (ত্রিকোণ কাঁচ-খণ্ডে) ইন্দ্রধনু দেখা যায় তা জানিস না?

বদ। তবে ত ইন্দ্রধনু ধরিয়া দেওয়া বড় সহজ! হা হা!

ডাণ্ডি, বাহন বিশেষ ; ইহা শিবিকার ন্যায় মানুষের স্কন্ধে বাহিত হয়।

আখ্। বড় আপা যে "কল্পতরু"! তিনি দিতে না পারেন কি?
কও। "কল্পতরু" নহে,—"কল্পলতা" বলিতে পার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে নূরজাহাঁ চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া জাফর ও গওহরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মাতার অঞ্চল ধরিয়া মুশ্‌তরী বলিল, "কেন মা, আজি এখন কেন আমরা বেড়াইতে বাহির হইব না?"

নূরজাহাঁ। সকালে তোদের মাম্মা ভিক্‌টোরীয়া স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন, এখন তিনি বিশ্রাম করিবেন। তাঁহাকে একা রাখিয়া আমরা কিরূপে যাইব?

জোহ্‌রা। কেন? মাম্মা একা থাকিতে ভয় করিবেন না কি? তুমি না যাও, আমরা আব্বার সঙ্গে যাইব।

কর্তা সে কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র মুশ্‌তরী ও জোহ্‌রা তাহাদের দরখাস্ত পেশ করিল। গওহর বলিলেন, "বেশ চল্—অধিক দূর যাইব না, কেবল ঈগেলস্ ক্রেগে গিয়া ফিরিয়া আসি।"

জোহ্। না, আব্বা! ঈগেল্‌স্ ক্রেগ্ না! সে দিকে বড় জোঁক।

মুশ্। না, ও জোঁকের ক্ষেত্রে গিয়া কাজ নাই।

গও। ছি! তোরা জোঁক দেখিয়া ভয় করিস? (জাফরের পদশব্দ শুনিয়া) আচ্ছা চুপ কর! তোদের মাম্মাকেও লইয়া যাইব। তাঁহাকে অগ্রে যাইতে বলিয়া আমরা পশ্চাতে থাকিব।

জোহ্। (আনন্দে করতালি দিয়া) সে বেশ হইবে! পথে জোঁক থাকিলে পূর্ব্বে তাঁহাকে ধরিবে।

মুশ্। চুপ চুপ! মাম্মা!—

ইতঃমধ্যে জাফর আসিয়া চায়ের টেবলে যোগদান করিলেন।

গও। ভাই! আজ আর একটু বেড়াইবে না?

জাফ। না; আমার পা বড় ব্যথা করিতেছে।

গও। তবু আজ একটু না হাঁটিলে কাল তুমি একেবারে খোঁড়া হইয়া যাইবে। বেশী নহে—চল এই ঈগেল্‌স্ ক্রেগ পর্য্যন্ত।

জাফ। আমি যে বুট পরিতে পারিব না।

গও। বুট পরিবার দরকার কি, শ্লিপর লইয়াই চল না? সে ত প্রস্তর সঙ্কুল পথ নহে; ঘাসের উপর চলিবে।

রাবু। (জনান্তিকে) শ্লিপর পরিয়া গেলে জোঁক ধরিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। (বালিকাদের হাস্য)

জাফ। (বালিকাদের প্রতি) ছি! হাসিস কেন? তোরা বড় বে-আদব; কেন নূরু, তুই কি একটা ধমক দিতেও পারিস না?

নূরু। দোষ বুঝাইয়া না দিলে ওরা ধমক মানে না।

গও। বিনা দোষে বিনা কারণে ধমক মানিবেই বা কেন? হাসিলে দোষ কি?

জাফ। বাস! গওহর তুমিই মেয়েদের মাথায় তুলিয়াছ।

গও। আচ্ছা, এখন তোমার যাওয়া ঠিক হইল ত?

জাফ। না—পথ কি বড় ঢালু? উপরে উঠিতে হইবে, না নীচে যাইতে হইবে?

গও। পথত একটু ঢালু হইবেই---এখানে সমতল স্থান কোথা পাইবে?

জাফ। তবে আমি যাইব না--এ প্রকাণ্ড শরীর লইয়া গড়াইতে চাই না।

গও। ছি! তুমি পাথুরে পথকে ভয় কর, ঢালুপথে গড়াইতে চাও না, ---ইহা তোমার womanishness (স্ত্রীভাব)!

নূর। "womanish" শব্দে আমি আপত্তি করি! 'ভীরুতা' 'কাপুরুষতা' বল না কেন?

জাফ। পিপীলিকার পক্ষ হইলে শূন্যে উড়ে। স্ত্রীলোকে শিক্ষা পাইলে পুরুষদের কথার প্রতিবাদ করে,—সমালোচনা করে। তুমি কি গওহরকে ভাষা শিক্ষা দিবে?

গও। স্ত্রীলোকেরা আমাদের অনুপযুক্ত কথার প্রতিবাদ করেন, আমাদের গল্পে অংশ গ্রহণ করেন, ইহা ত অতি সুখের বিষয়।

জাফ। তুমি এমন মূর্খ!---তোমারই পক্ষপাতিত্ব করিয়া নূরুকে ধমক দিলাম, আর তুমি উল্টা আমারই কথার প্রতিবাদ কর?

গও। প্রবলের পক্ষ সমর্থনের আবশ্যকতা নাই। তুমি তোমার ভগিনীর পক্ষপাতিত্ব করিবে, ইহাই স্বাভাবিক এবং সমুচিত।

নূর। ভাই আমার মত বা পক্ষ সমর্থন করিবেন কেন? আমি বেচারী তাঁহার কি কাজে লাগি?---আমি কি তাঁহাকে মোকদ্দমায় সৎ পরামর্শ দিতে

পারি? কি তাঁহার জমীদারী দাঙ্গার সময় পাঁচ সাত জন লাঠিয়াল পাঠাইয়া সাহায্য করিতে পারি?

গওহর হাসিলেন। জাফর অন্য কথা তুলিলেন;—

"সত্যই নূরু এবার আমার সঙ্গে যাইবে না? আমি ভাবিয়াছিলাম, আগামী বৎসর যাইতে পারিবে না, তখন কওসরুর বিবাহের ধুমধামে ব্যস্ত থাকিবে। এবার যাইবে না কেন? তুমি গুরুজী এই শিক্ষা দিয়াছ না কি?"

আবার প্রবলবেগে হাসি পাওয়ায় বালিকাদল পলায়ন করিল।

গও। দোহাই তোমার! আমি কিছু শিক্ষা দিই নাই। উনি ত প্রতি বৎসর তীর্থদর্শনের ন্যায় তোমার সহিত পিত্রালয়ে যাইতেন। এবার কেন যাইতে অনিচ্ছুক, উঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

জাফ। বল নূরু! কেন যাইবে না?

নূর। আমি বাবুদের ডাউহিল স্কুলে ভর্ত্তি করিবার চেষ্টায় আছি।

স্কুল শব্দ শুনিবামাত্র জাফর বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিলেন,—"কি বলিলে? স্কুলে মেয়ে ভর্ত্তি করিবে? এখনও ভারত হইতে মুসলমানের নাম বিলুপ্ত হয় নাই—এখনও মুসলমান সমাজ ধ্বংস হয় নাই! এখনই মেয়েরা স্কুলে পড়িবে? প্রথম অভিশাপ আমরাই ভাগিনেয়ীদের উপর? প্রথম অধঃপতন আমাদেরই?

গও। তুমি ভালরূপে কথাটা না শুনিয়াই বিলাপ আরম্ভ করিলে? ডাউহিল স্কুলে কেবল বালিকারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সাত আট জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। তথায় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তাদৃশ্য বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইলে দোষ কি?

নূর। সে স্কুলে পুরুষ মোটেই নাই। মেথরাণী ও আয়াই স্কুল-গৃহের যাবতীয় কার্য্য করে। কেবল বাবর্চি ও খানসামা পুরুষ। পাচকের সঙ্গে স্কুল গৃহের কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল রন্ধনশালা হইতে খানা বাহিয়া আনে দুই তিনজন চাকর। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সহিত আমি কথা ঠিক করিয়াছি যে ঐ খাদ্যদ্রব্য বাহিবার জন্য যদি আমি উপযুক্ত চাকরাণী দিতে পারি, তবে তিনি তাহাদিগকেই নিযুক্ত করিয়া পুরুষ কয়টিকে বরখাস্ত করিবেন। উক্ত শিক্ষয়িত্রীটি অতিশয় ভদ্রলোক—তিনি আমাদের পর্দার সম্মান করিয়া থাকেন। সমস্ত স্কুলটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম,—কোথাও একটিও চাকর ছিল না।

জাফ। তোমরা বল—আমি শুনি! আর ঐ স্কুলের পার্শ্বেই যে বালকদের স্কুল। ছুটির সময় বালক বালিকারা একত্রে খেলা করিবে—

গও। বালক স্কুল হইতে বালিকা স্কুলের ব্যবধান এক মাইলেরও অধিক; এমত স্থলে তাহারা একত্রে খেলিবে কিরূপে?

জাফ। যদি তোমার চক্ষে কোন পীড়া না হইয়া থাকে তবে ষ্টেশনের নিকট দাঁড়াইলেও দেখিবে,—উভয় স্কুলের চূড়া পাশাপাশি।

নূরজাহাঁ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গওহর সহাস্যে বলিলেন, "তোমার অভিজ্ঞতার বলিহারি যাই। আজি তুমি ভিক্টোরীয়া স্কুল পরিদর্শন করিয়া এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছ?"

জাফ। আমি স্কুলের ভিতর যাই নাই।

গও। (সবিস্ময়ে) তবে সকালে তিন ঘণ্টা তুমি কোথায় ছিলে?

জাফ। তৃতীয় বেঞ্চে কতকক্ষণ বসিয়াছিলাম। তারপর স্কুল-সীমানায় প্রবেশ করিয়া দেখি, পথ আর ফুরায় না। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, স্কুল পৌঁছিতে আরও ১৫ turn (পেচ) বাকী। (অর্থাৎ পথত সোজা নহে, আঁকা বাঁকা; তাই আরও ১৫ বার ঘুরিলে স্কুর পাওয়া যাইবে)। তখন আমি ভাবিলাম, আজি আর পথ শেষ হইবে না. তাই ফিরিয়া আসিলাম।

নূরজাহাঁ আবার হাসিলেন। আর গওহর বলিলেন, "বাস। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তুমি প্রায় স্কুলের দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ, ভিক্টোরীয়া স্কুলই দেখ নাই, অথচ ডাউহিল স্কুল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ! তুমি কি জান বালিকা বিদ্যালয় কোথায়? স্কুল গৃহের যে যুগল চূড়া দেখা যায়, উহা এক ভিক্টোরীয়া স্কুলেরই। স্কুলটি কি তুমি সামান্য গ্রাম্য পাঠশালা মনে করিয়াছ? উহা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা—এবং উহা অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বালকদের ক্রীড়া প্রাঙ্গনই ত প্রায় পাঁচ বিঘা জমী।"

নূর। এবং ডাউহিল স্কুল উহা অপেক্ষাও প্রকাণ্ড। একটি কক্ষে পঞ্চাশটি বালিকার শয্যা দেখিলাম; এবং প্রত্যেক পর্যঙ্ক অপর পর্যঙ্ক হইতে দুই হাত ব্যবধানে। এখন আন্দাজ করত কক্ষটা কত বড়?

জাফ। অতবড় ঘর এ প্রস্তর সঙ্কুল দেশে নির্ম্মাণ করা কি সহজ না সম্ভব?

নূর। সহজ না হউক সম্ভব ত। বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে ত। প্রথমে একটা টেনিস কোর্ট দেখিয়া আমার চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছিল। কতগুলি কঠিন প্রস্তরের মস্তক চূর্ণ করিয়া ঐ সমতল প্রাঙ্গনখানি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। কেবল প্রস্তর ভাঙ্গিতে হয় নাই, স্থান-বিশেষে জোড়া দিয়া ভরাটও করিতে হইয়াছে। অতখানি স্থান যে একেবারে গর্ত্তশূন্য ছিল, তাহা হইতে পারে না। একদিকে মহাশিল্পীর পর্বত-রচনা

কৌশল, অপর দিকে তাঁহারই প্রদত্ত মানববুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ—উভয়ের মিশামিশি বড় চমৎকার বোধ হয়।

গও। ভাই! তুমি দিনকতক এখানে থাক, তাহা হইলে, তুমিও কবি হইতে পারিবে! কবিত্ব-জ্ঞান-রহিত অবলার মরুতুল্য হৃদয়েও যখন কবিত্ব-কুসুম ফুটিয়াছে—

জাফ। আমি নূরুর অপেক্ষা কম prosaic (অকবি) নহি! আমরা উভয় ভ্রাতা-ভগিনীই প্রসিদ্ধ prosaic!

গও। কিন্তু এখানকার জলবায়ু এমন যে—

"বারেক দর্শন পেলে চিরমূক কথা কয়!
* * * মহামূর্খ কবি হয়!"

জাফ। কিন্তু তাহাতে লাভ কি? কবিত্বটা মস্তিষ্কের রোগবিশেষ! আমাদের কুলকামিনীরা পাহাড়ে ময়দানে বেড়াইয়া কবি হয়, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে!

গও। তবে কি বাঞ্ছনীয়?

জাফ। বাঞ্ছনীয় এই,—তাহারা সুচারুরূপে গৃহস্থালী করে, রাঁধে, বাড়ে, খাওয়ায়, খায়, নিয়মিতরূপে রোজা-নমাজ প্রতিপালন করে।

গও। নমাজ কাহার উদ্দেশে?

জাফ। (আরক্ত লোচনে) কাহার উদ্দেশে?—খোদাতালার উদ্দেশে।

গও। বেশ ভাই ঠিক বলিয়াছ। তুমি অবশ্যই জান, একটা পারস্য বয়েৎ আছে—"চিত্র দেখিয়া চিত্রকরকে স্মরণ কর।" আর ইনি এখনই মহাশিল্পী বলিয়া কাহার প্রশংসা করিলেন?

জাফ। মহাশিল্পী ত ঈশ্বরকে বলা হইয়াছে।

গও। তবে কবিত্ব ধর্মের বিরোধী হইল কিসে? ঈশ্বরের সৃষ্টি যতই অধিক দেখা যায়, ততই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির বৃদ্ধি হয়। চক্ষু, কর্ণ যথাবিধি খাটাইয়া সৃষ্টি-জগতের পরিচয় না লইলে স্রষ্টাকে ভালমতে চিনিবে কিরূপে? পর্বতচূড়ায় দাঁড়াইলে আপনা হইতেই হৃদয়ে ভক্তি-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়,—তখন অজ্ঞাতে হৃদয়-তন্ত্রে বাজিয়া উঠে—

"সেই অদ্বিতীয় কবি আঁকিয়া এমন ছবি—
আপনি অদৃশ্য হ'য়ে আছেন কোথায়?"

জাফ। আমি ভালমতে বাঙ্গালা বুঝি না।

গও। তবে বল—“জমীচমন গুল——” *

জাফ। (বাধা দিয়া) রাখ এখন তোমার কবিতা। কন্যাগুলি নিশ্চয় স্কুলে যাইবে?

গও। নিশ্চয়। কওসর, আখ্‌তর ও বদুর স্কুলে পড়িবার সময় গত হইয়াছে সেজন্য বড় আক্ষেপ হয়।

জাফ। তবে নুরজাহাঁকেও ভর্ত্তি কর।

গও। আমার আপত্তি নাই। ইনি ত বলেন যে, “শিং কাটিয়া বাছুর দলে মিশিতে ইচ্ছা হয়।”

জাফ। (সহোদরার প্রতি) মিশিলেই পার। তোমারও একান্ত ইচ্ছা নাকি শ্রীমতীদের খ্রীস্টান করা?

নূর। মেয়েরা খ্রীস্টান হইবে কেন? আমি অহঙ্কারের সহিত বলি—আমার মেয়েরা ধর্মভ্রষ্ট হইতে পারে না ইহারা খাঁটি সোনা—অনলে সলিলে ধ্বংস হইবে না।

গও। আমিও সহঙ্কারে বলি, তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস (ঈমান) টলিতে পারে, কিন্তু আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অটল!

জাফ। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অস্থায়ী হইল কিসে?

গও। যেহেতু তিনি আপন ধর্মের কোন তত্ত্বই অবগত নহেন। কেবল টিয়া পাখীর মত নমাজ পড়েন, কোন শব্দের অর্থ বুঝেন না। তাঁহাকে যদি তুমি স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধা না রাখ, তবে একবার কোন মিশনরী মেমের সহিত দেখা হইলেই তিনি মনে করিবেন, “বাঃ! যিশুর কি মহিমা!” সুতরাং সাবধান। যদি পার ত লৌহসিন্দুকে বন্ধ রাখিও।

জাফ। আর নূরু বুঝি নমাজে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অর্থ জানে?

গও। জানেন কিনা পরীক্ষা কর! তুমি কি মনে কর এই কুড়ি বৎসরের বিবাহিত জীবনেও আমি আমার অর্দ্ধাঙ্গীকে আমার ছায়াতুল্যা সহচরী করিয়া তুলিতে পারি নাই?

জাফ। তবে দেখ নূরু যে স্কুলে পড়ে নাই সে জন্য কি আটকাইয়াছে? তবে মেয়েগুলার মাথা খাও কেন?

গও। আমাদের পূর্বপুরুষেরা রেলপথে ভ্রমণ করেন নাই, টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠান নাই, সেজন্য তাঁহাদের কিছু আটকাইয়াছিল কি? তবে আমরা টেলিগ্রাম পাঠাই কেন, রেলগাড়ীতে উঠি কেন?

* অর্থাৎ “ধরনী-কানন ফুল”—বাকী অংশ ত উচ্চারিতই হয় নাই।

জাফ। আমাদের ত ওসব আবশ্যক হয়।

গও। যাহা আমাদের জন্য আবশ্যক, তাহা আমাদের মহিলাদের জন্যও প্রয়োজন। তাঁহারা আমাদের আবশ্যক অনুযায়ী বস্তুই ত যোগাইয়া থাকেন। গ্রাম্য চাষার স্ত্রীরা জরির কাজ জানে না, আচার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানে না কারণ চাষাদের তাহা আবশ্যক হয় না। ইউরোপীয় কামিনীরা পান সাজিতে জানে না, কারণ ইউরোপীয় পুরুষদের তাহা আবশ্যক হয় না। আবার আমাদের কুলবালারা চাষা স্ত্রীদের মত ধান ঝাড়িতে জানেন না, যেহেতু আমাদের তাহা প্রয়োজন হয় না। ক্রমে আমরা কারি, কাট্‌লেট্, পুডিং খাইতে শিখিতেছি, আমাদের গৃহিণীরাও তাহা রাঁধিতে শিখিতেছেন। আমাদের ছাড়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কই? এবং তাঁহাদের ছাড়া আমাদেরও নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কই? স্কুল কলেজের শিক্ষা যেমন আমাদের আবশ্যক, তদ্রূপ তাঁহাদেরও প্রয়োজন। তোমার পারিবারিক জীবন অপেক্ষা আমার গার্হস্থ্য জীবন অধিক সুখের, ইহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে? তোমার সমস্ত সুখ দুঃখ তোমার স্ত্রী কখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

জাফ। তাহা না পারুন; কিন্তু তিনি আমার মতের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। আমি যদি দিনকে রাত্রি বলি, তিনিও বলেন,—"হ্যাঁ, দিব্য জ্যোৎস্না!" আবার যদি আমি অমাবস্যা রাত্রিকে দিন বলি, তিনিও বলিবেন,—"হ্যাঁ, রৌদ্র বড় প্রখর"।

গও। সাবাস! (সকলের হাস্য)

জাফ। তা' না ত কি! স্বামীস্ত্রীর মত এক না হইলে দিবানিশি রুষ জাপান যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

গও। কিন্তু স্বামীস্ত্রীর মত এক হইল কই? তুমি যেরূপ বলিলে তাহাতে কেবল তোমারই মত প্রকাশ পায়, তাঁহার ত মতামত জানাই যায় না। তিনি কদাচ নিজ মত ব্যক্ত করেন না এবার যখন কোন পশুশালায় যাইবে, অনুগ্রহ করিয়া পশুগুলির সমক্ষে কোন বিশেষ মত প্রকাশ করিও, আর পশুগুলি উত্তর না দিলে বা মাথা নাড়িলে বুঝিয়া লইও, পশুগণ তোমার সহিত একমত হইয়াছে!

জাফ। শুন, আর একটি কাজের কথা বলি; আগামী বৎসর ত কওসরুর বিবাহ, এখন তাহাকে লইয়া তোমরা পাহাড় পর্বতে বেড়াও, বরপক্ষীয় লোকেরা শুনিলে কি বলিবে?

নূর। বরপক্ষের ইহাতে আপত্তি নাই, জানি।

গওহর। বর ত শিমলাতেই কাজ করেন। আর স্বামীর সহিত স্ত্রী বেড়াইবে, পিতার সহিত কন্যা বেড়াইবে, তাহাতে অন্য লোকের আপত্তি করিবার অধিকার?

জাফ। বেশ, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন। বরটিও তোমাদের মনোমত পাইয়াছ। তাহা হইলে দেখিতেছি আমার নির্বাচিত পাত্রের সহিত আখ্‌তরের বিবাহ দিবে না?

গওহর। না। কওসরের ভাবী দেবরের সহিত আখ্‌তরের বিবাহ হইবে।

জাফ। তবে উভয় কন্যার বিবাহ একই সঙ্গে দাও না কেন?

গওহর। তাহা হইলে ভালই হইত কিন্তু সে ছেলেটি এখন বিলাতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিমালয়ের ক্রোড়াস্থিত টুঙ্গ নামক স্থানে একটি ঝরণার ধারে কয়েক ব্যক্তি বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা, সে বলিল,—"মেজ আপা! দেখত এই ঝরণা কোথা হইতে আসিয়া ভীমবেগে আবার কোথায় চলিয়াছে! তুমি বলিতে পার শেষে কোথায় গিয়াছে?"

আখ্‌তর। না, রাবু! আমি ত জানি না শেষে কোথায় গিয়াছে। আসিয়াছে ঐ পাহাড়ের পাষাণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া।

রাবু। সামান্য জলধারা পাষাণ বিদীর্ণ করিল কিরূপে? তাহা কি সম্ভব?

কওসর। ঐ জলধারা কেবল পাষাণ বিদীর্ণ করিয়াছে, তাহাই নহে; কত প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড উহার চরণতলে গড়াইতে গড়াইতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বালুকাকণায় পরিণত হইয়াছে।

প্রকাণ্ড প্রস্তর বালুকায় পরিণত হওয়ার কথাটা রাবু সহজে ধারণা করিতে না পারিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য আব্বা?"

গওহর কথা কহিবার পূর্বে জাফর বলিলেন, "হ্যাঁ সত্য। তোরা যেমন পিতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিস, ঐ নির্ঝরগুলি সেইরূপ পাষাণময় পিতৃবক্ষে নৃত্য করিতেছে—পিতা তবু অটল! হিমাদ্রিও ঠিক গওহরেরই মত সহিষ্ণু! আর শোন, স্টীমার হইতে যে বিশালকায়া জাহ্নবী দেখিয়াছিস, এইরূপ কোন একটা শিশু নির্ঝরই তাহার উৎস।"

রাবু। (আনন্দ ও উৎসাহের সহিত) তবে মামা! বলুন ত ইহার কোনটা গঙ্গার উৎস?

জাফ। গঙ্গার উৎস এখানে নাই।

ক'ও। কি ভাবিতেছ আখ্তর?

আখ্। ভাবিতেছি,—এই ক্ষীণাঙ্গী ঝরণাগুলি হিমালয়ের হৃদয়ে কেমন গভীর হইতে গভীরময় প্রণালী কাটিয়া কলকলস্বরে স্রষ্টার স্তবগান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—আলস্য ঔদাস্য নাই—অনন্ত অবারিত গতিতে চলিয়াছে।

রাবু। মেজ আপা! আমিও একটি নদীর উৎস আবিষ্কার করিলাম।

আখ্। বটে?

ক'ও। কি আবিষ্কার করিয়াছিস বল ত?

রাবু। কারসিয়ঙ্গের পাগলা ঝোরাই পাগলা নদীর উৎস।

আখ্। দূর পাগলি।

বদর। রাবু কিন্তু কথাটা একেবারে অসঙ্গত বলে নাই,—ত্রিস্রোতা নদী ত এই দার্জিলিঙ্গের আশপাশেই—

ক'ও। ধন্য তোমাদের গবেষণায়! বদু ত বেশ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

বদু। যদি গবেষণায় ভুল হইয়া থাকে, তবে ওকথা থাক; আর এক মজার কথা বলি,—বেশ খেয়াল করিয়া দেখত, পাহাড়ের বুকের ভিতর দিয়া রেলপথ কেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—একদিকে সুউচ্চ পর্বত, অন্যদিকে নিম্নস্থিত অনুচ্চ পাহাড়ের স্তূপ—একটির পর অপরটি ঢেউয়ের পাড় ঢেউয়ের মত দেখায়। ইহাকে পর্বত-তরঙ্গ বলিলে কেমন হয়?

ক'ও। বেশ ভাল হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা তোমার মনে আছে বোন?

বদু। না দিদি! মনে ত পড়ে না।

রাবু। মাম্মা! আমি ঐ ঝরণার জল স্পর্শ করি গিয়া?

জাফ। যা'বি কিরূপে? অবতরণের পথ যে দুর্গম।

রাবু। আপনি অনুমতি দিন,—আমি যেমন করিয়া পারি, যাইব। সেজ আপা! তুমিও আসিবে?

বদু। না, তুমি একাই যাও।

জাফর অনুমতি দিলেন। রাবু অতি কষ্টে অগ্রসর হইল; শেষে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর তাহার গতিরোধ করিল। সেটি অতিক্রম না করিলে জলস্পর্শ করা হইবে না। উপর হইতে কওসর শাসাইল, "দেখিস কাপড় ভিজে না যেন।" প্রায় হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে রাবু সে প্রস্তর অতিক্রম করিল। শীতল জল অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

তদ্দর্শনে বদুর একটু হিংসা হইল। সে রেলিং-এর ধারে দাঁড়াইয়া বলিল,—"কিলো রাবু। স্বর্গে পঁহুছিয়াছিস যে? তোর আনন্দের সীমা নাই। তুই তবে থাক ঐখানে,—আমরা চলিলাম।"

নূরজাহাঁও ডাকিলেন, "আয় মা! বেলা যায়।" সকলে আরও কতক-দূর অগ্রসর হইলেন। ইঁহারা টুঙ্গ হইতে পদব্রজে কারসিয়ঙ্গ চলিয়াছেন।

পথে দুই তিনজন পাহাড়ী তাহাদিগকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া একদিকে দাঁড়াইল। গওহর জাফরকে বলিলেন, "দেখিলে ভাই ইহাদের শিভালরী (অবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন)?"

জাফ। ইহা উহাদের অভ্যাস. অনেক সময় স্ত্রীলোকেরাও আমাকে সুপথ ছাড়িয়া দিয়া পথিপার্শ্বে দাঁড়ায়।

নূর। যেহেতু তাহারা "নীচে কা আদমি"কে দুর্বল মনে করে।

জাফ। আমি কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট দুর্বলতা স্বীকার করি না।

গও। যে সকল তাহাব নিকট দুর্বলতা স্বীকার করায় দোষ কি?

জাফ। যাহাই হউক, স্ত্রীলোককে আমি কায়িক বলের শ্রেষ্ঠতা দিব না।

গও। কেন দিবে না? "Give the devil even his due" (শয়তানকেও তাহার প্রাপ্য স্বত্ব দান কর)।

জাফ। কিন্তু আমি রমণীকে তাহার প্রাপ্য স্বত্ব দিতে অক্ষম।

গও। তবে একবার শর্টকাট পথে কোন পাহাড়িনীর সহিত (বাজী) দৌড়িতে চেষ্টা কর দেখি!

জাফ। শর্টকাটে? তাহা মানুষের অগম্য!

নূর। তবে ঐ দুর্গম পথে যাহারা পৃষ্ঠে দুই মণ বোঝা সহ অবলীলাক্রমে আরোহণ করে, তাহাদের নিকট দুর্বল বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ কর কেন?

এস্থলে পার্বত্য শর্টকাট পথের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রস্তর-সঙ্কুল গড়ানিয়া খাড়া সংক্ষিপ্ত পথকে short cut বলে। শর্টকাট পথ বড়ই দুর্গম; কোথাও উচ্চ প্রস্তর, কোথাও গর্ত, কোথাও এমন ঢালু যে পা রাখা যায় না। পাথর কাটিয়া ভাঙ্গিয়া অশ্বাদি, গাড়ী ও ("নীচেকো") মানুষের জন্য গবর্নমেণ্ট যে অপেক্ষাকৃত সমতল, কিন্তু ক্রমোচ্চ সুগম পথ নির্মাণ করিয়াছেন। তাহাকে স্থানীয় ভাষায় "সরকারী সটক" বলে। ঐ সরকারী সটক-গুলি অনেক দূর আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়। সচরাচর গুর্খা ও ভুটিয়াগণ সরকারী সরাও পথে না চলিয়া শর্টকাটে যাতায়াত করে। কারণ যেখানে সর্টকাটে পাঁচ

মিনিটে যাওয়া যায়, সেইখানে সরকারী সড়ক দিয়া গেলে প্রায় ২০।২৫ মিনিট লাগে এবং সাতবার ঘুরিতে হয়।

নূরজাহাঁ পুনরায় বলিলেন, "এই অশিক্ষিত পাহাড়ীদের শিভাল্‌রী অবশ্য অবশ্য প্রশংসনীয়।"

গও। উহাদের নিকট আমাদের ভদ্রতা শিক্ষা করা উচিত। আমরা বৃথা ভদ্রতা ও সভ্যতার বড়াই করি।

নূর। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছ, ভাই? পাহাড়ী বা ভূটিয়া স্ত্রী পুরুষ—কেহই ভিক্ষা করে না।

জাফ। তাহাদের ভিক্ষার প্রয়োজন হয় না বলিয়া।

গও। প্রয়োজন না হওয়াও ত প্রশংসনীয়।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় তাঁহারা পথ-ক্লান্তি ভুলিতেছিলেন। কার্বসিয়ঙ্গ স্টেশনের নিকটে আসিয়া কওসর বলিল,—"কি বাবু! বড় ক্লান্ত নাকি?"

বাবু। না, মোটেই না।

জাফ। আরও এক মাইল যাইতে হইবে, জানিস?

ক্রমে তাঁহারা একটা বেঞ্চের নিকট আসিলেন। তথায় কয়েকজন গুর্খা বসিয়াছিল, তাহারা ইঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিল। নূরজাহাঁ বলিলেন, "একটু বসা যাউক"।

জাফ। না, চল আর বেশী দূর নাই।

বদু। হাঁ মাম্মা! বসুন না। ঐ দেখুন আকাশে আগুন।

জাফর পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই আকাশে আগুন লাগিয়াছে! সবই যেন অগ্নিময়!

আখ্‌। দেখ আপা! কাঞ্চনজঙ্ঘায়ও আগুন লাগিয়াছে!

জাফ। বাস্তবিক বড় চমৎকার দৃশ্য ত! এখান হইতেও কাঞ্চনজঙ্ঘার দুই তিনটি শৃঙ্গ দেখা যায়। অস্তমান রবির সোনালী কিরণে সত্যই সে কাঞ্চনকান্তি লাভ করিয়াছে। বোধ হয় যেন দিনমণি পশ্চিম গগনে আত্মগোপন করিতে যাইতেছে—আর সুকুমার মেঘগুলি তাহার পশ্চাতে ছুটিয়াছে! প্রদোষে এমন শোভা হয়, পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই। ওদিকে অলকমালা রাঙ্গাকিরণে স্নান করিয়া স্বর্ণবর্ণ লাভ করিতেছে! মৃদুমন্দ সমীরণ যেন তাহাদের সহিত লুকোচুরি খেলিবার ছলে মেঘমালাকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে!

গও। সালাম ভাই! তুমিই ত বল কবিত্ব মস্তিষ্কের রোগ বিশেষ।

জাফ। তুমি বলিয়াছ যে, এখানকার জলবায়ুতে ঐ রোগটা আছে। পূর্ববঙ্গের জলবায়ুতে ম্যালেরিয়া, হিমালয়ের জলবায়ুতে কবিত্ব।

গও। কেবল কবিত্ব নহে, বৈরাগ্য—যোগ্যশিক্ষা ইত্যাদিও। এইখানে বসিয়া স্রষ্টার লীলাখেলা দেখ—তোমার সান্ধ্য-উপাসনার ফলপ্রাপ্ত হইবে। এখানে নিজের ক্ষুদ্রত্ব বেশ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

নূর। বলিতে কি, অভ্যাসমত উপাসনায় এমন ভাবের আবেগ, ভক্তির উচ্ছ্বাস থাকে না।

গও। আর আমরা যে, সামাজিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীলোকদের এমন উপাসনা—অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টিবৈচিত্র্য দর্শন হইতে বঞ্চিত রাখি, ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট কি উত্তর দিব? যে চক্ষুর কার্য দর্শন করা, তাহাকে চির অন্ধ করিয়া রাখি—ধিক আমাদের সভ্যতায়! ইনি না কি এখানে আসিবার পূর্বে কখনও উষার প্রথম আলোক ও সূর্যোদয় দেখেন নাই।

জাফ। সম্ভবতঃ আমিও দেখি নাই—সেজন্য আমি ত একবার'ও বিলাপ করি না!

গও। কিন্তু তুমি মাঠে বাহির হইলেই দেখিতে পাইতে; তোমার গতি ত অবারিত। আর মনে রাখিও, যথাসাধ্য জ্ঞানোন্মেষ ধর্মেরই এক অঙ্গ।

জাফ। জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে লোক নাস্তিক হয়, এইজন্য কুলললনা-বৃন্দকে জ্ঞান হইতে দূরে রাখা আবশ্যক।

গও। যত অভিশাপ কুলবালার উপর! ইহা তোমার বিষম ভ্রম; জ্ঞানের সহিত ধর্মের বিরোধ নাই। বরং জ্ঞান ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ।

আরও অনেক কথা হইল। এদিকে বালিকার দলও নীরব ছিল না। আখ্তার মৃদুস্বরে বলিল, "দেখ আপা! ওদিকে দূরে উচ্চ গিরিচূড়ে চায়ের শ্যামল ক্ষেত্রগুলি সান্ধ্য রবিকিরণের তরল স্বর্ণবর্ণে স্নান করিয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। আবার কেমন ধীরে ধীরে ঈষৎ ধূমল বর্ণের বাষ্পরূপী ওড়নায় নিজ নিজ স্বর্ণকায় আবৃত করিতেছে।"

কও। ঠিক বলিয়াছ, বোন! আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা! তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের বলিহারি যাই।

বদূ। চল এখন বাসায় যাই।

আখ্। যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ততা কেন, দিদি?

বদু। আর এখানে থাকিয়া কি দেখিবে? ঐ দেখ ক্রমে সন্ধ্যা সমাগমে বুঝি শীতবোধ হওয়ায় চা-বাগানগুলি অন্ধকার লেপে শরীর ঢাকিতেছে। আর ত কিছুই দেখা যায় না।

কও। চা-বাগানের শীত বোধ হউক না হউক, বদুর শীতবোধ হইতেছে। কারণ বদু ভ্রমক্রমে শাল আনে নাই।

সকলে বাসা অভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা পর গওহর আলী দুহিতাদিগের পাঠগৃহে বসিয়া তাহাদিগকে পড়াইতেছেন। পাঠ শেষ হইলে তিনি অর্দ্ধঘণ্টাকাল তাহাদের সহিত গল্প করেন। গল্পচ্ছলে তিনি তাহাদিগকে কখন ঐতিহাসিক কখন ভৌগোলিক বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। অদ্য তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় সৌরজগৎ।

নুশ্‌তরী। ভাল কথা, আব্বা! মাম্মা কেন আমাদিগকে সৌর-চক্র বলেন? আমরাও কি আকাশে ঘুরি?

গও। তিনি বিদ্রূপ করিয়া আমাদের সৌরজগৎ বলেন। কিন্তু আইস আমরা ঐ বিদ্রূপ হইতে একটা ভাল অর্থ বাহির করিয়া লই।

কও। জান না? আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনার ভিতরও অনেক সময় মূল্যবান বস্তু লুক্কায়িত থাকে।

গও। হাঁ, অদ্য আমরা ঐ বিদ্রূপ-আবর্জ্জনা হইতে একটা মূল্যবান জিনিস বাহির করিতে চেষ্টা করি। কওসর! তুমি চেষ্টা করিবে, মা?

কও। আপনিই চেষ্টা করুন।

গওহর আরম্ভ করিলেন, "বলিয়াছি ত প্রত্যেক গ্রহই নিয়মমত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করা যেমন গ্রহগণের কর্ত্তব্য, তদ্রূপ তাহাদিগকে আলোক প্রদান ও তাহাদের প্রত্যেকটিকে যথাবিধি আকর্ষণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘোরা সূর্য্যের কর্ত্তব্য। এই সৃষ্টিজগতে প্রত্যেকে আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। কাহারও কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি হইলে সমষ্টির বিশৃঙ্খলা ঘটে।

"মনে কর প্রত্যেক লোকের গৃহই একটি সৌরজগৎ এবং গৃহস্থের আত্মীয়-স্বজনেরা ঐ সৌরপরিবারের এক একটি গ্রহ। গ্রহদের কর্ত্তব্য গৃহস্থের

অবস্থানুসারে তাহারই মনোনীত পথে চলা। এবং গৃহস্থেরও কর্তব্য পরিবারস্থ লোকদিগকে স্নেহরশ্মি দ্বারা আকর্ষণ করা, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা—এমন কি (দারিদ্র্যবশতঃ) খাদ্যের অপ্রতুলতা হইলে, প্রথমে শিশুদের, অতঃপর আশ্রিত পোষ্যবর্গকে আহার করাইয়া সর্বশেষে তাহার ভোজন করা উচিত। যদি এই পরিবারের একটি লোকও স্বীয় কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তবে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া পরিবারটি নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করিবে।

"যেমন কোন গ্রহ যদি আপন কক্ষকে অতিক্রম করিয়া দূরে যায়, তবে সূর্যের আকর্ষণ বিমুক্ত হইলে সে অন্য কোন গ্রহের সহিত টক্কর খাইয়া নিজে চূর্ণ হইবে এবং অপর গ্রহকেও বিপদগ্রস্ত করিবে। সুতরাং যাহার যে কক্ষ, তাহাকে সেই কক্ষে থাকিয়া স্বীয় কতব্যবর্ত্মে চলিতে হইবে।"

ঠিক এই সময় জাফর আসিয়া বলিলেন, 'সালাম ভাই। পথে আসিয়াছ। আমিও ত তাহাই বলি, যাহার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট আছে, সে তাহা অতিক্রম করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। সমাজরূপ সৌরজগৎ স্ত্রীরূপ গ্রহদের জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছে, সে সীমা উল্লঙ্ঘন করা স্ত্রীলোকদের উচিত নহে।"

গও। মাফ কর ভাই! আমাকে আগে আমার বক্তব্য বলিতে দাও। তুমি আসন গ্রহণ কর।

আখতর। (জনান্তিকে কওসরকে) মাম্মা কথা বলিবার ভঙ্গীও জানেন না। "সমাজরূপ সৌরজগৎ" আর 'স্ত্রীরূপ-গ্রহ" বলা হইল।

কও তাইত! সমাজটা নিজে সৌরজগৎ হইলে গ্রহদের সীমা নির্দিষ্ট করিবার অধিকার কি? ঈশ্বর স্বয়ং সবনের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। আচ্ছা এখন উঁহাদের কথা শুনি।

জাফর আসন গ্রহণ করিলে পর বালিকারাও আসন গ্রহণ করিল। জাফরকে দেখিয়া ইহারা সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়াছিল।

গওহর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কেবল অবলারা সীমা অতিক্রম করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে, ইহাই নহে, পুরুষেরাও স্বীয় কক্ষ লঙ্ঘন করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে।"

জাফ। পুরুষদের গন্তব্যপথ ত সীমাবদ্ধ নহে—তাহাদের আর কক্ষচ্যুত হওয়া কি?

গও। পুরুষেরাও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহাদেরও কর্তব্য আছে। তুমি কি স্ত্রীপুত্রকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া কোথাও যাইতে পার?

জাফ। না।

গও। তবে কিরূপে বল, তোমার পথ সীমাবদ্ধ নহে?

জাফ। তবু আমার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে।

গও। কর্তব্যে অবহেলা করিবার ক্ষমতা নাই।

সুশ। আব্বা! আমরা ত সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য কার্য করি, কিন্তু নয়ীমু ও মাসুমা ত কিছু করে না?

রাবু। তাহারা এত ছোট যে তাহাদের কর্তব্য কিছুই নাই।

গও। তাহাদেরও কর্তব্য আছে বই কি? নয়ীমুর কর্তব্য যথানিয়মে আহার-নিদ্রা পালন করা ও খেলা করা। মাসুমার কর্তব্য খাওয়া, নিদ্র যাওয়া, হাসা এবং দৌড়াইতে শিখা।

রাবু। ইশ! ভারী ত কর্তব্য! উহারাও কাজ না করিলে আমাদের এখানে এমন কি বিশৃখলা ঘটিবে?

কও। উহারা এখনও তোমাদের মত দুষ্টামী শিখে নাই; তাই উহারা যথানিয়মে স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করে। যদি মাসুমা না হাসে বা নয়ীমা না খায়, তবে বুঝিতে হইবে তাহাদের অসুখ হইয়াছে। তখন তাহাদের শুশ্রূষার জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

গও। তাহাদের চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত থাকিলে আমাদের দৈনিক কার্যে বিশৃখলা ঘটিবে কি না?

রাবু। হাঁ—বুঝিলাম।

গও। আর এক কথা মনোযোগের সহিত শুন। আমি বলিয়াছি, গ্রহমালা স্ব-স্ব কক্ষে থাকিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ কার্যে গ্রহদের সাদৃশ্য ও একতা আছে—অর্থাৎ সকলেই ঘুরে, এই হইল সাদৃশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল গ্রহই একই সঙ্গে উঠে, একই সঙ্গে বসে, তাহা নহে! (জাফরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) তাহাদের আবার 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা আছে। জাফর ভাই যে বলেন, সৌরপরিবারের অবলারূপ গ্রহদের 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা নাই, ইহা তাঁহার ভ্রম।

জাফ। ভ্রম নহে—ঠিক কথা। অবলাকে কোন প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। তুমি হয়ত মান্দ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ হইতে এ-স্বাধীনতার ভাব গ্রহণ করিয়াছ। খ্রীস্টধর্ম প্রচারকগণ যাহা বলেন, তোমার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্য রূপেই পরিগণিত হইয়াছে।

গও। আমি আজি পর্যন্ত উক্ত পুস্তিকার একখানিও পাঠ করি নাই। খ্রীস্টানদের নিকট কিছু শিখিতে যাইব কেন? ঈশ্বর কি আমাকে বুদ্ধি দেন নাই?

আর আমি ত এই কারসিয়ঙ্গ শৈলে আছি, এই সময় তুমি আমার বাড়ী অনুসন্ধান কর গিয়া, যদি আমার বাড়ীতে "Christian Tract Society-প্রকাশিত পুস্তিকা" একখানিও দেখিতে পাও, তবে আমি তোমাকে হাজার (১০০০'০০) টাকা দিব।

জাফ। হাজার টাকার বাজী?

গও। হঁা—লাগাও বাজী—এক হাজার নূতন টাকা। আর যদি পুস্তিকা পাও, তবে তুমি দিবে ১০০০'০০ টাকা।

জাফ। না, বাজী এইরূপ হউক যে, হারজিত, উভয় অবস্থাতেই তুমি টাকা দিবে। হা! হা-হা!

গও। বাস। ঐ খানেই বীরত্বের অবসান।

এই সময় নূরজাহাঁ আসিয়া কওসরের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

বদর। আব্বা, গ্রহদের "ব্যক্তিগত" স্বাধীনতা কেমন?

গও। যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে বুধের প্রায় তিন মাস, শুক্রের আট মাস, বৃহস্পতির ১২ বৎসর এবং শনির ৩০ বৎসর লাগে। ইহাই তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বা স্বাধীনতা। শনিগ্রহকে কেহ আরক্তনেত্রে আদেশ করিতে পারে না যে, "তোমাকেও বুধের মত ৩ মাসেই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে হইবে।" এবং এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বৈষম্য আছে, তাহা তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না।

কও। আর অত কথা এককালে বলাও ত সম্ভব নহে।

গও। হঁা, সম্ভবও নহে। এইরূপ মানবের সৌরপরিবারের ও পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য আছে এবং কতকগুলি বৈসাদৃশ্যও আছে।

জাফ। যথা গওহর আলীর সহিত আমার চক্ষুকর্ণের similarity (সাদৃশ্য) আছে এবং মতামতের dissimilarity (বৈসাদৃশ্য) আছে। (সকলের হাস্য)

কও। তরুলতার গঠন-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলেও আমরা বৈষম্য ও সাদৃশ্য পাশাপাশি বিদ্যমান দেখিতে পাই। বদু! সেদিন তোমাকে নানাজাতীয় fern এর (ঢেঁকি গুল্মের) সাধারণ আকৃতিগত সাদৃশ্য, এবং পত্রগত সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখাইয়াছিলাম, মনে আছে ত?

বদু। হাঁ। ঠিক এক রকমের দুইটি পাতা বাহির করিতে পারি নাই।

গও। তাই ত। জাফর ভাই যেমন মনে করেন সংসারে তিনি ছাড়া আর কেহ—বিশেষতঃ স্ত্রীলোক কথা কহিবে না। তিনি ব্যতীত আর কেহ স্কুলে পড়িবে না ইত্যাদি ইত্যাদি, ইহা প্রকৃতির নিয়ম নহে।

জাফ। আমি কি লোককে কথা বলিতেও নিষেধ করি?

গও। নিষেধ কর না বটে, কিন্তু তুমি এমনভাবে বলা আরম্ভ কর যে, আর কাহারও কথা কহিবার সুবিধা হয় না। ইনি তোমাকে তিন দিন কন্যাদের বালিকা স্কুলে পড়িবার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তুমি একদিনও ধৈর্যের সহিত শুন নাই। তুমি যে ভাবে মহিলাদের কথায় বাধা দিয়া নিজের বাগ্মিতা প্রকাশ কর, তাহা তোমার ন্যায় বিলাত ফেরতার পক্ষে কদাচ শোভনীয় নহে।

জাফ। আমি অধিক কথা বলি, তোমরাও বল না কেন?

গও। আমরা অত বকিতে পারি কই? আমি দুইশত টাকা পুরস্কার দিব, যদি কেহ তোমাকে বাকযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে।

নূর। কেবল বাগযুদ্ধ নহে—বাগডাকাতিও বটে।

জাফ। নূরু! তুইও বিপক্ষে গেলি?

নূর। না, ভাই! ক্ষমা কর,—আমি ত এমন কিছু বলি নাই!

গও। ঠিক,—বাগ্মিতা, বাকচাতুর্য, বাকচৌর্য, বাগডাকাতি এবং বাকযুদ্ধে যে ব্যক্তি আমার জাফর দাদাকে পরাস্ত করিবে, সে ২০০'০১ টাকা পুরস্কার পাইবে।

নূর। সভয়ে আর একটি কথা বলি,—ভাই দুই ঘণ্টা ধরিয়া কথা বলেন, কিন্তু কি যে বলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য!

গও। কেবল বকেন—লক্ষ্য ছাড়িয়া দিয়া কখন দক্ষিণে, কখন বামে, কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে—নানাস্থানে ঘুরেন! কিন্তু বকেন! অপরের বক্তব্য শুনেন না, কেবল নিজে বকেন! যাহা হউক, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে। জাফর দিনকে রাত্রি বলিলে যে তাঁহার বাড়ীর সকলকেই "দিব্যজ্যোৎস্না' বলিতে হইবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত শক্তিগুলির অনুশীলন যথানিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাক্‌শক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে।

জাফ। উঠ এখন; আজি যথেষ্ট বকিলে!

গও। আর দুই এক কথা বলিতে দাও—তোমার কথা নহে। সৌরচক্রের গ্রহমালা যেমন সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ আমাদেরও উচিত যে সত্য—অর্থাৎ ঈশ্বরে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস সহকারে নির্ভর করিয়া স্ব-স্ব কর্তব্য পথে চলি। যে কোন অবস্থায় সত্য ত্যাগ করা উচিত নহে—সত্যভ্রষ্ট হইলেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সত্যরূপ কেন্দ্রে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কও। আমরা সকলেই সৌরপরিবারের এক একটি ক্ষুদ্র তারা, পরমেশ্বর আমাদের সূর্য।

গও। ঠিক। এবং যাহারা উক্ত সৌরপরিবারের ন্যায় সুখে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।

কও। পরস্পরে একতা থাকাও একান্ত আবশ্যক।

গও। হাঁ, কিন্তু এই ঐক্য যেন সত্যের উপর স্থাপিত হয়। একতার মূলে একটা মহৎ গুণ থাকা আবশ্যক।

জাফ। আমি বলি, একতার ভিত্তি ন্যায় বা প্রেম হইলে আরও ভাল হয়।

গও। ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রেমও সদ্গুণ বটে, কিন্তু উহাদের মাত্রাধিক্যে আবার অনিষ্টের সম্ভাবনা। যেমন সময় সময় কঠোর ন্যায় কোমল প্রেমের বিরোধী হয়; আবার প্রেমের আধিক্য ন্যায়কে দলিত করে। বিচারক অত্যন্ত দয়ালু হইলে চলে না, আবার ন্যায়বিচারে প্রকৃত প্রমাণ অভাবে অনেক সময় নির্দোষীর দণ্ড হয়। সত্যের কিন্তু অপর পৃষ্ঠা নাই—উহা স্বচ্ছ সুনির্মল। এই জন্য বলি,—একতার ভিত্তি সত্য হউক।

জাফ। বেশ! নমাজের সময় হইল,—চল এখন তোমার কক্ষে!

গও। চল! নমাজে কিন্তু তুমি ইমাম হইবে।

জাফ। না, তুমি ত আমার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর না,—সুতরাং তুমি ইমাম হইবে।

গও। তবে মনে রাখিও,—সকল বিষয়ে আমি নেতা, তুমি অনুবর্ত্তী।

জাফ। না, তাহা হইবে না!

গও। তবে 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা অবলম্বন কর।

জাফ। তথাস্তু! তুমি তোমার কক্ষে উপাসনা কর—আমি আমার কক্ষে।

জাফর ও গওহর চলিয়া গেলে পর বদর বলিল "মাম্মা আমাদিগকে সৌরজগৎ বলিয়া বিদ্রূপ না করিলে এত কথা জানিতে পারিতাম না।"

আখ। ঠিক! অদ্য আম্মা আমাদের জন্য কয়লা হইতে কোহেনুর বাহির করিয়াছেন।

কও। মনে রাখিও—আমরা সকলে সৌরপরিবারের তারা!

সুলতানার স্বপ্ন *

একদা আমার শয়নকক্ষে আরাম কেদারায় বসিয়া ভারত-ললনার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম,—আমাদের দ্বারা কি দেশের কোন ভাল কাজ হইতে পারে না?—এইসব ভাবিতেছিলাম। সে সময় মেঘমুক্ত আকাশে শারদীয় পূর্ণিমার শশধর পূর্ণগৌরবে শোভমান ছিল; কোটি লক্ষ তারকা শশীকে বেষ্টন করিয়া হীরক-প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। মুক্ত বাতায়ন হইতে কৌমুদীস্নাত উদ্যানটি স্পষ্টই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এক একবার মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণ শেফালি-সৌরভ বহিয়া আনিয়া ঘরখানি আমোদিত করিয়া দিতেছিল। দেখিলাম, সুধাকরের পূর্ণকান্তি, সুমিষ্ট কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ, সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল, রজতচন্দ্রিকা, ইহারা সকলে মিলিয়া আমার সাধের উদ্যানে এক অনির্বচনীয় স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্দর্শনে আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম,—যেন জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! ঠিক বলিতে পারি না আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না;—কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম।

সহসা আমার পার্শ্বে একটি ইউরোপীয় রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি কি প্রকারে আসিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমার পরিচিতা 'ভগিনী সারা' (Sister Sara) বলিয়া বোধ হইল। ভগিনী সারা "সুপ্রভাত" বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন! আমি মনে মনে হাসিলাম,—এমন শুভ্র জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে তিনি বলিলেন, "সুপ্রভাত।" তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কেমন? যাহা হউক, প্রকাশ্যে আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—

"আপনি কেমন আছেন?"

"আমি ভাল আছি, ধন্যবাদ। আপনি একবার আমাদের বাগানে বেড়াইতে আসিবেন কি?"

আমি মুক্ত-বাতায়ন হইতে আবার পূর্ণিমা-চন্দ্রের প্রতি চাহিলাম,—ভাবিলাম, এসময় যাইতে আপত্তি কি? চাকরেরা এখন গভীর নিদ্রামগ্ন; এই অবসরে ভগিনী সারার সমভিব্যাহারে বেড়াইয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করা যাইবে।

* বর্তমান লেখিকার Sultana's Dream গত ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে Indian Ladies' Magazine-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

দার্জিলিং অবস্থানকালে আমি সর্বদাই ভগিনী সারার সহিত ভ্রমণ করিতাম। কত দিন উদ্ভিদ-কাননে (বোটানিকাল গার্ডেনে) বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে লতা-পাতা সম্বন্ধে—ফুলের লিঙ্গ নির্ণয় সম্বন্ধে কত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি, সে সব কথা মনে পড়িল। ভগিনী সারা সম্ভবতঃ আমাকে তদ্রূপ কোন উদ্যানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন; আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার সহিত বাহির হইলাম।

ভ্রমণকালে দেখি কি—এত সে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী নহে! —এ যে দিব্য প্রভাত! নগরের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, রাজপথে লোকে লোকারণ্য! কি বিপদ! আমি দিনের বেলায় এভাবে পথে বেড়াইতেছি! ইহা ভাবিয়া লজ্জায় জড়সড় হইলাম—যদিও পথে একজনও পুরুষ দেখিতে পাই নাই।

পথিকা স্ত্রীলোকেরা আমার দিকে চাহিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। আমি তাহাদের ভাষা না বুঝিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম যে, তাহাদের উপহাসের লক্ষ্য বেচারী আমিই। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"উহারা কি বলিতেছে?"

উত্তর পাইলাম,—"উহারা বলে যে, আপনি অনেকটা পুরুষ-ভাবাপন্ন।"

"পুরুষভাবাপন্ন। ইহার মানে কি?"

"ইহার অর্থ এই যে, আপনাকে পুরুষের মত ভীরু ও লজ্জানম্র দেখায়!"

"পুরুষের মত লজ্জানম্র!" এমন ঠাট্টা! এরূপ উপহাস ত কখন শুনি নাই। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার সঙ্গিনী সে দার্জিলিংবাসিনী ভগিনী সারা নহেন—ইঁহাকে আর কখনও দেখি নাই! ওহো! আমি কেমন বোকা—একজন অপরিচিতার সহিত হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! কেমন একটু বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঈষৎ কম্পিত হইল। তাঁহার হাত ধরিয়া চলিতেছিলাম কি না, তিনি আমার হস্তকম্পন অনুভব করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—

"আপনার কি হইয়াছে? আপনি কাঁপিতেছেন যে!"

এরূপে ধরা পড়ায় আমি লজ্জিত হইলাম। ইতস্তত: করিয়া বলিলাম, "আমার কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে; আমরা পর্দানশীন স্ত্রীলোক, আমাদের বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইবার অভ্যাস নাই।"

"আপনার ভয় নাই—এখানে আপনি কোন পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এ দেশের নাম 'নারীস্থান' * এখানে স্বয়ং পুণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।"

ক্রমে নগরের দৃশ্যাবলী দেখিয়া আমি অন্যমনস্ক হইলাম। বাস্তবিক পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দৃশ্য অতিশয় রমণীয় ছিল। সুনীল অম্বর দর্শনে মনে হইল যেন ইতিপূর্বে আর কখন এত পরিষ্কার আকাশ দেখি নাই! একটি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দেখিয়া ভ্রম হইল, যেন হরিৎ মখমলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। ভ্রমণকালে আমার বোধ হইতেছিল, যেন কোমল মসনদের উপর বেড়াইতেছি,—ভূমির দিকে দৃকপাত করিয়া দেখি, পথটি শৈবাল ও বিবিধ পুষ্পে আবৃত! আমি তখন সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, "আহা! কি সুন্দর!"

ভগিনী সারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সব পসন্দ করেন কি?" (আমি তাঁহাকে 'ভগিনী সারা'ই বলিতে থাকিলাম এবং তিনিও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন।)

"হাঁ এসব দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি এ সুকুমার কুসুমস্তবক পদদলিত করিতে চাই না।"

"সে জন্য ভাবিবেন না, প্রিয় সুলতানা! আপনার পদস্পর্শে এ-ফুলের কোন ক্ষতি হইবে না। এগুলি বিশেষ এক জাতীয় ফুল, ইহা রাজপথেই রোপণ করা হয়।"

দুইধারে পুষ্পচূড়াধারী পাদপশ্রেণী সহাস্যে শাখা দোলাইয়া দোলাইয়া যেন আমার অভ্যর্থনা করিতেছিল। দূরাগত কেতকী-সৌরভে দিক-পরিপূরিত ছিল। সে সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য—আমি মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলাম, "সমস্ত নগরখানি একটি কুঞ্জভবনের মত দেখায়! যেন ইহা প্রকৃতি-রানীর লীলা-কানন! আপনাদের উদ্যান-রচনা-নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।"

"ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে পারেন!"

"তাঁহাদিগকে অনেক গুরুতর কার্য করিতে হয়, তাঁহারা কেবল উপবনের উন্নতিকল্পে অধিক সময় ব্যয় করা অনাবশ্যক মনে করিবেন।"

"ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কি বলিতে পারেন? জানেন ত অলসেরা অতিশয় বাক্‌পটু হয়!"

* "পরীস্থান" শব্দের অনুকরণে "নারীস্থান" বলা হইল। ইংরাজীতে "লেডী ল্যাণ্ড" বলা গিয়াছে।

আমার বড় আশ্চর্যবোধ হইতেছিল যে, দেশের পুরুষেরা কোথায় থাকে? রাজপথে শতাধিক ললনা দেখিলাম, কিন্তু পুরুষ বলিতে একটি বালক পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। শেষে কৌতূহল গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরুষেরা কোথায়?"

উত্তর পাইলাম, "যেখানে তাহাদের থাকা উচিত সেইখানে, অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত স্থানে।"

ভাবিলাম, তাহাদের "উপযুক্ত স্থান" আবার কোথায়, আকাশে না পাতালে? পুনরায় বলিলাম, "মাফ করিবেন, আপনার কথা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের 'উপযুক্ত স্থানের' অর্থ কি?"

"ওহো! আমার কি ভ্রম!—আপনি আমাদের নিয়ম-আচার জ্ঞাত নহেন, একথা আমার মনেই ছিল না। এ দেশে পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে।"

"কি! যেমন আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেই রূপ তাঁহারাও থাকেন না কি?"

"হাঁ, ঠিক তদ্রূপই।"

"বাঃ! কি আশ্চর্য ব্যাপার!" বলিয়া আমি উচ্চহাস্য করিলাম। ভগিনী সারাও হাসিলেন। আমি প্রাণে বড় আরাম পাইলাম;—পৃথিবীতে অন্ততঃ এমন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে। ইহা ভাবিয়া অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করা গেল!

তিনি বলিলেন, "ইহা কেমন অন্যায়, যে নিরীহ রমণী অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, আর পুরুষেরা মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। কি বলেন, সুলতানা, আপনি ইহা অন্যায় মনে করেন না?"

আমি আজন্ম অন্তঃপুরবাসিনী, আমি এ প্রথাকে অন্যায় মনে করিব কিরূপে? প্রকাশ্যে বলিলাম,—"অন্যায় কিসের? রমণী স্বভাবতঃ দুর্বলা, তাহাদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে।"

"হাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন,—যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে। তা কোন বন্য জন্তু কোন একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও ত সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না। কি বলেন?"

"তাহা ঠিক; হিংস্রজন্তুটা ধরা না পড়া পর্যন্ত গ্রামটি নিরাপদ হইতে পারে না।"

"মনে করুন, কতকগুলি পাগল যদি বাতুলাশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়ে, আর তাহারা অশ্ব, গবাদি—এমন কি ভাল মানুষের প্রতিও নানা প্রকার উপদ্রব উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তবে ভারতবর্ষের লোকে কি করিবে?"

"তবে তাহারা পাগলগুলিকে ধরিয়া পুনরায় বাতুলাগারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে।"

"কেন! বুদ্ধিমান লোককে বাতুলালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া দেশের সমস্ত পাগলকে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় আপনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন না?"

"অবশ্যই না! শান্তশিষ্ট লোককে বন্দী করিয়া পাগলকে মুক্তি দিবে কে?"

"কিন্তু কার্যতঃ আপনাদের দেশে আমরা ইহাই দেখিতে পাই! পুরুষেরা—যাহারা নানা প্রকার দুষ্টামী করে, বা অন্ততঃ করিতে সক্ষম, তাহারা দিব্য স্বাধীনতা ভোগ করে, আর নিরীহ কোমলাঙ্গী অবলারা বন্দিনী থাকে! অশিক্ষিত অমার্জিতরুচি পুরুষেরা বিনা শৃঙ্খলে থাকিবার উপযুক্ত নহে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন?"

"জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,—তাহারা সমুদয় সুখ-সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়—তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।"

"তাই ত! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়,—'দোষ কার, বন্দী হয় কে!' কিন্তু বলি, আপনারা ওসব নিগড় পরেন কেন?"

"না পরিয়া করি কি? 'জোর যার মুলুক তার'; যাহার বল বেশী, সেই স্বামিত্ব করিবে—ইহা অনিবার্য।"

"কেবল শারীরিক বল বেশী হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত—আপনাদের সাহায্য অভাবে সমাজ অর্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

"শুনুন ভগিনী সারা! যদি আমরাই সংসারের সমুদয় কার্য করি, তবে পুরুষেরা কি করিবে?"

"তাহারা কিছুই করিবে না,—তাহারা কোন ভাল কাজের উপযুক্ত নহে। তাহাদিগকে ধরিয়া অন্তঃপুরে বন্দী করিয়া রাখুন।"

"কিন্তু ক্ষমতাশালী নরবরদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী করা কি সম্ভব, না সহজ ব্যাপার? আর তাহা যদিই সাধিত হয়, তবে দেশের যাবতীয় কার্য যথা রাজকার্য, বাণিজ্য ইত্যাদি সকল কাজই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে।"

এবার ভগিনী সারা কিছু উত্তর দিলেন না, সম্ভবতঃ আমার ন্যায় অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন অবলার সহিত তর্ক করা তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন।

ক্রমে আমরা ভগিনী সারার গৃহতোরণে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, বাড়ীখানি একটি বৃহৎ হৃদয়াকৃতি উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ ভাবটি কি চমৎকার!—ধরিত্রী জননীর হৃদয়ে মানবের বাসভবন। বাড়ী বলিতে, একটি টীনের বাঙ্গালা মাত্র; কিন্তু সৌন্দর্যে ও নৈপুণ্যে ইহার নিকট আমাদের দেশের বড় বড় রাজপ্রাসাদ পরাজিত। সাজ সজ্জা কেমন নয়নাভিরাম ছিল; তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে—তাহা কেবল দেখিবার জিনিস।

আমরা উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। তিনি সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন; একটি খঞ্জিপোষে রেশমের কাজ করা হইতেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও সেলাই জানি কি না। আমি বলিলাম,—

"আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেলাই ব্যতীত অন্য কাজ জানি না।"

"কিন্তু এদেশের অন্তঃপুরবাসীদের হাতে আমরা কারচোবের কাজ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না!" এই বলিয়া তিনি হাসিলেন, "পুরুষদের এতখানি সহিষ্ণুতা কই যে তাহারা ধৈর্যের সহিত ছুঁচে সূতা পরাইবে?"

তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তবে কি কারচোবের কাজগুলি সব আপনিই করিয়াছেন?" তাঁহার ঘরে বিবিধ ত্রিপদীর উপর নানা প্রকার সলমা চুমকির কারুকার্যখচিত বস্ত্রাবরণ ছিল।

তিনি বলিলেন, "হাঁ, এ সব আমারই স্বহস্ত প্রস্তুত।"

"আপনি কিরূপে সময় পান? আপনাকে ত অফিসের কাজও করিতে হয়, না? কি বলেন?"

"হাঁ। তা আমি সমস্ত দিন রসায়নাগারে আবদ্ধ থাকি না। আমি দুই ঘণ্টায় দৈনিক কর্তব্য শেষ করি।"

"দুই ঘণ্টায়। আপনি এ কি বলেন?—দুই ঘণ্টায় আপনার কার্য শেষ হয়। আমাদের দেশে রাজকর্মচারিগণ—যেমন মাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রমুখ প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।"

"আমি ভারতের রাজপুরুষদের কার্যপ্রণালী দেখিয়াছি। আপনি কি মনে করেন যে, তাঁহারা সাত আট ঘণ্টাকাল অনবরত কাজ করেন?"

"নিশ্চয়। বরং এতদপেক্ষা অধিক পরিশ্রমই করেন।"

"না প্রিয় সুলতানা। ইহা আপনার ভ্রম। তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন। কেহ আবার অফিসে থাকিয়া ক্রমাগত দুই তিনটি চুরুট ধ্বংস করেন। তাঁহারা মুখে যত বলেন, কার্যতঃ তত করেন না। রাজপুরুষেরা যদি কিছু করেন, তাহা এই যে, কেবল তাঁহাদের নিম্নতম কর্মচারীদের ছিদ্রান্বেষণ। মনে করুন একটি চুরুট ভস্মীভূত হইতে অর্দ্ধঘণ্টা সময় লাগে, আর কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।"

তাই ত। অথচ ভ্রাতৃমহোদয়গণ জীবিকা অর্জন করেন, এই অহঙ্কারেই বাঁচেন না! ভগিনী সারার সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। শুনিলাম, তাঁহাদের নারীস্থান কখনও মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় না। আর তাঁহারা আমাদের ন্যায় হুলধর মশার দংশনেও অধীর হন না! বিশেষ একটি কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম,—নারীস্থানে নাকি কাহারও অকাল-মৃত্যু হয় না। তবে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা হইলে লোকে অপ্রাপ্ত বয়সে মরে, সে স্বতন্ত্র কথা। ভগিনী সারা আবার হিন্দুস্থানের অসংখ্য শিশুর মৃত্যু সংবাদে অবাক হইলেন! তাঁহার মতে যেন এই ঘটনা সর্বাপেক্ষা অসম্ভব। তিনি বলিলেন, যে প্রদীপ সবে মাত্র তৈল সলিতা যোগে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কেন (তৈল বর্তমানে) নির্বাপিত হইবে। যে নব কিশলয় সবে মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে কেন পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্বে ঝরিবে।

ভারতের প্লেগ সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল; তিনি বলিলেন, "প্লেগ টেলেগ কিছুই নহে—কেবল দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকেরা নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রাম অপেক্ষা নগরে প্লেগ বেশী,—নগরের ধনী অপেক্ষা নির্ধনের ঘরে প্লেগ বেশী হয়, এবং প্লেগ দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র রমণী অধিক মারা যায়। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, প্লেগের মূল কোথায়—মূল কারণ ঐ অন্নাভাব। আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক ত দেখি।"

তাই ত, ধনধান্যপূর্ণা নারীস্থানে ম্যালেরিয়া কিম্বা প্লেগের অত্যাচার হইবে কেন? প্লীহা-স্ফীত উদর ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাঙ্গালার দরিদ্রদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহাদের রন্ধনশালা দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। অবশ্য যথাবিধি পর্দা করিয়া যাওয়া হইয়াছিল। একি রন্ধন-গৃহ, না নন্দন-কানন? রন্ধনশালার চতুর্দিকে সবজী বাগান এবং নানাপ্রকার তরিতরকারীর লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর ধূম্র বা ইন্ধনের কোন চিহ্ন নাই,—মেজেখানি অমল ধবল মর্মর প্রস্তর-নির্মিত; মুক্ত বাতায়নগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পদামে সুসজ্জিত। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনারা রাঁধেন কিরূপে? কোথাও ত অগ্নি জালিবার স্থান দেখিতেছি না?"

তিনি বলিলেন, "সূর্য্যোত্তাপে রান্না হয়।" অতঃপর কি প্রকারে সৌরকর একটা নলের ভিতর দিয়া আইসে, সেই নলটা তিনি আমাকে দেখাইলেন। কেবল ইহাই নহে; তিনি তৎক্ষণাৎ এক পাত্র ব্যঞ্জন (যাহা পূর্ব হইতে তথায় রন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল) রাঁধিয়া আমাকে সেই অদ্ভুত রন্ধনপ্রণালী দেখাইলেন।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা সৌরোত্তাপ সংগ্রহ করেন কি প্রকারে?"

ভগিনী বলিলেন, "কিরূপে সৌরকর আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শুনিবেন? ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন আমাদের বর্তমান মহারানী সিংহাসনপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ছিলেন। তিনি নামতঃ রানী ছিলেন, প্রকৃত পক্ষে প্রধান মন্ত্রী রাজ্য-শাসন করিতেন।

"মহারানী বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞান-চর্চা করিতে ভালবাসিতেন। সাধারণ রাজকন্যাদের ন্যায় তিনি বৃথা সময় যাপন করিতেন না। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল যে, তাহার রাজ্যের সমুদয় স্ত্রীলোকই সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হউক। মহারানীর খেয়াল,—সে খেয়াল তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হইল। অচিরে গবর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকা-স্কুল স্থাপিত হইল। এমন কি পল্লীগ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয় স্রোত প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ-প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না।—এই আইন হইল। আর এক কথা এই পরিবর্তনের পূর্বে আমরাও আপনাদের মত কঠোর অবরোধে বন্দিনী থাকিতাম।"

"এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থা!" এই বলিয়া আমি হাসিলাম।

"কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান সেই প্রকারই আছে! কতদিন তাঁহারা বাহিরে, আমরা ঘরে ছিলাম; এখন তাঁহারা ঘরে, আমরা বাহিরে আছি। পরিবর্তন প্রকৃতিরই নিয়ম! কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইল; তথায় বালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।"

"আমাদের পৃষ্টপোষিকা স্বয়ং মহারানী,—আর কি কোন অভাব থাকিতে পারে। অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একতর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা-প্রিন্সিপ্যাল একটি অভিনব বেলুন নির্মাণ করিলেন; এই বেলুনে কতকগুলি নল সংযোগ করা হইল। বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থাপন করা গেল,—বায়ুর আর্দ্রতা ঐ বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল,— এইরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজল করায়ত্ত করিলেন। বিদ্যালয়ের লোকেরা সর্বদা ঐ বেলুনের সাহায্যে জল গ্রহণ করিত কি না, তাই আর মেঘমালার আকাশ আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী লেডী প্রিন্সিপ্যাল প্রাকৃতিক ঝড়বৃষ্টি নিবারণ করিলেন।

বটে? তাই আপনাদের এখানে পথে কর্দম দেখিলাম না।" কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না,—নলের ভিতর বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে; আর ঐরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব। তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি।—তাহাতে আবার বিজ্ঞান রসায়নের সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ মোসলেম ললনাদের) কোন পুরুষে পরিচয় নাই। সুতরাং ভগিনী সারার ব্যাখ্যা কোন মতেই আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

"দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই জলধর-বেলুন দর্শনে অতীব বিস্মিত হইল,— প্রতিহিংসায়* তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল। প্রিন্সিপ্যাল মনস্থ করিলেন যে, এমন কিছু অসাধারণ বস্তু সৃষ্টি করা চাই, যাহাতে কাদম্বিনী বিজয়ী বিদ্যালয়কে পরাভূত করা যায়। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন, তদ্দ্বারা সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামত যথা তথা বিতরণ করিতে পারেন।"

---

* হিংসাবৃত্তিটা কি বাস্তবিক বড় দোষণীয়? হিংসা না থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা হয় কই? এই হিংসাই ত মানবকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে। তবে দেশকাল ভেদে ঈর্ষায় পতন হয়, সত্য। তা যে কোন মনোবৃত্তির মাত্রাধিক্যেই অনিষ্ট হয়; সকল বিষয়েরই সীমা আছে।

"যৎকালে এদেশের রমণীবৃন্দ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, পুরুষেরা তখন সৈনিক বিভাগের বলবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। যখন নর-বীরগণ শুনিতে পাইলেন যে, জেনানা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় বায়ু হইতে জল গ্রহণ করিতে এবং সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা তাচ্ছিল্যের ভাবে হাসিলেন। এমন কি তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্যপ্রণালীকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই।"

আমি বলিলাম, আপনাদের কার্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু এখন বলুন দেখি, আপনারা পুরুষদের কি প্রকারে অন্তঃপুরে বন্দী করিলেন? কোনরূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন না কি?"

ভগিনী বলিলেন, "না"।

"তাঁহারা যে নিজে ধরা দিবেন ইহাও ত সম্ভব নয়। মুক্ত স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী হইবে কোন পাগল? তবে অবশ্যই পুরুষেরা কোনরূপে আপনাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন।"

"হাঁ, তাই বটে"!

কে প্রথমে পুরুষ-প্রবরদের পরাভূত করিল,—সম্ভবতঃ কতিপয় নারীযোদ্ধা?

"না এদেশের পুরুষদল বাহুবলে পরাস্ত হয় নাই।"

হাঁ ইহা অসম্ভবও বটে, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্বল নহে। তবে?

"মস্তিষ্ক-বলে"।

"তাহাদের মস্তিষ্কও ত রমণীর তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। না?—কি বলেন?"

মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কি? হস্তীর মস্তিষ্কও ত মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারী, তবু ত মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে।"

"ঠিক ত। কিন্তু কি প্রকারে কর্তারা বন্দী হইলেন, এ কথা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন, আর বিলম্ব সহে না!"

স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অনেক ভাবে—অনেক যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনা চিন্তায়ি হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাহা হউক দশ বৎসর পূর্বে যখন সৈনিক বিভাগের কর্মচারীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন কতিপয় ছাত্রী তদুত্তরে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপ্যালদ্বয় বাধা দিলেন।

তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা বাক্যে উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য দ্বারা উত্তর দিও। ঈশ্বর কৃপায় এই উত্তর দিবার সুযোগের জন্য ছাত্রীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।"

"ভারী আশ্চর্য!" আমি অতি আনন্দে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া করতালি দিয়া বলিলাম, "এখন দাম্ভিক ভদ্রলোকেরা অন্তঃপুরে বসিয়া 'স্বপ্ন-কল্পনায়' বিভোর রহিয়াছেন।"

ভগিনী সারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

"কিছুদিন পরে কয়েকজন বিদেশী লোক এদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা ন্যায়-সংগত সুশাসন বা সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি কেবল স্বামীত্ব ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তিনি আমাদের সহৃদয়া মহারানীকে ঐ আসামী ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারানী ত দয়া-প্রতিমা জননীর জাতি—সুতরাং তিনি তাঁহার আশ্রিত হতভাগ্যদিগকে ক্রুদ্ধ রাজার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ধরিয়া দিলেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

"আমাদের রণসজ্জাও প্রস্তুত ছিল, সৈন্য সেনানীগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা বিরোচিত উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল, রক্ত গঙ্গায় দেশ ডুবিয়া গেল! প্রতিদিন যোদ্ধাগণ অম্লান বদনে পতঙ্গপ্রায় সমরানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিল।

"কিন্তু শত্রু পক্ষ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণে কেশরী বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদবর্তী হইতে লাগিল, এবং শত্রুগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইল!"

"কেবল বেতনভোগী সেনা কেন, দেশের ইতর-ভদ্র—সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমন কি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক পর্যন্ত সমরশায়ী হইতে চলিল। কতিপয় প্রধান সেনাপতি নিহত হইলেন; অসংখ্য সেনা প্রাণ হারাইল; অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানী হইতে মাত্র ১২।১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আর দুই চারি দিবসের যুদ্ধের পরেই তাঁহারা রাজধানী আক্রমণ করিবে।"

"এই সঙ্কট সময়ে সম্রাজ্ঞী জনকতক বুদ্ধিমতী মহিলাকে লইয়া সভা আহবান করিলেন। এখন কি করা কর্তব্য ইহাই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল।

"কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, রীতিমত যুদ্ধ করিতে করিতে যাইবেন; অন্য দল বলিলেন যে, ইহা অসম্ভব—কারণ একে ত অবলারা সমর-নৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার কৃপাণ, তোষাদান, বন্দুক ধারনেও অক্ষম, তৃতীয় দল বলিলেন যে, যুদ্ধ-নৈপুণ্য দূরে থাকুক—রমণীর শারীরিক দুর্বলতাই প্রধান অন্তরায়।"

"মহারানী বলিলেন," যদি আপনারা বাহুবলে দেশরক্ষা করিতে না পারেন, তবে মস্তিষ্কবলে দেশরক্ষার চেষ্টা করুন।"

"সকলে নিরুত্তর, সভাস্থল নীরব। মহারানী মৌনভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, "যদি দেশ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।"

"এইবার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপ্যাল (যিনি সৌরকর করায়ত্ত করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণে নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন—এখন অতি ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, বিজয় লাভের আশা-ভরসা ত নাই,—শত্রু প্রায় গৃহ-তোরণে। তবে তিনি একটি সংকল্প স্থির করিয়াছেন—যদি এই উপায়ে শত্রু পরাজিত হয়, তবে ত সুখের বিষয়। এই উপায় ইতিপূর্বে আর কেহ অবলম্বন করে নাই—তিনিই প্রথমে এই উপায়ে শত্রু জয়ের চেষ্টা করিবেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা—যদি এই উপায়ে কৃতকার্য হওয়া না যায়, তবে অবশ্য সকলে আত্মহত্যা করিবেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা কিছুতেই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিবেন না। সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে মহারানীর সভাগৃহ অবলাকণ্ঠের প্রতিজ্ঞা ধ্বনিতে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনী ততোধিক উল্লাসের স্বরে বলিল, আত্মহত্যা করিব।" সে যেন ততোধিক তেজোব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "বিদেশীয়' অধীনতা স্বীকার করিব না!"

"সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন এবং লেডী প্রিন্সিপ্যালকে তাঁহার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

লেডী প্রিন্সিপ্যাল পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আমরা যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে পুরুষদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা উচিত। আমি পর্দার অনুরোধে এই প্রার্থনা করি।" মহারানী উত্তর করিলেন, "অবশ্য। তাহা ত হইবেই।"

"পর দিন মহারানীর আদেশপত্রে দেশের পুরুষদিগকে জ্ঞাপন করা

হইল, যে অবলারা যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সে জন্য সমস্ত নগরে পর্দা হওয়া উচিত। সুতরাং স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার অনুরোধে পুরুষদের অন্তঃপুরে থাকিতে হইবে।

"অবলার যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা প্রথমে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না: পরে ভাবিলেন, 'মন্দ কি?' তাঁহারা আহত এবং অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ছিলেন—যুদ্ধে আর রুচি ছিল না, কাজেই মহারানীর এই আদেশকে তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত শুভ আশীর্বাদ মনে করিলেন। মহারানীকে ভক্তি সহকারে নমস্কার করিয়া তাঁহারা বিনাবাক্য ব্যয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, দেশরক্ষার কোন আশা নাই—মরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশের ভক্তিমতী কন্যাগণ সমরচ্ছলে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে যাইতে-ছেন, তাহাদের এই অন্তিম বাসনায় বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি? শেষটা কি হয়, দেখিয়া দেশভক্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষগণও আত্মহত্যা করিবেন।"

"অতঃপর লেডী প্রিন্সিপ্যাল দুই সহস্র ছাত্রী সমভিব্যাহারে সমর-প্রাঙ্গনা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "দেশের পুরুষদিগকে ত পর্দার অনুরোধে জেনানায় বন্দী করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে পর্দার আয়োজন করিলেন কিরূপে? উচ্চ প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া গুলীবর্ষণ করিয়াছিলেন না কি?"

"না ভাই! বন্দুক-গুলী ত নারী যোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল না, অস্ত্রধারা যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা থাকিলে আর বিদ্যালয়ের ছাত্রীর প্রয়োজন ছিল কি? আর শত্রুর বিরুদ্ধে পর্দার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক ছিল না—যেহেতু তাহারা অনেক দূরে ছিল; বিশেষতঃ তাহারা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই অক্ষম ছিল।"

আমি রঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"হয়ত রণভূমে মূর্তিমতী সৌদামিনীদের প্রভা দর্শনে তাহাদেরই নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছিল—"

"তাহাদের নয়ন ঝলসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সৌদামিনীর প্রভায় নয়,—স্বয়ং তপনের প্রখর কিরণে।"

"বটে? কি প্রকারে? আর আপনারা বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করিলেন কিরূপে?"

"যোদ্ধার সঙ্গে সেই সূর্যোত্তাপ-সংগ্রহের যন্ত্র ছিল মাত্র। আপনি কখনও স্টিমারের সার্চলাইট (search light) দেখিয়াছেন কি?"

"দেখিয়াছি।"

"তবে মনে করুন, আমাদের সঙ্গে অন্যূন দ্বিসহস্র সার্চলাইট ছিল, —অবশ্য সে যন্ত্রগুলি ঠিক সার্চলাইটের মত নয়, তবে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে 'সার্চলাইট' বলিতেছি। স্টিমারের সার্চলাইটে উত্তাপের প্রাখর্য থাকে না, কিন্তু আমাদের সার্চলাইটে ভয়ানক উত্তাপ ছিল। ছাত্রীগণ যখন সেই সার্চলাইটের কেন্দ্রীভূত উত্তাপ-রশ্মি শত্রুর দিকে পরিচালিত করিলেন,—তখন তাহারা হয় ত ভাবিয়াছিল, একি ব্যাপার! শত সহস্র সূর্য মর্তে অবতীর্ণ। সে উগ্র উত্তাপ ও আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুগণ দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। নারীর হস্তে একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নাই—একবিন্দু নরশোণিতেও বসুন্ধরা কলঙ্কিত হয় নাই—অথচ শত্রু পরাজিত হইল। তাহারা প্রস্থান করিলে পর তাহাদের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সূর্যকিরণে দগ্ধ করা গেল।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম, "যদি বারুদ দগ্ধকালে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া আপনাদের কোন অনিষ্ট হইত।"

"আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বারুদ ছিল বহুদূরে। আমরা রাজধানীতে থাকিয়াই সার্চলাইটের তীব্র উত্তাপ প্রেরণ করিয়াছিলাম। তবু অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য জলধর বেলুন সঙ্গে রাখা হইয়াছিল।"

তদবধি আর কোন প্রতিবেশী রাজা মহারাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে আইসেন নাই।"

"তার পর পুরুষ-প্রবরেরা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে চেষ্টা করেন নাই কি?"

"হাঁ, তাঁহারা মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতিপয় পুলিশ কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে মহারানী সমীপে আবেদন করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে অকৃতকার্য হওয়ার দোষে সমর-বিভাগের কর্মচারীগণই দোষী, সে জন্য তাঁহাদিগকে বন্দী করা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু অপর রাজপুরুষেরা ত কদাচ কর্তব্যে অবহেলা করেন নাই, তবে তাঁহারা অন্তঃপুর কারাগারে বন্দী থাকিবেন কেন? তাঁহাদের পুনরায় স্ব-স্ব কার্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।"

"মহারানী তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যদি আবার কখনও রাজকার্যে তাঁহাদের সহায়তার আবশ্যক হয়, তবে তাঁহাদিগকে যথাবিধি কার্যে নিযুক্ত করা হইবে। রাজ্য-শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যেখানে আছেন, সেইখানে থাকুন।

আমরা এই প্রথাকে 'জেনানা' না বলিয়া 'মর্দানা' বলি।"

আমি বলিলাম, "বেশ ত। কিন্তু এক কথা,—পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি ত 'মর্দানায়' আছেন, আর চুরি ডাকাতির তদন্ত এবং হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অত্যাচার

অনাচারের বিচার করে কে ?”

“যদবধি ‘মর্দানা’ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদবধি এদেশে কোন প্রকার পাপ কিম্বা অপরাধ হয় নাই, সেই জন্য আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত আর পুলিশের প্রয়োজন হয় না,— ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটেরও আবশ্যক নাই।”

“তাই ত আপনারা স্বয়ং শয়তানকেই * শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, আর দেশে শয়তানী † থাকিবে কিরূপে। যদি কোন স্ত্রীলোক কখনও কোন বে-আইনী কাজ করে, তবে তাহাকে সংশোধন করা আপনাদের পক্ষে কঠিন নয়। যাঁহারা বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ জয় করিতে পারেন,—অপরাধ ও অপরাধীকে তাড়াইতে তাঁহাদের কতক্ষণ লাগিবে ?”

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রিয় সুলতানা। আপনি এখানে আরও কিছুক্ষণ বসিবেন, না আমার বসিবার ঘরে চলিবেন ?”

আমি সহাস্যে বলিলাম, “আপনার রান্নাঘরটি রানীর বসিবার ঘর অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু কর্তাদের কাজ বন্ধ করিয়া এখানে আমাদের বসা অন্যায়; আমি তাঁহাদের বে-দখল করিয়াছি বলিয়া হয় ত তাঁহারা আমাকে গালি দিতেছেন।”

আমি ভগিনী সারার বসিবার ঘরে যাইবার সময় ইতস্ততঃ উদ্যানের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম,—“আমার বন্ধুবান্ধবেরা ভারী আশ্চর্য হইবেন, যখন আমি দেশে গিয়া নারীস্থানের কথা বলিব, —নন্দনকাননতুল্য নারীস্থানে নারীর পূর্ণ আধিপত্য, যৎকালে পুরুষেরা মর্দানায় থাকিয়া রন্ধন করেন, শিশুদের খেলা দেন, এক কথায় যাবতীয় গৃহকার্য করেন। আর রন্ধন প্রণালী এমন সহজ ও চমৎকার, যে, রন্ধনটা অত্যন্ত আমোদজনক ব্যাপার। ভারতে যে সকল বেগম খানম প্রমুখ বড় ঘরের গৃহিণীরা রন্ধনশালার ত্রিসীমায় যাইতে চাহেন না, তাঁহারা এমন কেন্দ্রীভূত সৌরকর পাইলে আর রন্ধনকার্যে আপত্তি করিতেন না।”

“ভারতের লোকেরা একটু চেষ্টা করিলেই সূর্যোত্তাপ লাভের উপায় করিতে পারেন। বিশেষ এক খণ্ড কাচ (convex glass) দ্বারা যেমন রবিকর একত্রিত করিয়া কাগজাদি দগ্ধ করা যায়, সেইরূপ কাচ বিশিষ্ট যন্ত্র নির্মাণ করিতে অধিক বুদ্ধি ও টাকা ব্যয় হইবে না।”

“জানেন ভগিনী সারা। ভারতবাসীর বুদ্ধি সুপথে চালিত হয় না— জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের সব কার্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়,

---

* পুরুষ জাতিকে † পাপ

সিদ্ধি করতালী লাভে! কোন দেশ আপনা হইতে উন্নত হয় না, তাহাকে উন্নত করিতে হয়। নারীস্থানে কখনও স্বর্ণবৃষ্টি হয় নাই,—কিম্বা জোয়ারের জলেও মণিমুক্তা ভাসিয়া আইসে নাই?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না।"

"তবেই দেখুন, ত্রিশ বৎসরে আপনারা একটা নগণ্য দেশকে সুসভ্য করিলেন,—না, প্রকৃত পক্ষে দশ বৎসরেই আপনারা এদেশকে স্বর্গতুল্য পুণ্যভূমিতে পরিণত করিতে পারিলেন। আর আমরা একটা সুসভ্য রত্নগর্ভা দেশকে ক্রমে উন্নত করিব দূরের কথা,—বরং ক্রমশঃ তাহাকে দীনতমা শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি"

"পুরুষের কার্যে ও রমণীর কার্যে এই প্রভেদ। আমি যে বলিয়াছিলাম পুরুষেরা কোন ভাল কাজ সুচারু রূপে করিবার উপযুক্ত নয়, আপনি বোধ হয় এতক্ষণে সে কথাটা বুঝিতে পারিলেন?"

"হাঁ এখন বুঝিলাম, নারী যাহা দশ বৎসরে করিতে পারে, পুরুষ তাহা শত শত বর্ষেও করিতে অক্ষম। আচ্ছা ভগিনী সারা, আপনারা ভূমিকর্ষণাদি কঠিন কার্য করেন কিরূপে?"

"আমরা বিদ্যুৎ-সাহায্যে চাষ করিয়া থাকি। চপলা আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়,—ভারী বোঝা উত্তোলন ও বহনের কার্যও সে-ই করে। আমাদের বায়ু-শকটও তদ্দ্বারা চালিত হয়। দেখিতেছেন, এদেশে রেল-বর্ত্ম বা পাকা বাঁধা সড়ক নাই, কেবল পদব্রজে ভ্রমণের পথ আছে।"

"সেই জন্য এখানে রেলওয়ে দুর্ঘটনার ভয় নাই,—রাজপথেও লোকে শকটচক্রে পেষিত হয় না। যে সব পথ আছে, তাহা ত কুসুম-শয্যা বিশেষ। বলি, আপনারা কখন কখন অনাবৃষ্টিজনিত ক্লেশ ভোগ করেন কি?"

"দশ এগার বৎসর হইতে এখানে অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয় না। আপনি ঐ যে বৃহৎ বেলুন এবং তাহাতে সংলগ্ন নল দেখিতে পাইতেছেন,—উহা দ্বারা আমরা যত ইচ্ছা বারিবর্ষণ করিতে পারি। আবশ্যক মত সমস্ত শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। আবার জলপ্লাবনেও আমরা ঈশ্বরকৃপায় কষ্টভোগ করি না। ঝঞ্ঝাবাত এবং বজ্রপাতেরও উপদ্রব নাই।"

"তবে ত এদেশ বড় সুখের স্থান। আহা মরি! ইহার নাম 'সুখস্থান' হয় নাই কেন? আপনারা ভারতবাসীর ন্যায় ঝগড়া-কলহ করেন কি? এখানে কেহ গৃহবিবাদে সর্বস্বান্ত হয় কি?"

"না ভগিনী। আমাদের কোঁদল করিবার অবসর কই? আমরা সকলেই সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি—প্রকৃতির ভাণ্ডার অণ্বেষণ করিয়া নানা প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা আহরণের চেষ্টায় থাকি। অলসেরা কলহ করিতে সময় পায়—আমাদের সময় নাই। আমাদের গুণবতী মহারানীর সাধ,—সমস্ত দেশটাকে একটি উদ্যানে পরিণত করিবেন।"

"রানীর এ আকাঙ্ক্ষা অতি চমৎকার। আপনাদের প্রধান খাদ্য কি?"

"ফল।"

"ভাল কথা, আপনারাই ত সব কাজ করেন, তবে পুরুষেরা কি করেন?"

"বড় বড় কল কারখানায় যন্ত্রাদি পরিচালিত করেন, খাতা-পত্র রাখেন,—এক কথায় বলি, তাঁহারা যাবতীয় কঠিন পরিশ্রম অর্থাৎ যে কার্যে কায়িক বলের প্রয়োজন সেই সব কার্য করেন।"

"আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ওঃ। তাঁহারা কেরানী মুটে মজুরের কাজ করিয়া থাকেন।"

"কিন্তু কেরানী ও শ্রমজীবী বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় এদেশের ভদ্রলোকেরা তাহা নহেন। তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশিক্ষায় আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। আমরা শ্রম বণ্টন করিয়া লইয়াছি —তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, আমরা মস্তিষ্কচালনা করি। আমরা যে সকল যন্ত্রের উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি কল্পনা করি, তাঁহারা তাহা নির্মাণ করেন। নরনারী উভয়ে একই সমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ,— পুরুষ শরীর, রমণী মন।"

"তা বেশ। কিন্তু ভারতবাসী পুরুষেরা একথা শুনিলে খড়্গহস্ত হইবেন। তাঁহাদের মতে তাঁহারা একাই এক সহস্র—'তনমন' সব তাঁহারা নিজেই। আমরা তাঁহাদের 'ছাই ফেলিবার জন্য ভাঙ্গাকুলা' মাত্র। আপনাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আপনারা গ্রীষ্মকালে বাড়ীঘর ঠাণ্ডা রাখেন কিরূপে? আমরা ত বৃষ্টিধারাকে স্বর্গের অমিয়ধারা মনে করি।"

"আমাদেরও সুস্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার অভাব হয় না। তবে আমরা পিপাসী চাতকের ন্যায় জলধরের কৃপা প্রার্থনা করি না, এখানে কাদম্বিনী আমাদের সেবিকা—সে আমাদের ইচ্ছানুসারে শীতল ফোয়ারায় ধরণী সিক্ত করিয়া দেয়। আবার শীত কালে সূর্যোত্তাপে গৃহগুলি ঈষৎ উত্তপ্ত রাখা হয়।"

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহার স্নানাগার দেখাইলেন। এ কক্ষের ছাদটা বাক্সের ডালার মত। ছাদ তুলিয়া ফেলিয়া ইচ্ছামত বৃষ্টিজলে স্নান করা যায়। প্রত্যেকের গৃহপ্রাঙ্গনে বেলুনের ন্যায় বৃহৎ জলাধার আছে,—আদি বেলুনের সহিত

ঐ জলধারগুলির যোগ আছে। আমি মুগ্ধভাবে বলিলাম, "আপনারা ধন্য। স্বয়ং প্রকৃতি আপনাদের সেবাদাসী আর কি চাই। পার্থিব সম্পদে ত আপনারা অতিশয় ধনী, আপনাদের ধর্মবিধান কিরূপ—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমাদের ধর্ম প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে ধর্মতঃ বাধ্য এবং প্রাণান্তেও সত্য ত্যাগ করিতে পারি না। যদি কালে ভদ্রে কেহ মিথ্যা বলে:"

"তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়?"

"না, প্রাণদণ্ড হয় না। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিজগতের জীব হত্যায়—বিশেষতঃ মানব হত্যায় আমোদ বোধ করি না। কাহারও প্রাণনাশ করিতে অপর প্রাণীর কি অধিকার? অপরাধীকে নির্বাসিত করা হয়, এবং তাহাকে এদেশে কিছুতেই পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।"

"কোন মিথ্যাবাদীকে কখনও ক্ষমা করা হয় না কি?"

"যদি কেহ অকপট হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা যায়।"

"এ নিয়ম অতি উত্তম। এখানে যেন ধর্মই রাজত্ব করিতেছে। ভাল, একবার মহারানীকে দেখিতে পাইব কি? যিনি করুণা প্রতিমা, নানা গুণের আধার, তাঁহাকে দেখিলেও পুণ্য হয়।"

"বেশ চলুন।" এই বলিয়া ভগিনী সারা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক খণ্ড তক্তায় দুইখানি আসন স্ক্রু দ্বারা আঁটা হইল, পরে তিনি কতিপয় গোলা আনিলেন, গোলা কয়টি দেখিতে বেশ চক্‌চকে ছিল, কোন্ ধাতুতে গঠিত তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, আমার মনে হইল উৎকৃষ্ট রৌপ্য-নির্মিত বলিয়া। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ওজন কত। আমি জীবনে কোন দিন ওজন হই নাই, কাজেই নিজের গুরুত্ব আমার জানা ছিল না, ভগিনী বলিলেন,—"আসুন তবে আপনাকে ওজন করি। ওজনটা জানা প্রয়োজন।"

আমি ভাবিলাম, একি ব্যাপার! যাহা হউক ওজনে আমি এক মন ষোল সের হইলাম। শুনিলাম, তিনি আটত্রিশ সের মাত্র। তবে ভগিনী সারার অপেক্ষা আর কোন গুণে না হউক আমি গুরুত্বে বেশী ত।

তারপর দেখিলাম, ঐ চক্‌চকে গোলার ছোট বড় দুইটি গোলা এই তক্তায় সংযোগ করা হইল। আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, সে গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ। তাহারই সাহায্যে আমরা শূন্যে উত্থিত হইব। বিভিন্ন ওজনের বস্তু উত্তোলনের নিমিত্ত ছোট বড় বিবিধ ওজনের হাইড্রোজেন গোলা ব্যবহৃত হয়। এখন বুঝিলাম, এই জন্য আমার ওজন অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

অতঃপর এই অপরূপ বায়ুযানে দুইটি পাখার মত কলা সংযুক্ত হইল, শুনিলাম ইহা বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা উভয়ে আসনে উপবেশন করিলে পর তিনি ঐ পাখার কল টিপিলেন। প্রথমে আমাদের 'তখতে রওয়াঁ' খানি* ধীরে ধীরে ৭।৮ হাত উর্দ্ধে উত্থিত হইল, তারপর বায়ুভরে উড়িয়া চলিল। আমি ভাবিলাম, এমন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত দেশের অধীশ্বরীকে দেখিতে যাইতেছি, যদি আমার কথাবার্তায় তিনি আমাকে নিতান্ত মূর্খ ভাবেন—এবং সেই সঙ্গে আমাদের সাধের হিন্দুস্থানকে 'মূর্খস্থান' মনে করেন? কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না,—সবে তখ্‌তে রওয়াঁ শূন্যে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে আর অমনই দেখি, আমরা চপলাগতিতে রাজধানীতে উপনীত। সেই বায়ুযানে বসিয়াই দেখিতে পাইলাম, সখী-সহচরী পরিবেষ্টিতা মহারানী তাঁহার চারি বৎসর বয়স্কা কন্যার হাত ধরিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাজধানী যেন একটি বিরাট কুসুমকুঞ্জ বিশেষ। তাহার সৌন্দর্যের তুলনা এ-জগতে নাই।

মহারানী দূর হইতে ভগিনী সারাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "বা! আপনি এখানে।" ভগিনী সারা রানীকে অভিবাদন বরিয়া ধীরে ধীরে তখ্‌তে রওয়াঁ অবনত করিলে আমরা অবতরণ করিলাম।

আমি যথাবিধি মহারানীর সহিত পরিচিতা হইলাম। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার যে আশঙ্কা ছিল, তিনি আমাকে কি যেন মনে করিবেন, এখন সে ভয় দূর হইল। তাঁহার সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, "অবাধ বাণিজ্যে তাঁহার আপত্তি নাই, "কিন্তু যে সকল দেশে রমণীবৃন্দ অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে সব দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে, দেশের কোন কাজ করে না, তাহারা বাণিজ্যের নিমিত্ত নারীস্থানে আসিতে বা আমাদের সহিত কাজ কর্ম করিতে অক্ষম। এই কারণে অন্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিতে পারে না। পুরুষেরা নৈতিক জীবনে অনেকটা হীন বলিয়া আমরা তাহাদের সহিত কোন প্রকার কারবার করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা অপরের জমী জমার প্রতি লোভ করিয়া দুই দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করি না, অথবা এক খণ্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করি না,—যদ্যপি তাহা কোহেনুর অপেক্ষা শত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়, কিম্বা কাহারও

* ইংরাজীতে 'travelling throne' বলা যাইতে পারে।

ময়ূর-সিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞান-সাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহাই ভোগ করি। তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।"

মহারানীর নিকট বিদায় লইয়া আমি সেই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম, এবং কতিপয় কলকারখানা, রসায়নাগার এবং মানমন্দিরও দেখিলাম।

উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ পরিদর্শনের পর আমরা পুনরায় সেই বায়ু যানে আরোহণ করিলাম। কিন্তু যেই আমাদের তখ্‌তে রওয়াঁ খানি ঈষৎ হেলিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল, আমি কি জানি কিরূপে আসনচ্যুত হইলাম,—সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমি তখনও সেই আরাম কেদারায় উপবিষ্টা।

ডেলিশিয়া-হত্যা।

"হত্যা" শব্দ শুনিয়া পাঠিকা ভগিনী ভয় পাইবেন না যে ইহা সত্যই ছোরা তরবারী বা বন্দুক পিস্তল দ্বারা রক্তারক্তি বিশিষ্ট হত্যাকাণ্ড। প্রসিদ্ধা গ্রন্থকর্ত্রী মিস মেরী করেলী "ডেলিশিয়া হত্যা" নামক এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। ডেলিশিয়া কাহিনীর সহিত আমাদের নারী সমাজের এমন চমৎকার সাদৃশ্য আছে যে, গ্রন্থখানি পাঠকালে অবাক হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

"এ পোড়া ভারত অন্তঃপুরের কথা
জানিল কি ছলে মেরি করেলী।"

অদ্য আমরা ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সমাজের দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব, অবলা পীড়নে কোন সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত।

ইংরাজ রমণীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি, তাঁহারা স্বাধীন, বিদুষী পুরুষের সমকক্ষা, সমাজে আদৃতা,—তাঁহাদের আরও কত কি সুখ সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্ত্তি মানস-নয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাঁহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতি-মধুর। সভ্যতা ও স্বাধীনতার ললামভূমি লণ্ডন নগরীতে শত শত "ডেলিশিয়া বধকাব্য" নিত্য অভিনীত হয়। হায়! রমণী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অবলা!!

সংবাদপত্র সমূহে কোন বিখ্যাত ইংরাজ-দম্পতীর প্রতিকৃতি দেখিলে আমাদের মনে হয়,—লর্ড অমুক ত বেশ প্রতিপত্তিশালী, জগতের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগান, কিন্তু লেডি অমুকের বুকখানি চিরিয়া দেখিলে জানিতে পারিতাম তাহাতে সুখ কতখানি।

গ্রন্থকর্ত্রী মেরী করেলী স্বয়ং অবলা, তাই ডেলিশিয়ার মর্ম্মবেদনা অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। এবং অবলা পাঠিকারাই সম্যক-রূপে "ডেলিশিয়া বধের" মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এই চমৎকার উপন্যাসের অবিকল অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে, তবু ইহার গল্পাংশের অনুবাদ পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

গ্রন্থকর্ত্রী উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, সামাজিক সত্য ঘটনা অবলম্বনে তিনি 'ডেলিশিয়া' চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক সত্য ঘটনা আমাদেরও জানা

---

* প্রকৃত উচ্চারণ "ডিলিশিয়া" কিন্তু বঙ্গভাষায় "ডেলিশিয়া" শ্রুতিমধুর বোধহয় বলিয়া আমরা "ডেলিশিয়া" লিখিলাম।

আছে, আমরা ভারতের সেই প্রপীড়িতা অবলাদের একটি নমুনা (representative) চরিত্রের নাম রাখিলাম "মজলুমা"। "ডেলিশিয়া"র প্রতিচ্ছত্রে প্রতিবর্ণে যেন "মজলুমা"রই চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"মজলুমা" চিত্রটি ডেলিশিয়া চিত্রের পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া দেখাইব—ইংলণ্ডের নারী সমাজের সহিত ভারত-ললনা সমাজের কি চমৎকার সাদৃশ্য। আর কোথায় কি প্রকার পার্থক্য আছে, তাহাও দেখা যাইবে।

ডেলিশিয়া স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুর বন্দিনী নহেন, আর মজলুমা পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অপরাধে বন্দিনী, কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু? অধিক নয়,—উভয়ে অবলা! উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্মপীড়িতা। কিন্তু ডেলিশিয়া বিদুষী এবং মজলুমা নিরক্ষর—এই একটা ভারী পার্থক্য আছে। সুশিক্ষিতা ডেলিশিয়া জীবন সমর প্রাঙ্গনে অমিততেজা বীরার ন্যায় (স্বামীরূপ) গুপ্তঘাতকের শরাঘাতে নিহত হয়, যৎকালে অশিক্ষিতা মজলুমা নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অত্যাচারী স্বামীর পদতলে মর্দ্দিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তেজস্বিনী ডেলিশিয়া পিস্তল হস্তে স্বামীকে স্পষ্ট বলিলেন, "তুমি আমার নিকট আর একপদ অগ্রসর হইলে আমি তোমাকে গুলী করিব। অভাগিনী মজলুমা সেরূপ কথা বলিবেন দূরে থাকুক—তিনি বরং অত্যাচারীর পদপ্রান্তে লুকাইয়া নাকিকান্না ধরিবেন—বলিবেন, "প্রভো! দাসীর কি অপরাধ হইয়াছে?" অথবা "দাসীর প্রতি সদয় হও।" শেষে অশ্রুধারায় শ্রীচরণ যুগল ধুইতে বসিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত লাভ করিবেন—ডেলিশিয়া ও মজলুমায় এই প্রভেদ।

ডেলিশিয়ার আত্ম-মর্যাদাজ্ঞান আছে, মজলুমার তাহা নাই। নির্যাতিতা প্রপীড়িতা হইলেও ডেলিশিয়ার কেমন একপ্রকার মহীয়ান্ গরীয়ান্ ভাব আছে, অত্যাচারী কর্তৃক তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতেছে কিন্তু অবনত হইতেছে না। তিনি গর্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া মরিবেন, কিন্তু নতশিরে যুক্ত করে প্রাণভিক্ষা চাহিবেন না। এই মহান ভাবটা যেন মজলুমার নাই। ইহার কারণ এ-দেশের স্ত্রীশিক্ষার অভাব। মজলুমা ভূমিষ্ঠা হইয়াই শুনিতে পায়, "তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম।" সুতরাং তাহার আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া গিয়াছে। সে আর নিজের মূল্য জানে না—পুরুষ আত্মীয়দের কর্তৃক বারম্বার পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদ-লেহনে বিরত হয় না স্বাধীনা ডেলিশিয়ার ও পরাধীনা মজলুমায় এই প্রভেদ।

এ দেশের গ্রন্থকারেরা নারী চরিত্রকে নানা গুণ ভূষায় সজ্জিত করেন বটে; বেশীর ভাগে অবলা হৃদয়ের সহিষ্ণুতা বর্ণনা করা হয় (কারণ রমণী পাষাণ প্রায় সহিষ্ণু না হইলে তাহার প্রতি অত্যাচারের সুবিধা হইত না যে!) কিন্তু এ সব পুস্তকে নায়িকার আত্ম-গরিমার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

এখন ডেলিশিয়া কাহিনীর গল্পাংশ অনুবাদ করা যাউক:

ডেলিশিয়া বাল্যকাল হইতে সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন। যখন তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর ছিল। তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাবলী পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদৃত হইত। এইরূপে প্রতিভাশালিনী ডেলিশিয়া বেশ সুখ্যাতি লাভ করিলেন এবং পুস্তক বিক্রয়ের ফলে যথেষ্ট অর্থলাভও করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহার অনেক শত্রুও সৃষ্টি হইল। দেশের অপর লেখকবৃন্দ হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতে পুস্তক রচনা কেবল পুরুষের কার্য। রমণীগণ কেবল নানা প্রকার বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া বিলাস পঙ্কে নিমজ্জিতা থাকিবে। আর যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে যে নারীর বয়স নাই, রূপ নাই, যে অতি বিশ্রী কদাকার কুৎসিতা, সেই লেখনী ধারণ করুক। ডেলিশিয়ার ন্যায় নিরুপমা রূপসী কিশোরী তাঁহাদের যশোপ্রভা ম্লান করিবে, ইহা যে একেবারে অসহ্য।

সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে ডেলিশিয়ার বিবাহ হয়। এ দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত প্রতিভা-শালিনী, অর্থশালিনী, সৌন্দর্যের রানী, ডেলিশিয়া যে, অবিবাহিতা ছিলেন, তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, সাধারণ পুরুষ-সমাজ তাঁহাকে কেমন এক প্রকার ভয়, ভক্তি ও স্বল্প বিশেষে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। নিজের বেশভূষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসিনী, সতত পুস্তক রচনায় নিযুক্তা রমণীকে বিবাহ করিয়া দাম্পত্য-জীবনে সুখী হইতে পারিবেন, এরূপ ভরসা হয় ত কেহ করিতে পারেন নাই। (আমাদের দেশে ত "পুস্তক লেখিকা" নাই বলিলেই হয়, তবু "পুস্তক পাঠিকাকে" ও "নভেল পাণি" জ্ঞানে অনেকে বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হন!)

মিস্টার উইলফ্রেড কারলীঅন উচ্চবংশ জাত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি পিতার ইচ্ছায় সৈনিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। 'ছিল' বলিতে মিঃ কারলীঅনের ছিল ছয় ফুট দীর্ঘাকৃতি, সৌম্যমূর্তি আর বুনিয়াদী বংশমর্যাদা। আয় এত অল্প যে তাহা ধর্তব্য নহে। মিঃ কারলীঅন দেখিলেন, ডেলিশিয়া-শিকার মন্দ নহে। একে ত তিনি আভরণ হীনা গোলাপ মুকুল; দ্বিতীয়তঃ বিপুল অর্থশালিনী। অবশেষে একদিন ডেলিশিয়ার জন্য সেই শুভ মুহূর্ত আসিল—যে

মুহূর্ত মানবজীবনে (? না, নারী জীবনে) মাত্র একবার আইসে ; যাহা ভগ্ন তরঙ্গের বাষ্পকণার মত ক্ষণস্থায়ী,—যাহা আকাশে উল্কার ন্যায় প্রতিভাত হয়, চাহিয়া দেখিতে না দেখিতে চির অন্তর্হিত হয়! ডেলিশিয়ার জীবনে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত আসিল। সেদিন ডেলিশিয়া কোন বড় লোকের গৃহে নৈশ ভোজে অথিতি ছিলেন; মিঃ করালীঅনও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

'ডেলিশিয়া!' মিঃ কারলীঅন ডেলিশিয়ার হস্তধারণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'ডেলিশিয়া, আমি তোমায় ভালবাসি!'

*　　*　　*　　*　　*

ডেলিশিয়ার বিবাহের দিন গীর্জার বাহিরে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল—একপক্ষে যুদ্ধদেবতা অপর পক্ষে সাহিত্যের দেবী—এ বিবাহকে কার্তিক এবং সরস্বতীর মিলন বলা যাইতে পারে—এ নব-দম্পতিকে দেখাই চাই। জনতার অনেকে যে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ ডোলশিয়া প্রাপ্ত হইলেন।

সচরাচর বলা হয়. 'বর কন্যাকে বিবাহ করিল,' কিন্তু এক্ষেত্রে বলিতে হইবে,—কন্যা বরকে বিবাহ করিলেন। কারণ ডেলিশিয়াই মিঃ কারলী-অনের অন্নবস্ত্র ইত্যাদি যোগাইবার ভার লইলেন! মজলুমার বেলায় আবার এরূপ বলা খাটে না, সেস্থলে বলিতে হইবে,—জমীদারী ধনদৌলত সহ দাসী স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন! ফল কথা, ডেলিশিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র নির্মাণ করিতে লাগিলেন আর তাঁহার স্বামী নিষ্কর্মা (drone)মক্ষীর ন্যায় মধু ভোগ করিতে লাগিলেন!

বিবাহের দিন অলঙ্কার বলিতে ডেলিশিয়া এক গুচ্ছ সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প-মাত্র পরিয়াছিলেন! উহাতে রমণী মণ্ডলী বিস্মিত হইলেন। নব-পরিণীতা ডেলিশিয়ার গায় গহনা নাই! কি আশ্চর্য! 'ওমা! ঠিক যেন আমাদের নারী সমাজ! ৫।৭ জন প্রবীণা নবীনা একত্র হইলে, তাঁহারা কেবল অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার করেন। যেই কোন নবধৃতা নববধূ আইসে, উপস্থিত রমণীবৃন্দ অমনি তাহার নাক কান ও গলদেশের খানাতল্লাসী আরম্ভ করে—কোথায় কি গহনা আছে। কর্ণাভরণ দেখিবার জন্য বেচারীর কান লইয়া যত টানাটানি হয়, তাহা বর্ণনাতীত। ভারত-বধূর ন্যায় ডেলিশিয়ার কান ধরিয়া টানাটানি হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কর্ণকুহর (শ্রবণ-শক্তি) লইয়া মুখরাগণ যথেষ্ট টানাটানির প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

প্রৌঢ়া মহিলা সমাজ আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, বেচারা কারলীঅন এমন সুশ্রী সুপুরুষ—তিনি বিবাহ করিলেন একটা "স্ত্রী গ্রন্থকর্ত্রী"কে (female authoress")!

পক্ষান্তরে মিঃ কারলীঅন বন্ধু মহলে ডেলিশিয়া সম্বন্ধে বলিতেন, "তিনি স্বাভাবিক গোলাপফুল,—কৃত্রিম রঙ, কলপ, পরচুলা (যাহা স্ত্রী কয়েদীদের মাথা হইতে কাটিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়), এসেন্স পাউডার—এ সকল কিছুরই ধার ধারেন না।" তচ্ছ্রবণে জনৈক বন্ধু বলিলেন, "ভাগ্যবান কুকুর (lucky dog)। তুমি এমন পুরস্কারের যোগ্য নহে।"

"সম্ভবতঃ নহি; কিন্তু—" বলিয়া মিঃ কারলীঅন বন্ধুর দিকে মধুর দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই চাহনীতেই তাঁহার কথার বাকী অংশ সমাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার ঐ সুন্দর কটাক্ষ বাণেই ত ডেলিশিয়াকে বিদ্ধ করিয়াছেন! বন্ধুগণ আমোদ করিয়া তাঁহাকে 'বিউটি কারলীঅন' (Beauty Carlyon) বলিয়া ডাকিতেন।

ডেলিশিয়ার বিবাহ-জীবনের প্রায় তিন বৎসর একরূপ নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তিনি সামাজিক আমোদ-উৎসবে বড় একটা যোগদান করিতেন না; অধিকাংশ সময় সাহিত্য-সেবায় যাপন করিতেন। লেখকেরা নির্জনতাই ভালবাসে। যে আধ্যাত্মিক ভাবের আস্বাদ পাইয়াছে, সে বহির্জগতের অন্তঃসারহীন আমোদ-আহলাদে বৃথা সময় নষ্ট করিতে চাহে না। উইলফ্রেডকারলীঅন্ কিন্তু 'বল' নৃত্য প্রভৃতি যাবতীয় অসার আমোদ বড় ভালবাসিতেন! তিনি প্রায় প্রতিদিনই দুই তিনটা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন।

এই সময় ডেলিশিয়ার সুখের বাসায় এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি আসিয়া পড়িল। তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। অগ্নিকণা তাঁহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দাহক্রিয়া আরম্ভ করিল।

দুই একজন পরিচিত লোক তাঁহাকে ঐ অগ্নির বিষয় জানাইতে চেষ্টা করিলেন, ডেলিশিয়া তাহা শুনিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "লোকগুলা অনর্থক আমাদের দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি আনিতে চায়। পরনিন্দা করিয়া উহারা কি সুখ পায়?" তিনি সময়ে সাবধান হইলে হয়ত অভিনয় এতদূর গড়াইত না। স্বামীকে সংশোধন করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীর প্রতি অন্ধ অনুরাগবশতঃ তিনি তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারিলেন না।"

মিঃ কার্‌লীঅন্‌ একদিন বলিলেন, "সাহিত্য-সেবিকা মহিলা'রা কোন-রূপ উপাধিপ্রাপ্ত হয় না, ইহা বড় অন্যায় এবং দুঃখের বিষয়। * * *

যাহা হউক, ডেলিশিয়া, আমি তোমাকে একটি উপাধি দিতেছি—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় এখন আমি পৈত্রিক লর্ড উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছি।"

ডেলিশিয়া ফাঁকা উপাধি প্রাপ্তিতে হাসিয়া ফেলিলেন। বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন,—

"প্রভো! আমি আপনার দীনতমা সেবিকা।"

লেডী শব্দ কি ডেলিশিয়ার সম্মান বৃদ্ধি করিবে? তিনি লেখিকারূপে যে যশোলাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এ লেডী পদবী কি? অমন কত লেডী জগতে অপরিচিত অবস্থায় মরে বাঁচে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু 'গ্রন্থকর্ত্রী ডেলিশিয়া' নামটি অমর থাকিবে।

আর একদিন লর্ড কার্‌লীঅন্‌ বলিলেন, "আমি মনে করি, সেই প্রাচীনকাল ভাল ছিল।"

"বটে? যখন পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধা রাখিত—যেমন গবাদি পশুকে খোঁয়াড়ে রাখা হয়*— এবং তাহাদের বিবেচনায় যতটুকু খাদ্য রমণীদের পাওয়া উচিত মনে করিত, তাহাই তাহাদের দিত—আর নারীগণ অবাধ্য হইলে তাহাদের প্রহার করিত? হইতে পারে, সে কাল সুখের ছিল, কিন্তু আমি তাহার পক্ষপাতী নহি। আমি জগতের ক্রমোন্নতি দেখিতে চাই—আমি চাই সভ্যতা—যাহাতে নারী ও পুরুষ সুশিক্ষা লাভ করে।"

* * * *

কারলীঅন বলিলেন, "আমার মতে উন্নতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আমি ইহার গতি মন্দ হওয়ার পক্ষে ভোট দিতে চাই।" *

---

* মিস করেলী সম্ভবতঃ কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, তাই তিনি চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধা রমণীদের অবস্থাকে "অতীতকালের" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আমরা অন্তঃপুরকে "খোঁয়াড়" বলিয়া স্বীকার করি না। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়?—Fact is fact !!

* সময়ের গতি যে কাহারও ভোটের অপেক্ষা করে না, তাই রক্ষা! ইংলিশম্যানের যখন এই মত, তবে আর ভারতবাসীর নিকট কি আশা করিব?

পরশ্রীকাতর লোকেরা কাহারও সুখ সুখ্যাতি সহ্য করিতে পারে না। ডেলিশিয়ার দাম্পত্য-জীবন মোটের উপর অত্যন্ত সুখের ছিল—তিনি কেবল একবার একটি শিশুর মৃত্যুশোক পাইয়াছিলেন, এ শোক ত পাবক—ইহাতে হৃদয় পবিত্র হয়। জননী-হৃদয়ের ঐ জ্বালাটুকু ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন অশান্তি বা দুঃখ ছিল না। সাহিত্য-জগতেও তিনি বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এতখানি সুখ হিংসুকের সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টায় ছিল। ডেলিশিয়া সংসার চিনিতেন, তাই সতর্কতাবশতঃ লোকনিন্দায় কর্ণপাত করিতেন না। তিনি নিন্দুকের মিথ্যা নিন্দা এড়াইতে গিয়া বন্ধুর কথায়ও কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ন্যায় সতী লক্ষ্মীর স্বামী পথভ্রষ্ট হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। আহা! তাঁহার কি সরল বিশ্বাস ছিল।

তাঁহার জনৈক বন্ধু মিঃ পল ভাল্‌ডিস নানা ইঙ্গিতে ডেলিশিয়াকে সতর্ক করিতে চাহিলেন, তাহাতে ডেলিশিয়া চটিলেন! মিঃ ভালডিস্ ডেলিশয়ার প্রিয় কুকুর স্পার্টানের গায় সাদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "লেডী কারলীঅন্, "আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু বলিতে এখন কেবল একজন আছে।"

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি স্পার্টানের কথা বলেন, না অপনার নিজের?"

ভাল্‌ডিস্ বলিলেন, "স্পার্টানের কথা বলি।"

ক্রমে কথা প্রসঙ্গে যখন মিঃ ভাল্‌ডিস বলিলেন, লর্ড কারলীঅন নগণ্য কিছুই নহেন, তখন ডেলিশিয়া বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মিঃ ভাল্‌ডিস্‌কে বিদায় দিলেন। তাইত, পতিপ্রাণা সতি কি পতিনিন্দা সহিতে পারেন?

ডেলিশিয়ার ব্যবহারটা যেন স্পার্টানের পসন্দ হইল না—সে তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিল। সে চাহনীর অর্থ এই—"তুমি মিঃ ভাল্‌ডিসকে তাড়াইয়া, দিলে কেন? তিনি আমার পরম বন্ধু।" ডেলিশিয়া কুকুরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "স্পার্টান! তিনি আমাদের প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন যে, তাঁহাকে আর আমরা নিকটে আসিতে দিব না।" স্পার্টান কিন্তু কর্ত্রীর এ-কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইল না।

যাহাদের কবিতা, রচনা প্রভৃতি ডেলিশিয়ার গ্রন্থের ন্যায় আদৃত হইত না, তাহারা হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিল। "বোহেমিয়ান" ক্লাবে ৮।১০ জন ভদ্রলোক একত্র হইলে তাঁহাদের অধিকাংশ লোক ডেলিশিয়া-নিন্দা করিয়া হৃদয়ের জ্বালা

নিবারণ করিতেন। একজন কবি বলিলেন, "স্ত্রীলোকে এমন লিখিতে পারিবে কেন,—অধিকাংশ পুস্তক তাঁহার স্বামী লিখিয়া দেন।" মিঃ ভালডিস বলিলেন, —"মিথ্যা কথা! তাঁহার স্বামী আপনারই মত মস্ত গাধা!"

"আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলেন মিষ্টার ভালডিস! আর আমাকে গাধা বলিতেও ছাড়েন নাই!"

ভালডিস বলিলেন. "হঁা! আমি লর্ড কারলীঅনের স্বহস্ত-লিখিত পত্র দেখিয়াছি; তিনি প্রতি শব্দে বানান ভুল করেন, প্রতি ছত্রে ব্যাকরণের মুণ্ডপাত করেন। আপনি যদি মনে করেন যে, এই বিদ্যা লইয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর পুস্তক লিখেন, তবে আপনি অবশ্যই গাধা! কিন্তু আপনি বাস্তবিক তাহা মনে করেন না, কেবল একজন মহিলার যশোপ্রভা দর্শনে হিংসা দগ্ধ হইয়া এমন কথা বলেন।"

কতক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পর কবি বলিলেন, "জানেন মিঃ ভালডিস লেখনীর ধার অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ!"

ভাল্‌ডিস্ তুচ্ছভাবে হাসিয়া বলিলেন, "ওহো! বুঝিলাম আপনি অর্দ্ধপেনী মূল্যের সংবাদপত্রে আমাকে গালি দিবেন।"

একদা ডেলিশিয়া তাঁহার প্রভুর জন্য অনেকগুলি জিনিস ক্রয় করিতে দোকানে গিয়াছেন। লর্ডের ফরমাইশ ছাড়া আরও বিশেষ কোন বস্তু ক্রয় করিবারও ইচ্ছা ছিল। তাঁহাদের বিবাহের বার্ষিক উৎসব হইবে, সেই শুভ দিনে তিনি লর্ড কারলীঅনকে কিছু উপহার দিবেন। প্রেম ত অশরীরী. তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য জড়বস্তুর অবলম্বনই চাই। পতিব্রতা সতী তাঁহার অকৃত্রিম পতি-ভক্তি একটি অঙ্গুরীয় বা একসেট বোতামের আকারে স্বামীকে উপহার দিবেন। এ দোকান সে দোকান ঘুরিয়া একস্থানে জানালার বাহির হইতে একজোড়া বোতাম দেখিয়া ডেলিশিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

বোতাম ক্রয়ের নিমিত্ত ডেলিশিয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন। মণিকার তাঁহাকে ধনবতী ভাবিয়া সযত্নে অনেক মণিমুক্তার অলঙ্কার দেখাইতে আরম্ভ করিল। ডেলিশিয়া মাত্র সেই বোতাম পসন্দ করিলেন, আর কিছু ক্রয় করিলেন না।

এত অল্প বিক্রয়ের পর জহরী ক্রেতাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে কেন? সে বহুমূল্য রত্নভাণ্ডার খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। তন্মধ্যে হীরক খচিত

একটি কপোতাকৃতি 'যুগনু'* বড় সুন্দর ছিল। কপোতের চঞ্চুপুটে একটি স্বর্ণলিপি এবং সেই স্বর্ণপত্রে একটি শ্লোক (মটো) পদ্মরাগে খচিত ছিল। ডেলিশিয়া সেইটি হাতে লইয়া বলিলেন, "এ যুগনুটি ত বড় চমৎকার! ইহাতে কবিত্ব ও শিল্প-নৈপুণ্য দুইই আছে।"

"হাঁ, কিন্তু এটি বিক্রয় হইবে না। ইহা লর্ড কারলীঅনের বিশেষ ফরমাইশ অনুসারে নির্মিত হইয়াছে।"

ডেলিশিয়া ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এবার হয়ত বিবাহের বার্ষিক উৎসবের দিন লর্ড কারলীঅন্ ডেলিশিয়াকে এই যুগনু উপহার দিবেন; তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই মণিকার যুগনুটি ডিবে হইতে বাহির করিয়া সূর্যকিরণে ধরিল—যাহাতে মণিগুলি বেশ ঝলমল করে! সে ডেলিশিয়াকে চিনিত না। বেশ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—

"এ কপোতের জন্য লর্ড কারলীঅনকে পাঁচশত পাউণ্ডের কিছু বেশী (প্রায় ৮০০০৲ টাকা) দিতে হইবে। তা ভদ্রলোকে যখন কোন মহিলা বিশেষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, তখন এরূপ ব্যয়বাহুল্যে কুণ্ঠিত হন না। এক্ষেত্রে সে মহিলাটি যে কারলীঅনের পত্নী নহেন, তাহা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারেন।"

ডেলিশিয়া বলিলেন, "আমি সেরূপ কিছু মনে করিব কেন? আমি ত বুঝি ইহাই স্বাভাবিক যে কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহধর্মিণীকে উপহার দবার জন্য এরূপ যুগনু নির্মাণ করাইবেন।"

জহুরী বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বটে? কিন্তু ফলতঃ আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, যখনই কোন ভদ্রলোক কোন বিশেষ ফরমাইশ দেন, সে বস্তু কখনই তাঁহার ধর্মপত্নীর হাতে পড়ে না। আমরা সর্বদাই ইহাতে দুঃখিত হই যে, আমাদের অতি যত্নে প্রস্তুত অলঙ্কারসমূহ মহিলারা প্রাপ্ত হন না। * * * নচেৎ এই বহুমূল্য হীরক কপোতটি কেন লেডী কারলীঅনের নিকট না যাইয়া নর্তকী লা-মেরিনার নিকট যাইতেছে?"

অ্যাঁ! মণিকার এ কি বলিল? ডেলিশিয়ার মাথা ঘুরিয়া গেল!

---

* আমাদের দেশে পাচলড়ি বা সাতনরি মুক্তামালার মধ্যস্থলে যে জড়াও "ধুকধুকি" থাকে, তাহাকে pendant বলা যাইতে পারে, কিন্তু pendant বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে বেহার অঞ্চলে "যুগনু" বলে। বঙ্গদেশে কেবল "ধুকধুকি" নিজে কোন অলঙ্কার নয়; বেহারে কিন্তু "যুগনু" নিজেই একটি অলঙ্কার। এইজন্য আমরা "যুগনু" শব্দ ব্যবহার করিলাম।

* * *

শেষে জহুরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি লেডী কারলীঅনের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন কি? তিনি সাহিত্য-জগতে "ডেলিশিয়া ভাহান্' নামে পরিচিত।"

ডেলিশিয়া বলিলেন,—"হাঁ—মনে হয়, পড়িয়াছি।"

জহুরী। তা বেশ। তিনি বাস্তবিক অতি যশস্বিনী রমণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার স্বামী তাঁহার বিষয় একটুও ভাবেন না * * *

শুনিতে পাই লর্ড কারলিঅন্ যে টাকার এমন অপব্যয় করেন, তাহা তাঁহার পত্নীর; তাঁহার নিজের এক পয়সাও নাই। যদি এ কথা সত্য হয় তবে কি লজ্জার বিষয়! অবশ্য লেডী কারলীঅন না জানিয়াই মেরিনার অলঙ্কারের মূল্য দিয়া থাকেন! * * * তবে আপনি এই বোতাম যোড়া লইবেন ত?

ডেলিশিয়া। হাঁ, ধন্যবাদ। এগুলি ভদ্রলোককে উপহার দিবার উপযুক্ত।

জহুরী। ঠিক। ইহার কারুকার্যে প্রগলভতা মোটেই নাই, অথচ সৌন্দর্য আছে। ইহা ভদ্রলোকের উপযুক্ত, সন্দেহ নাই, কিন্তু (ঈষৎ হাস্য) 'ভদ্রলোক' ক্রমেই বিরল হইতেছেন!

ডেলিশিয়া স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মণিকারের প্রমুখাৎ অনেক কথাই শুনিলেন। যে কথা তিনি বন্ধু-বান্ধবকে বলিতে দিতেন না,—মণিকার সেই কথা অতি নিষ্ঠুরভাবে শুনাইয়া তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিল!

এই চিত্র বঙ্গ-ললনার কেমন বোধ হয়? ইহা কি দর্পণের ন্যায় মজলুমার মূর্তি প্রতিবিম্বিত করে না? মজলুমার কণ্ঠ হইতে কণ্ঠহার মোচন করিয়া কোন বিলাসিনীকে না পরাইলে আর পুরুষপ্রবরের বাহাদুরী কি?

বাড়ী ফিরিয়া ডেলিশিয়া তাঁহার স্বামীর টেলিগ্রাম পাইলেন—"ডিনারের সময় ফিরিব না; আমার জন্য অপেক্ষা করিও না।"

ক্রোধে ক্ষোভে জর্জরিতা ডেলিশিয়া স্বীয় পাঠাগারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন; সঙ্গে কেবল স্পাটান ছিল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, —"স্পার্টান, মনে হয় আমি যেন বিষ খাইয়াছি—"

স্পার্টান সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল,—তাঁহার সেই নির্বাক দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "তুমি মানুষকে বিশ্বাস কর কেন? কুকুরজাতি পুরুষাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য!"

স্পার্টান ডেলিশিয়ার ভালবাসার যতখানি প্রতিদান দিতেছিল, লর্ড কারলীঅন্ ততটুকুও দিতে পারিলেন না। ডেলিশিয়া নানা চিন্তা করিতেছিলেন,— তাঁহার কঠোর শ্রমার্জ্জিত টাকাগুলি লা-মেরিনাকে অলঙ্কার পরাইতে ব্যয়িত হইবে, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত?

ডেলিশিয়ার টাকায় ও মজলুমার টাকায় প্রভেদ আছে। মজলুমার যে টাকা অত্যাচারী কর্তৃক অপব্যবহৃত হয়, সে টাকা মজলুমার স্ব-উপার্জ্জিত নহে,— তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত—অর্থাৎ পুরুষেরই উপার্জ্জিত। একজন পুরুষেরই সঞ্চিত ধন অপর পুরুষে ধ্বংস করে, ইহা বরং সহ্য হয়। কিন্তু ডেলিশিয়ার স্ব-উপার্জ্জিত টাকায় অপব্যবহার অসহ্য—এরূপ কাপুরুষতা ক্ষমাযোগ্য নহে। এ বিষয়ে মজলুমার তুলনায় ডেলিশিয়ার অবস্থা অধিক শোচনীয়। অথচ ইংরাজ সমাজ সভ্যতার দাবী করে! ইহাই কি সভ্যতা? ইহাই কি শিভালরী?

ডেলিশিয়া বলিলেন, "আমার একটি প্রতিমা স্বর্ণবেদিতে স্থাপিত ছিল,— অদ্য তাহা বেদিভ্রষ্ট হইয়াছে; মূর্ত্তিটা এখনও ভাঙ্গিয়া যায় নাই কেবল ভূমিতলে পড়িয়া আছে।"

মূর্ত্তির পতনের সহিত ডেলিশিয়ার প্রেমের মৃত্যু হইল। অদৃষ্টের কি নিদারুন পরিহাস,— ভাবিতে হৃদয় দ্বিধা হয়—কোথায় সে বিবাহের সম্বৎসরিক উৎসব, কোথায় এ প্রেমের সমাধি!

লর্ড কারলীঅন্ প্রায় ১টা রাত্রিতে বাড়ী ফিরিলেন। প্রায় সব কক্ষই অন্ধকার দেখিয়া ভারী বিরক্ত হইলেন। ডেলিশিয়ার অত্যধিক আদর-যত্নে তিনি 'আদুরে' হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ সামান্য অবহেলায় তাঁহার মানহানি হইল যে! প্রতি রাত্রি তাঁহার অপেক্ষায় আলো জ্বালিয়া রাখা হইত, অদ্য অন্ধকার কেন? তিনি নিজেই টেলিগ্রামে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে কথা ভুলিয়া গেলেন! না, তাহার ভাবটা এই—"আমি নিষেধ করিলেও ডেলিশিয়ার অপেক্ষা করা উচিত ছিল!"

তিনি ডেলিশিয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া সাড়াশব্দ না পাওয়ায়ও বিরক্ত হইলেন। এত শীঘ্র ডেলিশিয়া ঘুমাইয়াছেন? তিনি সর্ব্বদাই প্রভুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন,—অদ্য এ অনাদর কেন?

তিনি অধীর ভাবে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করায় স্পার্টান বিরক্তির সহিত উঠিয়া বলিল,—"গোঁ—!" সে কর্ত্রীর শয়নকক্ষের বহির্দ্বারে শয়ন করিয়াছিল।

তাহার বাকশক্তি থাকিলে বোধ হয় সে স্পষ্টই বলিত, "পাজি! তুমি এখানে কেন? কর্ত্তা ঘুমাইতেছেন, তাঁহাকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যাও তুমি জাহান্নামে!" স্পার্টানের সেই অব্যক্ত গোঙানিতে সত্যই কারলীঅন্ যেন অপমান বোধ করিলেন! তিনি কুকুরকে ধমক দিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

অদ্য তাঁহার মনটা খারাপ ছিল,--তিনি জুয়াখেলায় অনেক টাকা (ডেলিশিয়ার টাকা) হারিয়াছেন; লা-মেরিনাও ভাল ব্যবহার করে নাই।* এখন ডেলিশিয়ার দুটি মধুমাখা কথা শুনিলে প্রাণটা শীতল হইত; তা ডেলিশিয়ার যে গাঢ়নিদ্রা---!

পরদিন প্রভাতে ডেলিশিয়া অশ্বারোহণে বেড়াইয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া শুনিলেন, লর্ড তখনও নিদ্রিত। প্রাতঃকালীন মুক্ত বায়ুসেবনে তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল; এখন মনে হইল, বণ্ডস্ট্রীটে মণিকারের নিকট যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা দুঃস্বপ্নমাত্র! প্রিয়জনের বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় কথা সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না---লোকে যথাসাধ্য আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া সুখী থাকে! ডেলিশিয়া রমণী বই ত নহেন!

লর্ড সম্মুখে আসিবামাত্র ডেলিশিয়া সস্মিতবদনে অভিবাদন করিলেন, "উইল! তুমি এতক্ষণে উঠিলে? গতরাত্রে অনেক বিলম্বে আসিয়াছিলে, না?"

লর্ড কিন্তু এ কথায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে হইল,—অদ্য ডেলিশিয়ার কি যেন নাই! কেন? লর্ড সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, কেন? ডেলিশিয়া অতি সাবধানে দূরে দূরে থাকিতেছেন, কেন? ডেলিশিয়ার মৃদুহাস্য-টুকুতে যেন প্রাণ নাই! যদিও তাঁহার ব্যবহারের কোন ত্রুটি ধরা যাইতে পারে না, তবু ডেলিশিয়ার ভাবটা যেন প্রাণহীন বোধ হয়। * * *।

লর্ড বলিলেন, "ডেলিশিয়া! তোমার নূতন পুস্তকের কোন কোন অংশ বড়ই আপত্তিজনক হইয়াছে। গতরাত্রিতে একজন আমাকে এই কথা বলিতেছিল!" * * *

ডেলিশিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে? আমার রচনার অংশবিশেষ হয়ত তাঁহার কোন ক্ষতস্থান স্পর্শ করিয়াছে!"

* লা-মেরিনা মাতাল হইলে তাহার প্রণয়ীদিগকে বোতল ছুঁড়িয়া মারিয়া থাকে। অদ্য লর্ড কারলীঅন তাহার মাতলামির আস্বাদ পাইয়া আসিয়াছেন।

কারলীঅন্। তিনি ফিট্জ্ হাফ। তাঁহাকে তুমি জান। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার ভগিনীদিগকে কিছুতেই তোমার পুস্তক পাঠ করিতে দিবেন না। তাঁহার কথা আমার বড় বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল।

মিঃ কারলীঅন্ কথিত ফিট্জ্হাফ্ এর-কথাগুলি কি আমাদের সমাজের উক্তিরই প্রতিধ্বনি নহে? যে সকল পত্রিকায় উদারতাসূচক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, সে সব কাগজ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিতে পায় না। কেবল বঙ্গে নহে, সুদূর পশ্চিমদেশেরও কোন পত্রিকা (যাহা অবলাদের জন্য প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই মহিলা-রচিত) অনেক পাঠক তাঁহাদের আত্মীয়া মহিলাদের দৃষ্টিগোচর হইতে দেন না! ক্ষমতা পুরুষের হাতে কিনা! ডেলিশিয়া উত্তরে কি বলিতেছেন, তাহাও মনোযোগপূর্বক শুনুন,—

"তুমিত আমার পুস্তক পাঠ করিয়াছ; কাপ্তেন ফিট্জ্হাফ যে বিষয়ে আপত্তি করেন, সেরূপ কোন কথা কি তুমি সে পুস্তকে দেখিয়াছ?"

লর্ড। "এখন আমার ঠিক মনে হয় না।"

কাপ্তেন ফিট্জ্হাফ অনেক দিন সমাজের প্রকাশ্য নিন্দাপাত্র ছিলেন: তাঁহার কলঙ্কের কথা ডেলিশিয়া তুলিলেন! এবং তাঁহার ভগিনীরাও সাধ্বী নহেন। এই কাপ্তেন আবার ডেলিশিয়ার গ্রন্থের নিন্দা করেন! "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!"

* * *

ডেলিশিয়ার নূতন পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ ৮000 পাউণ্ডের অর্দ্ধেক লর্ডের নামে জমা করা হইয়াছে। ডেলিশিয়া যত টাকা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার অর্দ্ধেক স্বামীকে দিতেন।

সেইদিন অপরাহ্নে মিসেস্ ক্যাবেন্‌ডিশ্ ডেলিশিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়া তাঁহাকে নৈশ ভোজনের এবং ভোজনান্তে সঙ্গীতালয়ে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। ইনি ডেলিশিয়াকে বাল্যকাল হইতে জানেন এবং তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। ডেলিশিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। যেহেতু ব্যথিতহৃদয়ে নির্জনে দুশ্চিন্তার ভারবহন করা নিতান্ত অসহ্য। ভাবিলেন, এই ছলে কতক্ষণ স্নেহময় বন্ধুদের সংশ্রবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া থাকা যাইবে।

অদ্য শহরে বিজ্ঞাপনের ভারী ধুমধাম,—"প্রজাপতির জন্য—লা-মেরিনা (অভিনেত্রী)।" লা-মেরিনাকে দেখিবার জন্য হয়ত ডেলিশিয়ার একটু কৌতুহল ও

ছিল,—যাহার জন্য তাঁহার সুখ-গৃহ দগ্ধ হইতে চলিল,—যে তাঁহার ধ্বংসের কারণ, তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

যথা সময় ডেলিশিয়া মিস্টার ও মিসেস ক্যাবেনডিশ-এর সহিত সঙ্গীতালয়ে (অপেরা হাউসে) উপস্থিত হইলেন। "এম্পায়ার" অদ্য লোকে লোকারণ্য। লর্ড কার্‌লীঅন্‌ও আসিয়াছেন।

* * *

প্রজাপতির জন্ম হইল—এখন লা-মেরিনা প্রজাপতিরূপে নৃত্য করিতেছিল। ডেলিশিয়া দেখিলেন, লা-মেরিনার বক্ষস্থলে সেই কপোত—যাহা তিনি পূর্বদিন বণ্ডস্ট্রীটে মণিকারের দোকানে দেখিয়াছিলেন। সেই হীরক-কপোত,—কপোতের চঞ্চুপুটে সেই পদ্মরাগে লিখিত শ্লোক বিশিষ্ট সুবর্ণলিপি আর সন্দেহের স্থান কই? আর মণিকারের কথায় অবিশ্বাস করা যায় কিরূপে? সেই আলোকমালা পরিশোভিত-রঙ্গালয় সহসা ডেলিশিয়ার চক্ষে ঘোর অন্ধকার বোধ হইল। অকস্মাৎ দারুন শীতে যেন তাহার হস্তপদ অসাড় হইল।

ডেলিশিয়াকে বিবর্ণা দেখিয়া তাহার পার্শ্বোপবিষ্টা মিসেস ক্যাবেন্‌ডিশ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—

"একি ডেলিশিয়া! তোমার কি অসুখ হইয়াছে? (মিঃ ক্যাবেনডিশের প্রতি) রবার্ট! তুমি ইঁহাকে একটু বাতাসে লইয়া যাও,—ইনি যেন মূর্চ্ছা যাইবেন।"

মর্মাহতা ডেলিশিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমি এখনই ভাল হইব—চিন্তা নাই। বোধ হয় এ কামরার গরম আমার সহ্য হইতেছে না। আমার জন্য আপনারা ব্যস্ত হইবেন না।"

হায় ডেলিশিয়া! তুমি কক্ষের উষ্ণতায় বিচলিত হইতেছে, না অন্তর্দাহের উত্তাপে?

"এম্পায়ার' হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে ডেলিশিয়া লর্ড কার্‌লীঅন্‌কে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি ভৃত্য বর্সাকে দিয়া বলিলেন, "যেন লর্ড বাড়ী আসিবামাত্রই তাঁহাকে পত্রখানি দেওয়া হয়।"

অতঃপর শয়নকক্ষে গিয়া ডেলিশিয়া পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এমিলি, আমি সমুদ্রতীরে যাইব। জিনিসপত্র ঠিক কর যেন আমরা আগামী কল্য দশটার সময় ব্রোডস্টেয়ার্স যাইতে পারি। স্পার্টানকে সঙ্গে লইব।"

এমিলি তাহার চুলের বেণী খুলিতেছিল—তিনি (আন্তরিক ব্যাকুলতায় অস্থির ভাবে) হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমিলি সবিস্ময়ে বলিল, "ও লেডী, আপনার কি হইল?"

"না কিছু নয়" বলিয়া ডেলিশিয়া মৃদু হাসিতে চেষ্টা করিলেন। * * * "না এমিলি! ভয় নাই, আমি অসুস্থ নই—কেবল শ্রান্ত হইয়াছি। তুমি যাও, আমি একা থাকিলে ভাল হইব। দেখিও, তুমি সমুদ্র উপকূলে যাত্রার জন্য সময়ে প্রস্তুত হইবে।"

ডেলিশিয়া "এম্পায়ারে" যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা সহজে পরিপাক করা মজনুরও সাধ্যাতীত—যদিও ভারত রমণী ধৈর্যগুণে অতুলনীয়া। আর স্বাধীনা ডেলিশিয়ার পক্ষে ত ইহা বজ্রাঘাত তুল্য।

* * *

ডেলিশিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না।—নতজানু হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "ও প্রভো! এতদিনে বুঝিলাম আমি কি হারাইয়াছি। প্রেম আমাকে সর্বস্বান্ত করিয়া স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইল—চির অন্তর্হিত হইল! হায়! 'আছে' বলিতে রহিল কেবল যশোরূপ কণ্টক মুকুট।"

হায়! মজনুর ন্যায় ডেলিশিয়াও নির্জনে রোদন করিলেন! ইহা অশ্রু, না ভগ্ন হৃদয়ের শোণিত ধারা?

"আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম—তাহাকে উপাস্য মূর্তি মনে করিতাম। আমার পাপের (পৌত্তলিকতার) যথেষ্ট শাস্তি হইল।"

* * *

"আহা প্রেম!—প্রেম কি কোমল আহা! কঠোরস্পর্শে ইহা চিরতরে চূর্ণ হয়! উচ্চ আকাঙ্ক্ষা একবার নষ্ট হইলে আবার জাগিয়া উঠে—কিন্তু প্রেম—ইহা, 'এলো' ফুলের মত—শত বৎসরে একবার মুকুলিত হয়। এ জীবন লইয়া এখন আমি কি করি?"

কি আর করিবে?—মৃত্যু সাগরে বিসর্জন দাও। তুমি নিজের প্রেম-জ্যোতিতে তোমার লর্ডকে জ্যোতির্ময় দেখিতে। বার্ লীঅন্ বাস্তবিক জ্যোতির্ময় ছিলেন না। যে নিজে আলোকে থাকে, সে অন্ধকারের কিছু দেখিতে পায় না।

আহা! ডেলিশিয়া কি ভুল করিয়াছেন! তিনি স্বামীকে কেমন অনিন্দ্য দেবতা মনে করিতেন! তাঁহাকে কেমন অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিতেন! যে মোহিনী-মূর্তিটিকে ডেলিশিয়া অমূল্য ভক্তি-রত্ন খচিত হৃদয় সিংহাসনে

স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বর তাঁহারই নয়ন-সমক্ষে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ডেলিশিয়া! তুমি সে পুতুলের ভগ্ন খণ্ডগুলি কুড়াইয়া তুলিও না। * * *

পৌত্তলিকেরা যখন মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজা করে, তখন তাহাদের বিশ্বাস থাকে যে ইহাতে দেবতা অবতীর্ণা আছেন,—পূজা শেষে যখন মনে করে, দেবতা স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিমাটি বিসর্জন দেয়। কেবল মাটিজ্ঞানে কে পুতুল পূজা করে? ভক্ত যদি জানিতে পায় যে প্রতিমায় দেবতার পরিবর্তে ভূত পিশাচ আবির্ভূত ছিল, তবে? তবে আর কি পূজা করিতে পারে? কেবল তাহাই নহে, দেবতা ভ্রমে পিশাচের পূজা করা হইয়াছে, এ চিন্তা--এ লজ্জা অসহ্য!

ডেলিশিয়া কি ভয়ানক প্রতারিতা হইয়াছেন—প্রেমিক স্বামীজ্ঞানে বিশ্বাস-ঘাতক পিশাচের পূজা করিয়াছেন! কাঞ্চন ভ্রমে কর্দমের আদর করিয়াছেন! এতদিন ভ্রমবশতঃ ডেলিশিয়া শূন্যে যে সুখের অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, অদ্য সে প্রাসাদ চূর্ণ হইয়াছে, হতাশা ডেলিশিয়া সেই চূর্ণ প্রাসাদের আবর্জনা ও ধূলিরাশিতে বিলুণ্ঠিতা।

ভক্তিভাজন ভক্তির উপযুক্ত নহেন, নরাকারে পিশাচ—এই আবিষ্কারে ভক্ত-হৃদে যে বজ্রাঘাত হয়, তাহা ভুক্তভোগী হতাশ ভক্ত ভিন্ন আর কে বুঝিবে? সেরূপ প্রতারণার বৃশ্চিকদংশন যে সশরীরে ভোগ করিয়াছে, সেই জানে সে জ্বালা কেমন তীব্র! স্বপ্নরাজ্যে [illegible] [illegible] পুষ্পাবৃত পথে অন্ধভক্ত নিশ্চিন্ত মনে চলিতেছিল, সহসা কে তাহাকে জাগ্রত করিয়া বলিয়া দিল, ঐ কুসুমাবৃত স্থানে গভীর গর্ত আছে, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। হায়! সে জাগরণ কি কষ্টকর! জাগিবার পূর্বেই ভক্ত মরিল না কেন? হায় সত্য! এমন সত্য কে জানিতে চাহিয়াছিল? এ সত্য জানিবার পূর্বে মৃত্যু হইল না কেন? যাহাকে ষোল আনা বিশ্বাস করা গিয়াছিল, তিনি একবড়া বিশ্বাসেরও উপযুক্ত নহেন, নরদেবজ্ঞানে যাঁহার চরণে এতদিন ভক্তি কুসুমাঞ্জলি দান করা গিয়াছিল, তিনি নরপশু—এ আবিষ্কার ভক্তের অসহ্য!

হায়! এমন যে নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিতা হওয়া গিয়াছিল! ঈশ! কি যন্ত্রণা! ডেলিশিয়া তুমি যে দেবতার আরাধনা করিতে, তিনি সৈনিক বিভাগের "গার্ড্‌স্‌ অফিসার ও ভদ্রলোক" মাত্র--আর কিছুই নহেন!

অবিশ্বাসীকে পশু বলিলেও ঠিক হয় না। কোন্‌ পশু তেমন নীচ? সিংহ শার্দুল বলিলে 'বীর' বলিয়া প্রশংসা করা হয়; কুকুর বলিলে অতি কৃতজ্ঞ,

অতি বিশ্বস্ত বন্ধু বলা হয়; অশ্ব? সেও অপেক্ষাকৃত; ভাল; গর্দভ? সে বোকা কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির নয়; মহিষ, গণ্ডার, শূকর — না, মানুষের তুলনায় কোন জন্তুই নিকৃষ্ট নয়। কোন পশুই ভক্তহৃদয় পদ দলিত করে না,

অবশ্য অবলাহৃদয় দগ্ধ হইল বা চূর্ণ হইল, তাহাতে কর্তাদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না; প্রপীড়িতার নীরব যন্ত্রণার তপ্তদীর্ঘ নিঃশ্বাসে ক্ষমতাশালী পুরুষের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু বলি অকপট ভক্তির কি কিছু মূল্য নাই? সেই অমর-বাঞ্ছিত দুর্লভ ভক্তি হারাইয়া—বেদীভ্রষ্ট হইয়া প্রভুরা কি বড় সুখে থাকেন? মজলুমা অত্যাচারীর অন্য বস্ত্র বন্ধ করিতে পারে না, সত্য, অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারে না সত্য, কিন্তু অন্ধ ভক্তি ফিরাইয়া লইতে পারে ত? মানস দেবতাকে ঘৃণা না করিলেও দয়ার পাত্র জ্ঞান করিতে পারে ত? অবলার কৃপাপাত্র হওয়া কি সবলের পক্ষে বড় গৌরবের বিষয়?

ডেলিশিয়া অব্যক্ত যাতনায় পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যেন উচ্চারিত হইতেছিল,—

"বড় ভাল বাসিতাম, বড় ভক্তি করিতাম.
ভাল প্রতিদান নাথ! পাইলাম তার"

আবেগের উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রোরুদ্যমানা ডেলিশিয়া তন্দ্রাভিভূতা হইলেন।

মজলুমা! ডেলিশিয়ার বিলাপ কি আপনারই হৃদয়বিদারী বিলাপের প্রতিধ্বনি নয়? ডেলিশিয়ার দগ্ধ প্রাণের হা হুতাশ কি আপনারই হতাশ প্রাণের হা হুতাশের অনুরূপ নয়? প্রভেদ এই যে ডেলিশিয়ার স্বামীর অত্যাচারকে চুরি বলা যাইতে পারে, আর মজলুমার স্বামীর অত্যাচার ডাকাতি!

লর্ড কারনীঅন্‌ আইনের বিষয় অবগত ছিলেন—তিনি জানিতেন, আইন তাঁহারাই অনুকূলে!— নারীহন্তা ভদ্রলোকের জন্য কোন দণ্ড নাই।

ডেলিশিয়া যদি 'তালাক' প্রাপ্তির জন্য নালিশ করেন?—তিনি কি 'তালাক' পাইবেন? না কারণ তিনি লর্ডের নিরবতা প্রমাণ করিতে পারেন না; অমন একটা কোন এক ডজন মেরিনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা আইনের চক্ষে অত্যাচার নয়। সহধর্মিনীর অর্জিত টাকা মেরিনার জন্য অপব্যয় করাও আইনমতে দোষ নয়! তালাক

লইতে হইলে ডেলিশিয়াকে প্রমাণিত করিতে হইবে, স্বামী বিশ্বাসঘাতক এবং দুই অধিকাল হইতে তিনি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন ; ডেলিশিয়া ইহা প্রমাণিত করিতে পারিবেন না। "ডেলিশিয়া আমা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না" এইকথা (আইনের এইধারা) স্মরণ করিয়া কারলীঅন্ অতিব সন্তুষ্ট হইলেন। হায়রে আইন! পুরুষ-রচিত আইন—পুরুষের সুবিধার নিমিত্তই ইহার সৃষ্টি! অবলা হৃদয় দলন করা—তাহার জীবন মাটি করা—তাহাকে জীবন্তে হত্যা করা আইনানুসারে অত্যাচার নয়।

*　　　*　　　*

ব্রোডস্টেয়ার্সে আসিয়া ডেলিশিয়াও সামাজিক বিধিব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। কাহাকে শারীরিক কষ্ট দিলে, খুন জখম করিলে, অপরাধীর শাস্তি আছে; কিন্তু রমণী-হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, শতধা কবিলে রমণী-প্রেমের জীবন্ত সমাধি করিলে, কোন দণ্ড নাই!

"তাই বলি," ডেলিশিয়া ভাবিলেন, "তিনি যদি আমাকে প্রহার করেন কিম্বা আমাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়েন—তবেই আমি তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারি,—নচেৎ না!"

অপরাহ্নে, সমুদ্র তীরে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে ডেলিশিয়া তাঁহার ভগ্ন পুতুলের চিন্তা করিতেছিলেন। প্রতিমা বেদীভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু বেদীতে তাহার স্থিতিচিহ্ন এখনও বর্তমান!—ফুল ঝরিয়া যায় কিন্তু বৃন্তস্থলে তাহার অবস্থিতি চিহ্ন বিদ্যমান থাকে! সব যায়—কেবল স্মৃতি-যন্ত্রণা থাকে। অনিবার অশ্রুস্রোত বাধা মানিতেছিল না—ডেলিশিয়ার নয়নদ্বয় বাষ্পচ্ছন্ন হওয়ায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না,—গগন সৈকত, সাগরের বীচিমালা—এসব কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এমন সময় স্পার্টান সানন্দে ডাকিয়া উঠিল এবং কে একজন বলিল—

"লর্ড কারলীঅন্, আপনার সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলিতে পারি কি?"

ডেলিশিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মিঃ পল্‌ভাল্‌ডিন্।

যেদিন ডেলিশিয়া ব্রোডস্টেয়ার্সে আইসেন, তাহার পূর্বদিন "অনেস্টি" নামক সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি ডেলিশিয়ার অতি জগন্য মিথ্যা নিন্দা লিখিয়াছিল। পল্ ভাল্‌ডিন্ সে লেখককে যথেষ্ট কশাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি ডেলিশিয়াকে এই শুভসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছেন।

অন্যমনস্ক থাকা বশতঃ ডেলিশিয়া প্রথমে তাহা বুঝিতেই পারিতেছিলেন না। পরে সহাস্যে বলিলেন, "সংবাদপত্রের মতে যিনি একাধারে দ্বিতীয় শেক্সপিয়ার ও মিল্টন,—ওহো! সেই ব্যক্তিকে আপনি প্রহার করিয়াছেন!"

* * *

ভাল্‌ডিস্‌ বলিলেন, "লেডী কারলীঅন আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখায়।"

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, "আপনার অনুমান ঠিক। আমি বড়ই বিষন্ন—আমি আমার স্বামীর প্রেম হারাইয়াছি।"

"তবে আপনি সবই শুনিয়াছেন?"

"কি! কেবল আমি ব্যতীত সহরের সকলেই একথা জানে না কি?" * *

"বলুন ত ইহা কি সম্ভব যে লর্ড কার্‌লীঅন এমনই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন যে, তিনি প্রকাশ্যে লা-মেরিনার সহিত দেখা করিতে সঙ্কুচিত নহেন; এইরূপে তাঁহার পত্নীকে সমাজের বিদ্রূপ ও দয়ার পাত্রী করিয়াছেন?"

এ দেশে ত স্বামীর অধঃপতনের জন্য স্ত্রীকে লজ্জিত হইতে দেখা যায় না বরং স্ত্রীর সামান্য পদস্খলনে স্বামীর লজ্জা হয়। ইংলণ্ডে স্বামীর পতনে স্ত্রীও অপমান বোধ করেন। এ দেশে ও সেদেশে এ এক প্রভেদ।

ভালডিস্‌ উত্তর করিলেন, "লেডী কার্‌লীঅন্‌, আপনার বন্ধুরা আপনাকে সতর্ক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যখন আমি ইঙ্গিতে বলিয়াছিলাম যে, আপনার বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত, সেদিন আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য সেরূপ করা আপনার অন্যায় হইয়াছিল, আমি এরূপ বলি না। আপনি পতিপ্রাণা সতীর উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। এখন আপনি সবই জানিতে পারিয়াছেন——"

"এখন আমি জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু জানিয়া ফল কি? আমি কি করিতে পারি? স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে অবলার কোন উপায় নাই। আমি প্রহার চিহ্ন দেখাইতে পারি না,—তাঁহার কোন দুর্ব্যবহার প্রমাণিত করিতে পারি না! আইন বলিবে, "ফিরে যাও বোকা মেয়ে! তোমার স্বামী যাহাই করুন না কেন, তিনি যদি তোমার সহিত শিষ্ট ব্যবহার করেন, তবে তুমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পার না! ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এ উক্তি ইংরাজ ললনার! - কি বুক ভাঙ্গা কথা! যে অনলে মজলুমা দগ্ধ হন, সেই অনল ডেলিশিয়াকেও দগ্ধ করে!

ডেলিশিয়া আবেগ ভরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'পল ভান্‌ডিস! আপনি থিয়েটারে আবেগের অভিনয় করিতে পারেন, * দুঃখের স্বরূপ অনুকরণ করিতে পারেন; কিন্তু আপনি কোন কালে অবলার ভগ্ন হৃদয়ের অসহ্য মূক যন্ত্রণার ভয়াবহ গভীরতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন কি? না আমার বিশ্বাস, আপনার অতি সুন্দর কল্পনা শক্তিও ততদূর পৌঁছিতে পারে না। আপনি জানেন, আমি কেন সহসা এখানে—এই সাগর তীরে আসিয়াছি?—আমি জানি, আমার যন্ত্রণা দুর্বহ হইলে এই শান্ত শিষ্ট সমুদ্র আমাকে তাহার অতল বক্ষে স্থান দিতে আপত্তি করিবে না। কিন্তু না! আমি ডুবিব না! কিন্তু আপনি জানেন? আপনি অনুমান করিতে পারেন, কেন আমি অদ্য আমার স্বামীর সহিত দেখা না করিবার অভিপ্রায়ে এখানে চলিয়া আসিয়াছি? * * আমার আশঙ্কা ছিল, দেখা হইলে আমি তাঁহাকে হত্যা করিতাম!'

* * *

ডেলিশিয়া নিভৃতে চিন্তা করিতেছেন, এখন কি করা কর্তব্য? পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া নিত্য নূতন জ্ঞানার্জন করিবেন; অথবা অবিশ্রান্ত ভ্রমণে যদি শরীর অবসন্ন হয়, তবে স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডস্থিত নির্জন প্রদেশে অথবা আয়র্লণ্ডের মনোরম উপত্যকায় একটি বাড়ীতে থাকিয়া সাহিত্য-চর্চায় জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিবেন।

তাহাতে সমাজ তোমমন্দ বলিবে যে? 'লেডী কার্‌লীঅনের নির্জনবাসের কারণ কি? হয় ত তাঁর কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে!'

তাই ত! যতদিন আত্মীয় স্বজনের অত্যাচার সহ্য করিয়া তাহাদের পদলেহন করিতে পার, ততদিন তুমি ভাল। যদি তুমি আত্ম-শক্তির প্রকাশ কর, আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া উকিল মোক্তারের সহিত পরামর্শ কর, স্বাধীনতার ভাব দেখাও, আত্মীয়দের সহিত বনে না বলিয়া স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাক, —তবে কি আর রক্ষা? তবে সমাজের মতে তুমি অধঃপাতে গিয়াছ! ডেলিশিয়া ঠিকই বলিয়াছেন, "এ জীবন লইয়া এখন আমি কি করি?" বিধবা হইলে সমাজে লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পূর্বে ভারত ললনা মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া আত্মঘাতিনী হইত। ডেলিশিয়াকেও

* মিঃ পলভান্‌ডিস থিয়েটারের একজন বিখ্যাত অভিনেতা।

জীবনভার লইয়া বেশীদিন ভাবিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই মৃত্যুর শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

যে দিন "এস্পানারে" লা-মেরিনার বক্ষে কার্‌লীঅন্‌ প্রদত্ত প্রেম-চিহ্ন দেখিয়া আসিলেন, সেই দিনই ডেলিশিয়ার প্রকৃত মৃত্যু হয়,—অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু ও প্রেমের মৃত্যু একই কথা। জীবন্মৃতা ডেলিশিয়া তবু যে দেহভার বহন করিতেছেন, তাহা কেবল জীবনের এক গুরুতর কর্তব্যপালন বাকী আছে বলিয়া।

ডেলিশিয়া ১৫ দিন পরে গ্রোভডেস্টেয়ার্স হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভৃত্য রবসনের প্রমুখাৎ স্বামীর অনেক কলঙ্ক কথাই শুনিলেন। ক্রোধে লজ্জায় ডেলিশিয়ার দেহলতা কম্পিত হইল--তাঁহার নিজের ভৃত্যও তাঁহাকে দয়ার পাত্রী ভাবিল। রবসনের কথার ভাবে করুণা ছিল! সমবেদনা ছিল !!

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য ডেলিশিয়া শয়নকক্ষে গেলেন। দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় উপাধানের প্রতি চাহিয়া ডেলিশিয়া ভাবিলেন, "আমার এই উপাধানে লা-মেরিনার মস্তক ন্যস্ত হইয়াছিল ?" শয্যার নিকট যাইতে না যাইতেন তাঁহার মনে হইল যেন একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল সেই যন্ত্রণায় ডেলিশিয়া মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন ! তাঁহার পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া এমিলি দৌড়িয়া আসিল। * * *

ডেলিশিয়া চক্ষু মেলিলে, দেখিলেন, এমিলি তাঁহার সুশ্রূষায় ব্যস্ত। * *

গৃহে লর্ডের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই ডেলিশিয়াকে সন্ধ্যায় লেডী ডেক্সটারের নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। তথায় স্বকর্ণে স্বামীর মুখে তাঁহার নিন্দা শুনিতে পাইলেন। অবশ্য ডেলিশিয়াকে না দেখিয়াই তিনি নিন্দা করিতে-ছিলেন! তাঁহার কথা শেষ হইলে ডেলিশিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কঠোর দৃষ্টিতে স্বামীরদিকে চাহিলেন ! মুহূর্ত পরে তিনি নীরবে সরিয়া গেলেন। লেডী ব্রান্‌স্মুইথ (ইঁহারই সঙ্গে কার্‌লীঅন্‌ আলাপ করিতেছিলেন) সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কে?"

কারলীঅন্‌ কিঞ্চিৎ ভীতভাবে বলিলেন, "উনি ডেলিশিয়া—আমার স্ত্রী। লেডী ব্রান্‌স্মুইথ বলিয়া উঠিলেন, "তিনি! সেই সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা। আমার ধারণা ছিল না যে, তিনি এমন সুন্দরী। তিনি সে সব কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন।"

* * *

সে রাত্রি লর্ড কারলীঅন্‌ গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র রবসন তাঁহাকে জানাইল যে, কর্ত্রী তাঁহার জন্য পাঠাগারে অপেক্ষা করিতেছেন।

ডেলিশিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লর্ডের যেন হৃতকম্প হইল। দ্বারের পর্দার নিকট দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করিয়া তিনি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। (যেন রানীর সম্মুখে খুনী আসামী—বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে।)

লর্ড আরম্ভ করিলেন, "ডেলিশিয়া, আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি—"

ক্রোধে ডেলিশিয়ার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল, তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "থাম, আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন নাই! এখন আমি তোমার নিজমূর্তি দেখিয়াছি—তোমার সে মুখস খসিয়া পড়িয়াছে; মুখসটা আর তুলিয়া লওয়ার চেষ্টা বৃথা!"

প্রভু স্তম্ভিত হইলেন, একটু হাসিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন।

ডেলিশিয়া তাঁহার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আজি রাত্রে তুমি আমার নিন্দা করিয়াছ। * *"

"আমি তোমাকে বলি নাই," লর্ড আত্মরক্ষার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, "আমি বলিয়াছি, প্রায় সকল বিদুষী নারীই রমণীসুলভ কোমলভাব হারাইয়া থাকে।"

"ক্ষমা কর" ডেলিশিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি বলিয়াছ, স্ত্রীলোকেরা যাঁহারা পুস্তক লিখেন, যেমন আমার স্ত্রী"; ঠিক এই কথাগুলি বলিয়াছ। * * যৎকালে আমি পরম আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে তোমার উপাসনা করিতেছিলাম, তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছিলে। তুমি এইরূপে আমাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিলে!"

* * *

কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর ডেলিশিয়া বলিলেন, "আমার বক্তব্য এই — এখন হইতে আমরা স্বতন্ত্র থাকিব। কারণ * * আমি অভিনেত্রীদের অলঙ্কারের ব্যয়ভার বহন করিতে চাই না। আর তোমার বদান্যতা—অর্থাৎ লেডি ব্রান্‌স্‌ইথের 'বিল' শোধ করার ইচ্ছাও আমি অনুমোদন করি না।"

* * *

শেষে কার্‌লীঅন বলিলেন, "ডেলিশিয়া! তুমি কি প্রলাপ বকিতেছ। তুমি বাস্তবিক স্বতন্ত্রবাসের ইচ্ছা কর না? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কি করিবে?"

"আমি জীবিত থাকিব, অথবা মরিব, সেজন্য ভাবি না।"

লর্ড ভাবিলেন, এখন বোধ হয় ডেলিশিয়ার রাগ কম হইয়াছে। তাই তাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইলেন।

ডেলিশিয়া ক্ষিপ্র হস্তে পিস্তল তুলিয়া বলিলেন, "সাবধান! আমার নিকট আসিও না —"

লর্ড একটু হাসিলেন, "তুমি পাগল হইয়াছ ডেলিশিয়া? পিস্তলটা রাখ; বোধ হয় ওটা ভরা নয়। তবু তোমার হাতে পিস্তল ভাল দেখায় না।"

"না, ভাল ত দেখায় না; কিন্তু পিস্তলটা ভরা! তোমার আসিবার পূর্বেই আমি এটা ভরিয়া রাখিয়াছি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি আর একপদ অগ্রসর হও---আমি তোমাকে গুলী করিব!"

ডেলিশিয়া শেষ বিদায়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "বিদায় উইল! আমি তোমাকে বড় ভালবাসিতাম। কিছুদিন পূর্বে তুমি আমার হৃদয় সর্বস্ব ছিলে;---সেই প্রেম, যাহা অকস্মাৎ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে—মরিয়া গিয়াছে, তাহারই খাতিরে এখন আমরা শান্তির সহিত বিদায় লই।"

কিন্তু লর্ড ডেলিশিয়ার হস্তস্পর্শ করিলেন না; তিনি এত শীঘ্র বিদায় লইবেন না। তিনি নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন!

ডেলিশিয়া আর কিছু না বলিয়া লিখিতে বসিলেন।

'তুমি শুনিতেছ?' লর্ড পুনরায় বলিলেন, "আমি বিদায় গ্রহণ করিব না"

ডেলিশিয়া নিরুত্তর। তিনি নিজে স্থির ছিলেন, কেবল তাঁহার লেখনী নড়িতেছিল।

লর্ড কারলীঅন্ বলিলেন, "গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীলোকের বেশী স্বাধীনতায় বাধা দিয়া ভালই করেন। যদি তোমাদের ইচ্ছামত সব অধিকার তোমরা পাইতে' তবে তোমাদের অত্যাচারের সীমা থাকিত না। রমণীর উচিত নম্র শান্ত হওয়া; যদি সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা ধনবতী হয়, তবে সে টাকা তাহাদের স্বামীদের উপকারের জন্য ব্যয় করা উচিত। ইহাই সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিক নিয়ম,—রমণী পুরুষের সেবিকারূপে সৃষ্ট হইয়াছে—যখন সে তাহা (দাসী) হইতে চায় না, তখনই গোলমাল হয়।"

বাহবা! যদি ইংলণ্ড-নিবাসীর এই উক্তি, তবে আর আমরা গোটাকতক ইংলণ্ড প্রত্যাগত লোকের সঙ্কীর্ণচিত্ততা দেখিয়া আশ্চর্য্য হই কেন? কেন? যাঁহারা বিলাতি বিদ্যালাভের নিমিত্ত সে দেশে যান, তাঁহারা দুই চারিটা "কারলীঅন্" এর সংস্রবে পড়িয়া বিষাক্ত হন, ইহা অসম্ভব নহে। তাই ত গবর্নমেণ্ট কেন স্ত্রীলোকগুলিকে কামানে উড়াইয়া দেন না? অতগুলি গোলাগুলী

কামান বন্দুক আছে কিসের জন্য? অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমুদয় অবলাকে একটা বারুদের ঘরে বন্ধ করিয়া বারুদে আগুন দিলে সব আপদ চুকিয়া যায়। তাহা হইলে আর "ডেলিশিয়া ট্রাজেডী" বা "মজলুমা-বধ-কাহিনী" লিখিবার জন্য কেহ জীবিত থাকিবে না !! *

সুখের বিষয়, ইংলণ্ডে "কাব্‌লীঅন্"এর সংখ্যা (দুই এক শতের) অধিক নহে। যেখানে কাবলীঅন হেন নীচাশয় কাপুরুষ আছেন, সেখানে মিঃ ক্যাভেনডিশ ও পলভার্ণডিসের ন্যায় মহানুভব লোকও আছেন। মোটের উপর সহৃদয় পুরুষই বেশী। এবং আমাদের দেশেও (অধিক না হইলেও) অল্পসংখ্যক মহাশয় পুরুষ আছেন। বিশাল কণ্টক-অরণ্যে যে মুষ্টিমেয় ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য।"

ডেলিশিয়া তবু কিছু না বলিয়া পূর্ববৎ লিখিতে থাকিলেন।

অবশেষে লর্ড বলিলেন "আমি এখন শয়ন করিতে যাই; শুভরাত্রি, ডেলিশিয়া !"

এবার ডেলিশিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুভরাত্রি"

এই তাহাদের শেষ বিদায়! এই শেষ দেখা! কাব্‌লীঅন চলিয়া যাইবামাত্র ডেলিশিয়া উঠিয়া কপাট বন্ধ করিলেন।

যতক্ষণ জ্বর থাকে, ততক্ষণ জ্বরের উত্তেজনায় রোগী একরূপ সবল থাকে; যেদিন জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যায়, সেদিন রোগী হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে।

যতক্ষণ লর্ড কাব্‌লীঅন্ উপস্থিত ছিলেন, ক্রোধ খেদের উত্তেজনা ছিল, ততক্ষণ ডেলিশিয়ার হৃদয় সবল ছিল; কাব্‌লীঅন চলিয়া গেলে পর ডেলিশিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন—ক্রমে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল,—তিনি মূর্ছিত হইলেন।

পরদিন ডেলিশিয়ার উত্থানশক্তি ছিল না, তিনি ভগ্নহৃদয়, ভগ্নশরীর লইয়া সমস্তদিন শয়নকক্ষেই থাকিলেন। সেইদিন প্রাতে কাব্‌লীঅন

* "Murder of Delicia"র ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—Edward Fitzgerald wrote of one of England's greatest poets thus:—Mrs. Barrett Browning is dead. Thank Gcd we shall have no more "Aurora Leighs!" It is the usual manner assumed by men who have neither the brain nor the feeling to write an 'Aurora Leigh' themselves."

প্যারিস যাত্রা করিলেন। তিনি যাত্রাকালে ডেলিশিয়াকে ছোট একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন ডাকে একরাশি পত্র আসিয়াছিল, সে পত্রগুলি পাঠকালে ডেলিশিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

"তাহারা (পত্র-লেখকেরা) জানে না যে আমি মরিয়াছি।"

ডেলিশিয়া-চরিত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই,—সমাজ এবং আইন তাহার প্রতিকূলে থাকা সত্বেও তিনি বিশ্বাসঘাতক স্বামীর কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন। ইহাতে তাঁহার নৈতিক সাহসের প্রশংসা করিতে হয়। তাহার পবিত্র হৃদয় কত উচ্চ!—তাঁহার মনোভাব কি মহান—যে ব্যক্তি লা-মেরিনাকে ভালবাসেন, তাঁহার ভালবাসায় ডেলিশিয়ার প্রয়োজন নাই! তিনি স্বামীকে একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"তোমার যে হস্ত লা-মেরিনাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে কলুষিত হস্ত আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

কেহ বলিতে পারেন যে, ডেলিশিয়ার অর্থবল ছিল বলিয়া তিনি স্বামী হইতে পৃথক হইতে পারিলেন; স্বামীর অনুশ্রিতা হইলে ওরূপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমরা তেজস্বিনী ডেলিশিয়ার যে আত্ম-সম্মানজ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য হইলেও পৃথক হইতেন। তিনি লর্ড কারলিজন্-এর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইতেন; কিম্বা কাহারও বাড়ীতে গবর্নেস হইতেন অথবা কোন আতুরাশ্রমে অতি সামান্য বেতনে সেবিকা হইতেন। স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, জীবনের সে কয়টা দিন যাপনের জন্য ডেলিশিয়া উপার্জনের কোন পথ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া লইতেন। ইচ্ছা অতি প্রবল থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না।

ডেলিশিয়ার এই ভাব—এই মৃত্যু সমাজের পক্ষে অতীব কল্যাণকর। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে কতিপয় মজলুমাকে ডেলিশিয়ার ন্যায় সমর-শায়িনী হইতে হইবে। তা সাধুদের আত্মোৎসর্গ বিনে এ-জগতে কখন কোন ভালকাজটি হইয়াছে?*

ঐরূপ উচ্চভাব ও সুমার্জিত রুচি লাভ করিতে হইলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। কবে মজলুমা ডেলিশিয়ার মত বীরনারী হইতে পারিবেন?

মৃত্যুর পূর্বে ডেলিশিয়া উইল করিলেন, যেন তাঁহার স্বামী আজীবন মাসিক তিন শত টাকা (বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ড) বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

* উপক্রমণিকায় ঐভাবের কথা আছে।

অবশিষ্ট ছয় লক্ষ (৬০০০০০'০০) টাকা দীন-দুঃখীদের দান করা হইল। এবং ভবিষ্যতে তাহার পুস্তক বিক্রয়ের টাকাও অনাথ আতুরদিগকে দান করা হইবে।

লর্ড কার্লীঅন্ প্যারিসে থাকিতেই ডেলিশিয়ার মৃত্যু হইল। তিনি হৃদরোগে (হৃৎপিণ্ড সহসা স্তম্ভিত হওয়ায়) মারা গিয়াছেন।

ডেলিশিয়া-হত্যা কাহিনীর এই শেষ কি দারুণ নৈরাশ্য! হতাশ-পীড়নেই ডেলিশিয়ার জীবন-রবি মধ্যাহ্নে অস্ত গেল,—পূর্ণ বিকাশের সময় কুসুম শুকাইয়া গেল!

এইরূপ কত মজলুমা ভগ্নহৃদয়ে আমাদের দেশে অন্তঃপুরের নিভৃত কোণে নিহতা হন, কে তাহার সন্ধান লয়? সে তাপদগ্ধা অভাগিনীদের উদয় বিলয় কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে না!

দাম্পত্য-জীবনের অবস্থা যাহাই হউক, ডেলিশিয়া সামাজিক জীবনেও সুখী ছিলেন না। ডেলিশিয়া সমাজে যথেষ্ট আদরপ্রাপ্তা হন নাই কেন? যেহেতু তিনি নিজে ভাল লোক ছিলেন; যেহেতু তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা ছিলেন; সাহিত্যক্ষেত্রে যশোবিজয়ে লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। স্ত্রীলোকের এতটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা?—ইহা সমাজের অসহ্য! শেষে সান্ত্বনা লাভের জন্য সমাজ বলিত, 'অধিকাংশ রচনা কার্লীঅন্ লিখেন।' লেখার সুখ্যাতিটা নিতান্ত না দিলে নয়—তবে তাহা ডেলিশিয়াকে না দিয়া কারলিঅন্কে দেওয়া যাউক!

ডেলিশিয়ার জন্য অকপট হৃদয়ে শোক করিল কে?—স্পার্টান। কুকুর স্পার্টানের বাক্শক্তি থাকিলে সে বলিত,—"যদি সত্য, বিশ্বস্ততা এবং বিশুদ্ধ ভক্তি সদ্গুণ হয়, তবে কুকুর পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ততা ও কপটাচারকে সদ্গুণ বলা যায়, তবে অবশ্য পুরুষ জাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।"

একথার উত্তরে আমাদের বঙ্গীয় ভ্রাতৃসমাজ কি বলিতে চান? এ উক্তি একজন ইংরাজ মহিলার। তাঁহাকে কিছু বলা এ-দেশী কর্তাদের ক্ষমতাতীত! কিছু বলিলেও ইঁহাদের কণ্ঠস্বর সাত সমুদ্র পার হইয়া লেখিকার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিবে না। তবে আর কি করিবেন ভ্রাতৃগণ! নীরবে রোদন করুন!

পাঠিকা! এ-দীর্ঘ উপন্যাস পাঠে আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন, জানি, কিন্তু তবু আপনাকে "ডেলিশিয়া-হত্যা"র শেষ উক্তিটি না শুনাইয়া ছুটি দিতে পারি না! শেষ কথার ভাবার্থ এই—

পৃথিবীর রাজা মহারাজার নিকট ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আশা নাই। তবে একদিন স্বয়ং সর্বশক্তিমান বিশ্বপতি সুবিচার করিবেন—তখন তিনি সতী সাধ্বী অবলার প্রতিবিন্দু অশ্রুর জন্য, রমণীর নীরব যন্ত্রণার প্রত্যেকটি দীর্ঘ নিশ্বাসের জন্য অত্যাচারীকে শাস্তি দিবেন। আমাদের এই একমাত্র ভরসা, এই আশায় বিশ্বাস করিয়া আমরা ধৈর্য ধারণ করিব—নতুবা (যদি ঐ বিচারের আশা না থাকে তবে) মনে করিতে হয়, ঈশ্বর নিষ্ঠুর—এবং জগৎ তাঁহার নরক!*

কথা কয়টি বড় নৈরাশ্যে বুক ভাঙ্গিয়া উচ্চারিত হইয়াছে! আহা!

* শেষ উক্তিটি এমনই মর্মস্পর্শী যে, তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—
"Not a tear, not a heart-throb of one pure woman wronged shall escape the eyes of Eternal Justice, or fail to bring punishment upon the wrong-doer! This we may believe—this we must believe,—else God Himself would be a demon and the world His Hell!"

জ্ঞানফল *

[রূপকথা]

আদম ও হাভা পূর্বে ইডেন-উদ্যানে থাকিতেন। তাঁহারা প্রভু পরমেশ্বরের অতিথিরূপে পরম সুখে স্বর্গে ছিলেন; তাঁহাদের কোন অভাব ছিল না। পরমেশ্বর আদম-দম্পতিকে কেবল একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা হাভা স্বর্গোদ্যানের সুকুমার জাফরান মণ্ডিত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিষিদ্ধ তরুর ছায়াতলে আসিয়া পড়িলেন। তিনি মুগ্ধনেত্রে কাননের সৌন্দর্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। শাখাস্থিত বিহগের মধুর কাকলি শুনিতে শুনিতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সেই বৃক্ষের কয়েকটি ফল চয়ন করতঃ একটি ভক্ষণ করিলেন।

ফল ভক্ষণ করিবামাত্র হাভার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা যদিও রাজ-অতিথিরূপে রাজভোগে আছেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাঁহার বর-অঙ্গে একখানি চীর পর্যন্ত নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ আজানুলম্বিত কেশদামে সর্বাঙ্গ আবৃত করিলেন। কেমন এক প্রকার অভিনব মর্মবেদনায় তাঁহার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইল।

এই সময় তথায় আদম গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাভা তাঁহাকে স্বীয় হস্তস্থিত ফল খাইতে অনুরোধ করিলেন। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণে আদমেরও জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি নিজের দৈন্যদশা হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিতে লাগিলেন।—এই কি স্বর্গ? প্রেমহীন, কর্মহীন অলস জীবন,—ইহাই স্বর্গসুখ? আরও বুঝিলেন, তিনি রাজবন্দী, এই ইডেন-কাননের সীমানার বাহিরে পদার্পণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই! তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের ইষ্টক এবং (সুরকি মসলার স্থলে) প্রবাল ও মুক্তাচূর্ণ নির্মিত সুরম্য প্রাসাদে থাকেন, অথচ "আপন" বলিতে এক কড়ার জিনিস তাঁহার নাই,—এমন কি পরিধানের এক খণ্ড বস্ত্র পর্যন্ত নাই! এ কেমন রাজভোগ? এখন অজ্ঞতারূপ স্বর্গ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—জ্ঞানের জাগ্রত অবস্থা স্পষ্ট উপলব্ধ

---

* এস্থলে কোরান-শরিফ বা বাইবেলের বর্ণিত ঘটনার অনুসরণ করা হয় নাই।

হইতে লাগিল। সুতরাং মোহ ও শান্তির স্থলে চেতনা ও অশান্তি দেখা দিল। তিনি হাভাকে বলিলেন, "এতদিন আমরা কি মোহে ভুলিয়াছিলাম! আমাদের এই অবস্থায় কত সুখী ছিলাম!"

হাভা উত্তর দিলেন, "তাই ত! এই যে সৌন্দর্যের ললামভূমি,—সুগন্ধি জাফরান কুসুমশয্যা যাহাতে দূর্বারূপে বিরাজমান; এই যে হীরক-প্রসূন-ভূষিতা ললিতা বল্লরী; এই যে মকরত-কিশলয়-শোভিত তরুরাজি-শীর্ষে পদ্মরাগ ফুল,—ইহারা নয়ন রঞ্জন করে বটে কিন্তু ইহাতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে কই? 'কওসর' জলাশয়ের মকরন্দ প্রতিম অমিয় বারি তৃষ্ণা নাশ করে বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের পিপাসা মিটে কই? এ সব স্বর্গীয় ঐশ্বর্যে আমাদের কি প্রয়োজন?" কোন এক অজ্ঞাত পরিবর্তন লাভের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইলেন।

পরমেশ্বর উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়া দেখিলেন, আদম-দম্পতি তাঁহাকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে ডাকিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষোভে, অভিমানে, লজ্জায় বিভুসমীপে যাইতে পারিলেন না। সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর সকলই অবগত ছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোরা স্বাধীনতা চাহিস? যা তবে দূর হ! পৃথিবীতে গিয়া দেখ স্বাধীনতায় কত সুখ!"

আদম-দম্পতি সেই দিন পতিত হইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। এখানে তাঁহারা অভাব-স্বাচ্ছন্দ্য, শোক-হর্ষ-রোগ, আরোগ্য, দুঃখ-সুখ প্রভৃতি বিবিধ আলো-আঁধারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত দাম্পত্য-জীবন লাভ করিলেন। হাভা কন্যাদিগকে অধিক ভালবাসিতেন; তিনি আশীর্বাদ করিলেন, কন্যাকুল দীর্ঘায়ু হইবে, সুখে-শান্তিতে গৃহে অবস্থিতি করিবে; প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিবে।

আদম আবার পুত্রদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাদৃশ প্রবল না থাকায় তিনি তনয়দিগকে বিশেষ কোন বর দান করেন নাই।

জননী হাভার আশীর্বাদ মতে তাঁহার দুহিতানিচয় জন্মে এক গুণ, বাড়ে দ্বিগুণ, দীর্ঘায়ু হয় চতুর্গুণ। আর আদমের প্রিয় তনয় জন্মে এক গুণ, অতি সোহাগে প্রতিপালিত হয় বলিয়া রোগ ভোগ করে দ্বিগুণ, মরে চতুর্গুণ। স্বাভাবিক মৃত্যু না হইলে তাহারা যুদ্ধচ্ছলে

পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে! একদল কারাগারে পচে, অবশিষ্ট নানা ক্লেশ ভোগ করে!

স্বর্গচ্যুতা হাভা তাহার ভুক্তাবশিষ্ট যে জ্ঞানফলটি পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলেন, তাহার বীজে ধরণীর পূর্বাংশে এক বিশাল মহীরুহ জন্মিল। সময়ে শাখীটি ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু সে দেশের লোকে তৎকালে ইহার যথেষ্ট আদর করিতে জানিত না। তরুতলে রাশি রাশি সুপক্ব ফল পড়িয়া থাকিত, শৃগাল ও কাক তদ্দ্বারা উদরপূর্তি করিত। অবশিষ্ট ফল নিকটবর্তী শান্তানদীর বেলায় পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল, কতক গড়াইয়া নদীগর্ভে পড়িল।

জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত নদীজল যথাকালে বিরাট সাগরে গিয়া মিশিতেছিল। বিরাট সাগরের পরপারে পরিস্থান।

পরিস্থানের নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য ব্যতীত বড়াই করিবার উপযুক্ত আর বিশেষ কিছু তাহাদের ছিল না। সে দেশে কেবল মাকালের বন; উপযুক্ত খাদ্য-সামগ্রীর একান্ত অভাব। জিনগণ * নানা কৌশলে অতি যত্ন পরিশ্রমেও কর্কশ অনুর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারিত না। পরিগণ অমরাবতী তুল্য বিলাসভবনে বাস করে, নানা প্রকারে বিলাস-সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত থাকে; তাহাদের ঐশ্বর্যও প্রচুর, তথাপি তাহারা জঠরানলের জ্বালায় ক্লেশ পায়! বিধাতার লীলা এমনই চমৎকার!

একবার কতিপয় জিন অবগাহন কালে ক্ষুধার তাড়নে আকুল হইয়া বিরাট সাগরের লবণাম্বু খানিকটা গলাধঃকরণ করিল। জলপান করিবামাত্র তাহাদের অজ্ঞতারূপ আবরণ অপসারিত হইল। এতকাল তাহারা যে অন্নচিন্তারূপ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই, এখন সে মীমাংসা সহজেই হইয়া গেল। জ্ঞানের দিব্য চক্ষে তাহারা পথ দেখিতে পাইল।

সেই দিন উক্ত জিনগণ মনস্থ করিল, তাহারা নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় করিবে। অতঃপর তাহারা মাকাল ফলে জাহাজ বোঝাই করিয়া বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাত্রা করিল। জিনদের জাহাজখানি নানাস্থান ঘুরিয়া বিরাট সাগরের উপকূলে কনক দ্বীপের এক

* জিন—নর। পরী—নারী

বন্দরে উপনীত হইল। কনক দ্বীপে একজাতি সুবর্ণকায় মানবের বসতি ছিল।

কনক দ্বীপের সমৃদ্ধিশালী নগর দেখিয়া জিন-বণিকের চক্ষু স্থির হইল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, তাহাদের দেশের মত ঐশ্বর্য্যশালী দেশ আর নাই, তাহারা 'ধুলামুঠা ধরিলে সোনামুঠা' হয়! কিন্তু কনক দ্বীপের ভূমি রত্নগর্ভা! এখানে নানা জাতি সুস্বাদু ফলের গাছ আছে, তন্মধ্যে আম্রকানন প্রধান। এখানকার সুসভ্য ঋষিপ্রকৃতি লোকেরা প্রধানতঃ ফল ভক্ষণে জীবনধারণ করে। জিন-বণিক মনে করিল, কোনরূপে একবার ইহাদিগকে ভুলাইতে পারিলে হয়। তখন তাহারা কনক দ্বীপবাসীদের নিকট হইতে মাকাল বিনিময়ে কতকগুলি সোনামুখী, আঁধারমাণিক প্রভৃতি আম্র লইল। এইরূপে প্রতি বৎসর মাকাল বোঝাই জাহাজ লইয়া আসিত আর আম্রপূর্ণ জাহাজ লইয়া যাইত। ক্রমে বাণিজ্য বেশ পাকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কনক দ্বীপে আম্রফলের দুর্ভিক্ষ হইতে লাগিল।

পর বৎসর বণিকেরা বিপণীতে আম্রের অভাব দেখিয়া চিন্তিত হইল। তাহারা নগর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে আম্রের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল। গ্রামে গিয়া তাহারা দেখিল, হৈমন্তিক ক্ষেত্রসমূহ সুবর্ণ ধান্যে পরিপূর্ণ! কৃষককুল রাশি রাশি ধান্য লইয়া মনের আনন্দে গৃহে গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে জিনেরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল,—"ইহারা ক্ষুধার যন্ত্রণা জানে না!" অতঃপর কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বণিক কৃষকের নিকট মাকাল বিনিময়ে ধান্য প্রার্থনা করিল। কৃষক তাহার ভাষা বুঝিল না; অপিচ ছোট ছোট হৃষ্টপুষ্ট বালক বালিকার দল সবিস্ময়ে জিনদের পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে জিনদের সুন্দর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! বণিক মনে মনে ভাবিল, "একি রঙ্গ! আমরা এই কৃষক-শিশুদের তামাসার বিষয় হইলাম দেখি!"

যাহা হউক, কোন প্রকারে কৃষককে বণিকেরা নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করিল। কৃষক প্রথমে মাকালের পরিবর্ত্তে ধান্য দান করিতে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু তাহার পুত্র বলিল, "আহা! দাও, ওরা ক্ষুধার্ত্ত। আমাদের এত ধান আছে!" *

---

* আহারে!—"নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত্তে ধনে দুর্ভিক্ষ নিলে!"

জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পরিস্থানে প্রতি বৎসর বাণিজ্যতরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন আর খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা নাই, সুতরাং পরীদিগের আর কোন প্রকার ক্লেশ নাই। তাহারা মনের সাধে ঐন্দ্রজালিক রথারোহণে সময় সময় কনক দ্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিত। তাহাদের সহিত কনক দ্বীপ-বাসিনী ললনাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইল। ফলে তাহারা পরীদের বেশভূষার অনুকরণ প্রয়াসী হইতে লাগিল। বাকী রহিল কেবল পরীর পাখা দুইটির অনুকরণ।

পূর্বে দুই একখানা জাহাজে বৎসরে একবার মাত্র মাকালের আমদানি হইত, পরে অসংখ্য তরীপূর্ণ মাকাল বৎসরে তিন চারিবার কনক দ্বীপে আসিতে লাগিল। আর রাশি রাশি ধান্য পরীস্থানে রপ্তানী হইতে চলিল। মাকালের মায়া এমনই যে, কৃষক আর কিছুতেই আত্মসংযম করিতে পারিতেছিল না। আর কৃষক সম্বৎসরের জন্য ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে না, ক্রমে এমন হইল, অদ্য যে ধান্য ক্ষেত্র হইতে কর্তন করিয়া আনে, কল্য তাহা মাকাল বিনিময়ে বিক্রয় করে। সুতরাং কনক দ্বীপে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আসিয়া ঘর বাঁধিল।

এই মাকাল-বাণিজ্যের সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিরাট সাগরতীরে একটি অপরূপ পেয়ারা গাছ হইয়াছিল। জ্ঞান-ফলের রসমিশ্রিত জল দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় ঐ পেয়ারা ফল কিছু কিছু জ্ঞান ফলের গুণপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জিন পরীগণ ঐ পেয়ারা নিজেদের জন্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কিন্তু একদিন বণিকেরা যৎকালে জাহাজে মাকাল তুলিতেছিল, সেই সময়ে দৈবাৎ তরু চূড়া হইতে গোটাকত পেয়ারা জাহাজে পড়িল। সেই পেয়ারা মাকালের সহিত কনক দ্বীপে আনীত ও বিক্রীত হইল।

কনক দ্বীপবাসী দুই চারিজন ভাগ্যবান ব্যক্তি পরীস্থান হইতে আনীত পেয়ারা ভক্ষণ করিয়া তাহার বীজ ফেলিয়া দিলেন। সেই বীজে কনক দ্বীপেও পেয়ারা গাছ হইল। ক্রমেই শতাধিক বৎসর অতীত হইল।

* * *

পেয়ারা ফলের কল্যাণে কতিপয় কনক দ্বীপবাসী ভদ্রলোক এখন ভ্রান্ত স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন। দীর্ঘকালের,—শত শত বৎসরের মোহ নিদ্রার পর এ কি তীব্র জাগরণ! অন্ধ চক্ষুপ্রাপ্ত হইয়া ঘোর অন্ধকারে পড়িলেন!! তাহারা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, জিনগণ এক মাকাল ফলের পরিবর্তে দেশের সর্বস্ব লইয়া গিয়াছে; এখন জলৌকার ন্যায় তাঁহাদের বুকের অবশিষ্ট রক্ত শোষণ করিতেছে। কনকের দৈন্য দুর্দশা দেখিয়া তাহাদের হৃদয় শতধা হইতে লাগিল।

আর সে আম্রকানন নাই; কোন স্বাদুফল গাছেই আর ফল নাই; ক্ষেত্রে স্বর্ণ শস্য নাই, রত্নগর্ভা ধরণী ধূলিগর্ভা হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে "হা অন্ন হা অন্ন!" আর্তনাদ উঠিয়াছে। পূর্বের মত কৃষকের আর কান্তিপুষ্টি নাই; তাহার দেহ কঙ্কালসার, পরিধানে শতগ্রন্থি চীর। কনক দ্বীপবাসীর আর কিছুই নাই, আছে কেবল মাকাল আর মাকাল। নগরে রাজপথে দ্বিধারে পণ্যবীথিকায় মাকাল; গ্রামে হাটে বাজারে মাকাল, গ্রাম্য মুদির দোকানে মাকাল,—সমুদয় দেশ মাকালে আচ্ছন্ন। এখন উপায়?

কনক দ্বীপবাসী শাপে বরপ্রাপ্ত হইয়াছে, মাকালের সহিত জ্ঞান-পেয়ারা লাভ করিয়াছে, সুতরাং উপায় ভাবিতে আর বিলম্ব হইবে না। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, আর মাকাল গ্রহণ করিবে না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা,—সকলে এক যোগে দৃঢপ্রতিজ্ঞা করিল, তাহারা আর মাকালের মায়ায় ভুলিবে না। তাহারা এখন যে নব উৎসাহ, প্রবল শক্তি লাভ করিয়াছে,—মাকালে নাকাল না হইলে এত শীঘ্র তাহা লাভে সমর্থ হইত না। এ জন্য তাহারা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জিনদিগকে শতবার ধন্যবাদ দিল।

এ-দিকে যথানিয়মে জিন-সওদাগর পূর্ব অভ্যাস মত জাহাজ বোঝাই মাকাল লইয়া বন্দরে পৌঁছিল। কিন্তু এবার আর মাকাল বিক্রয় হইল না। যখন কিছুতেই বণিকেরা বেসাতির কূল কিনারা করিতে পারিল না, এবং ভারে ভারে নয়নরঞ্জন মাকাল পচিয়া নষ্ট হইতে লাগিল, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া পরীস্থানে এই দুঃসংবাদ প্রেরণ করিল।

পরীস্থানে বণিক-সভায় এ-বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল,—আন্দোলন-প্রলয়ে বিরাট্ সাগরের সুগভীর শান্ত জল পর্যন্ত আলোড়িত হইল। পরিশেষে জনৈক গলিতদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ বলিলেন, "অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কনক দ্বীপবাসী কেন মাকালে বিরাগী হইল।"

বণিকদল কনক দ্বীপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, নানা প্রকার জনরব শুনিয়া অবগত হইল যে, যাহারা পেয়ারার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাকালে বিরোধী। সওদাগর এই সন্দেশ মায়া বলে এক নিমিষেই পরীস্থানে প্রেরণ করিল। সেই দিনই বণিকনেতা আদেশ দিলেন, "কনকের পেয়ারা তরু সমূলে উৎপাটন কর।"

পুনরায় বণিকেরা মায়া সন্দেশবহ দ্বারা তাহাদের নেতাকে জ্ঞাপন করিল, "অত বড় মহীরুহ সমূলে উৎপাটন করা অসম্ভব। অতএব কি আদেশ? বণিকনেতা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন, "উহার মূল ছেদন কর।"

পেয়ারা তরুর মূলে শত শত শাণিত কুঠারের আঘাত পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে কনক দ্বীপবাসী প্রথমে ত অবাক হইল, পরে বুঝিল, ব্যাপারখানা কি! তাহারা প্রথমতঃ অনুনয় বিনয় দ্বারা জিন-বণিককে বৃক্ষচ্ছেদনে বাধা দিল,—পরে সওদাগরের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া সরোদনে নিষেধ করিল। কিন্তু জিনেরা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন কনক দ্বীপে ভয়ানক হৈ চৈ পড়িয়া গেল, শান্তিপূর্ণ দেশটির দিকে দিকে অশান্তি-অনল জ্বলিয়া উঠিল! জিন তবু নাছোড়বান্দা! তাহারা বরং স্বর্ণকায়দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল:

"ঈশ্বর যখন জ্ঞানফল মানবের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং এই ফল গ্রহণদোষেই আদিমাতা স্বর্গবিচ্যুত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয় জানিও এ-ফল মানবের অতীব অনিষ্টকারী। অতএব তোমাদের পরম উপকারের জন্যই আমরা এত পরিশ্রম করিয়া এ-গাছ কাটিতেছি।"

দেশের লোকেরা যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর ফাঁকা তর্কে ভুলিবার পাত্র নয়! তাহারা বলিল, "তবে তোমরা ও ফল খাও কেন? আগে পরীস্থানের পেয়ারাগাছ কাট গিয়া, পরে আমাদের গাছ কাটিও। আর আদি জননী যখন ঐ ফল বিনিময়ে স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ করিয়াছেন, তখন ও ফলের মূল্য কত, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বর্গ হইতে আনীত ফল মর্ত্যে অবশ্য অবশ্য অতি যত্নে রক্ষণীয়।" কিন্তু সে কথা শুনে কে?—এ যে আঁতে ঘা!

বৃক্ষ কর্তন উপলক্ষে কনকে কিছু কাল খুব বাক্-বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। এই সময় কোন অশীতিপর পণ্ডিত বলিলেন, "এ বিকৃত পেয়ারা গাছের জন্য তোমরা বৃথা কলহ কর কেন? ইহা ত সে আদি জ্ঞানফলের রূপান্তরিত ফল মাত্র। তোমরা হাভা কর্তৃক রোপিত সেই আদি বৃক্ষের অনুসন্ধান কর। শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, তাহা পৃথিবীর পূর্বাংশে আছে। চল, আমরা তাহারই সন্ধানে যাই।" বৃদ্ধের কথামতে সকলে বর্তমান ছাড়িয়া অতীতের সন্ধানে চলিল! বৃদ্ধ পণ্ডিত কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলেন না,—তিনি উপদেশ দান করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অনেক দিনের পর্যটনে বহু নদ-নদী, জনপদ, পর্বত, প্রান্তর এবং অরণ্য অতিক্রম করিয়া কনকবাসীরা যথাস্থানে একটি সুবৃহৎ মৃত তরু সন্নিকটে উপস্থিত হইল। অনেক শাস্ত্র দেখিয়া, বহু কিংবদন্তী শুনিয়া তাহারা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, এই শুষ্ক তরুই আদি জ্ঞানবৃক্ষ। তখন মর্মান্তিক ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশে তাহাদের বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতে লাগিল! তাহারা এত পরিশ্রম করিয়া, দীর্ঘ প্রবাসে আহার নিদ্রা তুচ্ছ করিয়া, এত কষ্ট সহিয়া

এদেশে আসিল এই মৃত তরু জন্য? স্থানীয় লোকেরা বলিল, প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসর হইল গাছটি মরিয়াছে। জনৈক আগন্তুক তদুত্তরে বলিল, "তবু ভাল, তোমরা যে অনুগ্রহপূর্বক ইহাকে ইন্ধনরূপে অনলে উৎসর্গ কর নাই, তাই রক্ষা!!!"

এখন কি করা যায়? কি উপায়ে জ্ঞানবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হইবে? কেহ বলিল, প্রাণপণে জল সেচন কর, কেহ বলিল, অশ্রুসেক কর; কেহ বলিল, হৃদয়ের শোণিত দান কর, ইত্যাকার নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে লাগিল। এমন কি দুই এক জন মানবের প্রাণ-বিনিময়ে যদি তরুবর সঞ্জীবিত হয়, তবে তাহারা তাহাতেও কুণ্ঠিত নয়।

সকলে শুষ্ক তরুর নানা প্রকার যত্ন করিতে লাগিল,—অশ্রুধারা, রক্তধারা কিছুই দিতে কুণ্ঠিত হইল না! কিন্তু মৃত কবে সঞ্জীবিত হয়? সমুদয় চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহারা মর্মাহত হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। রোদনে ক্লান্ত হইয়া এক ব্যক্তি তরুমূলে শয়ন করিয়াছিলেন; তিনি তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন কোন সন্ন্যাসী বলিতেছেন:

"বৎস! ক্রন্দনে কোন ফল হইবে না। দুই একটি কেন, দুই লক্ষ নরবলি দান করিলেও জ্ঞানবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হইবে না। দুই শত বৎসর হইল এই দেশের অদূরদর্শী স্বার্থপর পণ্ডিত-মূর্খেরা ললনাদিগকে জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে; কার্যক্রমে ঐ নিষেধ সামাজিক বিধানরূপে পরিগণিত হইল এবং পুরুষেরা এ-ফল নিজেদের জন্য একচেটিয়া করিয়া লইল। রমণীবৃন্দ এ-ফলের চয়ন ও ভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এ-গাছের সেবা শুশ্রূষায় বিমুখ হইল। কালে নারীর কোমল হস্তের সেবা-যত্নে বঞ্চিত হওয়ায় জ্ঞানবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। যাও, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও; এখন সেই পেয়ারার বীজ বপন কর গিয়া। জিনগণ যে গাছ কাটিতে চাহে, কাটুক; তোমরা তাহাদের বাধা না দিয়া গোপনে বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিও। এখন তোমরা নরনারী উভয়ে মিলিয়া নব রোপিত পেয়ারা চারার যত্ন করিও, তাহা হইলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। সাবধান! আর কন্যাজাতিকে পেয়ারায় বঞ্চিত করিও না! নারীর আনীত জ্ঞানফলে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, একথা অবশ্য স্মরণ রাখিবে!" নিদ্রাভঙ্গে তিনি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সঙ্গিদিগকে বলিলেন; তাহারা ইহা শুনিয়া সকলে একবাক্যে বলিল, চল তবে ফিরিয়া যাই। জনৈক উদারহৃদয় ভদ্রলোক বলিলেন, "তাই ত পুরুষেরা নদী পার

হইয়া কুমীরকে কলা দেখাইয়াছিল,—নারীর আহৃত জ্ঞানে নারীকেই বঞ্চিত করিয়াছিল,—তাহার ফল হাতে হাতে।"

কনক দ্বীপের উদ্যমশীল বালকেরা উদ্যানের এক কোণে খানিকটা স্থান পরিষ্কার ও চিহ্নিত করিল, পরে বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আইস ভগিনী। তোমরাও যোগদান কর।" আমরা কোদালি দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করি, তোমরা স্বহস্তে বীজ বপন কর! আজি কি শুভদিন, এখন হইতে আমাদের নিজের গাছ হইবে।" বিস্ময়স্তম্ভিত জিনেরা নীরবে দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল, কনকবাসীর এ-শুভকার্যে তাহারা বাধা দিতে পারিল না। নব উৎসাহে অনুপ্রাণিত কনকবাসীদের এ মহৎ কার্যে—জিন দূরে থাকুক, দৈত্যও এখন বাধা দিতে অক্ষম!

অতঃপর কনক দ্বীপ পুনরায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ ধনধান্যে পূর্ণ হইল; অধিবাসীগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহারা আর কোন প্রকার ইন্দ্রজালে ভুলিবার পাত্র নয়! কারণ এখন ললনাগণ জ্ঞান-কাননের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন।

কনকের রূপ কথা অমৃত সমান,
মৃত ব্যক্তি যদি শুনে পায় প্রাণদান!

নারী-সৃষ্টি

(পৌরাণিক উপাখ্যান)

[কিছুদিন হইল কোন ইংরাজী সংবাদপত্রে নারী-সৃজন সম্বন্ধে একটি চমৎকার কৌতুকপূর্ণ গল্প পাঠ করিয়াছিলাম। আমার ভগিনীদিগকে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পূর্বেই বলিয়া রাখি, আমি স্কুলের ছাত্রীর জন্য শাব্দিক অনুবাদ করিব না—মূল বিষয়ের মর্মোদ্ধার করিব। সুতরাং কেহ মূলের সহিত অনুবাদের বৈষম্য দেখিয়া হতাশ বা বিরক্ত হইবেন না।]

কর্নেল ইঙ্গারসোল (Ingersoll) "মুসার ভ্রম" শীর্ষক বক্তৃতা দান কালে নারী-সৃজন বিষয়ক পুরাকালের একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি তদ্দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেন যে, বাইবেলের নারী-সৃষ্টির ইতিহাস অপেক্ষা ঐ প্রাচ্য গল্পের ভাব কত উচচ এবং কত উদার। কিন্তু জানি না, তিনি নিম্নলিখিত হিন্দুর পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে ইহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতেন কি না।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই প্রাচীন পুস্তকখানি অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক ইংরাজ লেখক মিঃ বেন (Mr. Bain) ইহা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অতঃপর উহা "চিকাগো টাইম্‌স্ হেরাল্ড" (Chicago Times Herald) পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়। গল্পটি এই প্রকার:

আদিকালে যখন পৃথিবী, চন্দ্র. সূর্য, তারকা আদি কিছুই ছিল না—ছিল কেবল ঘোর অন্ধকার। ত্বষ্টি নামক হিন্দু দেবতা এই বিশ্ব জগৎ সৃজন করিলেন। সর্বশেষে যখন রমণীসৃষ্টির পালা, তখন বিশ্বস্রষ্টা ত্বষ্টি দেখিলেন যে, তিনি পুরুষ সৃজন কালেই সমুদয় মাল-মসলা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। আর ঘন কিম্বা শক্ত কোন বস্তুই অবশিষ্ট নাই। ত্বষ্টিদেব নৈরাশ্যে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন।

ধ্যান ভঙ্গের পর ত্বষ্টি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদার্থের সার সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন, যথা: (১) পূর্ণচন্দ্রের গোলত্ব; (২) সর্পের বক্রগতি; (৩) লতিকার তরুশাখা অবলম্বন; (৪) তৃণের মৃদু কম্পন; (৫) গোলাপ লতার ক্ষীণতা; (৬) কুসুমের সৌকুমার্য; (৭) কিশলয়ের

নবুত্ব; (৮) হরিণের কটাক্ষ; (৯) সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য; (১০) কুয়াসার অশ্রু; (১১) সমীরণের চাঞ্চল্য; (১২) শশকের ভীরুতা; (১৩) ময়ূরের বৃথা গর্ব; (১৪) তাম্রচঞ্চু পক্ষীর পাখার কোমলতা; (১৫) হীরকের কাঠিন্য; (১৬) মধুর স্নিগ্ধ স্বাদ; (১৭) ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা; (১৮) অনলের উত্তাপ; (১৯) তুষারের শৈত্য; (২০) ঘুঘুর ললিত স্বর; (২১) নীলকণ্ঠের কিচির মিচির গান—

ঐ পর্যন্ত অনুবাদ লিখিবার পর অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায় আমি কলম হাতে লইয়াই টেবিলে ন্যস্ত বাম হাতে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। জানি না, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না। সহসা আমার কক্ষটা অতিশয় আলোকিত হইয়া উঠিল—বোধ হইল যেন ঘরের ভিতর দুই চারিটি সূর্য উদয় হইয়াছে! সম্মুখে চাহিয়া দেখি, আলো স্তম্ভের ন্যায় অতি উজ্জ্বল একটি মূর্তি দণ্ডায়মান। সেদিকে দেখিতে আমার নয়নদ্বয় ঝলসিয়া গেল। আমি তখনই চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। আমার সম্মুখস্থিত জ্যোতির্ময় মূর্তিটি বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শুন বৎসে! আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বষ্টি। তুমি আমার নারী-সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিতেছ দেখিয়া সুখী হইলাম। আমি সর্বশুদ্ধ তেত্রিশটি উপাদানে নারী রচনা করিয়াছি। ইংরাজ লিপিকর মিঃ বেন এই উপকথা সংস্কৃত হইতে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিবার সময় ভ্রমক্রমে ১২টি উপকরণের নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। অদ্য আমি সেই ভ্রম সংশোধন করিতে আসিয়াছি। কেন না পৌরাণিক ইতিহাসে কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আমি সেই দ্বাদশ বস্তুর নাম বলিয়া যাই, তুমি লিখ।" আমি মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় বিহবলচিত্তে কলমটা কালিতে ডুবাইয়া লইয়া অলসভাবে লিখিতে লাগিলাম:

(২২) তেঁতুলের অম্লত্ব; (২৩) লবণের লাবণ্য; (২৪) মরিচের ঝাল; (২৫) ইক্ষুদণ্ডের মিষ্টতা"—ভ্রম হইতেছে ভাবিয়া আমি থামিলাম, ক্ষণকাল পরে সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলাম, "মহাত্মন্! এ যে চাটনীর মসলা—"

ত্বষ্টি স্মিতমুখে অথচ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আমি যাহা বলি, নির্বিবাদে লিখিয়া যাও।" আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যন্ত্রচালিতার ন্যায় লিখিলাম:

(২৬) কুইনাইনের তিক্ততা; (২৭) যুক্তি-জ্ঞানহীনতার কূটত্ব; (২৮) কলহ-প্রিয়তার মুখরতা; (২৯) দার্শনিকের অন্যমনস্কতা; (৩০) রাজনৈতিকের ভ্রান্তি;

(৩১) পাষাণের সহিষ্ণুতা ; (৩২) সলিলের তারল্য এবং (৩৩) নিদ্রার মোহ।"

পাঠিকা ভগিনী হয় ত বড্ড রাগ করিয়াছেন, গল্পের তালভঙ্গ এবং রসভঙ্গ হইল দেখিয়া। তা কি করি, বলুন দেখি। পরের লেখা অনুবাদ করিতে গেলে নিজের স্বাধীনতা খাটান যায় না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে কল্পনা বেচারীকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে হয়। যাক, এখন পুনরায় অনুবাদ চলুক, না, আমি আবার গোড়া হইতে বলি, অনুবাদ ও দৈববাণী একত্রে মিশাইয়া বলি।—

ধ্যান ভঙ্গের পর ত্বস্তি চক্ষু মর্দন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতিপয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের সারভাগ সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন, যথা :

(১) পূর্ণচন্দ্রের গোলত্ব ; (২) সর্পের বক্রগতি ; (৩) লতিকার তরুশাখা অবলম্বন ; (৪) তৃণদলের মৃদু কম্পন ; (৫) গোলাপ লতার ক্ষীণতা ; (৬) কুসুমের সৌকুমার্য ; (৭) কিশলয়ের লঘুত্ব ; (৮) হরিণের কটাক্ষ ; (৯) সূর্যরশ্মির উজ্জ্বল্য ; (১০) কুয়াসার অশ্রু ; (১১) সমীরণের চাঞ্চল্য ; (১২) শশকের ভীরুতা ; (১৩) ময়ূরের বৃথা গর্ব ; (১৪) তালচঞ্চু পক্ষীর পাখার কোমলতা ; (১৫) হীরকের কাঠিন্য ; (১৬) মধুর স্নিগ্ধ স্বাদ ; (১৭) ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা ; (১৮) অনলের উত্তাপ ; (১৯) তুষারের শৈত্য ; (২০) ঘুঘুর কাকলী ; (২১) নীলকণ্ঠের কিচিরমিচির ; গান ; (২২) তেঁতুলের অম্লত্ব ; (২৩) লবণের লাবণ্য ; (২৪) মরিচের ঝাল ; (২৫) ইক্ষুরসের মিষ্টতা ; (২৬) কুইনাইনের তিক্ততা ; (২৭) [যুক্তি-জ্ঞানহীনতার কূটতর্ক ; (২৮) কলহ প্রিয়তার মুখরতা ; (২৯) দার্শনিকের অন্যমনস্কতা ; (৩০) রাজনৈতিকের ভ্রান্তি ; (৩১) পাষাণের সহিষ্ণুতা ; (৩২) সলিলের তারল্য ; (৩৩) নিদ্রার মোহ।

ত্বস্তিদেব উপরোক্ত তেত্রিশ উপাদান একত্র মিশ্রিত করিয়া ললনা রচনা করিলেন। (Egg beater দ্বারা উত্তমরূপে ফেটিয়া।) বলা বাহুল্য রমণী সৃজন করিতে সৃষ্টিকর্তাকে অত্যধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে অনেক গবেষণা, অনেক চিন্তা, গভীর ধ্যান ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। লোকে যে জিনিসটি প্রস্তুত করিতে অধিক মাথা ঘামায়, তাহা নিশ্চয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। কোন বস্তু নির্মাণ করিয়া হাত পাকিলে পর সর্বশেষে যাহা প্রস্তুত করা হয়, তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হয়। সুতরাং রমণী যে সৃষ্টি-জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। অতঃপর ত্বস্তি সেই অতি যত্নে নির্মিতা অঙ্গনা পুরুষকে উপহার দিলেন।* অষ্টম দিবস পরে পুরুষ তাঁহার

* উপহারটি যেন বানরের গলায় মতির হার!

নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"হে প্রভো। আপনি যে জীবটি আমাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, সে ত আমার জীবন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে যে অবিরত বকবক কচর-কচর করে; সে আমাকে এক তিল অবকাশ দেয় না; সে যে বিনা কারণে বিলাপ করে; এক কথায় সে যারপরনাই মন্দ।" স্বস্তি অবলাকে ফিরাইয়া লইলেন।

অষ্টাহ অতীত হইলে পর পুরুষ পুনর্বার দেবতা-সমীপে উপনীত হইয়া বলিল— "হে দেব! আপনার প্রদত্ত জীবটিকে প্রত্যাখান করা অবধি আমার জীবন অতিশয় নির্জ্জন ও নীরস হইয়া পড়িয়াছে। আমার স্মরণ হয়, সে কি সুন্দর! আমার সম্মুখে নাচিত, গাহিত, খেলিত! মনে পড়ে তাহার সেই কটাক্ষ—মরি মরি! সে কেমন করিয়া আড় নয়নে আমার দিকে চাহিত! সে আমার খেলার সহচরী ছিল; আমার জীবন-সঙ্গিনী ছিল! তাহার বিরহ আমার অসহ্য।"

স্বস্তি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে পুনরায় সে রমণী প্রদান করিলেন। †

চতুর্থ দিবসে আবার স্বস্তিদেব দেখিলেন যে, পুরুষ বনিতাসমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট আসিতেছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পুরুষ বলিল, "দেব! আমায় ক্ষমা করুন; আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, নারী আমার আনন্দের কারণ, না, বিরক্তির কারণ। তাহাকে লইয়া আমার সুখশান্তি অপেক্ষা কষ্টের ভাগই অধিক। অতএব প্রভো! আপনি কৃপাবশতঃ আমাকে ইহা হইতে মুক্তিদান করুন।"

এবার দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যাও, তোমার যাহা ইচ্ছা করো গিয়া!"

পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল, "এ যে আমার কালস্বরূপ, ইহার সহিত জীবন-যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যে কিছুতেই ইহার সঙ্গে থাকিতে পারি না।"

স্বস্তি উত্তর দিলেন, "তুমি ত ইহাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পার না!"

পুরুষ নিরুপায় হইয়া মনের দুঃখে খেদ করিতে লাগিল, "কি আপদ আমি রমণাকে রাখিতেও চাহি না, ফেলিতেও পারি না!!"

তদবধি নারী অভিশাপরূপে পুরুষের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে!!!

---

† নারীও যেন প্রাণমনহীন, বুদ্ধি বিবেকহীন একটা কাঠের পুতুল বিশেষ—পুরুষ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সে নিজেকে অপমানিতা বোধ করে নাই, আবার ফিরাইয়া লইতে আসিলেও গৌরব অনুভব করে নাই। স্বস্তিদেব অবশ্যই জানিতেন, এইরূপ নির্বাক "কাঠের পুতুল" গৃহিনীই পুরুষের বাঞ্ছনীয়া।

নার্স নেলী

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

১

আমার ছোট ননদ খুকী তিন বৎসর যাবৎ রোগে ভুগিতেছেন। অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত লক্ষ্ণৌ আসিয়াছেন। তাঁহার যত্ন করিবার জন্য আমিও সঙ্গে আসিয়াছি। আল্লাহ্ রাখে, আমাদের কাফেলার অনেক লোক, খুকীর স্বামী-পুত্র প্রভৃতি সকলেই ছিল।

আমাদের জনৈক বন্ধু হেমবাবুও লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বিমলা দেবী পীড়িত হইয়া জানানা হাসপাতালে আছেন শুনিয়া, আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তিনি শয্যাশায়িনী ছিলেন। তাঁহার বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দেয় নার্স; তাঁহার বাহুর ক্ষতস্থলে পটি বাঁধে নার্স। এক কথায়, তাঁহার সমুদয় কার্য নার্সগণই করে। আমি প্রায় দুই ঘন্টাকাল তথায় ছিলাম, ততক্ষণে বিভিন্ন কার্যের জন্য গোটা পাঁচ নার্সকে আসিতে যাইতে দেখিলাম। কিন্তু রক্ত-পুঁজ-পূর্ণ বালতি লইয়া যে নার্সটি, তাঁহার চেহারাটা আমার চক্ষে যেন কেমন বোধ হইল।

আমি একদিন অন্তর একদিন হেমবাবুর স্ত্রীকে দেখিতে যাইতাম। সত্য কথা বলিতে কি, বিমলাকে দেখিবার আগ্রহ তত ছিল না; তাঁহার সেই জীর্ণ শীর্ণ রুগ্নকায়া মলিনবদনা—বিষাদের প্রতিমূর্তি নার্সটিকেই দেখিতে যাইতাম। তাহার সেই যেন চিরপরিচিত মুখখানি; অথবা চিনি-চিনি চিনিতে পারি না মুখখানি আমার কেমন যেন লাগিত। একদিন বিমলা বলিলেন, "হাঁ ভাই, তুমি নার্স নেলীর দিকে অমন ক'রেচেয়ে থাক কেন?"

আমি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "ওর ঐ শুকনো মুখখানা দেখে বড় মায়া লাগে।"

বিমলা। হ্যাঁ, ওর বড় দুক্ষু, আমারও বড্ড মায়া করে। কিন্তু উপায় কি? ওকে দু'চার আনা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবার যো নাই। ছ'টাকা মাইনে পায়—খেয়েই পেট ভরে না। প্রথম প্রথম আমি নার্স নেলীকে সিকিটা আধুলিটা দিতুম, কিন্তু পরে জানতে পাল্লুম, সিস্টার রিভা সব কেড়ে নিয়ে

হাসপাতালের যত চাকর আছে, সবাইকে ভাগ ক'রে দেন—হয় ত নেলীর ভাগেও একটা পয়সা কখনও পড়ে। সিস্টার রিভার কি অন্যায় দেখ দেখি। যত নোংরা কাজ, সব নেলী করে, অথচ সে একটু ভাল খাবার খেতে পায় না।

আমি। নেলী কি জাতে মেথর?

বিমলা। না, বাঙ্গালী খ্রীস্টান। শুনেছি, এককালে সেও গেরস্থ ঘরের বউ-ঝি ছিল। পাদ্রীমাগীরা ফুস্‌লিয়ে খ্রীস্টান করে ওকে ঘরের বার করেছে। তার আগেকার নাম বদলে নেলী নাম রাখা হয়েছে। নেলী বাংলা জানে বলে তাকে আমাদের, অর্থাৎ বাঙ্গালী রোগিণীদের সেবায় রাখা হয়েছে। মুসলমান মেয়েদের কোয়ার্টারে নেলীকে মোটেই যেতে দেয় না, ভয়, পাছে কেউ তাকে মুসলমান ক'রে ফেলে। আর এক কথা শুনেছ, নেলী নাকি দিব্বি কোরান পড়তে পারে!

নেলী কোরান শরীফ পাঠ করিতে পারে, শুনিয়া আমার মনে আরও কেমন খট্‌কা লাগিল। না জানি সে কোন্ মুসলমান কুলে কালী দিয়া পতিত হইয়াছে! হায়! কোরান শরীফের এই অবমাননা! খ্রীষ্টান নেলী—মেথরাণী নেলী—যে হস্তে ঘৃণিত রক্ত পুঁজ পরিপূর্ণ বালতি পরিষ্কার করে, সেই হস্তে কোরান শরীফ স্পর্শ করে! কার্যতঃ নেলী এখানে মেথরের কাজ করে, কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্রীগণ তাহাকে নার্স নেলী বলিয়া ডাকেন।

বিমলাকে দেখিবার ছলে হাসপাতালে যাইতাম বটে, কিন্তু একদিনও নেলীর সঙ্গে দু'টি কথা বলিবার সুবিধা পাইতাম না। নেলীও কাজের ছলে আমাদের নিকট যখন-তখন আসিত—অথবা দূর হইতে তাহার সুন্দর ডাগর চক্ষু দু'টি আমার দিকেই ন্যস্ত রাখিত। হঠাৎ আমি দেখিতে পাইলে চক্ষু অবনত করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইত। এখন আমার ফিকির হইল, কিরূপে নেলীর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। কালে ভদ্রে সুযোগ পাইয়া নেলীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিত। যাহা হউক, নেলীকে আমাদের নিকট পাইবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল।

খুকীর অস্ত্র-চিকিৎসা করাই স্থির হইল। কিন্তু আমি ত কিছুতেই খুকীকে হাসপাতালে যাইতে দিব না। এজন্য দুলা মিয়াঁর (খুকীর স্বামীর) সঙ্গে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইল—তিনি আমাকে হাসপাতালের উপকারিতা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন; সমুদয় ন্যায়শাস্ত্র আবৃত্তি করিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ

হেমবাবুর স্ত্রীর নজীর পেশ করিলেন। কিন্তু হাসপাতাল একবার আমার যে সর্বনাশ করিয়াছে, তাহাতে আমার প্রাণ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছে। আমার সে দগ্ধক্ষত এখনও আরোগ্য হয় নাই। দুলা মিয়াঁকে আর সে সব কথা খুলিয়া বলিলাম না। শেষে আমারই জয় হইল! "ধন্য স্ত্রীলোকের কুসংস্কার!" বলিয়া দুলা মিয়াঁ অস্ত্র (যুক্তি-অস্ত্র) ত্যাগ করিলেন! বাসাতেই অস্ত্র হইবে, ঠিক হইল।

যথাসময় হাসপাতালের বড় ডাক্তার মিস ফলী তাঁহার দলবলসহ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই তিনটা নার্সও ছিল। আমরা সকলে বাঙ্গালী, "হিন্দী কা চিন্দি" বুঝি না, তাই আমাদের ভাষা বুঝাইতে নার্স নেলীকে আসিতে হইয়াছিল। কার্যশেষে সকলে চলিয়া গেলেন। কেবল রোগিণীর শুশ্রূষার জন্য দুই জন সেবিকা, নেলী এবং লিজী রহিল।

পরদিন যথাসময় সকলের স্নান আহার এবং খুকীকে ঔষধ পথ্য খাওয়ান শেষ হইলে পর আমি অবসর ও সুযোগ পাইয়া নির্জনে নেলীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নার্স, তোমার বাড়ী কোথায়?"

তদুত্তরে সে আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল—বহু কষ্টে উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, "বুবুজান! আমাকে চিনিতে পারেন নাই?"

অ্যাঁ! আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! আমি মেজেতে বসিয়া পড়িলাম। হাঁ, চিনিলাম ত! অহো! কি নিষ্ঠুর সত্য—কি দারুণ সত্য আবিষ্কার করিলাম!

* * নেলী তাহার দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করিল। ইতিহাসের প্রত্যেকটি অক্ষর অশ্রুবিধৌত ছিল।

২

* * পুর গ্রামে আমার পিত্রালয়। পিতামহের মৃত্যুর পর আমার পিতা ও পিতৃব্য পৈতৃক সম্পত্তি সমভাগে ভাগ করিয়া লইলেন। পিতৃব্যের সংসারে (চাকর, চাকরাণী ব্যতীত) মাত্র তিনটি প্রাণী, তিনি, তাঁহার ভার্যা এবং তাঁহাদের একমাত্র কন্যা নয়ীমা। পিতার সংসারে আমরা পাঁচ ভাই ভগিনী-সহ মোট সাত জন। তবু শুনিতাম, চাচাজানের হাতে টাকা নাই। তাঁহার অনেক দেনা আছে, ইত্যাদি।

আমাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল—আমরা পরম সুখে খাইয়া পরিয়া গা-ভরা গহনায় সাজিয়া থাকিতাম! আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ীর

তুলনা কোথায়? সাড়ে তিন শত বিঘা লা-খেরাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটী। বাড়ীর চতুর্দিকে ঘোর বন, তাহাতে বাঘ, শুকর, শৃগাল—সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সে জন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা ঘুঘু, "বউ কথা কও", "ওখুকি, ওখুকি" "চোক গেল" প্রভৃতি পাখীর ভৈরবী আলাপে শয্যাত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের "হুয়া হুয়া ক্যা হুয়া" শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি, মগরেবের নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখীর "কা-আক্-কা-আক্-কু" ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি, এখন রাত্রি তিনটা। আমাদের শৈশব জীবন পল্লী-গ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে চাচিজান একমাত্র তিন বৎসরের কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। চাচাজান্ চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন। কন্যার প্রতিপালনই তাঁহার প্রধান সমস্যা। আমার মাতা তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে বলিলেন, "তুমি অত ভাবছ কেন? নয়ীমার মা মরেছেন, আমি ত মরি নাই। যে কোলে আমার তিন মেয়ে, জোবেদা, হামিদা, আবেদা মানুষ হয়েছে, সে কোলে কি নয়ীমার জায়গা হবে না?"

পিতৃব্য যেন অকূল সাগরে ডুবিতে ডুবিতে কূল পাইলেন। পরদিন তিনি নয়ীমাকে পাঁচজন দাসী-সহ আমাদের বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন।

নয়ীমা আমাদের সব ভাই-বোনের চেয়ে ছোট বলিয়া আমরা তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতাম। আমার পিতা-মাতা তাহাকে আমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসিতেন। এইরূপে নয়ীমা রাজকুমারীর মত স্নেহ-যত্নে বর্ধিত হইতে লাগিল।

পল্লীগ্রামে আমরা উচ্চশিক্ষার ধার ধারিতাম না। সামান্য পড়া লেখা, যাহা আমরা জানিতাম, তাহা নয়ীমাও শিক্ষা করিল। শিকা গাঁথা, বেণী প্রস্তুত করা, সুপারীর ফুল, সুপারী কাটা, নারিকেলের চিরা, জীরা কাটা, সুজনী সেলাই ইত্যাদি যাহা কিছু শিক্ষণীয় ছিল, নয়ীমা সে সমস্তই ক্রমে শিখিয়াছিল। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মতে, মেয়ে-মানুষের পড়া-লেখা শেখার মত অকেজো জিনিস যেন পৃথিবীতে আর নাই।

সাত বৎসর হইতে নয়ীমা আমাদের সঙ্গে আছে। চাচাজানও পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আপন ভাগের সম্পত্তি সব অপব্যয়ে উড়াইয়া দিয়াছেন; কেবল নয়ীমার মাতার অলঙ্কারগুলি নষ্ট করেন নাই, তাহা আমার পিতাকে দিয়াছেন।

কিছুদিন হইল আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জামাল আহমদ সাহেব প্রায় আট দশ বৎসর পরে বিদেশ হইতে ট্রান্সফার হইয়া এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমি শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছি; এবং আরও কতিপয় আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়াছেন। এ সময় আমাদের বাড়ীটা লোকের ভীড়ে বেশ গম্‌গম্‌ করিতেছিল।

এক দিন আমরা চারি ভগিনীতে গল্প গুজব করিতেছিলাম, এমন সময় ভাইজান তথায় আসিলেন। তিনি আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা লেখাপড়ার চর্চা কর না, এমন আঁধার মন নিয়ে কি ক'রে থাক? হঁ্যা নয়ীমা! তুমি কিছু পড়া শুনা কর না?"

নয়ীমা উত্তর দিল, "আমি কোরান শরীফ খতম করিয়াছি। এখন বড় আপার নিকটে কোরান শরীফের তর্জমা আর রাহে নাজাত পড়ি।"

ভাইজান হাসিয়া বলিলেন, "বাস্‌, এই! আর কিছু পড় না. একটু বাংলা, একটু ইংরাজী?"

আমি আমার (১৮ বৎসর বয়সের) জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "ভাইজান! আপনি বাংলা, ইংরাজী অনেক পড়ে বিলাত গিয়ে, শেষে এতদিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, না, কালেক্টর হয়েছেন। নয়ীমা ইংরাজী পড়ে কি হবে? কোন্‌ জেলায় কালেক্টরী করতে যাবে?"

ভাই। নয়ীমা ভাল লেখাপড়া শিখলে কালেক্টরের স্ত্রী হতে পারবে। ভাল বর পাবে; ভাল ঘরে বিয়ে হবে।

আমরা সকলে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। আমি তখনই ভাইজানের সৃষ্টিছাড়া কথা মাতাকে গিয়া জানাইলাম। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম।

"ভাইজান বলেন, লেখাপড়া শিখলে নয়ীমা কালেক্টরের বউ হবে!" মাতা আমার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হুঁ—আচ্ছা, তাই হ'বে।"

৩

আমাদের বাড়ীময় ভারী ধুম পড়িয়া গিয়াছে— ভাইজানের সঙ্গে নয়ীমার বিবাহ। আমাদের আনন্দের সীমা নাই—আমাদের খেলার পুতুল নয়ীমা এখন আমাদের বড় ভাবীজান হইবে! আমার সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী আবেদার ভারী রাগ, সে কিছুতেই নয়ীমার পা ছুঁইয়া সালাম করিবে না, কারণ নয়ীমা তাহার

অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। সকলে আবেদাকে ঐ কথা লইয়া ক্ষেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিল। এদিকে ভাইজানও যারপর-নাই বিরক্ত,—ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছেন। তিনি বিলাত-ফেরা, বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী—তিনি কি একটা দশ বৎসরের বালিকা বিবাহ করিয়া দেশ হাসাইবেন? তিনি বঙ্গের সভ্য সমাজে কিরূপে মুখ দেখাইবেন? তিনি আমাকেই সব দোষ দেন যে, "জোবেদাই সব নষ্টের গোড়া! আমি সে দিন তাচ্ছিল্য ভাবে কি একটা কথা বলেছি, তাই ও গিয়ে মাকে লাগিয়েছে। তারপর এই মহা বিভ্রাট!"

ভাইজান রাগ করুন, আর যাহাই করুন, তাঁহার একটা মস্ত গুণ এই যে, তিনি পিতামাতা এবং অপর আত্মীয়-স্বজনের কথার অবাধ্য ছিলেন না। মাতার দু'টি মিষ্ট কথা, পিতার উপদেশ তাঁহাকে সহজেই সম্মত করিয়া ফেলিল। মা বলিলেন, এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে তিনি বড় যত্নে মানুষ করিয়াছেন, তাহাকে পরের ঘরে যাইতে দিবেন না, ইত্যাদি। ভাইজান আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। নিরীহ সুবোধ বালকটির মত বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আমাদের দূরসম্পর্কীয়া এক ভাবী সাহেবা ভাইজানকে শুনাইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি লো, বিলাত-ফেরা সাহেবকে মেহদী উবটন লাগান হবে না?"

ভাইজান রুদ্ধ ক্রোধে বলিলেন, "যা আপনার মরজী! আমি উবটন বা তার চেয়ে জঘন্য কিছু মাখলে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তবে আমার আপত্তি নাই। আমি ত নীরবে মাথা পেতে দিয়েছি—যত ইচ্ছা অত্যাচার করুন।"

আমি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে মেহদী বাটিয়া আনিয়া তাঁহার দুই হাত ভরিয়া লাগাইয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না ভাইয়ের হাতে অধিকক্ষণ মেহদী রাখা, কিন্তু আমি কার্য্যান্তরে গিয়া সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বেচারা ভাইজান তখনও হাত দুইটি ইজি চেয়ারের দুই বাহুতে রাখিয়া উদাসীনভাবে বসিয়া আছেন। আমি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁহার হাত ধুইতে বসিলাম। লাল টকটকে হাত দেখিয়া ভাইজান ত রাগিয়া অস্থির! তিনি অনেক বিদ্যালাভ করিয়াছেন, এবং উদ্ভিদ্-তত্ত্ব (Botany) পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মেহদীর মাহাত্ম্য জানিতেন না।

তিনি আমার হাত হইতে সবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তখনই স্বীয় স্নানাগারে গিয়া অনেকটা সাবান ও স্পঞ্জের সদ্ব্যবহার করিলেন। কিন্তু মেহদী ত নাছোড়বান্দা!

৪

* * নগরের জানানা হাসপাতালে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা দুই মাস হইতে আছেন। তাঁহার ছয় মাসের শিশু পুত্র জাফরও সঙ্গে আছে। এখানে তাঁহার আদর-যত্নের সীমা নাই। হাসপাতালের বড় ছোট লেডী ডাক্তার ও সেবিকাগণ পালাক্রমে সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্তা থাকে। এক কথায়, তিনি এখানে রাজভোগে আছেন। তাঁহার স্বামী ও দেবর প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা জমীলাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শ্বশ্রূ মহোদয়াও সময় সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। রোগিণী আমার ভ্রাতৃবধূ নয়ীমা।

আমার মাতা নয়ীমাকে হাসপাতালে পাঠাইতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু ক্রমেই যখন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন অগত্যা ভাইজান মাকে বলিলেন, "মা! আমি এ পর্য্যন্ত কদাচ তোমার কথার অবাধ্য হই নাই; এখন একজনের জীবন-মরণ হাসপাতালের চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতেছে, এ সময় বাধা দিও না। আজ তোমার কথা রাখিতে পারিব না।" ভাইজান এই এক দিন মাতৃ-উপদেশ লঙ্ঘন করার জন্য আজীবন অনুতাপ করিয়াছেন।

অপর কক্ষে কতিপয় মিশনারী রমণী গল্প ও হাস্য পরিহাস করিতেছেন। এক জন বলিলেন, "এই বার দেখিব। পোড়া সমালোচকেরা আর বলিতে পারিবে না যে, আমরা কেবল দুর্ভিক্ষ পীড়িত অনুক্লিষ্ট পথের কাঙ্গাল ধরিয়া কনভার্ট করি!"

দ্বিতীয়া রমণী। এমন শিকার পাইলে কলিকাতার বিশপ বাহাদুরও কৃতার্থ হইতেন!

তৃতীয়া। ইশ! ভারী ত তোমাদের বাহাদুরী—একটা ১৯ বৎসরের বালিকা (হোক না সে দুই ছেলের মা, আমি তাকে বালিকাই বলি) ভুলাইয়া খ্রীস্টান করা কোন্ বড় শক্ত কথা!

১মা। শক্ত কথা না হউক, কিন্তু * * কাঁপিয়া উঠিবে—এমন কি সমুদয় বঙ্গদেশ তোলপাড় হইবে। একজন কালেক্টরের স্ত্রীকে হাত করা কি সহজ ব্যাপার?

২য়া। সন্ধ্যা হইল, এখন চল নয়ীমা বিবির কামরায় আজ আমি ভজন গাহিব। তিনি আরও এক মাস হাসপাতালে থাকিবেন। সুতরাং আমাদের যথেষ্ট সময় আছে।

দুই চারিজন মিশনারী-ললনা সর্বদা নয়ীমার নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। রোগী দেখা এবং রোগীর সেবাই তাহাদের পরম ধর্ম। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ অমায়িক ভালবাসায় নয়ীমা মোহিত হইয়াছেন। তাঁহারা সন্ধ্যার সময় ভজন গাহিয়া যীশুর অপার মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে অনন্ত নরক হইতে রক্ষা পাইবার পথ প্রদর্শন করিতেন। নয়ীমা নিজের ধর্ম সম্বন্ধীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কিছুই জানেন না—তাঁহার নির্মল অন্তরে যীশু-মহিমার গভীর রেখা অঙ্কিত হইল। তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর কলুষিত হইতে আরম্ভ করিল। যে কখনও আলোক দেখে নাই, তাহার নিকট জোনাকীর আলোই সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয়। নয়ীমার দশাও সেইরূপ।

৫

তিন মাস পরে নয়ীমা—না, আমার ভাবীজান হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি আর সে প্রিয়ভাষিণী মধুরহাসিনী নয়ীমা নহেন। তিনি কাহারও সহিত ভাল মুখে কথা কহেন না। ইহাতে সকলেই ভাবিলেন যে, দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া তাঁহার মেজাজ খিট্‌খিটে হইয়াছে। ভাইজান তাঁহাকে মাতার সহিত দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে নয়ীমার চিত্ত স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি হাসপাতালের সঙ্গিনীদের অদ্যাপি ভুলিতে পারেন নাই; জঙ্গলা বাতাস আর তাহার ভাল লাগে না।

নয়ীমা একদিন শাশুড়ীর নিকট কৈফিয়ত তলব করিলেন যে, তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় নাই কেন? তাঁহাদের কিসের অভাব ছিল, কি বাধা ছিল? তিনি অবাক হইয়া বধূর মুখ দেখিতে লাগিলেন। পরে সহাস্যে বলিলেন, "পাগলের মেয়ে বলে কি?"

নয়ীমা। বলি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! আমাকে একটা আস্ত জানোয়ার ক'রে রেখেছেন। এক অক্ষর পড়ালেখা শিখান নাই যে, আজ ভদ্র সমাজে

বসবার উপযুক্ত হতেম। উনি আমার লেখাপড়া শেখাতে বললেন, আপনি তা শুনে সাত তাড়াতাড়ি আমায় বিয়ে দিয়ে পাশে বাঁধলেন।

মা। তুমি ত বাছা এমন মুখরা ছিলে না। এ সব কথা তুমি কোথায় শিখলে? তোমায় তিন বছর বয়স থেকে মানুষ করলুম। এত যত্নের ধন তুমি—তোমাকে পরের হাতে না দিয়ে নিজের ঘরে রেখেছি। তারই নাম কি বেঁধে ফেলা?

ন। মূর্খ লোকেরা শিক্ষার মর্ম কি বুঝবে? তাই আপনারা সেটা আবশ্যক বোধ করেন নি। বুঝেছিলেন কেবল বিয়ে।

মা। বাছা! এখন নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, এলে বিয়ে (এল. এ., বি. এ.) পাশ করিয়ে কেমন মেম সাহেব সাজাও দেখব! আমি পড়ালেখা শেখা মন্দ বলছি না; কিন্তু আমরা পাড়াগাঁয়ে থেকে সুবিধা করতে পারি নি। মেয়েদের জন্য স্কুল নেই, মক্তব নেই, পাঠশালা নেই। ঘরে পড়াবার জন্যও ভাল শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় না। এখন তোমরা শহরে বেড়িয়ে যদি পড়া লেখার সুবিধা করতে পার, ভাল।

তাহাই হইল। দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত না থাকায়—আর যদিও বা মরুভূমে ওয়েসিসের ন্যায় দুই একটি উপযুক্ত মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ত "শরীফগণ" কন্যা পাঠাইবেন না! বিশেষতঃ মফঃস্বলবাসিগণ কি করিবেন? সুতরাং জমিলার জন্য পালাক্রমে কতকগুলি মিশনারী রমণী নিযুক্তা হইলেন। তাঁহারা নিজের নিয়ম অনুসারে প্রথমে বাইবেল হইতে গল্প বলিয়া পরে অন্য কাজ আরম্ভ করিতেন।

ইহাতেও ভাল সুবিধা হইল না। শেষে একজন ইউরোপীয়ান গবর্নেস্ নিযুক্তা হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া একাধারে আমার ভাবীজানের সঙ্গিনী (Companion), জমিলার শিক্ষয়িত্রী এবং এ-সংসারের গৃহিণী হইলেন। এখন মিস্ নরেন্স এ বাড়ীতে সর্বেসর্বা। তিনি মিষ্ট কথায় বাড়ী-শুদ্ধ সকলকে একরূপ ভুলাইয়া রাখিয়াছেন।

* * *

৬

বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। অদ্য * * নগরের আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য। * * পরগনায় যত লোক ছিল—তাহারা প্রায় সকলেই

উপস্থিত। ব্যাপার কি? ব্যাপার?—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জামাল আহমদের স্ত্রী মোসাম্মাত নয়ীমা খাতুন প্রায় ২৫,০০০·০০ টাকার অলঙ্কার এবং নগদ ১৭,০০০·০০ টাকা লইয়া লালকুঠি মিশন হাউসে পলাইয়া গিয়াছেন। এক মাস যাবৎ এই জটিল মোকদ্দমা চলিতেছে। উভয় পক্ষেই বড় বড় ব্যারিস্টার নিযুক্ত আছেন। নয়ীমা পাল্কী করিয়া এজলাসে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য বিচারকের রায় প্রকাশ হইবে।

সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ উপস্থিত হইয়াছেন, এমন লোমহর্ষণ সংবাদ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের পত্রিকা অতিশয় লোকরঞ্জন হইবে।

একদল লোক আসিয়াছে তামাশা দেখিয়া হাততালি দিতে। কেহ আসিয়াছে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করিতে। কেহ এই অবসরে খানিকটা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়িয়া লইলেন। কেহ স্ত্রীশিক্ষার কুৎসা গাহিলেন। কেহ কাটা ঘায়ে লবণের ছিঁটা দিয়া বিলাত-ফেরা মিঃ জামাল আহমদকে, তাঁহার কন্যা সুশিক্ষা—উচ্চশিক্ষার চরমে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মোবারকবাদ দিলেন।

কেহ বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন। কেহ সান্ত্বনা দিতেও আসিয়াছেন।

কেহ কেহ আপন চিন্তায় শঙ্কিত হইয়াছেন যে, এ-রকম হইলে ত ঘরে বউ-ঝি রক্ষা করা দায়! আজ এত বড় কালেক্টর সাহেবের বিবি মিশনারী-দের কথায় ঘরের বাহির হইলেন, তবে আমাদের ত কথাই নাই।

নয়ীমা নিজ মুখে বলিলেন যে, তিনি স্ব-ইচ্ছায় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহত্যাগ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাঁহার শাশুড়ী ও স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু গৃহে যথাবিধি দীক্ষিতা হইবার সুবিধা ছিল না বলিয়া মিশন হাউসে আসিয়াছেন। তিনি কেবল ধর্মের জন্য—একমাত্র যীশুর জন্য—স্বামী, কন্যা, পুত্র, গৃহ—এক কথায় সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিচারক একরূপ রফা করিতে চাহিয়াছিলেন যে, এখন ত দীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে তবে আপনি বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মিস্ লরেন্স সাধারণতঃ অন্তঃপুরের দুর্দশা এবং বিশেষতঃ নয়ীমার অন্তঃপুরের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিলেন। তিনি দশ বৎসর যাবৎ বিহার ও কলিকাতার বিভিন্ন অন্তঃপুরে যাতায়াত করিয়া অন্তঃপুর-রহস্য সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।

শেষ নিষ্পত্তি এই হইল যে, টাকা ও অলঙ্কার যাহা নয়ীমা সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহা তাঁহারই থাকিবে; আর পুত্র ও কন্যা পিতার নিকট থাকিবে। নয়ীমা পুত্রলাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই।

৭

নয়ীমা এখন লালকুঠিতে মিশনারী রমণীদের সঙ্গে আছেন। তাঁহার আদর-যত্নের সীমা নাই। মাথায় রাখিলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখিলে পিঁপড়ায় খায়—এ হেন আমেদ মেম সাহেবাকে তাহারা রাখিবে কোথায়? উনিশ বৎসরের বালিকার এই ধর্মানুরাগ, এ মহান আত্মত্যাগ, কি কম প্রশংসার বিষয়? ইনি মিশন হাউসে আদর্শ রমণী। সকলের মাথার মুকুট, কন্ঠের মণি—এই আমেদ মেম সাহেবা! অত্যধিক প্রশংসা ও তোষামোদে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আমেদ মেম সাহেবা এত পূজা পাইয়াও এমন বিমর্ষ কেন?

যীশুর জন্য যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ ততক্ষণই সুখকর বোধ হইতেছিল, যতক্ষণ সোনার সংসার হইতে বিচ্ছিন্না হন নাই। ক্রমে যখন মোকদ্দমার গতি কুপথে চলিল, যখন স্বামী ও সন্তানদের সহিত ইহজীবনে দেখা হওয়ার আশার শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু নিবিয়া গেল, তখনই নয়ীমার প্রফুল্লতা তিরোহিত হইল। বিচারালয় হইতে বিজয়-গর্বে ফিরিবার সময় তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পাল্কী হইতে নামিয়াই নয়ীমা মূর্ছিতা হইলেন; মিশনারী ভগিণীগণ "ভারি গরম!" বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। হাঁ, গরমই বটে, এ যে প্রাণ পোড়ার গরমী!

জ্ঞান হওয়া মাত্র নয়ীমা তওবা করিলেন; বারম্বার প্রাণ ভরিয়া কলেমা পড়িলেন; আল্লাহকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন এ সব বৃথা! গভীর রজনীতে মনে করিতেন, পলাইয়া যাই—যাই স্বামীর পা জড়াইয়া ধরি গিয়া! কিন্তু পথ যে চিনেন না। লালকুঠি হইতে কালেক্টর সাহেবের কুঠি কত দূর? কোন্ দিকে? কে পথ বলিয়া দিবে? হায় হায়! কেউ না।

যত দিন ছলে বলে কৌশলে নয়ীমার সমস্ত অলঙ্কার ও টাকাগুলি হস্তগত না হইয়াছিল, ততদিন মিশনারী ভগিণীগণ তাঁহাকে যথেষ্ট আদর

করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহারা সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছেন। এখন "আছে" বলিতে নয়ীমার হাতে দু'গাছি কাচের চুড়ি আর পরনে একখানা বিলাতী মোটা ধুতি। এখন তাহারা নয়ীমাকে পদব্রজে গীর্জা যাইতে বলেন, নয়ীমা তাহাতে স্বীকৃতা নহেন।

শেষে নয়ীমাকে এক মুষ্টি অন্নদান করাও তাঁহাদের পক্ষে ভার বোধ হইতে লাগিল। এখানে সকলেই খাটিয়া খায়, বাড়ী বাড়ী পড়াইতে যায়, প্রচার করিতে যায়। কেবল নয়ীমা বসিয়া খাইবে কেন? শেষে তাঁহারা নয়ীমাকে হাসপাতালে নার্সগিরী করিতে দিলেন। কিন্তু এই বঙ্গদেশে তাহাকে রাখা নিরাপদ নহে ভাবিয়া নয়ীমাকে বহুদূরে, লক্ষ্ণৌ পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

নয়ীমা তাঁহার কোরান শরীফখানি সংগে আনিয়াছিলেন—যে অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহার প্রত্যেকটি আয়েত খণ্ডন করিয়া জগৎকে দেখাইবেন, মুসলমান ধর্ম কেমন অসার, অন্ধ বিশ্বাসীর ধর্ম! তাঁহার সে সব কল্পনা জাহান্নামে গিয়াছে। এখন সেই কোরান শরীফখানি তাঁহার একমাত্র দুঃখের সঙ্গী! সকলে শয়ন করিলে পর গভীর নিশীথে উঠিয়া তিনি ওজু করিয়া অতি যত্নে কোরান শরীফ লইয়া বসেন। পাঠ করিবেন কি, দরবিগলিত অশ্রুধারায় ভিজিয়া যায় বলিয়া প্রতি পত্রে সাদা ব্লটিং কাগজ রাখিয়াছেন। অনুতাপে দগ্ধ হইলে রোদনে এত শান্তি পাওয়া যায়, সুখের ক্রোড়ে পালিতা নয়ীমা এত দিন তাহা জানিতেন না।

স্বামী-চিন্তা এখন নয়ীমার জীবনের সার হইয়াছে। পতি ধ্যান, পতি জপমালা হইয়াছে। এয়া আল্লাহ্! আর একবার—মাত্র একটিবার অভাগিনীকে স্বামীর চরণে পৌঁছাইয়া দাও! তুমি সর্বশক্তিমান, সব করিতে পার!—পার না কেবল এইটুকু? এখনও তওবার দ্বার রুদ্ধ হয় নাই, নয়ীমার তওবা গ্রহণ কর, প্রভু গফুরর রহিম।

লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে আসিয়া নয়ীমা নার্স নেলী হইয়াছেন। দিবা ভাগে রোগীসেবা করিতে হয়, নামাজ ও কোরান শরীফ পাঠের সুবিধা হয় না। সঙ্গে থাকে কেবল অনিবার অশ্রুধারা। প্রথম প্রথম অন্যান্য নার্স, এমন কি লেডী ডাক্তারেরাও তাঁহাকে নানা প্রকার আশ্বাস-বাক্যে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার দীন দুনিয়া—ইহকাল পরকাল—দুই রসাতলে গিয়াছে, যে স্বয়ং সার্বভৌম সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য মেথরাণী সাজিয়াছে, যে স্বহস্তে সোনার নীড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, তাহার সান্ত্বনা কোথায়? অতঃপর আর কেহ নেলীকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করে নাই।

এইরূপে সুদীর্ঘ সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সাত বৎসরের সাত বারো চৌরাশী মাসের দুই হাজার পাঁচ শত পঞ্চান্ন দিবসের একটি দিনও নেলীর বিনা ক্রন্দনে অতিবাহিত হয় নাই। তিনি কোন মতে স্বীয় অস্থিচর্মসার দেহ-খানিকে বহন করিয়া জীবনের দিন গণনা করিতেন। রজনীর প্রতীক্ষায় কোনরূপে দিবা অতিক্রম করিতেন। রাত্রিকালে নামাজ ও কোরান শরীফ পাঠের সুবিধা হইবে, তাহাই যাহা কিছু সান্ত্বনা। কিন্তু যে দিন রাত্রির কাজ (night duty) থাকিত, সে দিন নেলীর ভাগ্যে নামাজের সুখটুকুও ঘটিত না। সোবহান আল্লাহ্! রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়ায়—অশ্রুপ্লাবনে সেজদার স্থান ভিজাইয়া দেওয়ায়—এত শান্তি লাভ হয়!

নেলীর ঐরূপ কঙ্কালসার দেহখানি দেখিয়া প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সে যখন বলিল, "বুবুজান! আমাকে চিনিতে পারেন নাই?" তখন আর কোন সংশয় রহিল না। আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। আমি তাই মেজেতে বসিয়া পড়িলাম। যে আমার মাতৃক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই পিতৃব্যজাতা ভগিনীকে চিনিব না? তাই ত, কোরান শরীফ পাঠ করিতে পারে, এমন বাঙ্গালী খ্রীস্টান ভূ-ভারতে কয়টা আছে? কিন্তু হায়! নন্দন কাননের পারিজাত নয়ীমাকে কীট নেলী রূপে কে দেখিতে চাহিয়াছিল? যে নয়ীমা শৈশবে পাঁচ জন দাসী সহ আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল, সে আজ পরের সেবাদাসী! * * *

"হায় রে নিয়তি! তুমি কত খেলা খেল,
সুখের শিখরে নিয়া দুঃখ-কূপে ফেল!"

৮

নেলীর ইতিহাস শ্রবণকালে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। বারম্বার মনকে বুঝাইতেছিলাম যে, নয়ীমা স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিতেছে—ইহা ত তাহার ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাতে আমার দুঃখিত হইবার কারণ কি? কিন্তু নেলীর আত্মগ্লানিপূর্ণ মর্মন্তুদ ভাষায় পাষাণ শতধা হইত, মানুষ কোন্ ছার?

নেলী আত্মকাহিনী সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বিরামের পর তাঁহার স্বামী ও পুত্র-কন্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অতি সংক্ষেপে যথাসম্ভব সংযত ভাষায় সমস্ত অবস্থা বলিলাম। বলিলাম,—"যে দিন ভাইজান মোকদ্দমা হারিয়া

বিচারালয় হইতে অধোমুখে গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন, তখনই "হায় নয়ীমা!" বলিয়া মাতা শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণাব্যঞ্জক হা-হুতাশ ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের বুলি ছিল, "হায় নয়ীমা!" ভাইজান পুরুষ মানুষ, কোন প্রকার বাহ্যিক কাতরতা প্রকাশ করিতেন না; তিনি ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় নীরবে সে অপমান, লজ্জা, ক্রোধ, খেদ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সহ্য করিতে লাগিলেন।

মাস দুই পরে মা দেহত্যাগ করিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই অভাগিনী জমিলার জ্বর হইল। পিতার গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া সে তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিত না। তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন, "দাদী আম্মা"। তাঁহাকে হারাইয়া মাতৃহীনা বালিকা একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

জ্বরের বিকারে "মা" "মা" বলিয়া প্রলাপ বকিত। কাঁদিয়া বলিত, "মা তুই আবার হাসপাতালে গেলি কেন? আয় ফিরে আয়! জাফর তোর জন্য বড় কাঁদে, আয় মা! দাদী আম্মাও নাই!" জমিলা অধিক দিন কষ্ট পায় নাই, মৃত্যু তাহাকে শান্তিক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছে।

পক্ষকাল মধ্যে মাতা ও কন্যাকে হারাইয়া ভাইজান শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সহ্যগুণেরও সীমা আছে। বেচারা জাফরেরও কান্না বাড়িয়া গেল। ভাইজান তাহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিতেন কিন্তু মাত্র এক বৎসরের শিশু মাতৃহারা হইয়া আর কত দিন সুস্থ থাকিবে? এক মাসের মধ্যে সেও ইহধাম ত্যাগ করিল।

ভাইজান অদ্যাবধি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার সোনার সংসার সম্পূর্ণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁহার 'আছে' বলিতে একমাত্র ভগিনী আমিই আছি। "নয়ীমা! একবার মানস-চক্ষে তোমার নিজ হাতে গড়া সেই গোরস্থানের প্রতি—তোমার শ্মশানবাসী স্বামীর প্রতি চাহিয়া দেখ ত!" আমার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে মূর্ছিতা নয়ীমা ভূপতিত হইল।

আমি নেলীর চোখে মুখে একটু জলের ছিটা দিব মনে করিতেছি, এমন সময় দুলা মিঞা আমার কক্ষদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়োপ্রাপ্তা কন্যা সিদ্দিকা দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের সম্মুখে আর আমি নেলীকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইলাম না। সিদ্দিকা আমার হাত ধরিয়া তাহার মাতার নিকট লইয়া গেল।

৯

খোদার ফজলে খুকী আরোগ্যলাভ করিলে পর আমরা দেশে ফিরিলাম। ফিরিবার পূর্বে পশ্চিমের আরও কয়েকটি নগর, বিশেষতঃ দিল্লী, আগ্রা ও লাহোর ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। লাহোরে আনারকলির সমাধিমন্দির দর্শনে একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আকবরের প্রভূত ক্ষমতা, অন্যদিকে যুবরাজ সেলিমের অনাবিল প্রেম—উভয় চিত্র যেন মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিলাম।*

আগ্রায় তাজমহল দেখিয়া আরও একটি কথা মনে উদয় হইল। নারীদ্বেষী পুরুষগণ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যতই দীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়ুন না কেন, সত্যের জয় অনিবার্য। শিক্ষা—স্ত্রীলোক পুরুষ নির্বিশেষে সর্বদা বাঞ্ছনীয়। স্থলবিশেষে অগ্নি গৃহদাহ করে বলিয়া কি কোন গৃহস্থ অগ্নি বর্জন করিতে পারে?

তাজমহল সৌধটি জগদ্বিখ্যাত; পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য বস্তুর অন্যতম আশ্চর্য। তাজমহলের নাম না জানে এমন লোক এ ধরাতলে অতি অল্প। কিন্তু ভুবন-বিখ্যাত তাজমহলের অভ্যন্তরে যিনি সমাহিতা আছেন, সে মমতাজমহলকে কয় জনে চিনে? ঐ অমন নয়নরঞ্জন মর্মর প্রস্তর নির্মিত অনিন্দ্যসুন্দর তাজমহল ও তৎগর্ভস্থা মহিষীকে চিরস্মরণীয়া করিতে পারে নাই। আর নূরজাহাঁ বেগম? তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কণামাত্র আয়োজন করা হয় নাই। তাঁহার নগণ্য সামান্য সমাধিমন্দির লাহোরের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র অজ্ঞাত স্থান শাহতারায় বনাবৃত অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। অনেকে সে কবরস্থানের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানে না। কিন্তু নূরজাহাঁ বেগম চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন। সে কি বস্তু, যাহা নূরজাহাঁকে অমর করিয়াছে? ঐ শিক্ষা। সুশিক্ষার প্রসাদে জগজ্জ্যোতিঃ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। খোদা না খাস্তা, ভূমিকম্পে কিম্বা কোন প্রবল শত্রুর কামানে তাজমহল ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু নূরজাহাঁ বেগমের স্মৃতির মৃত্যু নাই!

যাক, আমার ধান ভানিতে শিবের গানে প্রয়োজন নাই। গৃহ প্রত্যাগমন করিয়াও আমি নেলীর সনির্বন্ধ অনুরোধ ভুলিতে পারি নাই। তিনি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, ভাইজানকে অনুরোধ করিয়া যেন আমি তাঁহাকে বাড়ী আনাই। তিনি এখন পতিগৃহে সামান্যা চাকরাণী কিম্বা

* যুবরাজ সেলিমের প্রণয়িনী আনারকলি সম্রাট আকবরের আদেশে জীবন্ত সমাহিতা হইয়াছেন।

অধমতমা মেথরাণী-রূপে জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করিতে চাহেন। অত্যধিক রোদনে তাঁহার ক্ষয়কাশ হইয়াছে, অভাগিনী আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

পূজার ছুটিতে আমি পিতৃগৃহে—না, এখন ত পিতা নাই,—সুতরাং ভ্রাতৃগৃহে গেলাম।

একদিন ভাইজানকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া সেই সুযোগে তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া।—

ধীরে ধীরে বলিলাম, "ভাইজান! তোমার পা টিপে দি?" তিনি প্রসন্নবদনে বলিলেন, "আচ্ছা। কিছু মতলব আছে নাকি?"

আবার সেই সুখের শৈশব মনে পড়িল। বাল্যকালে ভাইজানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, তাঁহার পায়ের তলা টিপিয়া দিতাম, পায়ের আঙ্গুল ধরিয়া টানিতাম। তাই আজও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু মতলব আছে নাকি? আমি বহুকষ্টে যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় আমার মতলব প্রকাশ করিলাম। নয়ীমার প্রাণপোড়া রামকাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলাম, "অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া পতিপ্রাণা নয়ীমা এখন অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় পবিত্রা হইয়াছেন।"

সমুদায় শ্রবণান্তে ভাইজান বলিলেন: "তাহা হইলে নয়ীমাকে দেখিবার আশা করিতে পারি? তাহাকে জীবনে আর একটিবার দেখিব বলিয়া আমিও এখন পর্যন্ত মরি নাই। আমার সব মনে আছে—এ দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসরে কিছুই ভুলি নাই। মনে আছে—যে দিন 'হায় নয়ীমা' বলিয়া জননী শয্যাগ্রহণ করিয়া আর ওঠেন নাই! মনে আছে, জমিলা আমার বুকে মুখ লুকাইয়া তাহার মাতার জন্য কাঁদিত। আমার সম্মুখে তাহার নাম উল্লেখ করিতে সাহস পাইত না—দুঃখিনী বালিকা অব্যক্ত যন্ত্রণায় এটা ওটা ছুঁতা ধরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিত! শেষে আমারই কোলে তাহার মাতা সম্বন্ধে প্রলাপ বকিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে! আরও মনে আছে—জাফর, আমার অন্ধের যষ্টি জাফর—আমার জীবনের শেষ অবলম্বন জাফর, যেদিন আমার বুকে মাথা রাখিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে! আমার বক্ষ না হইলে সে ঘুমাইত না—শেষ নিদ্রার সময়ও সে আমারই বুকে লুটাইয়া পড়ে!"

* * *

"এতখানি লাঞ্ছনার পরেও যে বেহায়া জীবন-যাপন করিতেছি, তাহা কেবল নয়ীমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া। চাকুরি ছাড়িলে কর্মহীন জীবনে স্মৃতি আমাকে পাইয়া ধসিত—অচিরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় হয় ত এতদিন মরিয়া যাইতাম। যেদিন জাফর প্রাণত্যাগ করিল, সেই দিন এই পিস্তলে গুলী পুরিয়াছিলাম, আত্মহত্যা করিব বলিয়া—"

ভাইজান বুকের পকেট হইতে একটি ছয়নলী পিস্তল বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"কিন্তু আত্মহত্যা করি নাই। এই যে স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিয়া, এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়া বাঁচিয়া আছি,—কেবল জীবনে আর একবার নয়ীমাকে দেখিবার আশায়—"

আমি কিঞ্চিৎ উৎসাহে ও আশায় ভাইজানের মুখের দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম, বুঝি অভাগিনী নেলীর কপাল ফিরিল—বুঝি সে আবার স্বামীপদে আশ্রয় লাভ করিবে। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। তাঁহার মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর; চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তলটি ধরিয়া বলিলেন,—

"কোনরূপে নয়ীমাকে একবার আমার সম্মুখে আনিতে পার? তাহা হইলে তাহার সঙ্গে আমার জীবনের শেষ দেনা-পাওনা শোধ করিয়া লইব! আমার জীবনের এই শেষ আকাঙ্ক্ষা, জোবেদা! আর কিছু চাহি না। নয়ীমাকে—না. হাঁ, কি বলিলে, সে এখন 'নেলী' হইয়াছে?—বেশ, তবে সেই নেলীকে এই পিস্তলে গুলী করিয়া হত্যা করিব! একটি একটি করিয়া এই ছয় গুলী ছুঁড়িয়া নেলীকে হত্যা করিয়া আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিব!! কিন্তু না, ওঃ! তাহা ত হইবে না! নয়ীমা যে তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান হইয়াছে; তবে ত সে অবধ্যা। মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নাই।" এই বলিয়া তিনি পিস্তলটি ভূতলে রাখিলেন।

ঠিক এই সময় তাঁহার বালক ভৃত্য একটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আনিয়া দিল। ভাইজান পাঠ করিলেন:

লক্ষ্ণৌ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন, "কবর প্রস্তুত রাখ, নার্স নেলীর শবদেহ প্রেরিত হইল।"

শিশু-পালন*

উপস্থিত ভদ্রমহিলাগণ !

চোখের উপর নিত্য যে মহামারী, বিশেষতঃ শিশুহত্যা দেখতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক মনে করি। ভাববার বিষয়, গত বৎসর কেবল বাংলা দেশে ষোল লক্ষ, এক চল্লিশ হাজার, এক শত এগার জন লোক মারা গেছে—তার মধ্যে দশ বছরের কম বয়সের ছেলে মেয়ে ছয় লক্ষ, চব্বিশ হাজার, সাত শ' পঞ্চান্ন জন ছিল। ঐ সোয়া ছয় লক্ষ ছেলের মধ্যে এক বছরের কম বয়সের শিশু দুই লক্ষ, আটাত্তর হাজার, তিন শ' সত্তর জন ছিল। ফল কথা, সাড়ে ষোল লক্ষ লোকের তিন ভাগের একভাগ ছেলেমেয়ে ছিল। ছেলেমেয়েরাই ত ভবিষ্যৎ—তারা যদি এমন হুহু করে মরে যাবে, তবে আমাদের আর থাকবে কি? আর সব জায়গার বিষয় ছেড়ে শুধু কলিকাতায় দেখছি, গত বৎসর ৬০০০ অর্থাৎ দৈনিক ১৬ জন করে আঁতুড়ে শিশু মারা গেছে। যদি যত্ন করা যেত, তা' হ'লে রোজ ১৪ জন করে ছেলে বাঁচান যে'তে পারত। ২৫ বৎসর আগে এই শহরে যত ছেলে জন্মাত, তার শতকরা ৫০ জন শিশু এক বৎসরের মধ্যেই মারা যেত। ১৮৯৫ সনে শতকরা ৪৮ জন ছেলে মরেছে। তারপর শহরের জলবায়ুর কিছু উন্নতি হয়ে ১৯০০ সনে শতকরা ৪৪ জন করে মরেছে। আর গত বছর শতকরা ৩০/৪০ জন করে মরেছে। তার মধ্যে রোজ ১৪ জন করে শিশু কেবল মা ও দাইয়ের অযত্নে বলি দেওয়া হ'য়েছে। অযত্নে ছেলে মারা হয়েছে, এর অর্থ এই যে, পোয়াতিরা ঠিক মত যত্ন করতে জানে না। কারণ যাই হউক, এ-রকম শিশু-হত্যা ত সহজ নয়, এর প্রতিকার করতে হবে।

আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাচ্ছে যে, পুরাকালে আমাদের অতিবৃদ্ধা ঠাকুমা, দিদিমারা যা করেছেন, সে সব ব্যবস্থা মন্দ ছিল,—তার কিছুই ভাল নয়। সেই জন্য তার উল্টো করতে হবে। একটু পরিষ্কার করে বলি, ধরুন,

* বিগত ৬ই এপ্রিল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে পঠিত হয়। সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রবন্ধটি অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিতে বাধ্য হইলাম।

যেমন দিদিমার আমলে হিন্দু পোয়াতিকে ৯ দিন থেকে ২১ দিন আর মুসলমান পোয়াতিকে ৪০ দিন আঁতুড় ঘরে বন্ধ থাকতে হতো, এখন তার উল্টো করতে গিয়ে দুই দিনের পোয়াতি (প্রসূতি) মোটর গাড়ীতে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোবে বা সংসারের কাজ কর্মে হাত দিবে। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা বোকা ছিলেন না ; তাঁরা যা ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা নিখুঁৎ ছিল, তাই তাঁরা নির্বিবাদে ৯০/৯৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচে গেছেন। এখন তো আমাদের "বয়স না হতে কুড়ি আগে পাকে কেশ!" দশ বছর বয়সে চশমা পরতে হয়। মাঝখান থেকে আমরা সেই নিয়মের বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে হিতে বিপরীত করে ফেলেছি! আমার সুশিক্ষিতা ভগিনীগণ! আপনারা পুরাকালের, বিশেষতঃ মুসলমান নিয়মের সঙ্গে এখনকার ডাক্তারী ব্যবস্থার তুলনা করে দেখবেন।* এই দেখুন না, আমাদের ব্যবস্থা বলে :

(১) প্রসূতিকে যথাসম্ভব নির্জন ঘরে রাখবে।

(২) ঘরের দরজার কাছে কাঠ কয়লার আগুন রাখবে।

(৩) বাহিরের যে লোক ঘরে আসবে সে হাত পা ও কাপড় আগুনে গরম করে আসবে।

(৪) মুসলমানী মতে ৪০ দিন আর হিন্দু মতে ২১ দিন পর্যন্ত পোয়াতি শুয়ে বসে থাকবে, বেশী নড়া চড়া করবে না।

(৫) আঁতুড় ঘরে অতিরিক্ত বাহুল্য জিনিস ("অশুচ" হওয়ার ভয়েই বলুন, আর যাই বলুন) রাখবে না।

* কিছুদিন হইল ডাক্তার মিস্ বি. এম. বোস, এম. বি. মহোদয়া গ্রীয়ার পার্কে সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা দান কালে খাদ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "দেখ মেয়েরা! তোমরা এক তরকারী দিয়ে ভাত খাবে। সাত রকম তরকারী খেলে পেটে অসুখ হয়। মনে রেখো, এক সময়ে এক তরকারীর বেশী খাবে না।" গত ১৩২৫ সালের শ্রাবণ মাসের "আল এসলাম" পত্রিকার ১২৮ পৃষ্ঠায় 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মোহাম্মদ' (দঃ) শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই,—'হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এত দূরদর্শী ছিলেন যে, তিনি বিরুদ্ধ ভোজন এবং অতি ভোজন দোষ দূর করিবার জন্য এক তরকারী দিয়া আহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আজ যদি মানবমণ্ডলী এক তরকারী দিয়া আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে উদরাময়, আমাশয়, * * * (প্রভৃতি) বহু সংখ্যক ব্যাধি একবারে দূরীভূত হইয়া পৃথিবীকে অর্দ্ধ-স্বর্গে পরিণত করিতে পারে।"

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন :—বেচারা গরীব মানুষেরা কেবল শাকভাত বা ডালভাত খায় বলে তাদের অসুখ বিসুখ বড় লোকদের তুলনায় অনেক কম হয়। বড় লোকেরা নানা রকম চর্ব্য চোষ্য খেয়ে খেয়ে ব্যাধির আধার হয়ে পড়েন।

আর আধুনিক ডাক্তার কি বলেন? তিনি বলেন:

(১) রোগীর কামরায় মানুষের ভীড় বা গোলমাল হওয়া উচিত নয়। (পোয়াতিও ত রোগী বিশেষ?)

(২) কয়লার আগুন পাবক, অর্থাৎ বাতাসকে পরিষ্কার করে। (তবে সে জিনিসটা পোয়াতির ঘরে থাকলে দোষ কি?)

(৩) বাহিরের লোকের কাপড় চোপড়ে রোগের কীটাণু থাকা সম্ভব; আর আগুনের উত্তাপে রোগের বীজাণু মারা যায়।

(৪) ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসূতির পেটের ভিতরের অংশ বিশেষ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সে সময় নড়া চড়া করা উচিত নয়। এমন কি বিছানা ছেড়ে উঠতে নাই। (ছয় সপ্তাহ অর্থে বিয়াল্লিশ দিন, তবে আমাদের মুসলমানী ব্যবস্থা চল্লিশ দিন ঘরে থাকতে বলেও কি পাপ করলে?)

(৫) রোগীর কামরায় অতিরিক্ত জিনিস, এমন কি বই, কাগজ ইত্যাদিও রাখা উচিত নয়। কারণ সেগুলো infected অর্থাৎ অশুচি হয়।

আমরা যদি এখন কাঠ কয়লার ধোঁয়া রাখি; ঘরটা গরম রাখতে হবে বলে' সব দরজা জানালা বন্ধ করে তাকে পাতকূয়া করে' ফেলি; কিম্বা ছাগলের ঘরে পোয়াতিকে রাখি, সে দোষ কার—আমাদের না ব্যবস্থার?

আমাদের দেশের পোয়াতিদের প্রধান দোষ এই যে, তারা পরিষ্কার বাতাসের মর্ম বোঝে না। চারিদিকের দোর-জানালা একেবারে বন্ধ করে রাখে। পাড়াগাঁয়ে দরমার কিম্বা চেঁচাড়ির বেড়া দেওয়া খড়ের ঘরে অমন করে দোর বন্ধ করলে, তত অনিষ্ট হয় না, কারণ বেড়ার ফাঁক দিয়ে কোন রকমে ঘরে বাতাস আসতে পারে। কিন্তু কলকাতার পাকা বাড়িতে কিম্বা মাটির দেয়ালের ঘরে দোর-জানালা বন্ধ করলে কিছুতেই বাইরের বাতাস আসতে পারে না। এক ঘরে অনেক বেশী লোকের শোয়া উচিত নয় তাতে ঘরের বাতাস খারাপ হয়। শোবার ঘরে রোদের আলো যেন যেতে পারে। দিনের বেলা সব দরজা খুলে রাখা উচিত।

খাস কলকাতায় এত শিশু নষ্ট হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, প্রসূতির শরীর ভাল না থাকায় শিশু মায়ের দুধ পায় না। গাইয়ের দুধ আর নানা রকম ছাই মাটি খাইয়ে শিশুকে এক রকম গলা টিপে মারা হয়। কেবল শিশু রক্ষার চেষ্টা করলে কোন ফল হবে না—শিশুর মা'দের স্বাস্থ্যেরও যত্ন

করা দরকার। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলছেন, মায়ের কর্তব্য কি, তা না জেনে শুনে কেউ যেন মা না হয়। মায়ের প্রধান কর্তব্য সন্তান পালন করা, এ-কথা অবশ্য কাউকে বলে দিতে হবে না, কারণ পশু পক্ষীও এ কর্তব্য পালন করে থাকে। কিন্তু পশুতে ও মানুষে প্রভেদ আছে বলেই মানুষকে তার কর্তব্য ঠিক করে শিখে নিতে হয়। পশুরা তাদের কাজে ভুল করে না ; আমরা মানুষ কি না, তাই আমাদের পদে পদে ভুল।

নোংরামির জন্যও অনেক আঁতুড়ে ছেলে মারা পড়ে। নাওয়া ঠিক মত হয় না ; ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে নাওয়ান হয় না। যে ছেলেরা মায়ের দুধ পায় না, তাদের জন্য যে দুধ বা ফুড তৈরি করা হয়, তার বাসন পাত্র ঠিক মত পরিষ্কার থাকে না। একবার অনেকখানি দুধ তৈরি করে ফেলে, সেই ঠাণ্ডা দুধ তিন চার বার খাওয়ান হয়। এই রকম আরও কত অত্যাচার হয়, তা আর কত বলব। "সর্ব অঙ্গেই ব্যথা, ঔষধ দিবে কোথা!"

শিশুকে রোজ একবার নাওয়াতে হবে। জলটা একটু গরম, শিশুর বগলে হাত দিলে যেমন গরম লাগে কিম্বা মায়ের কনুইতে যে গরম জল গা-সহা বোধ হয়, অতটুকু গরম হলেই হবে। শীতকালে খোলা জায়গায় বা যেখানে ঝাপটা বাতাস লাগে, এমন জায়গায় নাওয়াবে না। নাওয়াবার আগে বেশ করে সর্ষের তেল মালিশ করে নেবে, কিন্তু এ সময় দুধ খাওয়াবে না। কোন রকম উগ্র সাবান ব্যবহার না করে বরং ডালের বেশম মাখলে চলে। স্নান শেষ হলে তাড়াতাড়ি গরম তোয়ালে কিম্বা পরিষ্কার পুরোন কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেশ করে শিশুর গা মুছে দিতে হবে। শরীরের কোন অংশ, যেমন কানের পীঠ, বগল, কুঁচকি যেন ভিজা না থাকে। নচেৎ ঐ সব জায়গায় ঘা হবে।

নাওয়া শেষ হলে তাড়াতাড়ি শিশুকে কাপড় পরাবে। হালকা ফ্লানেল কিম্বা সেই রকম কাপড় পরান চাই। কাপড় খুব ঢিলে ঢালা হওয়া চাই। উলেন টুপী আর মোজা কোন কালে পরান উচিত নয়। কাপড় খুব পরিষ্কার আর শুকনো থাকা চাই। কোন রকম ভিজে, এমন কি ঘামে ভিজা কাপড়ও গায়ে রাখতে নাই।

তারপর শিশুর খাওয়া—এইটেই সব চেয়ে বড় কথা। এক বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ সব চেয়ে ভাল ; তা যদি একান্তই না পাওয়া যায়, গাইয়ের দুধে অনেকটা জল মিশিয়ে মায়ের দুধের মত পাতলা করে খাওয়াবে। এজন্য দুধ খাওয়া শিশি(feeding bottle) ব্যবহার করা প্রশস্ত। ঝিনুকে কিম্বা চামচে দিয়ে দুধটা একেবারে গলায় ঢেলে দিলে শিশুর পক্ষে সেটা হজম করা কষ্টকর হয়।

মাই কিম্বা ফীডিং বোতলের বোঁটা চুষে চুষে খেলে দুধের সঙ্গে শিশুর মুখের লালা কতক পরিমাণে পেটে যায়। ঐ লালায় এমন একটা গুণ আছে, যাতে দুধ কিম্বা যে কোন খাদ্য সহজে হজম হয়। ঐ রূপে জল মিশিয়ে ছাগলের কিম্বা গাধার দুধও খাওয়ান যেতে পারে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে, মানুষের জন্য মানুষের দুধই সব চেয়ে ভাল খাদ্য। সর্বদা মনে রাখবে যে, গাই কিম্বা ছাগলের দুধ খাওয়াতে হলে, তাতে মিছরি মিশিয়ে মিষ্টি করে খাওয়াবে। কারণ গাইয়ের দুধে মানুষের দুধের চেয়ে মিষ্টি কম থাকে। তিন মাসের ছেলেকে দেড় ছটাক খাঁটি দুধ, আধ ছটাক ননী, দেড় ছটাক পানি আর একটু মিছরি এক সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর সঙ্গে একটু চুনের পানি মিশিয়ে দিলে আরও ভাল হয়। তা হলে ছেলের পেট ফাঁপার ভয় থাকে না। যদি দেখা যায়, এতে শিশু ভাল থাকে না, অর্থাৎ মোটা তাজা হয় না, তবে ননীর ভাগ কম করে দুধ মিছরির ভাগ বাড়িয়ে দিবে। বিলাতী অর্থাৎ টিনের ঘন দুধ খাওয়াতে হলে, টাট্‌কা তৈরি করে খাওয়াতে হবে। এক সঙ্গে অনেকখানি তৈরি করে, তাই সাত বার খাওয়াবে না। এ দুধ এই নিয়মে তৈরি হয়;— আধ ছটাক দুধ, আধ ছটাক ননী, এক পোয়া (কিম্বা সাড়ে চার ছটাক) জল। এর চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেকে মেলিন্স ফুড দেওয়া যেতে পারে। এতেও দুধ এবং ননী মিশিয়ে দিতে হবে। এইরূপে এলেনবেরী ও বেঙ্গার সাহেবের তৈরি ফুড এবং হরলিক সাহেবের মলটেড মিল্ক দেওয়া যেতে পারে।* ক্রমে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবে এবং দুধ যাতে বেশী খায়, সে দিকে নজর রাখবে। মনে রাখা দরকার, ছেলেকে কখনও ঠাণ্ডা দুধ বা ফুড খাওয়াতে নাই।

* শিশুকে হর্লিক্স মিল্ক ও বেনজারস ফুড প্রভৃতি কৃত্রিম দুগ্ধ খাওয়ান সম্বন্ধে একটি উর্দু কবিতা মনে পড়ল, যথা:

"তিফিল মেঁ বু আয়ে কেয়া মা বাপ কে আতওয়ার কী ?
দুধ ত ডিবেব কা হায়, তালিম হায় সরকারী কী।।"

অর্থাৎ বেচারা শিশু পিতামাতার স্বভাবের গন্ধ লাভ করিবে কোথায় হইতে? সে ত টিনের ডিবের কৃত্রিম দুধ খায়, আর শিক্ষা লাভ করে গবর্নমেণ্টের। সত্যই ত মাতৃস্তন্য পান না করিলে শিশু মাতার স্বভাবের প্রভাব লাভ করিবে কেমন করিয়া?

"স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি—"

ইত্যাদি চিরসত্য কথাও মিথ্যা হইয়া যায়।

ঘুম—শিশুকে নাওয়াবার পরেই খাওয়াবে, তারপর তাকে ঘুম পাড়াবে। দুধ খাওয়া আঁতুড়ে ছেলের জন্য প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা, দুই বছরের ছেলের জন্য ১৪ ঘণ্টা এবং চার বছরের ছেলের জন্য ১২ ঘণ্টা ঘুমের দরকার। শিশুর মুখে চুষনি দিয়ে রাখা অভ্যাস ভাল নয়। কেউ কেউ আবার ছেলেকে শান্ত রাখার জন্য আফিম খাওয়ায়, এ অভ্যাসও ভাল নয়। ছেলেদের দোলায় শোয়াবার অভ্যাস করতে নাই। দোলা দোলাতে গিয়ে মায়ের বৃথা সময় নষ্ট হয়, আবার শিশুরও শরীর মাটি হয়। ছেলের শোবার ঘরে যেন পরিষ্কার বাতাস খেলতে পারে। ঘরে বাতাস আসবে, কিন্তু ছেলের গায়ে যেন জোরে বাতাস না লাগে। ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগবার ভয় খুব বেশী। প্রায়ই দেখা যায়, শিশু ভিজা বিছানায় শুয়ে থাকে। বিশেষতঃ ঘুমের সময় যদি ভিজা বিছানায় থাকে কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস আদুল গায়ে লাগে, তবে বিপদের ভয়। ফ্লানেলের টুকরো দিয়ে ছেলেকে ঢেকে রাখবে। শোবার ঘরে কেরোসিনের আলো রাখতে নাই। এক কোণে সর্ষের তেলের একটা প্রদীপ রাখবে।

যদি সম্ভব হয়, শিশুকে আলাদা বিছানায় শোয়ান ভাল। তা হ'লে সে স্বাধীনভাবে নড়তে চড়তে পারবে। মায়ের সঙ্গে শু'লে সে ততটা পরিষ্কার বাতাস পায় না, মায়ের নিঃশ্বাসের বাতাসে তার অনিষ্ট হয়। মশা মাছির উপদ্রব থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য মশারী খুব দরকার। ঘরের মেজেতে বা কোন পাত্রে জল খোলা থাক্‌লে তাতে মশা জন্মায়; ঘরে আবর্জনা থাকলে মাছি হয়। যাতে মশা ও মাছি না জন্মাতে পারে, সে দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখা চাই। তার ঔষধ কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। কাপড় প্রতিদিন রৌদ্রে দেওয়া চাই; রোদ না থাকলে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিম্বা কাঠকয়লার আগুনে বিছানার কাপড় গরম করে নেবে।

শিশুর সামান্য অসুখ হ'লেও যত্ন করা চাই। ছেলেদের পরিপাক, অর্থাৎ হজম ঠিক হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। কাঁদলেই দুধ খাওয়াবে না, বরং অন্য কোন অসুবিধা আছে কি না তার তদন্ত করতে হবে। ঔষধ ব্যবহার যথাসাধ্য কম করবে। ঔষধের অভ্যাস ভাল নয়। খুব দরকার না পড়লে ডাক্তার ডাকবে না। আর যখন ডাক্তার ডাকবে, তখন ডাক্তারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমি জানি, অনেক সময় গিন্নীরা ডাক্তারকে ফাঁকি দেন; অর্থাৎ ডাক্তারের উপদেশ মানেন না, পরে ডাক্তারকে মিথ্যা কথা বলেন যে, হ্যাঁ, ঠিক সময় মত ঔষধ দিয়েছি; ঐ পথ্য ছাড়া আর কিছু খায় নি। এতে অনিষ্ট কার—ডাক্তারের, না গিন্নীদের,—আপনারাই

ভেবে দেখুন। নাওয়া, খাওয়া, ঘুম ঠিক নিয়ম মত হ'লে শিশুদের বেশী অসুখ না হওয়াই সম্ভব। পরিষ্কার বাতাস সব চেয়ে দরকারী জিনিস। মানুষ খেতে না পেলে ১৩ দিন, জল না পেলে ৩ দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু বাতাস না পেলে ৩ মিনিটের অধিকক্ষণ বাঁচতে পারে না। আমরা ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র সর্বপ্রথমে বাতাস খেতে অর্থাৎ নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করি, আর জীবনের শেষ মুহূর্তে নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়ি। তাই বলি, পরিষ্কার বাতাসটা সব চেয়ে বিশেষ দরকারী।

কেবল যে আমাদের দেশেই বেশী লোক মারা যাচ্ছে তা নয়। মানবজাতির এই যে ভয়ানক অধঃপতন—এটা প্রথমে ইংলণ্ড ১৮৯৯ ও ১৯০২ সনে বুয়র যুদ্ধের সময় অনুভব করেন। সৈন্য সংগ্রহ করবার সময় ডাক্তারেরা পরীক্ষা ক'রে যখন একে একে অনেক লোককে সেপাই হবার উপযুক্ত নয় বলে বাদ দিতে লাগলেন, তখন কর্তাদের চৈতন্য হ'ল যে, শিশু রক্ষার উপায় করতে হবে, নচেৎ সমস্ত দেশের লোক অধঃপাতে যেতে বসেছে।

এবারের যুদ্ধের সময় ফ্রান্স বুঝতে পারলেন যে, তাঁর লোকবল কমে যাচ্ছে; তাই শুনেছি তাঁরা আইন করেছেন যে, গবর্নমেন্ট দেশের পোয়াতিদের প্রত্যেক ছেলের জন্য একটা করে বৃত্তি দিবেন, যাতে শিশুর যত্ন হয়। যে ঘরে চারিটি ছেলে মেয়ে আছে, সে স্থলে ছেলের বাপকেও একটা আলাদা বৃত্তি দেওয়া হয়। ফল কথা, ইউরোপ মানুষ রক্ষা সম্বন্ধে সাবধান হয়েছেন, এখন আমাদের সাবধান হবার পালা।

আমার মনে হয়, এ শিশু মহামারীর আর একটা বিশেষ কারণ আমাদের দেশের বাল্যবিবাহ। ডাক্তার ভারতচন্দ্র বলেছেন, "মায়ের কর্তব্য না শিখে কেউ যেন মা না হয়।" যে নিজেই ১২.১৩ বছরের বালিকা, সে আর কর্তব্য শিখতে সময় পেলে কখন? উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের মতে কুড়ি বছর বয়সের আগে মেয়ের বিবাহ দিতে নাই।

মেয়েদের শরীর যাতে ভাল থাকে, সেদিকেও নজর রাখা দরকার। বালিকা স্কুলে মেয়েদের শরীর ভাল রাখবার জন্য ব্যায়াম করার ব্যবস্থা আছে বটে, তা ত কাজে পরিণত করবার যোটি নেই। কারণ ছাত্রীর মা বাপ ড্রিল করতে বারণ করেন। মেয়েরা ১২ বছর বয়স পর্যন্ত জড়ভরত হয়ে বসে থাকবে, তারপর তাদের বিয়ে হবে; ফল—ছেলে বাঁচে না, কপাল মন্দ!

আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, আজ আমি যা বলছি, তা এই প্রথম বলা নয়। আমি ১৪ বছর পূর্বে বলেছিলাম, "যাঁরা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে

করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট "পাহলোয়ান" দেখিতে চাহেন কি না? * * * যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁরা সুকুমারী-গোলাপ লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!" ইত্যাদি। (মতিচুর প্রথম খণ্ড—৪৯ পৃষ্ঠা।) যা হউক, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশরক্ষার জন্য দু'টি বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে দেখছি। প্রথম স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার; দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের বেশ করে পড়া-লেখা শিখাতে হবে, যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শিখে; আর অল্প বয়সের ছেলে মেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে হবে। আপনারা ভেবে দেখেছেন, সধবা মেয়েমানুষ বেশির ভাগে মরে কেন? কারণ তাদেব স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বলে। এখন দেখছি, শিশু রক্ষা করতে হ'লে আগে শিশুর মা'দের রক্ষা করা দরকার। ভাল ফসল পেতে হলে গাছে সার দেওয়া দরকার। বুঝলেন? মেয়েদেরও খাওয়া দাওয়ার একটু যত্ন করবেন। মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় বলে বেচারীদের শুকিয়ে মারবেন না। তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ গৃহের গৃহিণী; তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী।

মুক্তিফল

[রূপকথা]

কাঙ্গালিনী বহুদিন হইতে পীড়িতা। তাঁহার জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছে—কাঙ্গালিনী বুঝি এখন মরেন। অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসা হইতে পারে না—চিকিৎসা দূরে থাকুক, দিনান্তে একবার আহার্যও জোটে না, একমাত্র জীর্ণকন্থা দারুণ শীত ও লজ্জা নিবারণের সম্বল। যিনি এক কালে ভোলাপুরের রানী ছিলেন তিনি অদ্য কাঙ্গালিনী!

কাঙ্গালিনী তরুতলে শ্যামল দূর্বাশয়নে শায়িতা। অসংখ্য মশা মাছি তাঁহার ক্ষত অঙ্গ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছে। তিনি রোগে ভুগিয়া এত দুর্বল হইয়াছেন যে, মশা মাছিও তাড়াইতে পারেন না। তাঁহার বালক পুত্র নবীন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছে। সে কখন দূর্বা লইয়া খেলা করে, কখন বা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া মাছি তাড়ায়। কাঙ্গালিনী যখন অসহ্য যাতনায় অস্থির হন, মুদ্রিত নয়নে অশ্রু বিসর্জন করেন, নবীন তখন তাহার ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা মাতার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলে, "মা! আমি বড় হইলে তোমাকে এত এত ভাত আনিয়া দিব, তোমায় বানারসী সাড়ী পরাইব!"—নবীনের বালসুলভ বাচালতায় তিনি আপন যন্ত্রণা ভুলিয়া মৃদু হাস্য করেন।

তরুশাখায় বসিয়া একটি পাখী মধুর স্বরে বলিতেছিল,—"চৌদ্দপুত——এত দুখ!"* তাহা শুনিয়া কাঙ্গালিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "পাখীটা আমারই দুঃখগাথা গাহিতেছে! আমি শত শত পুত্রের জননী হইয়া এত কষ্ট ভোগ করিতেছি! হায়! আমার এ দুঃখ-অমানিশা কি কখন পোহাইবে?"

দর্পানন্দ নূতন বুটজুতা পায়ে মচ্ মচ্ করিয়া আসিয়া কাঙ্গালিনীকে সহাস্যে বলিলেন, "মা! আর তোমার দুঃখ-দারিদ্র্য রহিবে না, আমি তোমার জন্য সোনার মল গড়াইতে দিয়াছি।" কাঙ্গালিনী অতি কষ্টে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! আগে প্রাণে বাঁচি ত! ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত"—

* যেমন কতিপয় পাখীর স্বরে "চোখ গেল," "বউ কথা কও" ইত্যাদি শুনা যায়, সেইরূপ একটি পাখীর ডাক "চৌদ্দ-পুত এত দুখ" এই কথার অনুরূপ।

দর্প। (বিরক্তির সহিত) তোমার দুর্নিবার ক্ষুধার তৃপ্তি কিসে হইবে, আমি ত জানি না। বুড়া মানুষদের লইয়া বড় জ্বালাতন হইতে হয়। তুমি বীফ-টী ও এরারুট বিস্কিট খাইতে চাও না, তবে খাইবে কি?

কাঙ্গালিনী। আমি গরীব মানুষ, একমুঠা মুড়ি মুড়কি পাইলে বাঁচি।

দর্প। ও সব অসভ্য লোকের কুখাদ্য। তুমি যদি পনির, বিস্কিট, মার্মালেড ও দুধের মোরব্বা না খাও, তবে উপবাসে মর। আমি আর তোমার জন্য কিছু করিতে পারিব না। দেখি তোমার জ্বর সারিয়াছে কি না, এই নাও এক মাত্রা কুইনাইন খাও।

কাঙ্গালিনী। আমার রোগ কুইনাইনে সারিবার নহে।

"তবে মরিতেছ মর।"—এই বলিয়া দর্পানন্দ চলিয়া গেলেন।

কাঙ্গালিনীর অন্যতম পুত্র প্রবীণ আসিয়া মাতার নিকট বসিলেন। তিনি সস্নেহে জননীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা! তুমি দিন দিন বড়ই রোগা হইতেছ।"

কাঙ্গালিনী দর্পানন্দের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়াছিলেন, এখন অভিমান করিয়া বলিলেন, "সে জন্য তোর ভাবনা কেন? তোদের 'শেরি', 'শ্যাম্পেনের' অভাব না হইলেই হইল!"

প্রবীণ। বন্ধুবান্ধব সহ 'শেরি', 'শ্যাম্পেন' পান করেন তোমার ধনবান পুত্র দর্পানন্দ; সে কথা আমাকে বল কেন মা? আমি ত সুরা স্পর্শ করি না, কেবল বিস্কিট খাই। আর এ কি কথা বল মা,—তোমার জন্য আমরা ভাবিব না? আমরা তোমার এতগুলো সন্তান থাকিতে তুমি অনাহারে বিনা-চিকিৎসায় মারা যাইবে?

এই সময়ে শাখাস্থিত পাখীটা আবার ডাকিয়া উঠিল—"চৌদ্দ পুত—এত দুখ"। প্রবীণ তদুত্তরে বলিলেন, "না পাখী, আর এত দুঃখ থাকিবে না—আমরা মায়ের দুঃখ দূর করিব।"

কাঙ্গালিনী। হাঁ, মরিলে ত দুঃখ দূর হয়ই—এখন আমি মরিতে প্রস্তুত।

নবীন মাতা ও ভ্রাতার কথোপকথন বুঝিতে না পারিয়া বিস্ফারিত নেত্রে মাতার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিল, আর এক একবার ভ্রাতার মুখপানে চাহিতেছিল। মা মরিবেন, এই কথা শুনিবা মাত্র সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঙ্গালিনী পুত্রকে আদর করিয়া বলিলেন, "তুই কাঁদিস্ না, আমি মরিব না। তোর দাদার সঙ্গে খেলা করিতে যা।"

নবীন। এই ত আমি এত বড় হইয়াছি, আর খেলা করিব না। চল দাদা, মা'র জন্য ওষুধ আনি গিয়া।

প্রবীণ। আমাদের সাধ্যমতে যে ঔষধ আনি তাহাতে মায়ের উপকার হয় না। মা! তুমি কি ঔষধ খাও না?

কাঙ্গালিনী। থাক বাবা! আমার জন্য আর ভাবিও না। এখন আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়! তোমরা দীর্ঘজীবী হও, তোমাদের বালাই লইয়া আমি মরি!

নবীন। (সজলনয়নে) তুমি মরিলে আমি বড় কাঁদিব! মা গো! তোমায় মরিতে দিব না।

কাঙ্গালিনী। ওরে হতভাগা ছেলে! তোরই জন্য মরিতে পারি না। যে দিন সিংহাসনচ্যুত হইলাম, যে দিন রাজরানীর পদ হারাইয়া কাঙ্গালিনী হইলাম, সেই দিন মরিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তোরা অসহায় শিশু ছিলি বলিয়া মরি নাই! তোদের এই অবস্থায় ফেলিয়া মরিতেও কষ্ট হয়। নচেৎ মরণে ভয় করি না,—এমন ঘৃণিত জীবন বহন করা অপেক্ষা শতবার মৃত্যু শ্রেয়ঃ!

নিন্দুককে সঙ্গে লইয়া দর্পানন্দ এই সময় আবার আসিয়া বলিলেন, "ঔষধ পথ্য না খাইলে মানুষ বাঁচে কি রূপে? মা! তুমি এমন অবোধ মেয়ে কিছু বুঝ না। আমি সুবর্ণমল পরাইয়া তোমার চরণ উজ্জ্বল করিতে চাই, তবু তুমি সন্তুষ্ট হও না। আবার বলি কুইনাইন খাও।"

কাঙ্গালিনী। দেখ দর্প! আমাকে আর জ্বালাতন করিস্ না। আমি দীন দুঃখিনী অন্নভিখারিণী, তোমার স্বর্ণমল আমার পক্ষে উপহাস মাত্র। আর আমার রোগ ঔষধে সারিবার নহে। যাহাতে এ রোগ সারে, সে কার্য তোমার ন্যায় আনাড়ী পুত্রের অসাধ্য। তুমি নিজের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিও, আর চাই কি?

নিন্দুক। যাহাতে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়, এমন কার্য দর্পানন্দ কখন করে নাই, এখন সুবর্ণ বেড়ী পরাইয়া মায়ের চরণ উজ্জ্বল করিতে চাহিয়াছিল, বেচারার সে সাধও অপূর্ণ রহিল! অবশেষে কুইনাইন খাওয়াইয়া মায়ের মুখ তিক্ত করাও হইল না!

কাঙ্গালিনী। যাও নিন্দুক! তোমার কথা শুনিলে আমার গা জ্বলে!

প্রবীণ। কি করিলে মা তোমার রোগ সারিবে, আমি প্রাণপণে সে সাধনা করিব। যদি তোমার রোগ ক্লেশ নিবারণ করিতে না পারি, ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার শিক্ষা-দীক্ষায়!

নিন্দুক। বাস্! আর ভাবনা নাই! প্রবীণ আমার অদ্বিতীয় বাক্‌পটু—বাক্যেই সে সিদ্ধিলাভ করিবে!

নবীন। তোমার পায়ে পড়ি, বল মা! কি করিলে তুমি ভাল হইবে!

কাঙ্গালিনী। বলিলে লাভ কি? তুই কি সে ঔষধ আনিতে পারিবি?

প্রবীণ। আমি আনিতে পারিব—আমি থাকিতে তোমার চিন্তা কি মা?

কাঙ্গালিনী। তবে শুন। বহুদিনের কথা,—জনৈক সন্ন্যাসী আমার বাড়ী অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, আমি পুত্র ও কন্যার প্রতি তুল্য ব্যবহার করি না। তিনি বিদায় লইয়া যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, "বৎসে তুমি পুত্রকে অধিক স্নেহ কর, কন্যাকে একটুও আদর যত্ন কর না, ইহা বড় অন্যায়। পরিণামে তুমি এই অতি আদুরে পুত্রের দ্বারা কষ্ট পাইবে।" আমি ভাবিলাম, কন্যার প্রতি অধিক যত্ন প্রদর্শন করিলে লাভ কি? কন্যা কি আমার ভোলাপুর রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে? প্রকাশ্যে ব্যস্তভাবে বলিলাম, "প্রভো! আমায় শাপ দিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি শাপ দিব কি, যে যাহা করে তাহাকে সে কর্মফল ভোগ করিতেই হয়। কন্টক বপন করিয়া কেহ কুসুম চয়ন করে কি? অযোগ্য পুত্রের জননী হওয়া এবং অপত্যস্নেহে পক্ষপাতিতা করিবার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে।" আমি পুনরায় তাঁহার পদযুগল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত দিনে আমার শাপাবসান হইবে?" তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "কৈলাস-শিখরে মুক্তিফলের গাছ আছে; যে দিন কেহ তোমাকে সেই গাছের ফল আনিয়া খাওয়াইবে, সেই দিন তুমি শাপমুক্ত হইবে।"

প্রবীণ। আমি এখনই তোমাকে মুক্তিফল আনিয়া দিতেছি।

দর্প। কৈলাস পর্বত এখন মায়াপুরের রাজার রাজ্যভুক্ত। সুতরাং মুক্তিফল আনয়ন সহজ নয়। মা! তুমি এমন কথা বল যাহা মানবের সাধ্যাতীত।

নিন্দুক। কোন কার্যই মানুষের সাধ্যাতীত নয়।

প্রবীণ। আমি মায়াপুরের রাজার চরণে ঐ ফল ভিক্ষা চাহিব। আমি সম্রাটের চরণ উদ্দেশে চলিলাম।

কাঙ্গালিনীর দুহিতা শ্রীমতী কাঁদিয়া বলিলেন, "আহা! মা আমাদের প্রতি অনাদর অবহেলা করার জন্য শাপগ্রস্তা হইয়াছেন। তাই আমরা কি মায়ের কাজ করিব না? চল দাদা, আমিও তোমার সঙ্গে রাজদ্বারে ভিক্ষা চাহিতে যাইব।"

দর্প। তুমি আবার কোথায় যাইবে? তুমি যেখানে আছ, সেই খানে থাক, আর এক পদ অগ্রসর হইও না।

নিন্দুক। (করতালি দিয়া) শ্রীমতী আর ফাটকে আটক রহিবে না। আর মায়ের চিন্তা কি?—এইবার শ্রীমতী মুক্তিফল আনিবে।

শ্রীমতী। (স্বগত) দর্পদাদা অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিবেন না, নিন্দুক দাদার বিদ্রূপ-বাণ ততোধিক অসহ্য! যদি ঈশ্বর সহায় হন, তবেই মায়ের সেবা করিতে পারিব। (প্রকাশ্যে) নিন্দুক দাদা! তোমার বিদ্রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, বরং তোমার দুর্গতির জন্যই আমার দুঃখ হয়—আমি তোমারই জন্য ব্যথিত।

নিন্দুক। নেহাল হইলাম! শ্রীমতী আমার প্রতি দয়া করেন, আর চাই কি?

প্রবীণ। শ্রীমতী, তোমার রচিত দুই চারিটি গানের নকল আমাকে দাও দেখি, ভিক্ষা প্রার্থনার সময় গানের প্রয়োজন হয়।

শ্রীমতী। ঐ জন্যই ত আমি তোমার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম—আমিও গান গাইতাম—

প্রবীণ। না বোন, তোমাকে কৈলাস পর্যন্ত যাইতে দিতে পারি না। তুমি আমার সহিত গল্প কর, উপন্যাস পাঠ কর, আমার সঙ্গে পারমার্থিক গান গাও—এই পর্যন্তই যথেষ্ট; ইহাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা বা সমকক্ষতা দিতে পারি না।

নিন্দুক। সীমা লঙ্ঘন করিও না, শ্রীমতী, লোক হাসাইও না।

দর্প। দেখ ত সুমতি কেমন সরল মেয়ে, সে ত কুটিরের বাহিরে পদার্পণ করে না।

শ্রীমতী। সুমতি বোকা, তাই কোণের ভিতর লুকাইয়া থাকে। আর তাহার বাহিরে আসিবার সাহস কই?

সুমতি কাজ না পাইয়া কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া জীর্ণকন্থা সংস্কার করিতেছিলেন এবং নীরবে সকলের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন; তিনি শ্রীমতীর শেষ কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, "আমি বোকা হই বা ভীরু হই, কিন্তু যথাবিধি শক্তি সঞ্চয় না করিয়া দিদির মত হঠাৎ বাহিরে যাইব না। দিদি বাহির হইয়াই এমন কি দিগ্বিজয় করিয়াছেন? কত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন?—ঐ উপন্যাস পাঠ করা আর দাদার সহিত সুর মিলাইয়া গান করা— বাস্? ঐ পর্যন্তই ত?"

দর্প। সুমতি বোকা বলিয়াই ত আমরা উহাকে একটু কৃপাচক্ষে দেখি।

শ্রীমতী। বেশ। দেখিব, সুমতি আর কত দিন তাহার মস্তিষ্কের অস্তিত্ব গোপন রাখে। কিন্তু দাদা, আমাদিগকে মস্তক উত্তোলন করিতে না দিলে তোমাদেরও বলবৃদ্ধি হইবে না যে।

নিন্দুক। চুপ কর শ্রীমতী, তোমার বক্তৃতা শুনিতে চাই না। তুমি নিজের কাজ দেখ. হাঁড়ি বাসন ধোও গিয়া।

২

কৈলাস পর্বত শিখরে মায়াপুরের রাজার প্রমোদ-কানন। আঠারো হাজার দৈত্য মুক্ত কৃপাণ হস্তে উদ্যান রক্ষা করিতেছে। মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু দূরে থাকুক, পক্ষী, মক্ষিকা, পিপীলিকা পর্যন্ত সে কাননে প্রবেশ করিতে পারে না।

মায়াপুরের বৃদ্ধ রাজা দিবাশেষে রাজকার্য সমাধা করিয়া কর্মচারীবৃন্দকে একে একে বিদায় দিলেন। এখন রাজকুমার, মন্ত্রী এবং কতিপয় প্রধান কর্মচারী মাত্র আছেন। এমন সময় একজন দৈত্য রাজসভায় আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল, "মহারাজ! ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?"

রাজা। নির্ভয়ে বল।

দৈত্য। কৈলাস শিখরে জিনকুল চূড়ামণি মহারাজার প্রমোদ-কাননে মুক্তিফলের গাছ আছে—

মন্ত্রী। হাঁ, তাই কি?

দৈত্য। সে অমর-বাঞ্ছিত বৃক্ষে শত বৎসরে একটি ফল হয়—

জনৈক কর্মচারী। হাঁ জানি। আবার তাহাতে ফল ধরিয়াছে, ইহাও আমরা অবগত আছি। তোমার বক্তব্য শীঘ্র বল, দীর্ঘ ভূমিকায় প্রয়োজন নাই।

দৈত্য। (ভয়কম্পিত কলেবরে) জনশ্রুতি শুনিতে পাই, ভোলাপুর হইতে মানব-নন্দন মুক্তিফল চয়ন করিতে আসিতেছে—

যুবরাজ। অসম্ভব! মিথ্যা জনরব।

মন্ত্রী। যদিই জনশ্রুতি সত্য হয়, তবে তোমরা আঠারো হাজার দৈত্য আছ কিসের জন্য?

কর্মচারী। তোমাদের ন্যায় ভীমকায় জাগ্রত প্রহরী থাকিতে ভয় কি? বিশেষতঃ পৃথিবীতে ভোলাপুর অতি ক্ষুদ্র নগণ্য দেশ, তথাকার মানব-সন্তান কি তোমাদের অপেক্ষা অধিক বলবান?

দৈত্য। না মহাশয়! আমি কেবল রাজধানীতে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আমরা সকলে সশস্ত্রে প্রস্তুত আছি—আবশ্যক হইলে কৈলাস ভূধরে মানব-রক্তের নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইবে।

মন্ত্রী। বীরের উপযুক্ত কথা! এখন তুমি যাইতে পার।

যুবরাজ। (আসন ত্যাগ করিয়া) আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সকলে। আপনি বলুন।

যুবরাজ। আমি রাজকার্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার আস্পর্দ্ধা রাখি না। কিন্তু এ সময় মন্ত্রীবরের কথার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি দৈত্যদিগকে মানব-রক্তের নদী প্রবাহিত করিতে উৎসাহ দিয়া বুদ্ধিমানের কার্য করেন নাই। ভোলাপুরের নির্বীর্য মানব ধ্বংস করা আমাদের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত জাতির পক্ষে কিছুমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে। পরন্তু মায়াপুররাজ দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ নামে জিন-জগতে বিখ্যাত। মায়াপুর রাজ্যে নরশোণিত পাত হইলে আমাদের প্রতিবেশী জিনরাজগণ কি বলিবেন? সমস্ত পরীস্থান আমাদিগকে বীর না বলিয়া কাপুরুষ বলিবে না কি?

মন্ত্রী। যুবরাজের কথা অতি যুক্তিসঙ্গত। মানব-রুধিরে আমাদের সুনাম কলঙ্কিত হইবে, এমন কি সমগ্র পরীস্থান কলুষিত হইবে। কিন্তু মানবের আস্পর্দ্ধাও ত অসহ্য! তাহারা মুক্তিফল লইতে আসিতেছে, তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কি উপায়?

কর্মচারী। যুবরাজ অবশ্যই উপায় ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজা। বৎস! তোমার যুক্তি অতি সারবান। তুমি পরীস্থানের মুকুটতুল্য মায়াপুর সাম্রাজ্যের আসন্ন কলঙ্ক মোচন করিলে। এখন যাহাতে কার্যসিদ্ধি হয় তাহাই কর। তুমি কৃতকার্য হইলে তোমাকে রাজ্যদান করিয়া আমি বানপ্রস্থ লইব।

সকলে। যাহাতে সাপ মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে, তদ্রূপ ব্যবস্থা হওয়া চাই।

যুবরাজ। কথিত আছে, মানবজাতি অতিশয় মূর্খ এবং জিন জাতি ও দৈত্যগণ মায়াবিদ্যায় পারদর্শী। অজ্ঞ বিবেকহীন মানবকে ইন্দ্রজালে বশীভূত করা অতি সহজ ব্যাপার। মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধর করুণ সুরে সহানুভূতিসূচক মোহন মুরলী বাজাইলে, তাহা শুনিয়া মানবগণ তালে তালে নৃত্য করিবে। তখন অন্যান্য জিন গায়কেরা তাহাদের বলিবে, চল আমরা তোমাদিগকে মুরলীধরের নিকট লইয়া যাই। তাহাতে মানুষেরা সম্মত হইলে জিন ও দৈত্যগণ অনায়াসে তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে।

উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী করতালি-সহকারে যুবরাজের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর যুবরাজ প্রধান প্রধান দৈত্য, প্রহরী ও মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধরকে লইয়া কয়েক দিন গোপনে পরামর্শ করিয়া সমস্ত ঠিক করিলেন।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, দৈত্যগণ কোন প্রকারে মানবের অনিষ্ট করিবে না। তাহারা কেবল মানুষের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং যথাকালে মায়াপুরে সেই সংবাদ প্রেরণ করিবে।

বহুদিন পূর্বেই কৈলাস পর্বতের চতুর্দিকে কন্টক রোপণ করা হইয়াছিল। জিন, পরী ও দৈত্যগণ মায়াযানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে।

৩

লায়েক দিবানিশি জননীর সেবা করিয়া ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের আহার-নিদ্রায় উদাসীন থাকায় তাঁহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। তিনি মাতার পদপ্রান্তে নীরবে বসিয়া তাঁহার পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে ছিলেন। পুত্রের সস্নেহ করস্পর্শে কাঙ্গালিনী নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "লায়েক! তুমি এখানে। তাই ত, লায়েক ভিন্ন অভাগিনী মায়ের ব্যথায় আর কে ব্যথিত হইবে? তা বাছা! তোমার যত্নে আমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। মুক্তিফল প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি ব্যাধিমুক্ত হইব না।"

শ্রীমতী ছোট একটি থালায় কিছু খাবার আনিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা, তুমি বড়ই দুর্বল হইয়াছ। এখন কিছু একটু মুখে দাও, তবে একটু সবল হইবে।"

কাঙ্গালিনী। মুক্তিফলের পূর্বে আর কিছু ভক্ষণ করিতে পারি না।

লায়েক। প্রবীণ কবে না কবে ফল আনিবে। এদিকে তুমি যে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছ, মশা মাছি তাড়াইবার সামর্থ্যও তোমার নাই।

শ্রীমতী। দাদার ফল আনয়নের পূর্বেই হয়ত মা মারা যাইবেন। হায়! রোগীর মৃত্যুর পর ঔষধ আসিলে লাভ কি?

কাঙ্গালিনী। আমার জন্য ভাবিস্ না মা। আমি মরিব না,—আমি মরিলে জগতে ক্লেশ-ভার কে বহন করিবে? উপবাসে থাকিয়া নানা ব্যাধির আধার হইয়া অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়াও আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে। এই যে পরিধানে জীর্ণ কন্থাখণ্ড—ইহার একপ্রান্ত মায়াপুর রাজ্যের জিনদের হস্তে,

জন্য প্রাপ্ত আমি অভাগিনী অর্ধ উলঙ্গিনী দ্রৌপদীর ন্যায় প্রাণপণে ধরিয়া কটিদেশে বেষ্টন করিয়া কোন মতে লজ্জা নিবারণ করিতেছি। এত অপমান সহিয়াও আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে। হে আল্লাহ্! আমায় ক্ষমা কর।

ইতিমধ্যে নায়েক রোগ-যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। শ্রীমতী শশব্যস্তে দৌড়িয়া ভ্রাতার নিকট আসিলেন। সহোদরের আসন্নকাল বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমতী দীন-নয়নে মাতার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"দেখ মা! দাদা এমন হইলেন কেন?"

কাঙ্গালিনী তখন কোনরূপে উঠিয়া মুমূর্ষু পুত্রকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "নায়েক! নায়েক! বাপ! তুই আমারে ছাড়িয়া চলিলি! হায়! এ দুর্দিনে তুই আমার সহায় ছিলি! আমার মরণ লইয়া তুই মরিলি!"

নায়েক অর্ধনিমীলিত লোচনে বলিলেন, "মা, তুমি কাতর হও কেন? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মায়ের সেবা করিতে গিয়া মরিতেছি। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? যে নিজের জন্য মরে তাহার মৃত্যু ক্লেশদায়ক; যে মায়ের চরণে আত্মবলিদান করে—"এইমাত্র বলিয়াই নায়েক প্রাণত্যাগ করিলেন।

কাঙ্গালিনী। এই জন্য নায়েককে আমার শুশ্রূষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আমার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া নায়েক মারা গেল। হায়! অভিশপ্তার শাপ মোচন করে, কাহার সাধ্য! পুত্রগুলিকে অধিক ভালবাসিতাম—অতি সোহাগে তাহাদের কেহ হইল দর্পানন্দ, কেহ হইল কৃতঘ্ন, কেহ হইল নিন্দুক, কেহ হইল মাতৃদ্রোহী—আর যে মানুষ নামের উপযুক্ত হইল, সে সোনার চাঁদ নায়েক শমন-কবলে পড়িল। আর আমার আশা-ভরসা কোথায়?

শ্রীমতী। মা, নৈরাশ্যে আকুল হইও না,—এখনও ধীমান দাদা, প্রবীণ দাদা ও নবীন আছেন; আমিও তোমার দীনতমা সেবিকা আছি। আশা ছাড়িতে পারি না। তোমার এ দুর্দশা দূর হইবে এরূপ আশা করি।

কাঙ্গালিনী। দর্পানন্দের এত ঐশ্বর্য থাকিতে আমি দীনহীনা, এ-দুঃখ কাহাকে বলিব?

নবীন নায়েকের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকাডাকি করিল। নায়েকের আত্মা শূন্য [illegible] মতীকে গিয়া বলিল, "দিদি, নায়েক দাদা এ-সময় [illegible]

শ্রীমতী। আমাদের নায়েক দাদা ঘুমান নাই—অমর হইয়াছেন।

নবীন। আমিও অমর হইব, দিদি।

কাঙ্গালিনী। বেশ! যা, এখন বকিস্ না, খেলা কর্ গিয়া।

নবীন। একা একা খেলা ভাল লাগে না, প্রবীণ দাদা কখন ফিরিবেন?

কাঙ্গালিনী। প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া আসিবেন।

নবীন। দাদা মুক্তিফল আনিতে পারিবেন না, আমি আনিতে যাই।

শ্রীমতী। তুমিও ত এখন এত বড় হইয়াছ, বেশ ত যাও না,—ফল লইয়া শীঘ্র ফিরিও—আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম।

৪

প্রবীণ কৈলাশ ভূধরের পাদমূলে বসিয়া প্রতিদিন মায়াপুরের রাজাকে সম্বোধন করিয়া আবেদনের পাণ্ডুলিপি লিখেন। আবেদন লিখিতে ইতিমধ্যে ঝাড়া সাত মণ মসী ব্যয় হইয়াছে; লেখনীর জন্য দেশের সমুদয় খাগ্ড়া বনের খাগ্ড়া প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে; কাগজে আর কুলায় না, এখন মানকচুর পাতায় আবেদন লিখা হয়। এদিকে আবার মানকচু-পত্রের বিনাশ দেখিয়া মানকচুর দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কায় বরাহকুল অন্নদাতা দেবতার নিকট অভিযোগ-লিপি প্রেরণ করিয়াছে।

প্রবীণ এক একবার এক এক দৈত্যের দ্বারা আবেদন-লিপি প্রেরণ করেন, কিন্তু আবেদনের কোন উত্তর আর প্রাপ্ত হন না। মায়াবী গায়কেরা তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, রাজা স্বহস্তে মুক্তিফল চয়ন করিয়া তোমাদিগকে দিবেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

প্রবীণ। (মায়াবীর প্রতি) আমি ত নিশ্চিন্ত আছিই। কিন্তু বাড়ী গেলেই দর্পানন্দ মাতাকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন, "তোমার গুণধর পুত্র মুক্তিফল আনিল কই?" আর ইদানীং নবীন বড় হইয়াছে, তাহার তাড়া আরও অসহ্য বোধ হয়। সে আমাকে কিছুতেই স্থির থাকিতে দেয় না, নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করে।

মায়াবী। নবীনটাকে কোনরূপে জব্দ করিতে পারেন না?

প্রবীণ। পঁচিশ ত্রিশ জন দৈত্য প্রহরী সহায় হইলে নবীনকে জব্দ করা কঠিন ব্যাপার নয়।

মায়াবী। নবীনের ধরা পাইলে হয়,—সে বড় [illegible] দৈত্যদের নিকট আসিয়া ফল প্রার্থনা করে না এবং আমাদের [illegible]

সর্বদা দূরে দূরে থাকে। আর দর্পানন্দের বিদ্রূপের জন্য ভাবিবেন না, তিনি এক প্রকার আমাদের হাতেই আছেন। তিনি বানর সাজিতে চাহেন, যে জন্য লাঙ্গুলের প্রয়োজন। সেই লাঙ্গুল লাভের জন্য তিনি এখন জিনের সাধনা করিতেছেন।* এবার আমরা তাঁহাকে লাঙ্গুল বন্ধনে বাঁধিলে, তিনি আর নড়িতে পারিবেন না,—তাঁহার মুখে কথাটি ফুটিবে না। এ বৎসর যুবরাজের জন্মোৎসবের দিন দর্পানন্দ লাঙ্গুলাবদ্ধ হইবেন।

প্রবীণ। (স্বগত) আমিও লাঙ্গুল লাভ করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন নবীন হাসিবে, সেই ভয়ে লাঙ্গুলের লোভ সম্বরণ করিলাম। দর্পানন্দের ত লাজ নাই, কাজেই ল্যাজেও আপত্তি নাই। (প্রকাশ্যে) ঐ দেখুন, দর্পানন্দ সবান্ধবে আসিতেছেন।

মায়াবী। আসুন, আপত্তি নাই, উনি আমাদের বন্ধু।

দর্প। (মায়াবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া) কুশলে আছেন ত?

মায়াবী। আসুন, বসুন। আপনার সংবাদ কেমন?

দর্প। আমাদের সবই মঙ্গল। আমার লাঙ্গুলের কথাটা বোধ হয় জিনকুল-চূড়ামণি মহারাজের স্মরণ আছে?

মায়াবী। অবশ্য স্মরণ আছে। কিন্তু এক কথা, আপনিও মুক্তিফলের প্রার্থী নাকি?

দর্প। না মহাশয়, আমি কি পাগল? যাহাতে পূজ্যপাদ মায়াপুররাজ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এমন কাজ আমার দ্বারা হওয়া অসম্ভব; সে কথা আমার যমজ ভ্রাতা প্রবীণকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রবীণ। (সভয়ে) আমি কি করিয়াছি? আমি কি বলপূর্বক মুক্তিফল আনিতে যাইতেছি? আমি কেবল রাজার চরণ-কমলে সবিনয় করপুটে ভিক্ষা চাহিতেছি,—দাতার ইচ্ছা হইলে ভিক্ষা দিবেন।

মায়াবী। তাহাই ঠিক। আপনারা রাজার বদান্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা অবশ্যই আপনাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। মুক্তিফল পাকিতে এখনও অনেক বৎসর বিলম্ব আছে, ফলটি পাকিবা মাত্র আমরা আপনাদিগকে সাধিয়া আনিয়া দিব।

* পার্থিব কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় অনেকে জিনের সাধনা (আমল) করিয়া থাকে। মানবের সাধনা-বলে জিন বশীভূত হয়। আলাদিনের প্রদীপের কথা প্রায় সকলেই জানে।

দর্প। সে ফলে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধা মাতা মরিতেছেন, মরুন। আমি এবং আমার একশত ছয়জন বন্ধু জিন রাজার অতিশয় ভক্ত,—সুতরাং আমরা মুক্তিফল চাই না। (বন্ধুদের প্রতি) তোমাদের রচিত সেই স্তব গানটি গাও দেখি।

দর্পানন্দ প্রভৃতি একশত সাতজন সেতার বাজাইয়া সমস্বরে গাহিলেন:

"আমরা ক'জন সবে এক শত সাত
অতি অকপট জিন-ভকত নেহাত।
হৃদয়ের অন্তস্তলে
যে প্রবল বেগে চলে
শীতল বিমল জিন-ভক্তির প্রপাত,
দিগন্ত কাঁপায়ে ওঠে তার কলনাদ।
ধারি না কাহার ধার,—
ভগিনী ভ্রাতার মা'র,—
ক্ষুধায় মরুক মাতা, নাই দৃক্‌পাত।
জিনরাজ-ভক্ত মোরা এক শত সাত।"

গান শ্রবণে মায়াবী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাহ্‌বা দর্পানন্দ! বাহ্‌বা!! আপনারা অতিশয় বুদ্ধিমান, নিজের সুখ-স্বার্থ বেশ বুঝিয়াছেন। তবে আর বুড়িটার জন্য চিন্তা কি?"

দর্প। না, বুড়িমায়ের জন্য আমার কিছু মাত্র চিন্তা নাই; আমাদের সুখ-শান্তি বজায় থাকিলেই হইল।

প্রবীণ। (স্বগত) আমাকে হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া নবীন সুখ শান্তি ভোগ করিতে দিবে না। ধীমান দাদাও বারম্বার তাড়া দিতেছেন। তিনি বলেন, মুক্তিফল প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। আমি কেবল মাতাকে প্রবোধ দিবার জন্য মুখে বলিয়াছিলাম, ফল আনিয়া দিব, কিন্তু নবীন সত্য সত্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। (প্রকাশ্যে) তাই ত ভাই, আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।

মায়াবী। দেখুন, আপনারা ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবেন না। আমরা ব্যাধিক্লিষ্টা কাঙ্গালিনীর জন্যই মুক্তিফল রক্ষা করিতেছি। নতুবা আমাদের আর কি স্বার্থ?

দর্প ও প্রবীণ। তাই ত আহা! আপনাদের কি দয়া!

মায়াবী। প্রবীণ! আপনাকে আমরা যৎপরোনাস্তি ভালবাসি, আপনি সতত আমাদের কাছে কাছে থাকিবেন।

প্রবীণ। (অনুচ্চস্বরে) যে আজ্ঞা; আপনারা আমাকে চোখে চোখে রাখিবেন।

[মায়াবীর প্রস্থান।]

নিন্দুক বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া সকলের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। মায়াবী প্রস্থান করিলে পর তিনি সমক্ষে আসিয়া সহাস্যে প্রবীণকে বলিলেন, "কি প্রবীণ! মুক্তিফল পাইলে?"

প্রবীণ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন, "পাই নাই, পাইবার আশা ত আছে। ধৈর্য ধারণ কর, অধীর হইও না,—আমি নিশ্চিত মাতাকে মুক্তিফল আনিয়া দিব। নবীন পর্বতের সন্নিকটস্থিত অরণ্য খানিকটা পরিষ্কার করিয়াছে; সেই পথে একটু অগ্রসর হইয়া দেখি, কৈলাস কত দূর।"

দর্প। সাবধান! ও পথে পদার্পণ করা উচিত নয়, দৈত্যগণ দেখিতে পাইলে অনর্থ ঘটাইবে।

প্রবীণ। নবীন যে আমাকে ঐ দিকে সোপান নির্মাণ করিতে বলে। সে এত কঠিন পরিশ্রম করিয়া কন্টক উৎপাটন করিতেছে, আর আমি একটু যাইয়া দেখিব না?

দর্প। তা দেখ, কিন্তু নবীন যেরূপ অবিমৃষ্যকারী, সে ইহার ফলে বিপন্ন হইবে।

নিন্দুক মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "নবীন ও প্রবীণের কৈলাস আরোহণ, মুক্তিফল চয়ন,—এ সব কার্য অতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, কারণ দৈত্যগুলি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে কি না!"

প্রবীণ। আমি আত্মগোপন করিতে জানি, আমি নবীনের মত অসতর্ক নই। আমি উভয় কূলের মন রক্ষা করিয়া চলি; নবীনকে বলি, হাঁ সোপান প্রস্তুত করিব; দৈত্যকে বলি, আমি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থাকি, যেই তোমরা উপর হইতে মুক্তিফল ফেলিয়া দিবে, অমনি আমি লুফিয়া লইব।

নিন্দুক ও দর্পানন্দ উচ্চহাস্য করিলেন। প্রবীণ একটু অপ্রস্তুত হইলেন।

৫

মায়াপুর রাজসভায় পাত্রমিত্র সকলে উপস্থিত। মহারাজ অসুস্থতা-নিবন্ধন সভায় আসিতে পারেন নাই, তিনি অন্তঃপুরে পরীমহলে বিশ্রাম করিতেছেন। যুবরাজ রাজকার্য করিতেছেন।

জনৈক কর্মচারী মুরলীধরকে বলিলেন, "কই, আপনার বংশীরবে মানব ভুলিল কই?"

মুরলীধর। আমার মাননীয় বন্ধু সম্ভবতঃ পৃথিবীর সমাচার অবগত নহেন; মানুষ ভুলিয়াছে বই কি।

কর্মচারী। প্রবীণের কথা একরূপ, কার্য অন্যরূপ। তিনি মুখে বলেন. "হাঁ হাঁ, রাজার চরণে শুধু ভিক্ষা চাই", কার্যতঃ কিন্তু তিনি গোপনে নবীনের সহিত কৈলাস পর্বতে আরোহণের নিমিত্ত সোপান নির্মাণ করিতেছেন; এ-সব সংবাদ মুরলীধর অবগত আছেন কি?

অন্য কর্মচারী। তবে ত চিন্তার বিষয়।

মুরলী। (সহাস্যে) আপনারাও ভাল, প্রবীণের সোপান রচনা ছেলে-ভুলান মাত্র। প্রস্তর দ্বারা সোপান প্রস্তুত করিতেছেন, তা'ও আবার বৎসরে এক ধাপের অধিক নির্মিত হয় না।

যুবরাজ। কথা কাটাকাটির কাজ কি, প্রধান গায়ককে ডাকিয়া সমাচার জিজ্ঞাসা করা যাউক।

প্রধান গায়ক তৎক্ষণাৎ মায়াযানে আগমন করিলেন।

মুরলী। বলুন কবিবর, ধরণীর কি সংবাদ? প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া গিয়াছেন?

গায়ক। প্রবীণ মুক্তিফল লইতে পারিবেন, তবে এত দৈত্য প্রহরী আছে কেন? কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষেরা কৈলাস আরোহণে কৃতকার্য হইতেও পারেন।

মন্ত্রী। অসম্ভব। অতি অসম্ভব।

যুবরাজ। গায়ক কিরূপে জানিলেন, প্রবীণ কৈলাস শিখর আরোহণে সক্ষম হইবেন?

গায়ক। প্রবীণ কৈলাসারোহণ করিতে পারিবেন না; সে বেচারা এতদিন কেবল আবেদন লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন নবীনের প্ররোচনায় তিনি সোপান প্রস্তুত করিতে চাহেন। নবীন তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেন না,—নবীনই যত অকাণ্ডের মূল।

মন্ত্রী। তথাপি আশঙ্কার কোন কারণ নাই। নবীন, প্রবীণ, ধীমান, নিন্দুক, দর্পানন্দ প্রমুখ সকলে মিলিয়া সমবেত চেষ্টা না করিলে, তাঁহারা কৈলাস

আরোহণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না; অথচ তাঁহাদের পরস্পরে কখনও একতা স্থাপিত হইবে না, সুতরাং আমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। তদ্ব্যতীত কাঙ্গালিনী পুত্র বলিদান না করিলে মুক্তিফল পাইবেন না। আর তিনি অপত্যবাৎসল্যহেতু পুত্র বলি দিতে পারিবেন না, ইহাও আমরা জানি।

গায়ক। তাহা সত্য, কিন্তু নায়েক স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করিয়াছেন।

সকলে। (সবিস্ময়ে) বটে? কাঙ্গালিনীর অক্ষম ভীরুপুত্র জীবনের মায়াত্যাগ করিতে পারিয়াছে?

গায়ক। হাঁ, নায়েকের আত্মত্যাগ সত্য ঘটনা, আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি।

জনৈক সভাসদ্। তাহা হইলে বেচারী কাঙ্গালিনীকে মুক্তিফলে বঞ্চিত করা অন্যায়।

মন্ত্রী। (ব্যঙ্গ ভাষায়) বটে? তবে আমরা কৈলাস গিরি হইতে আঠারো হাজার দৈত্য প্রহরী সরাইয়া লই—মানব অনায়াসে নির্বিঘ্নে অপক্ক মুক্তিফল খাইয়া দেখুক, তাহার আস্বাদ কেমন?

অনেকে। (এক বাক্যে) না, না। আহা, এমন কাজ করিতে নাই। অবোধ মানবনন্দন স্বকীয় ভালমন্দ বুঝে না, তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ। আমরা থাকিতে তাহারা অপক্ক মুক্তিফল ভক্ষণে বিপন্ন হইবে, ইহা আমাদের দয়াসুধাসিক্ত সুকোমল প্রাণে সহিবে না।

মানবের আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়া রাজসভাস্থিত সকলে এক এক ঘটি অশ্রু বিসর্জন করিলেন।

যুবরাজ। (প্রথমে বহুকষ্টে অশ্রুসম্বরণ পূর্বক) গায়ক কি বিশ্বাস করেন, অপরিণামদর্শী নবীন পর্বতারোহণ করিয়া এখন মুক্তিফল চয়নে কৃতকার্য হইবেন?

গায়ক। না, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। কেবল নবীনের আস্ফালন উল্লম্ফন দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

মন্ত্রী। জ্যোতিষ শাস্ত্রে জানা যায়, যতদিন কাঙ্গালিনীর কণ্যাগণ তাহাদের ভ্রাতৃবর্গের কার্যে সহায়তা না করিবে, ততদিন কেহই মুক্তিফল লইতে পারিবে না। আর কাঙ্গালিনীর দুহিতা কি প্রকার নগণ্য ও অকর্মণ্য, তাহা আপনারা সকলে অবগত আছেন।

সকলে। তবে আমরা বহু বৎসর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

মন্ত্রী। অবশ্য। এইত নবীন ও প্রবীণের সোপান প্রস্তুত ব্যাপারই দেখুন না। নবীন বলেন, "এক ধাপ উচ্চে নির্মাণ করি," "প্রবীণ বলেন, "না, নীচে

নামিয়া আর এক ধাপ প্রস্তুত করি।" নবীন বলেন, "উপরে উঠি"; প্রবীণ বলেন, "নীচে নামি",—এই বিষয় লইয়া উভয় ভ্রাতায় কেবল বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে।

অনৈক পারিষদ্‌। (সহাস্যে) আমার বন্ধু মহোদয়গণ কাঙ্গালিনীর এইসব অযোগ্য পুত্রের আস্ফালন দেখিয়া আমাদিগকে সতর্ক হইতে বলেন। যদি কেহ শূন্যগর্ভ বক্তৃতা গর্জ্জনে শঙ্কিত হন, তিনি কোকিলের কাকলি শ্রবণেও মূর্ছা যাইতে পারেন।

(সভাসদ্‌গণের উচ্চহাস্য)

মন্ত্রী। বাস্তবিক উৎকণ্ঠার কারণ নাই, কেবল কতিপয় দুষ্টবুদ্ধি দৈত্য মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া আমাদিগকে এখন বিরক্ত করিতেছে। *

যুবরাজ। এখন আমরা নিরুদ্বেগ হইলাম। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য নয়; মুরলীধর যথাবিধি মায়াবংশী বাজাইতে থাকুন।

অতঃপর মুরলীধর দ্বিগুণ ত্রিগুণ উৎসাহে মায়াবংশী বাদন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মোহন বাঁশীর ললিত সুর শুনিয়া সপ্তসাগর স্তম্ভিত হইয়া গভীর গর্জ্জন ভুলিল; সদাগতি সমীরণ স্থির হইল; তরুলতা স্থাবর জঙ্গম—সকলে উৎকর্ণ হইল; গগনবিহারী বিহগকুল মধুর কাকলী ভুলিয়া গেল;—তখন বাঁশীর সুরে প্রবীণ ভুলিবেন না কেন? তিনি ত মানুষ বই নন!

৬

কৈলাসের উপত্যকায় নবীন, প্রবীণ, ধীমান ও নিন্দুক উপস্থিত। ধীমান সোপান প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিতেছেন, নবীন তাঁহার উপদেশ উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি কাঁচা বাঁশের মই প্রস্তুত করিতেছে। প্রবীণ অতি ধীরে ধীরে প্রস্তর সোপান নির্মাণের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। নিন্দুক

* সাধারণতঃ মুসলমানেরা ভূত প্রেত বিশ্বাস করে না, কিন্তু জিনপরী ও দৈত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। প্রবাদ আছে, জিনেরা মানবদের সহিত অল্প-বিস্তর হিংসা করে এবং স্থলবিশেষে আবার জিনপরী নরনারীর সহিত বিবাহও করিয়া থাকে। আর দৈত্য-দানবও জিন জাতির সহিত শত্রুতা রাখে। কবির মতে দৈত্য ভীমকায় ও অত্যন্ত বলবান হইয়াও জিনের অধীন থাকে। প্রায় শুনা যায়,—জিনরাজা, দৈত্য প্রজা; অমুক পরীর অন্তঃপুরের রক্ষক প্রহরী দৈত্য ইত্যাদি। যাহা হউক, সামান্য সুবিধা পাইলেই দৈত্য জিনকে অনর্থক বিরক্ত করিয়া বৈরসাধন করে।

কার্য করিতে আসেন নাই, তিনি অপর কর্মোৎসাহী ভ্রাতাদের ছিদ্রাণ্বেষণ করিতে আসিয়াছেন। নিন্দুক সুবিধা বুঝিয়া কখনও নবীনের প্রতি শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, কখনও বা প্রবীণকে বিদ্রূপ ধারায় নাকানি চোবানি খাওয়াইতেছেন। এইরূপে ভ্রাতৃচতুষ্টয় মাতৃকার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নবীন। (প্রবীণের প্রতি) দাদা, তোমার দীর্ঘসূত্রিতা দেখিয়া গা জ্বলে। আজ পর্যন্ত তোমার উপকরণই সংগৃহীত হইল না,—কবে সিঁড়ি হইবে, তবে তুমি উঠিবে? মুক্তিফল আনা তোমার কাজ নয়!

প্রবীণ। ইস্! আমি ২২।২৩ বৎসর হইতে মাতৃসেবা করিয়া আসিতেছি, কৈলাসচূড়ায় উঠিতে চেষ্টা করিতেছি, আজ তুই তিন দিনের ছোঁড়া বলিস্ কি না, 'মুক্তিফল আনা তোমার কাজ নয়!' তুই বুঝি মনে করিস্, ঐ ভাঙ্গা বাঁশের মই দিয়া উঠা যাইবে? একে ত পদচাপে মই ভাঙ্গিয়া যাইবে, দ্বিতীয়তঃ ঝড়বৃষ্টি শিলাপাত হইতে রক্ষা পাইবার কি উপায়?

নবীন। পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে গেলে তুমি বৃষ্টি জলে ভিজিবে না?

প্রবীণ। আমি কি তোমার মত অর্বাচীন যে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অগ্রসর হইব? আমি প্রতি ধাপ সিঁড়ির নীচে এক একটি চোরকুঠরী নির্মাণ করিব, আবশ্যক হইলে—চপলা-চমক দেখিলে তাহার ভিতর লুকাইব।

ধীমান। নিজের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে অত ভাবিতে গেলে পরমায়ুঃ শেষ হইবে, অথচ কার্য কিছুই হইবে না।

প্রবীণ। পথে বিস্তর কাঁটা আছে, তাহা জান দাদা?

ধীমান। কাঁটার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। কেবল কাঁটা কেন, পার্বত্য অরণ্যশঙ্কুল পথে সর্প বৃশ্চিকও আছে; আরও উর্ধ্বে শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতও আছে, সে সব উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

নবীন। না, ওসব কিছু মানিব না,—বাইকাটা অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে ভয় কিসের? চল (প্রবীণের হাত ধরিয়া) দাদা চল।

প্রবীণ। (স্বগত) আমার সাহসে কুলায় না। (প্রকাশ্যে), তোমার মইটা ত মজবুত নয়, উঠিতে পা কাঁপে যে!

নবীন। বাইকাটা অস্ত্রে ভর দিয়া,—কোন মতে লম্ফ দিয়া একবার উঠিলে হইল।

প্রবীণ। বাইকাটা অস্ত্রখানি লুকাইয়া সঙ্গে রাখিতে হইবে, নচেৎ প্রহরী দৈত্যগণ উহা দেখিলে ক্ষেপিবে। আর আমার আবেদন-লিপিগুলিও অবশ্য সঙ্গে থাকিবে।

নবীন। তোমার আবেদন লিখিতে যতগুলি মানকচুপত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ত সাত গাড়ীর বোঝা,—সেগুলি বহিয়া লওয়া অসম্ভব। না দাদা, আবেদন নিবেদনে কাজ নাই—

প্রবীণ। না নবীন, ঐ শুন মেঘগর্জন। অর্দ্ধপথে ভিজিতে হইবে।

নবীন। ভিজিলেই ক্ষতি কি?

(তিন জন মায়াবী গায়কের প্রবেশ)

১ম গায়ক। আপনারা কোথায় চলিয়াছেন?

প্রবীণ। নবীন কৈলাস গিরিচূড়া আরোহণ করিতে চাহে।

নিন্দুক। (জনান্তিকে) প্রবীণ কেমন চতুর! তাড়াতাড়ি সে নবীনের যাত্রার কথা বলিল, সে নিজেও যে ঐ পথের পথিক সে কথা আপাততঃ গোপন রহিল!

২য় গায়ক। ঐ মই দিয়া উঠিবেন? আপনারা বাতুল না কি? আর বাইকাটা অস্ত্রে প্রয়োজন কি?—ওটা ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

৩য় গায়ক। চলুন, আমরা পথ দেখাইয়া দিব, সুন্দর পাকা রাস্তা আছে।

প্রবীণ। চল নবীন, উহারা পথ প্রদর্শন করিবেন।

নবীন। না, আমরা অপরের সাহায্য গ্রহণ করিব না।

প্রবীণ। শুনিয়াছি মায়াপুর রাজ্যে মুরলীধরের বসতি, তিনি নাকি কল্পদ্রুমবৎ সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

১ম গায়ক। হঁা, যদি বলেন ত আমরা আপনাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাই। তিনি স্বহস্তে আপনাদিগকে মুক্তিফল দান করিবেন।

প্রবীণ। কি বল নবীন, চলিবে না?

নবীন। অমন অনেক কল্পতরু দাতার প্রশংসা শুনা গিয়াছে। কিন্তু ভিক্ষায় আর আমাদের কুলাইবে না।

প্রবীণ। নিশ্চয় জানিও, মুরলীধরের ন্যায় উদার হৃদয় কল্পদ্রুম দ্বিতীয় আর নাই।

নবীন। আমার ত বিশ্বাস হয় না।

[দূরাগত বংশীধ্বনি]

তোমরা কি চাও নরনারী—
সব দিতে পারে বংশীধারী।

এস গো প্রবীণ! (দূরে যা নবীন,
তোর মুখ দেখিতে না পারি)—
এস বন্ধু নিকটে আমারি।
মুক্তিফল ছার— কত কুল আর
কোটি ফলে আমি অধিকারী।
রবি যদি চাও, দিব আমি তা'ও,—
তারা-হার পাইতে পারি।
চাহিও না কিন্তু পূর্ণিমার ইন্দু,—
শুধু সুধাকর দিতে নারি।
এস গো প্রবীণ, তাড়াতাড়ি!

প্রবীণ। আর কি দেখ নবীন, চল ইঁহাদের সঙ্গে—

নবীন। আমি যাইব না, মুরলীধর ত আমাকে ডাকেন নাই। তিনি ডাকিলেও যাইতাম না।

"তবে তুমি থাক, আমি চলিলাম"— এই বলিয়া প্রবীণ নবীনকে ছাড়িয়া গেলেন। জিনগণ তাঁহাকে অন্যদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরও গভীর অরণ্যে লইয়া গেলেন। * তাঁহারা প্রবীণকে বুঝাইলেন যে, প্রবীণ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে মুক্তি মোক্ষ—সবই পাইবেন। এমন কি জিনেরা তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব দান করিবেন।

প্রবীণ। (আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে) আমাকে সসাগরা ধরণীর রাজা করিবেন, আমি অধমের প্রতি আপনাদের এত অনুগ্রহ!

মায়াবী। শুধু সসাগরা বসুন্ধরা কেন,—সৌরজগতের রাজত্বগুলিও ক্রমে ক্রমে আপনাকে দিব। শনির সাম্রাজ্য অতি বিশাল, তাহা জয় করিতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে।

---

* প্রবাদ আছে, জিনেরা নাকি সহজে মানবের বশীভূত হইতে চাহে না, তাই সাধারণতঃ লোকের সাধনায় তাহারা নানা প্রকারে বাধা দিয়া থাকে; কখনও সাধককে বিকট মূর্তি দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করে, কখনও বা ছলে কৌশলে ভুলাইয়া বনে লইয়া গিয়া সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। ধ্যানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেবও বড় দুঃখে তাঁহার আরাধ্যা দেবীকে বলিয়াছিলেন,—

"শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া,
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া!"

দুর্গা দেবী কি চমৎকার কৌশলে ব্যাসদেবকে "গর্দভ বারাণসী" বরদান করিয়াছেন।

প্রবীণ। আহা! আপনাদের দয়ার বালাই লইয়া মরি! আমাকে একেবারে রাজা না করিয়া আপাততঃ মন্ত্রী করিলেও চরিতার্থ হইব।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা! কোথায় তুমি! আর কত দূর গেলে দাদার দেখা পাইব?

প্রবীণ। একি জ্বালা! নবীন এখানেও আসিল! আমি কিন্তু সাড়া দিব না।

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া প্রবীণ ত্বরিত পদে একটি গুহার ভিতর লুকাইলেন। নবীনও সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া প্রবীণকে দেখিলেন।

নবীন। একি দাদা! তুমি এ সুড়ঙ্গের ভিতর কেন? এদিকে আমি তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হইলাম! আমি দিবানিশি পথ চলিয়া তিন দিন পরে অদ্য তোমার ধরা পাইলাম।

প্রবীণ। তুমি মই দিয়া কৈলাসে উঠিতে চাও, তাহা আমি পারিব না।

নবীন। বেশ দাদা! তুমি যাহাই বল, আমি তাহাই মানিব। চল, তোমারই পথে চল, আমি কেবল আমার স্বদেশী বাইকাটা অস্ত্রখানি সঙ্গে লইব।

প্রবীণ। (স্বগত) তুমি যাহাই বল, আমি আর তোমাকে আমার সঙ্গে কিছুতেই মিশিতে দিব না। (প্রকাশ্যে) তোমারই দোষে আমার সিঁড়ি প্রস্তুত হইল না, নতুবা এত দিন আমি অংর্বপথে উঠিতাম।

নবীন। এখনই কি হইয়াছে, সিঁড়ি প্রস্তুত কর না? কোথায় ইট, পাথর, সব লইয়া চল।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও প্রবীন চক্ষুলজ্জার দায়ে নবীনকে সঙ্গে লইয়া পর্বতগাত্রে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দুই এক ধাপ সোপান নির্মাণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মায়াবী গায়কেরা অদূরে থাকিয়া সমস্বরে মধুর রাগে গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

ঐ শুন ঐ শুন মুরলী বাজে—
করিছ সময় নাশ বৃথা কি কাজে?
আবেদন ল'য়ে হাতে
চল আমাদের সাথে,
লয়ে যাব তোমা বংশীধরের কাছে।
এস ত্বরা ঐ শুন মুরলী বাজে।

প্রবীণ উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত হইলেন; ভাবিলেন, নবীন সঙ্গে থাকিলে পশ্চাদপদ হওয়া অসম্ভব, মুরলীধরের

নিকট কদম-তলায় যাওয়া অসম্ভব, অথচ নবীন আমাকে ছাড়ে না,—কি করি। নবীনকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিই।

অতঃপর প্রবীণ সোপান প্রস্তুত করা ছাড়িয়া নবীনকে সবলে ধাক্কা দিলেন—ধাক্কার বেগ সম্বরণ করিতে না পারায় নিজেও তাহার সঙ্গে পড়িলেন, উভয়ে গড়াইতে গড়াইতে নিম্ন উপত্যকায় আসিয়া পড়িলেন।

অনন্তর উভয়ে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিন্দুক করতালি দিয়া হাসিতে লাগিলেন। ধীমান হাসিলেন না, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রবীণ নবীনকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "তোমারই দোষে আমরা পড়িলাম।"

নবীন। বাঃ দাদা! তুমি ধাক্কা দিলে!

প্রবীণ। আমি কি জানি? তুমিই আমাকে লইয়া পড়িলে!

নবীন। বেশ বল, উল্টা চোর কোটাল শাসে! তুমি ধাক্কা না দিলে আমরা পড়িতাম কিরূপে?

প্রবীণ। যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তোমাকে ধাক্কা দিলে আমি পড়িতাম কেন?

নবীন। যেহেতু তুমি ধাক্কার ধাক্কা সামলাইতে পার নাই।

প্রবীণ। সমস্ত জগৎ সাক্ষী—কেহ বলুক ত যে ব্যক্তি ধাক্কা দেয়, সে কি পড়ে?

নবীন। সমস্ত জগৎ তোমার চাতুরী বুঝিয়াছে। এ ক্ষেত্রে তুমিই আমাদের পতনের কারণ।

প্রবীণ। চুপ কর মিথ্যাবাদী! আমি আজ ২২।২৩ বৎসর হইতে সোপান রচনা করিয়া আসিতেছি, আর আজ কিনা আমিই পতনের কারণ হইলাম!

নবীন। অকথ্য ভাষায় গালি দিলেই কেহ বড় হয় না। কে মিথ্যাবাদী, তাহাও সকলে বিদিত আছে।

প্রবীণ। তুমি আমার ২৩ বৎসরের পরিশ্রম মাটি করিলে। হায়! আজীবন মায়ের সেবা করিয়া আসিলাম,—সমুদয় যত্ন পরিশ্রমের ফল এক মুহূর্তে ব্যর্থ হইল! চল ত মায়ের নিকট—

নবীন। চল না! মাও বুঝেন, তাঁহার কোন্ পুত্র কেমন।

৭

কাঙ্গালিনী ঘোরতর পীড়িতা,—জীবনের আশা প্রায় আর নাই। শ্রীমতী ও সুমতি মাতৃসেবায় নিযুক্তা। মাতার কঙ্কালসার দেহ ও পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া এক একবার শ্রীমতী নিরাশ হইয়া কাঁদেন, আবার ভাবেন, এই দাদা মুক্তিফল সহ আসিলেন আর কি! পাতাটি নড়িলে, সামান্য কিছু শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে শ্রীমতী আশায় উৎফুল্ল হন,—এই বুঝি দাদা আসিলেন।

দুরাশায় উদগ্রীব হইয়া সুমতি পৌষ মাসের সুদীর্ঘ রজনী জাগিয়া যাপন করিয়াছেন।

প্রভাত হইল, অদ্য নবীন, প্রবীণ প্রভৃতি মুক্তিফল সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। আহা! আজি কি সুখের দিন! সুমতি জননীর মুখ হাত ধোয়াইয়া, ছিন্ন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া জীর্ণ কুটিরের দ্বারদেশে বসিয়া স্থির নয়নে পথ পানে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

অপর ভ্রাতাদের আগমনের পূর্ব্বে নিন্দুক দ্রুতপদে আসিয়া ভগিনীদিগকে বলিলেন, প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া আসিয়াছেন।

সুমতি। (ব্যাকুলভাবে) আমার ত বিশ্বাস হয় না,—আমার মাথার দিব্য, সত্য বল দাদা!

নিন্দুক। তোমার চুলের দিব্য, সত্য বলিতেছি। ধীমান দাদা মায়ের জন্য স্বর্ণ-থাল ভরিয়া খাবার আনিতেছেন, আর নবীন মায়ের জন্য বারাণসী শাড়ী আনিতেছে।

শ্রীমতী। আহা! সকলে শীঘ্র আসুন। এ দিকে মা আমার রোগে শোকে জীবন্মৃতা হইয়াছেন। হায়, দাদারা কতক্ষণে আসিবেন।

নিন্দুক। অধীর হইও না শ্রীমতী, ধৈর্য ধারণ কর। ঐ দেখ প্রবীণ আসিতেছে।

প্রবীণকে দূর হইতে দেখিয়া প্রথম সুমতি দৌড়িয়া আসিলেন, "কই দাদা, ফল কই?"

প্রবীণ। তোমার সাধের কনিষ্ঠ নবীনকে জিজ্ঞাসা কর। নবীন না গেলে আমি আনিতে পারিতাম।

নবীন। তবে এত দিন আন নাই কেন?

সুমতি। শেষে তোমরা কি করিয়া আসিলে? এদিকে মায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত, ফল না আনিয়া তোমরা রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলে কোন্ মুখে?

প্রবীণ। আমাকে অনুযোগ করা বৃথা,—সব দোষ নবীনের।

নবীন। ধর্ম জানেন, সব দোষ দাদার। তিনি আমাকে ফেলিয়া দিলেন—

প্রবীণ। পতনের জন্য নবীন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল—

নবীন। দাদা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমাকে ধাক্কা দিবেন—

প্রবীণ। মিথ্যা বলিয়া আর পাপভার বাড়াও কেন?

নবীন। তুমি বৃদ্ধ বয়সে এত মিথ্যা—

ধীমান। মাতার জীবন সঙ্কটাপন্ন, এই কি তোমাদের কলহের সময়? অকৃতকার্য হইয়া আসিয়াছ, এই লজ্জাই কি যথেষ্ট নয়?

কাঙ্গালিনী। (স্বগত) ধরণী! দ্বিধা হও,— তোমার বক্ষে মুখ লুকাই! (প্রকাশ্যে) শ্রীমতী মা, তোর ভাইয়েরা বড় শ্রান্ত, তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বল।

সুমতি। নিন্দুক দাদা, তুমি ধর্মতঃ বল দেখি, কে কাহাকে ধাক্কা দিয়াছে?

নিন্দুক। কি বলিব বোন,—মোহন বাঁশীর স্বরে যার মন তিষ্ঠে না ঘরে, যাহাকে মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধর আপন পার্শ্বে কদম্ব-তরুর ছায়াতলে ডাকিতেছেন, সে-ই অন্যমনস্কভাবে ধাক্কা দিয়াছে। ফলে উভয়ে পতিত হইয়াছে।

নবীন। নিন্দুক দাদা এইবার সত্য বলিয়াছেন।

প্রবীণ। তবে আমি কি এতদিন কেবল অরণ্যে রোদন করিলাম?

শ্রীমতী। দাদা! তুমি ২৩ বৎসর অরণ্যে রোদন করিয়াছ, অথবা কি করিয়াছ, তাহা আমরা জানি না—আমরা তোমার কার্যফল দেখিতে চাই। মায়ের কুটিরের দ্বার হইতে কৈলাস গিরির সীমা পর্যন্ত যে বিজন অরণ্য ছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়াছে কে?

ধীমান। সে ঘোর বন নবীন ২৩ বৎসর ধরিয়া পরিষ্কার করিয়াছে।

নিন্দুক। প্রবীণ ত সেই বিজন বনে বসিয়া কেবল আবেদন লিখিতেছিল।

সুমতি। যাহা হউক, তোমরা এখন থাম। ঐ দেখ, মায়ের কুটিরে আগুন লাগিয়াছে, চল শীঘ্র নিবাইতে যাই।

কাঙ্গালিনী ভূমিশয্যায় পড়িয়া নীরবে নয়ন-জলে মাটি ভিজাইতেছিলেন। লজ্জা, ক্ষোভ, অভিমানে তাঁহার হৃদয় শতধা হইয়াছিল। সুমতি তাঁহাকে ধরিয়া দাহ্যমান কুটিরের বাহির করিতে চেষ্টা করায় তিনি বলিলেন, "কে ও সুমতি? আর আমাকে টানাটানি করিস্ কেন মা?—পুড়িয়া মরিতে দে।"

শ্রীমতী। না, মা! আমরা থাকিতে তুমি মরিবে, ইহা অসহ্য।

কাঙ্গালিনী। অভাগীর মেয়ে! তোরা জানিস, মুক্তিফল না পাইলে আমি শাপমুক্ত হইব না, তবে আমাকে শুধু প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়া বৃথা কষ্ট দিস কেন?

নবীন। মাগো! তুমি রাগ করিও না। আমি মুক্তিফল আনিতে আবার চেষ্টা করিব। এবার কৈলাসে উঠিতে পারি নাই, পুনরায় আরোহণের চেষ্টা করিব।

শ্রীমতী ও সুমতি। এবার আমরাও সঙ্গে যাইব, পথ কি বড় দুর্গম?

নবীন। একেবারে দুর্গম নয়,—কতক দূর মই দিয়া উঠা যাইতে পারে—

শ্রীমতী। বুঝিয়াছি,—থাক, মইয়েরও প্রয়োজন নাই। চল নবীন, শীঘ্র; আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

নিন্দুক। অবাক করিলে শ্রীমতি,—নবীন ত তবু মই সংগ্রহ করিয়াছে, তুমি তাহার উপরও নির্ভর কর না!

শ্রীমতী। কেন দাদা, আপনার পায়ের উপর নির্ভর করিব! পার্বত্য লতাগুল্ম ধরিয়া উঠিব,—তাহাতে না কুলাইলে হামাগুড়ি দিয়া, বুকে ভর দিয়া—যে কোন প্রকারে হউক, উঠিব।

প্রবীণ। যেখানে পর্বত অত্যন্ত ঢালু সে স্থান অতিক্রম করিবে কিরূপে?

নিন্দুক। সেখানে উভয় ভগিনী উড়িতে চেষ্টা করিবে!

সুমতি। এত বিদ্রূপ কর কেন দাদা? কোন উপায় ত হইবেই। এ জগতে কিছুই স্থায়ী নয়; হয় আরোগ্য, নয় মৃত্যু—কিন্তু রোগ চিরকাল থাকে না।

ধীমান। কেবল কথায় কাজ নাই, এখন সকলে মিলিয়া আবার যাত্রা করি।

প্রবীণ। হাঁ চল,—দুই এক খানা আবেদন সঙ্গে লইয়া আমিও আসিতেছি।

শ্রীমতী। আমি এই চুল খুলিলাম,—আমরা সকলে জননীকে মুক্তিফল আনিয়া দিতে না পারা পর্যন্ত আমি আর চুল বাঁধিব না! হে প্রভু পরমেশ্বর! সহায় হও!

কাঙ্গালিনী। এ কি দেখি, আমার কোমলাঙ্গী ননির পুতুল দুহিতা ক্ষুদ্র স্বার্থে,—সাংসারিক ভোগবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া আমার সেবায় নিযুক্তা হইল! শ্রীমতী ও সুমতি যখন তাহাদের ভ্রাতাদের কার্যে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আমার ভরসা হয় সম্ভবতঃ আমার সুদীর্ঘ নিরাশযামিনী প্রভাত হইবে!—এত দিনে হয়ত আমার সন্তান-সন্ততি মুক্তিফল আনিতে পারিবে।—আশা মায়াবিনী।

সৃষ্টি-তত্ত্ব

সেদিন গল্প করিতে করিতে আমাদের অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল, জিন, পরী, ভূত। কেহ শ্বেতশ্মশ্রু জিনকে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন; কেহ দেখিয়াছেন সিতবসনা পরী এবং কেহ ভূতকে মাছভাজা খাইতে দেখিয়াছেন! মিস্ ননীবালা দত্ত ঘুমাইয়া পড়িলেন; আমি একটা সোফায় বসিয়াছিলাম। জাহেদা বেগম আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া ল্যাম্প নিবাইয়া আপন কামরায় চলিয়া গেলেন। শিরীন বেগম আপন কামরায় না গিয়া আমারই পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। ল্যাম্প নিবিল, কিন্তু এক কোণে মোমবাতি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে গৃহসজ্জা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বলিতে পারি না, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কিনা, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি জাগ্রত ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়ানক একটা শব্দ হইল। তাহাতে ননীবালা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কিসের শব্দ হলো?"

"বলতে পারি না। কিছুদিন হ'লো আমি সংবাদপত্রে ছবি দেখেছিলুম, বিলেতে একটা এরোপ্লেন এঞ্জিন ভেঙ্গে কোন বাড়ীর ছাদের উপর পড়ে গিয়েছিল, আর এরোপ্লেনের আরোহী ভাঙ্গা ছাদ গলিয়ে অক্ষত শরীরে একেবারে কামরার ভিতর পালঙ্কের উপর গিয়ে পড়েছিল! আমাদের এ উলু খাওয়া ভাঙ্গা ছাদের উপরও কারুর এরোপ্লেন-ট্রেন এসে পড়েনি ত? জানালা খুলে দেখুন না?"

মিসেস্ বীণাপাণি ঘোষ যথাবিধি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, "বিছানা ছেড়ে উঠুন শিগ্‌গির!"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? আমি ননীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ননী বলিলেন, "যে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে, জানালা খুলব কি ক'রে? তা' ছাড়া আমার ভয় করে। আপনারা যত সব ভূতের গল্প বলেছেন!"

"আচ্ছা, আমি জানালা খুলে দেখছি,"—বলিয়া বীণা গবাক্ষ খুলিয়া ফেলিলেন।

বাতায়ন খুলিবা মাত্র এক ঝাপটা বাতাস ও বৃষ্টিজল আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিল—তৎসঙ্গই মস্ত এক উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমাদের ত চক্ষু স্থির। গোলমাল শুনিয়া শিরীন জাগিয়া উঠিয়াছেন, অন্য কক্ষ হইতে আফসার দুলহিন দৌড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও নির্বাক! আমরা চীৎকার করিয়া বাড়ীময় সকলকে জাগাইয়া তুলিব, না, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই অগ্নি-স্তূপের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অগ্নিস্তূপ ক্রমে এক জ্যোতির্ময় মনুষ্য-মূর্তিতে পরিণত হইল। আমার মনে হইল, এই মহাপুরুষকে কোথায় যেন কখন দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলাম না। কারণ, মানুষের মুখ চিনিয়া রাখা আমার অভ্যাস নয়, সেজন্য অনেক সময় অপ্রস্তুতও হইতে হইয়াছে। আগন্তুক অগ্নিমূর্তি বলিলেন,—

"বৎসে! তোমরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছ? আমি অভয় দিতেছি, কোন ভয় নাই।"

শিরীন। সেদিন আমাদের এখানে একটা টিকটিকি বোবা ফকির সাজিয়া আসিয়াছিল, আপনি তাহাদেরই কেহ নাকি?

ননী। আপনারা মওলানা সাহেবের বাড়ীর কাছে বাসা নিয়াছেন, তাই ত টিকটিকির উপদ্রব।

অগ্নিমূর্তি। (সতেজে) না, না! আমি সে সব কিছু নই। আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বষ্টি।

"ত্বষ্টি" নাম শ্রবণ করিবা মাত্র বীণা ও ননী তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন আমারও স্মরণ হইল, কলিকাতায় "নারীসৃষ্টি" লিখিবার সময় আমি এই জ্যোতির্ময় মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। আমরা সসম্মানে ত্বষ্টিদেবকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। বীণা বলিলেন, "অসময়ে নরলোকে পদধূলি (বর্ষাকালে "ধূলি" না বলিয়া "পদকর্দম" বলিতে হয়!) দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ত্বষ্টি। কারণ? (আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া) কারণ ঐ মেয়েটা।

আমি সবিস্ময়ে, সভয়ে, সবিনয়ে বলিলাম, "মহাত্মা বলেন কি, আমি?"

ত্বষ্টি। হ্যাঁ, তুমি! তুমি আমার নারী-সৃজনের ইতিহাস বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গোলমাল বাধাইয়াছ। তা, তোমারই বা দোষ দিব কি; কতক দোষ "সওগাত" আফিসের।

ননী। সে কি রকম?

স্বস্তি। তাহা এই :—ইনি "নারীসৃষ্টি" লেখাটা "সওগাত" নামক মাসিক পত্রিকায় দিয়াছিলেন। সে সময় সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না ; আফিসের গণ্ডমূর্খগুলা ইঁহার লিখিত পাদটীকা দুইটি বাদ দিয়া তাহা প্রকাশ করে। পাদটীকা-অভাবে রচনাটি স্থল বিশেষে দুর্বোধ হইয়াছে। সুতরাং সুবোধ পাঠকেরা উহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তখন তাঁহারা বলেন, "ডাক ব্যাটা স্বস্তিকে, ইহার কোথায় কি ভ্রান্তি আছে, বুঝাইয়া দিয়া যাউক!" তাই দেখ না, সময় নাই, অসময় নাই, একটা প্ল্যানচেট পাইলেই ইহারা আমাকে সুরলোক হইতে ডাকিয়া আনিয়া বিরক্ত করে। অদ্যকার ঘটনা শুন ; কতকগুলি যুবক "সত্যগ্রহ" ব্রত লইয়া মাতিয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, "সত্যগ্রহ" ছাড়িয়া "মিথ্যাগ্রহণ" কর।' কিন্তু উহারা অবোধ বালক, হিতোপদেশ মানে না। "মিথ্যাগ্রহণ" না করার ফলে পুলিশের তাড়াহুড়া খাইয়া দুইজন উকিল বাবু পলাইয়া রাঁচি আসিয়াছেন। তোমাদের বাড়ীর অদূরেই তাঁহাদের বাসা। কিন্তু জান, "চোর না শুনে ধরম কাহিনী।" রাঁচির এই অবিরাম বৃষ্টি কাদাতেও তাঁহাদের শান্তি নাই। তাঁহারা আদাজল খাইয়া, দিনের বেলা বালি কাঁকর কাদা জল মাখিয়া "মিথ্যাগ্রহণ"-এর বিরুদ্ধে সত্যপ্রচার প্রয়াসে লেক্‌চার দিয়া দিয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বেড়ান ; আর রাত্রিকালে দুই বন্ধুতে প্ল্যানচেট লইয়া দেবলোকের শান্তিভঙ্গ করেন! রাত্রি ১২টা-১টা পর্যন্ত উকিল বাবুদের ডাকাডাকির জ্বালায় অস্থির থাকিতে হয়। তোমাদের নরলোকে যা হোক শান্তিনেশে যুবকদের শাস্তি দিবার জন্য সি. আই. ডি. আছে ; কিন্তু সুরলোকে তাহাদের জব্দ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। তাই দেখ না, এত রাত্রে উকিল বাবুদের বাসা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় আমার বাষ্পরথ তোমাদের ছাদের কলসে আটকাইয়া পড়ে, আমিও সশব্দে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টি ভেজা সহ্য হয় না, তাই যেমনই বীরবালা বীণা বাতায়ন খুলিয়াছেন, অমনি আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি।

ননী। কিন্তু দেব! বাতায়নে লোহার গরাদে আছে যে!

স্বস্তি। আরে, রাখ তোমার উইপক্ট গরাদে! বিশেষতঃ আমাকে আটকায় কে?

ননী। দেব! আপনি কি কি উপাদানে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিতে বড় কৌতূহল হয়।

স্বস্তি। না, বাছা! আমার সময় নাই। এখন আমি আসি। তোমরা ঘুমাও।

কিন্তু আমরা সকলেই তাঁহাকে বেশ করিয়া ধরিয়া বসিলাম। পুরুষ সৃষ্টির রহস্য না শুনিয়া তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।

শিরীন। আপনি অনেকক্ষণ বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন, এক পেয়ালা গরম চা খাবেন। আপনি গল্প বলুন, আমি চা প্রস্তুত করিতে বলি। (অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,) মারো—

স্বস্তি। (সচকিতে) সে কি? কাহাকে মারিবে?

শিরীন হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

স্বস্তি। উনি লাঠিয়াল ডাকিতে গেলেন না কি?

বীণা। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) না, তিনি চাকরাণী ডাকিতে গেলেন। উহার চাকরাণীর নাম "মারো"! * আপনি এখন গল্প বলুন। ঐ দেখুন, শিরীন বেগম সাহেবাও ফিরিয়া আসিয়াছেন।

স্বস্তি। তোমরা নেহাৎ ছাড়িবে না, তবে আর কি করা। তোমরা মেয়েরাও দেখিতেছি, উকিল বাবুদের চেয়ে কম নও! তাঁহারা তবু আইন-কানুনের দোহাই মানেন, তোমরা কিছুই মান না। শুনিলে ত তোমাদের মনে থাকিবে না। তবে ননি, তুমি কাগজ কলম লইয়া বস। আমি বলিয়া যাই, তুমি তাড়াতাড়ি লিখ। দেখ, খুব দ্রুতগতি লিখিবে।

ননী যতক্ষণ কলম দোয়াত অন্বেষণ করিতেছিলেন, ততক্ষণে বীণা কাগজ পেন্সিল হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দেব! সময়ের অল্পতার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি বলুন, আমি শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি। আমি মিনিটে শর্টহ্যাণ্ডের তিনশত শব্দ লিখিতে পারি।" ইহা শুনিয়া মহাত্মা স্বস্তি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলেন, বীণা লিখেন, আর আমরা নীরবে শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, বেচারা স্বস্তিদেব নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। তিনি কখনও বা হাই তুলিয়া ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়নে অনুচ্চস্বরে বলিতেছিলেন; আবার কখনও চক্ষুমর্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন এবং বীণা ঠিক লিখিয়াছেন কিনা তাহা

* বেচারী চাকরাণীর সুন্দর "মরিয়ম" নামটি বিকৃত হইয়া "মারো"তে পরিণত হইয়াছে। আমি বেহার অঞ্চলে থাকা কালীন অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতিপয় মহিলার নাম শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। যথা- "হাশো", "লাডো", "দল্লু", "উল্লু", "জুব্বা", ইত্যাদি। নামগুলির স্বরূপ না দেখাইলে উহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং পাঠিকা ভগিনীও স্বস্তিদেবের মত ভীত হইতে পারেন। তবে শুনুন, "হাশমত আরা," "লতিফুন্নেসা," দৌলতন্নেসা," "অলিউন্নেসা" এবং "জোবেদা"।

পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। ভুল থাকিলে তাহা কাটিয়া পুনরায় লিখাইতে-ছিলেন। তিনি যে নিদ্রা-কাতর নহেন, এতখানি বাগাড়ম্বর দ্বারা যেন তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন! একবার তিনি গর্জনস্বরে বলিলেন,—

"জান বৎসেগণ! কন্যা রচনার সময় আমার হস্তে কোন বস্তুই ছিল না; সুতরাং আমাকে কোন দ্রব্যের গন্ধ, কোন বস্তুর স্বাদ এবং কোন পদার্থের বাষ্প মাত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পুরুষ নির্মাণের সময় আমাকে কিছু মাত্র ভাবিতে হয় নাই। আমার ভাণ্ডারে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ছিল,—হস্ত প্রসারণ করিলে যাহা হাতে ঠেকিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যথা—দন্ত নির্মাণের সময় **সর্পের বিষদন্ত** আমূল লইয়াছি; হস্ত পদ নখ প্রস্তুত করিতে **শার্দুলের সমস্ত নখর** লইয়াছি; মস্তিষ্কের কোষসমূহ (cells) পূর্ণ করিবার সময় **গর্দভের গোটা মস্তিষ্কটাই** ব্যবহার করিয়াছি। নারী সৃজন-কালে আমি শুধু অনলের উত্তাপ লইয়াছিলাম। পুরুষের বেলায় একেবারে **জ্বলন্ত অঙ্গার** লইয়াছি। বাছা! তুমি তাহাই লিখ।"

বীণা লিখিলেন, (জ্বলন্ত অঙ্গার)।

স্বস্তি। বৎসে! মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর, রমণীর বেলায় আমি তুহিনের শৈত্যটুকু মাত্র লইয়াছিলাম, পুরুষের বেলায় **তুষার খণ্ড**,—এমন কি **আস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা** ব্যবহার করিয়াছি। তাহা কি তুমি লিখিয়াছ, বীণা?

বীণা কাগজ দেখাইলেন— (তুষার, কাঞ্চনজঙ্ঘা)।

শিরীন। আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস (Vesuvius) এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা যে পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই আমরা পুরুষের নিজের ভাষায়ই বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাই যে এখনই—

"জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিল সংহার-মূর্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ
গর্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ।"

আবার পর মুহূর্তেই (অবশ্য "পার্বতী বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্রভাব")—

"সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা,
আ-খণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম।"

শ্রুতলিপি শেষ হইলে মহাত্মা স্বস্তি বলিলেন, "দেখ বাছা! তুমি ইহা সহজ ভাষায় লিখিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন একটি শব্দ, এমন কি একটি ছেদ পর্যন্তও এদিক ওদিক না হয়।"

বীণা। তাহাই হইবে; আপনি ভাবিবেন না। আমি বেশ সাবধানে লিখিব। নচেৎ প্রভুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে—এখন ত কেবল পুরুষেরা ডাকাডাকি করে, তখন মেয়েরাও জ্বালাতন করিয়া মারিবে।

অতঃপর স্বস্তিদেব বিদায় হইলে সকলে যে যাহার শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু আমি শয়ন করিতে যাইবার সময় কি জানি কিরূপে পড়িয়া গেলাম। সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, আমি তখনও সোফায় বসিয়া; গৃহকোণে মোমবাতিটা মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর শিরীন ও বীণা মড়ার সহিত বাজী রাখিয়া ঘুমাইতেছেন! দূরাগত কুক্কুটধ্বনি শ্রবণে বুঝিলাম, রজনীর অবসান হইয়াছে। তবে কি এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?

পুস্তকাকারে-অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী

রসনা-পূজা

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পূজা করিয়া থাকে। কেহ অগ্নি উপাসক, কেহ চন্দ্র-সূর্যের উপাসক, কেহ জড়-পুত্তলিকা উপাসক, ইত্যাদি। কেবল নিষ্ঠাবান মুসলমান অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তুর উপাসনা করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ রসনা-পূজা করিয়া থাকেন। যদি আমি ইহাদিগকে "রসনা-পরস্ত" (রসনা-উপাসক) বলি, তবে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজে 'বুতপরস্তি'-ও যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।[১] যেহেতু দেবতাদের অনুকরণে অনেকগুলি পীরের নাম শুনা যায়—এক এক প্রকার বিপদে এক এক পীরের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত "নজর ও নেয়াজ" দিতে হয়। যাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন করে, সে বেচারা "কোত্তা (কুকুর) পীরের দরগাহে" (মন্দিরে ?) গিয়া "নজর" (দর্শনী) মানস করিয়া আইসে! হঠাৎ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে "আচানক (হঠাৎ) পীরের" উদ্দেশ্যে রোজা রাখা হয়!! সম্ভবতঃ পা খোঁড়া হইলে "লঙ্গর শাহের দরগাহে" "শিন্নী" লইয়া যাইতে হয়!![২]

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর পূজা করিলে আত্মার অধঃপতন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রকার অবনতিও হয়। আমাদের দুর্গতি ও অবনতির কারণ অনেকে অনেকরূপ অনুমান করেন; আমার বোধ হয় রসনা-পূজা ইহার অন্যতম কারণ। স্ত্রীলোকেরা ঐ পূজার আয়োজনে সমস্ত সময় ব্যয় করেন। অন্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে তাঁহাদের অবসর থাকেনা। সমস্ত দিনও অর্ধরাত্রি ত তাঁহাদের রন্ধনের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়, পরে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখেন—"যাঃ! মোরব্বার সিরা (চিনির রস) জ্বলিয়া গেল!"

আমরা আহার ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারি না, সত্য। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। মনে রাখিবেন—ভোজনের উদ্দেশ্য শরীরের পুষ্টিসাধন। কিন্তু সচরাচর আমাদের খাদ্যসামগ্রী যেরূপ হয়, তাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন হওয়া

১ যদ্যপি তর্কের অনুরোধে এবং গলাবাজির জোরে অস্বীকার করা হইয়া থাকে, সে ভিন্ন কথা।

২ হিন্দুদের নৈবেদ্যের সহিত উক্ত প্রকার 'নজর ও নেয়াজে'র সাদৃশ্য নাই কি ?

দূরে থাকুক, বরং ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া শরীরের ধ্বংস সাধন হয়। আমাদের চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—খাদ্যগুলি কেবল রসনা-দেবের তৃপ্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয়।

জনৈক ডাক্তার একদা কোন ধনী মুসলমান কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: "আপনার বাড়ী একদিন খেয়ে আমি তিনদিন খেতে পারি নাই। এই রকম খাবার আপনারা সর্বদাই খেয়ে থাকেন, কাজেই আপনাদের অসুখ ছাড়ে না।" ডাক্তার বাবু ঠিক বলিয়াছেন। আবার মজা এই যে, চিররুগ্ন জীবন বহন করাই ভদ্রতার লক্ষণ! কুশল প্রশ্ন করিলে কেহ সহসা উত্তর দেয় না, "সম্পূর্ণ ভাল আছি।" তাদৃশ চিররুগ্ন অবস্থা রমণী-সুলভ কোমলতা ("নাজাকৎ!") বলিয়া প্রশংসিত হয়। কেবল চাষা স্ত্রীলোকেরা সবল সুস্থ থাকে।

আহারের অত্যাচার যে কেবল ধনবানের গৃহে হয়, তাহা নহে, দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরেও সুযোগ অনুসারে রসনা-পূজা হইয়া থাকে।

শুনিতে পাওয়া যায়, কোন ডেপুটি কালেক্টর না কি বলিতেন, "(দরিদ্র) কুলীন মুসলমান আমি বেশ চিনি। যদি কাহারও মুখ দেখিয়া চিনিতে না পারি, তবে একবার তার বাড়ী গেলে আর চিনিতে বাকী থাকে না। কুলীনের লক্ষণ এই,—

"কাহারও বাড়ী গেলে দেখিবে, চালের উপর খড় নাই, ঘরখানার চারিদিক আবর্জনাময়, বসিবার একটু স্থান নাই; মাথার উপর (চালে) মাকড়সার জাল ঝুলিতেছে—এইরূপ ত হীন অবস্থা। কিন্তু জল খাবার সময় দেখিবে, অতি উৎকৃষ্ট পারাটা, কোর্মা, কাবাব উপস্থিত—আমাদের সাত দিনের খাবার খরচ তাঁহার একদিনে ব্যয় হয়।"

যদি উক্ত কালেক্টর মহাশয় কখন কাহার বহির্বাটী দেখিয়া কুলীন চিনিতে না পারেন, তবে তিনি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে গৃহস্বামীর কৌলীন্য সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ থাকিবে না! কিন্তু সে ডেপুটি কালেক্টরের ভাগ্যে অন্তঃপুর দর্শনলাভ অসম্ভব। অতএব আমরা একটু নমুনা দেখাই,—

প্রথমে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হউন—দ্বারদেশে পচা কাদা; হংস, কুক্কুট ইত্যাদি সেই (পচা ফেনমিশ্রিত) কাদা ঘাঁটিতেছে, তাহার দুর্গন্ধে আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ত্রাহি ত্রাহি করিবে। ৩ কিন্তু পশ্চাৎপদ হইবেন না—কোনমতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ কেওড়া বা গোলাপ

৩ অভ্যাসের কৃপায় গৃহিণী বা গৃহস্বামীর নিকট ঐ দুর্গন্ধ অপ্রিয়বোধ হয় না।

জলে জাফরান ভিজাইতেছে ইত্যাদি। এখানকার সুগন্ধ এতই আনন্দপ্রদ (inviting) যে ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িতে ইচ্ছা হইবে! পারাটা, সমোসা ভাজার সৌরভ কি চমৎকার—বলিহারি যাই! এখানকার সৌন্দর্য দেখিলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে যায়, তৃপ্তি হয়, আহার ত দূরে থাকুক। এখানে দাঁড়াইয়া আপনার বোধ হইবে—"আঃ মরি! মরি! এ কোন্ সৌরভ-রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম!—এ স্বর্গ না কি!!"

আমাদের খাদ্য সম্বন্ধীয় পরিচ্ছন্নতা সময় সময় সীমা লঙ্ঘন করে। যেমন, মাংস এত ধোওয়া হয় যে, তাহার বলকারক গুণ থাকে না, গরম জলে মাংস ধুইলে মাংসে আর থাকে কি? অন্যান্য বস্তুও প্রায় প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিষ্কার করা হয়। এই প্রকার খাদ্যদ্বারা কেবল জড় রসনার পূজা হয়।

আমরা কেবলই রসনা-পূজায় সময় কাটাই। আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞানচর্চা ত আমরা জানিই না। সামান্য সূচিকার্য ও রন্ধন-প্রণালী কেবল আমাদের শিক্ষণীয়। ৫০০ রকমের আচার চাটনী; ৪০০ প্রকার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানিলেই সুগৃহিণী বলিয়া পরিচিতা হইতে পারা যায়। রমণী রাঁধুনীরূপে জন্মগ্রহণ করে, এবং মরণে বাবুর্চি-জীবনলীলা সাঙ্গ করে। আমাদের সুখের চরম সীমা সচরাচর উপাদেয় খাদ্য রাঁধিতে শিক্ষা করা ও বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করা পর্যন্ত!

এইরূপ অত্যধিক রসনা-পূজায় বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়। এস্থলে রসনা-পূজার কেবল ত্রিবিধ অনিষ্টের উল্লেখ করা গেল—(১) ব্যয়-বাহুল্য বা অপব্যয়, (২) শ্রম-বাহুল্য এবং (৩) স্বাস্থ্য নষ্ট। ময়দার পারটা ও মসলা-বহুল কোর্মা সহজে পরিপাক হয় না, তাহা দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কারণ ঐ দুষ্পাচ্য খাদ্যের পরিপাক কার্যে আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিকে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ শক্তি যোগাইতে গিয়া শরীরের অন্যান্য যন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে। তাদৃশ অখাদ্য রাঁধিতে গৃহিণীদের অনর্থক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করা হয়।

শরীরের পুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আহার করিতে গেলে রসনা-পূজা ত্যাগ করিতে হইবে। প্রতিদিন অত ছাই-ভস্ম না খাইয়া কেবল যথানিয়মে উপযুক্ত পরিমাণে সুখাদ্য খাইলেই আহারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। মোহনভোগ, ফিরনী ইত্যাদির পরিবর্তে পাতলা দুধ খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ।

উক্ত প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে অপেক্ষাকৃত সময় কম লাগে। ব্যয়ও পরিমিত হয়। ঐ অবসরটুকু অন্য সৎকার্যে ব্যয় হইতে পারে।

আমরা রসনা-পূজা করিতে বসিয়া অধঃপাতে গিয়াছি। দিল্লীর সম্রাটগণ বিলাস-স্রোতে ভাসিয়াই দিল্লী হারাইয়াছেন। এস্থলে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা গেল। দিল্লীশ্বর মোহাম্মদ শাহের সহিত নাদির শাহ যুদ্ধ করিতেছিলেন। মোহাম্মদ শাহ ছিলেন বিলাসী—সর্বদা নানাবিধ সুস্বাদু বস্তু দ্বারা রসনা-পূজা করিতেন, তাই পরাস্ত হইয়া সিংহাসন হারাইলেন, আর নাদির শাহ রসনা-উপাসক ছিলেন না—কেবল শুষ্ক রুটি ও কাবাব খাইতেন, তাই বিজয়ী হইয়া মোহাম্মদ শাহের মুকুট ও সিংহাসন লইতে পারিলেন। দেখুন ত শুষ্ক রুটির গুণ ক্ষমতা কত! অতীতের পুরাতন কথা ছাড়িয়া দিলে, বর্তমানে রুশ-জাপান যুদ্ধেও তাই দেখা যায়। রুশীয়দের অপেক্ষা জাপানীদের ভোজনের আড়ম্বর কম, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাপান অমিত তেজের পরিচয় দিতেছে। তাই দেখুন, কেবল আহার করিলে বলবৃদ্ধি হয় না। খাদ্য পরিপাক হইলে লাভ, নচেৎ না।

অল্প আহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, বরং পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়। অনেকে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোন কোন রোগে অন্য চিকিৎসা না করিয়া কেবল আহার পরিমিত করায় রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে, "যা না করে বৈদ্যে, তা করে পৈথ্যে।" রসনা সংযত করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

একটা বচন আছে; "মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাক।" এ মরণের অর্থ ত্যাগ স্বীকার, বৈরাগ্য ইত্যাদি। মানুষ ত্যাগ না করিলে মুক্তি পাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে সংযম শিক্ষা না করিলে হঠাৎ বৈরাগ্য শিক্ষা হয় না। এক লাফে কে গাছের আগায় উঠিতে পারে? ক্রমশঃ এক পা দুই পা করিয়া উঠিতে হয়।

রোজা (উপবাস) ব্রত আমাদিগকে সংযম শিক্ষা দিয়া থাকে। এই রোজা যথানিয়মে পালন করিলে সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়। মানুষ মাত্রেরই সংযম শিক্ষা আবশ্যক। এই জন্য দেখা যায়, "পৃথিবীর প্রায় সমুদায় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন না কোন প্রকারের উপবাস ব্রত বর্তমান রহিয়াছে।" [৪] কারণ মানুষ জানে না, কি প্রকার খাদ্য কি পরিমাণে খাওয়া উচিত।

---

৪ এই প্রবন্ধ রচনাকালে মৌলভী মকবুল আলী বি. এ. প্রণীত "রোজা" নামক পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশটুকু 'রোজা' হইতে গৃহীত।

আক্ষেপের বিষয়, রমজান মাসে আমাদের খাদ্য-সামগ্রীর ধুমধাম সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য হইতে বিরত থাকিয়া নির্মল চিত্তে উপাসনা করা ত দূরে থাকুক, "ইফতারী" (সন্ধ্যাকালীন খাবার) প্রস্তুত করিতেই দিন শেষ হয়। কোথায় রসনা সংযত হইবে, না আরও রসনার সেবা বৃদ্ধি পায়। প্রকারান্তরে রোজার নাম করিয়া রসনা-পূজার মহা-আড়ম্বর হয়। পূর্বে মহাপুরুষেরা সামান্য ফল-মূল বা শাক-রুটি দ্বারা সন্ধ্যায় জলপান (ইফতার) করিতেন। রাত্রিতে কি খাইবেন, দিবাভাগে খোদাকে ভুলিয়া সে চিন্তাও করিতেন না। ধর্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করিবার আশায় সমস্ত দিন পান-ভোজন ত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে থাকিতেন। আর এদেশের মুসলমানেরা তাঁহার উপযুক্ত (?) শিষ্য কিনা,—"ধর্ম ধর্ম" বলিয়া চীৎকার-স্বরে গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া তোলেন,—তাই বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ ও সন্ধ্যার খাবার-আয়োজনে সমস্ত দিন ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকেন!! ইহাতে রোজার উদ্দেশ্য যে কত দূর সাধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

যত প্রকার উপবাস-ব্রত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে আমাদের রোজা-ব্রতই শ্রেষ্ঠ—অবশ্য যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি প্রতিপালিত হয়। ইহা দ্বারা যত উপকার হয়, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝেন।

খ্রীস্টীয় রোজার (গুড ফ্রাইডের) সময় ধর্মপরায়ণ খ্রীস্টানগণ শুধু পান-ভোজন ব্যতীত পার্থিব সমুদয় কার্য হইতে বিরত থাকেন।[৫] সে সময় তাঁহারা কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না এবং নিজেরাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন না, নূতন কাপড় পরেন না; একান্ত প্রয়োজন না হইলে কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করেন না,—এক কথায়, সকল প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, ভোগ, বিলাস ত্যাগ করেন। ঐ ত্যাগ স্বীকার করায় যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য সদ্ব্যয় করেন! আমাদের "এতেকাফ"-এর[৬] সহিত ঐ ব্রতের কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে প্রভেদ এই যে, "এতেকাফের" সময় মস্‌জিদে বসিয়া মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নহে। (মৌলভী

৫ অনেকে উপবাসও করিয়া থাকেন। কেহ সর্বদাই প্রতি শুক্রবারে উপবাস করেন।

৬ 'এতেকাফ' ব্রত বিশেষ। ধর্মোদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পার্থিব কার্য্য হইতে বিরত থাকা।

নইমুদ্দীন প্রণীত "জোব্দাতল মসায়েল" দ্রষ্টব্য।) আর খ্রীস্টানদের তাহা নিষিদ্ধ। (তবে দায়ে পড়িলে ভিন্ন কথা।) এবং আমাদের "ফেতরা" দানের সময়ও ঘরের (অতিরিক্ত) পয়সা বাহির করিতে হয়। মহাত্মা মোহাম্মদ (দঃ) হয়ত বলিয়াছিলেন যে, রোজার সময় আহার পরিমিত করায় যে খরচ বাঁচিয়া যায়, তাহা দ্বারা আপন দরিদ্র প্রতিবেশীর সাহায্য কর ("ফেতরা" দাও); কিন্তু বঙ্গীয় মোসলেমগণ তাঁহার ভক্তশিষ্য, তাই উল্টা চাল চালেন; তাঁহার উপদেশের বিপরীত কার্য করেন।[৭] সুতরাং অন্যান্য মাসের ব্যয় অপেক্ষা রমজান মাসে তাঁহাদের ব্যয় বৃদ্ধি হয়। আমার এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নাই—পাঠিকাগণ আপন আপন জমা-খরচ মিলাইয়া দেখিবেন,—অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান শরীফের খরচ বেশী কিনা।[৮]

হিন্দুগণ সময় সময় ভীম (বা নির্জলা) একাদশী করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। হিন্দু বিধবারা প্রায় দীর্ঘজীবী হয়, একথা কেহ অস্বীকার করেন কি? বিধবাদের পরমায়ুঃ বৃদ্ধির কারণ এই যে, তাঁহারা রসনা সংযত রাখেন—এক সন্ধ্যা আহার করেন।

পাদ্রীগণ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানের রোজায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ ব্যতীত কোন ফল লাভ হয় না; এ কথাটি যুক্তিহীন। প্রমাণ—হিন্দু বিধবার স্বাস্থ্য। তবে "মুসলমান" নামধেয় জীবগণ যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি পালন না করে, সে দোষ তাহাদের,—রোজার নহে। সকল প্রকার সাংসারিক বস্তু ত্যাগ করাই প্রকৃত রোজা। (নতুবা "ধর্ম হয় না ক'রলে উপবাস।") কিন্তু সচরাচর মুসলমানেরা এই পবিত্র রোজার কি ভয়ানক অবমাননা করিয়া থাকেন!!

আমাদিগকে মুসলমান বলিলেও "মুসলমান" শব্দটির অপমান করা হয়। সুতরাং আমাদের ভণ্ড রোজার সম্বন্ধে যে পাদ্রীগণ বলেন, "Whatever is gained by fasting, is lost by feasting" (অর্থাৎ, দিনে রোজার দ্বারা যে পুণ্য হয়, তাহা রাত্রির অতি-ভোজনে নষ্ট হয়) তাহা ঠিক। আমাদের রোজার উদ্দেশ্য কেবল রসনা-পূজার মহা ঘটা!

৭ ঈদ-উৎসবের দিন যে দান করা হয়, তাহাকে 'ফেতরা' বলে।

৮ রোজা ধর্মের পাঁচটি প্রধান অঙ্গের (কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ) এক অঙ্গ। সে রোজা যাহারা এরূপে পালন করেন, অথচ 'ইসলাম' 'ইসলাম' বলিয়া শত কণ্ঠে চীৎকার করেন, তাঁহারা 'মুসলমান'ই বটে। তাঁহাদের নামাজও সেইরূপ।

কবে মুসলমান "মানুষ" হইবে ? রসনা-পূজা ছাড়িয়া ঈশ্বর-পূজা করিতে শিখিবে ? জগতের অনেক জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, ভাল-মন্দ বুঝিয়াছে ; কেবল ইহাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এখন ত আমাদের আর সে "জরির মস্‌নদ", তাকিয়া বা দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুম-কোমল "শাহানা বিছানা" নাই, তবে নিদ্রা যাইতেছি কোন্ সুখে ? আমাদের অবস্থা এখন এই প্রকার—"ঝোপ্‌ড়ী মেঁ রহনা ও মহলকা খাব দেখ্‌না !" অর্থাৎ, বর্তমানে কুঁড়ে ঘরে থাকি এবং অতীতের অট্টালিকার স্বপ্ন দেখি !! একজন কবি বলিয়াছেন,

I slept and dreamt life was beauty,
I woke and found life is duty.

তাই ত জীবনটা খেলা নহে।

পরিশেষে বলি, জীবন-ধারণের নিমিত্ত আহার করিতে হয়, খাইবার আশায় জীবন-ধারণ করা উচিত বোধ হয় না। ভরসা করি, এবার রমজান শরীফে আপনারা সাবধান থাকিবেন।

নবনূর
২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা,
অগ্রহায়ণ, ১৩১১ সন।

ঈদ-সম্মিলন

সংবৎসর পরে আবার ঈদ আসিল। আজি আনন্দের দিন, উৎসবের দিন সমুদয় মোস্‌লেম সমাজের সম্মিলনের দিন!

সারা বৎসরের অবসাদের পর আজি উৎসাহের দিন আসিয়াছে। যেন বসন্ত-সমাগমে মানবের গৃহরূপ কাননে অসংখ্য প্রীতি-কুসুম ফুটিয়াছে! বালক-বালিকার দল ত মনে করে, ঈদ না জানি কি! আর তাহাদের অভিভাবকেরাও কি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাহাদের আনন্দ-কোলাহালে যোগদান করেন না? আজিকার এ আনন্দ-প্রবাহে ধনীর অট্টালিকা ও দরিদ্রের দীনতম কুটির একই ভাবে প্লাবিত।

ঈদের নামাজের মূলে কি মহান ঐক্য লক্ষিত হয়! সহস্র সহস্র লোক একই কাবাশরীফ লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নামাজে দাঁড়াইয়াছে;—সকলে একই সঙ্গে ওঠে, একই সঙ্গে বসে,—একই সঙ্গে সহস্রাধিক মস্তক প্রভুর উদ্দেশে আনত হয়। তারপর? তারপর, নামাজ সমাপ্ত হইলে পর সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। কি সুন্দর ভ্রাতৃভাব! যাহারা প্রতিবেশীর প্রতি এতদিন কোনরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিত, তাহারা আজি সে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছে। আজি মসজিদে ছোট-বড় ধনী-নির্ধন এক যোগে সম্মিলিত হইয়াছে! এ দৃশ্য কি চমৎকার! এ দৃশ্য দেখিলে চক্ষু পবিত্র হয়; ক্ষুদ্র স্বার্থ, নীচ ঈর্ষা লজ্জায় দূরীভূত হয়; নিরানন্দ মৃতপ্রায় প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়। জাপানে একতা আছে সত্য; কিন্তু আমাদের এ অপার্থিব একতার তুলনা কোথায়? বৎসরের শুভদিনে এমন শুভ-সম্মিলন কোথায়?

কালের আবর্তনে এইরূপ আরও অনেক ঈদ আসিয়াছে; আরও অনেকবার মোসলেম ভ্রাতৃগণ এমনই ঈদের নামাজে যোগ দিয়াছেন; আরও অনেক বৎসর ঈদের নবীন চন্দ্র তাঁহাদের প্রাণে এমনই করিয়া ঐক্য জাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দিবাশেষে ঈদ রবির অস্ত-গমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃভাবও ম্লান হইয়াছে। যেন প্রতি বৎসর ঐক্যরূপ অমূল্য রত্নটি আমরা মসজিদ প্রাঙ্গণে রাখিয়া আসি! অথবা একতা যেন মসজিদ প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে! বলি, এ বৎসর এ বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগেও কি আমাদের ঈদ-সম্মিলন দিবাশেষে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে? না, এবার আমরা একতা সযত্নে রক্ষা করিব।

একতা মহাশক্তি; একতা আমাদের ধর্মের মূল,—আমাদের সমুদয় ধর্ম-কর্মেই ঐক্য নিহিত আছে। জানি না, কোন্ দস্যু (আমাদিগকে অজ্ঞান-তিমির নিশীথে নিদ্রিত পাইয়া) আমাদের মহামূল্য একতানিধি অপহরণ করিয়াছে। জানি না, কাহার অভিশাপে আমরা অভিশপ্ত হইয়াছি। তাই এখন আমরা সহোদরের সহিত মল্লযুদ্ধ করি, সহোদরার সহিত হিংসা করি, পুত্র-কন্যার অমঙ্গল কামনা করি। আমাদের ঘরে ঘরে আত্মকলহ লাগিয়া আছে। যাহাদের গৃহে পিতাপুত্রে বিবাদ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ, তাহারা সমস্ত সমাজটিকে "আপন" ভাবিতে পারিবে কিরূপে?

ঈদ-সমাগমে আজি আমাদের সে দুঃখ যামিনীর অবসান হউক। ঈদের বালার্কের সহিত আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে নব-আশার নবনূর উদ্দীপ্ত হউক। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ পদদলিত হউক। বলিয়াছি ত, এবার আমরা একতা মসজিদে ফেলিয়া আসিব না। আমাদের এ মহাব্রতে ঈশ্বর সহায় হউন।

আর এক কথা। এমন শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিন হিন্দু-ভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দুরাশা? সমুদয় বঙ্গবাসী একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি? অন্ধকার অমানিশার অবসানে যেমন তরুণ অরুণ আইসে, তদ্রূপ আমাদের এখানে অভিশাপের পর এখন আশীর্বাদ আসুক; ভ্রাতৃ-বিরোধের স্থানে এখন পবিত্র একতা বিদ্যমান থাকুক। আমীন।

আবার বলি, আজি কি সুখের দিন—আশীর্বাদ ও সুসংবাদ লইয়া শুভ ঈদ আসিয়াছে!!

নবনূর
৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা,
পৌষ, ১৩১২ সন।

সিসেম ফাঁক

আলিবাবার নিকট দস্যুদের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান পাইয়া কাসেম তথায় গেল। "সিসেম ফাঁক" বলিবা মাত্র ধনাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে বিস্ময়মুগ্ধ হইল। যক্ষের ধন দেখিয়া কাসেমের চক্ষুস্থির! সে দুই হস্তে প্রবাল, মুক্তা, মরকত, পদ্মরাগ, হীরক প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিতে লাগিল। থলিয়া ভরিয়া আশরফী লইল। সে জীবনে এত ধন কখনও দেখে নাই; আজি তাহার ভারী আনন্দ। সে বহুমূল্য সাটীন, কিংখাপ ইত্যাদি রেশমী বস্ত্রে বস্তা বোঝাই করিয়া রাখিল। অদ্য সে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে ধন বহিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু সবই ত হইল; এখন বাহির হইবার উপায় কি? কাসেম ত মূলমন্ত্র—অর্থাৎ উক্ত চারি শব্দ: "সিসেম ফাঁক," ভুলিয়া গিয়াছে! রাশীকৃত ধন লইয়া, ধনস্তূপে থাকিয়া, মণিমুক্তায় পরিবেষ্টিত হইয়া সে যে বন্দী—মুক্তির উপায় নাই। পরিশেষে কাসেম উন্মত্তের ন্যায় দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া "গোধূম ফাঁক," "উচ্ছে ফাঁক" ইত্যাদি অনেক শব্দ উচ্চারণ করিল; কিন্তু সকল বৃথা—আসল কথা, "সিসেম ফাঁক" সে ভুলিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার মুক্তির পথ রুদ্ধ।

আজি ১০।১২ বৎসর হইতে দেখিতেছি, আমাদের মুসলমান সমাজে জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—চারিদিকে বেশ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; নানা প্রকার সভা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা কাসেমের ন্যায় "অল্ ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ," "সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন," "অল ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স," অমুক ইনস্‌টিটিউশন, অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি বহুবিধ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটনের মন্ত্রটি, অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার বিষয় ভুলিয়া ছিলেন দেখিয়া আমি মৃদুহাস্য করিতাম। মনে মনে বলিতাম, ভ্রাতঃ! যাহাই করুন না কেন,—এ রত্ন-সম্ভার লইয়া সওগাত দিতে যাইবেন কোথায়? দ্বার যে বন্ধ। গৃহে যে গৃহিণী, ধর্মে যে সহধর্মিণী, ভাবী বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার যে রক্ষয়িত্রী ও পালনকর্ত্রী, তাহাকে সঙ্গে না লইলে আপনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না! গরীবের কথা বাসি হইলে ফলে; আমার কথাও (১০।১২ বৎসরের) বাসি হইয়া ফলিয়াছে।

এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই। তাই তাঁহারা আর শুধু ভ্রাতৃসমাজ লইয়াই ব্যস্ত নহেন। চতুর্দিকে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা

বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এখানে মুসলমান মহিলা সমিতি, সেখানে মহিলা ক্লাব প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান আমাদের শ্রুতিগোচর ও নয়নগোচর হইতেছে। এমন কি, গত বর্ষের "অল্ ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্সের" অধিবেশনে পর্দানশীন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ভ্রাতৃগণ এখন ভগিনীদের চিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা" এ ভারত আর জাগিবে না।

সওগাত
১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা,
অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

ঐ সুধাময় সঙ্গীত শ্রবণে পথিক রাত্রিজাগরণ-জনিত বেদনা ভুলিলেন। কেমন আনন্দানুভব করিলেন, তাহা বলিতে পারি না, তাহা কেবল অনুভবেরই জিনিস ; যে অনুভব করিয়াছে, সেই বুঝে।

আমাদের পথিক ভাবিলেন, ঐ মসজিদে গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে কেমন হয়? তাঁহার সঙ্গে মাত্র একটি হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল, সুতরাং মসজিদে দুই এক দিন বাস করিতে কোন অসুবিধা ছিল না। তিনি মসজিদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রবেশ করিতে সাহস পাইলেন না। একি! তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন যে। না, তিনি মসজিদে যাইবেন না। তিনি অসহায়ভাবে পথিপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

এই সময় তিন জন ব্রাহ্ম মহিলা ঐ পথে যাইতে যাইতে কি ভাবিয়া ঐ পথিকের নিকট দাঁড়াইলেন। এবার এ নিরাশ্রয় পথিক হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহিলাত্রয়কে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—

"আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আমার একটু উপকার করিবেন কি?"

প্রথম মহিলা। "উপকার? কি করিতে হইবে বলুন, চেষ্টা করিয়া দেখি।"

"আমার ভগিনীকে আপনারা দুই এক সপ্তাহের জন্য স্থান দিবেন কি? আমার অন্যত্র প্রয়োজন আছে। বাড়ীতে কেহই নাই। আপনারা তাহাকে দুই সপ্তাহ রাখুন, পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া, যাহা হয়, করিব।"

প্রথমা। আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আপনার বাড়ী কোথা? আপনি কে? আমরা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা, তবু আমাদের নিকট আপনার ভগ্নীকে রাখিতে চাহেন, ইহার অর্থ কি?

দ্বিতীয়া। আমরাও ত এখানে প্রবাসী—আমরা আজই কলিকাতায় চলিয়া যাইতেছি। আপনি স্থানীয় কোন লোকের বাড়ী চেষ্টা দেখুন।

পথিক অতি কাতরভাবে দীন-নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,— "আপনারা কেবল দয়াধর্মের অনুরোধে আমাকে—না, আমার কুমারী ভগ্নীকে আশ্রয় দান করুন!"

মহিলাত্রয় পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "আপনার ভগ্নীকে আমরা রাখিতাম, কিন্তু আমরা বাস্তবিক অদ্যই কলিকাতা যাইতেছি।"

"সেও কলিকাতায় যাইবে। আপনাদের বাসায় তাহাকে পৌছাইয়া দিই ; রেল-ভাড়া সে নিজেই দিবে।"

প্রথম মহিলা। (সঙ্গিনীদের প্রতি) তোমাদের কি মত ?

দ্বিতীয়া। তোমার যাহা ইচ্ছা। আমার আপত্তি নাই। তবে পরের বাড়ী কি না—মিসিস্ সেনকে পূর্বে কিছু না বলিয়া একজন অপরিচিতাকে লইয়া হঠাৎ যাই কিরূপে ? কি বল বিভা ?

বিভা। আমার পরামর্শ এই—অদ্য আমরা যাই ; মিসিস্ সেনকে সব বলিয়া রাখিব। (পথিকের প্রতি) আগামী কল্য আপনি সেখানে যাইবেন। এই নিন্, এই কাগজে আমাদের ঠিকানা লেখা আছে। আমাদের নিজের বাড়ী নয়—আমরা তারিণী-বিদ্যালয়ে কাজ করি। আপনার ভগিনী-সহ আপনি সেইখানে যাইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দীন-তারিণী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার তারিণীচরণ সেন অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র-কন্যা কেহই ছিল না ; ছিলেন কেবল তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণী বিধবা দীন-তারিণী। তিনি চারি বৎসর পর্যন্ত বৈধব্য-যন্ত্রণার সহিত নানাবিধ রোগ ভোগ করিলেন। অতঃপর কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তারগণ তাঁহাকে জবাব দিলেন। কিন্তু দীন-তারিণী মরিলেন না।

দেবর-ভাশুর প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীন-তারিণী একটি বিধবা-আশ্রম স্থাপন করিলেন। আশ্রমের নাম রাখিলেন—'তারিণী-ভবন'। তারিণী-ভবনের শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসাহিতা হইয়া তিনি একটা বিদ্যালয় খুলিলেন এবং 'নারী-ক্লেশ নিবারণী সমিতি' নামে একটি সভা গঠন করিলেন। তারিণী-ভবনের বিরাট অট্টালিকার একপ্রান্তে বালিকা-বিদ্যালয়, অপর প্রান্তে বিধবা-আশ্রম। কিন্তু ক্রমে তাঁহাকে তৎসংলগ্ন একটা আতুর-আশ্রমও স্থাপন করিতে হইল।

এইরূপে দীন-তারিণী শমন-ভবনের দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাগতা হইয়া বিরাট কার্যক্ষেত্রে নব-জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার এই কর্ম-জীবনে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বিরক্তই রহিলেন এবং তারিণী লক্ষাধিক

টাকার অযথা শ্রাদ্ধ করিতেছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতেন আর তারিণীর কার্য-কলাপকে বিদ্রূপ করিতেন।

যে বিধবার তিন কুলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে?—তারিণী-ভবনে। যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে?—তারিণী-বিদ্যালয়ে। যে সধবা স্বামীর পাশবিক অত্যাচারে চূর্ণ-বিচূর্ণ, জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে কোথায় গমন করিবে?—ঐ তারিণী-কর্মালয়ে। যে দরিদ্র দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে, তাহারও আশ্রয়-স্থল ঐ তারিণী আতুরাশ্রম।

দীন-তারিণী স্বীয় আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক একরূপ 'সমাজচ্যুতা' হইয়া নির্জনে বাস করিতেন। কিন্তু 'নির্জন' বলিলে মিথ্যা বলা হয়, কারণ তারিণী-বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রী (ডে-স্কলার) ব্যতীত কেবল বোর্ডিং হাউসেই শতাবধি বালিকা বাস করে; তদ্ব্যতীত তাহাদের শিক্ষয়িত্রী, 'মেট্রন', পরিচারিকা ইত্যাদি ত আছেই। তারিণী-ভবনেও লোকসংখ্যা অল্প নহে। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণ বলিতেন, "তারিণী আর লোক পাইবে কোথায়? কোন্ ভদ্র ঘরের বউ-ঝি তাহার নিকট যাইবে? দেশের যত পতিতা স্ত্রীলোক, যত কুষ্ঠরোগী, যত সব নগণ্য অনাথ শিশু—তাদের লইয়াই ত তারিণীর সংসার!!" এবম্বিধ মন্তব্য শ্রবণে তারিণী দুঃখিত না হইয়া বরং হাসিতেন। তিনি বলিতেন, "পর-সেবা করিবার মত সৌভাগ্য কি সকলের হয়?"

দীন-তারিণী সেদিন সন্ধ্যার সময় বড় ব্যস্ত ছিলেন। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত অনেক কাজের ভিড়। একজন কোচম্যান্‌কে কি কারণে সরকার বাবু প্রহার করিয়াছেন, সে নালিশের বিচার! সেইদিন অপরাহ্নে ৫নং 'বাসের' ঝি বলিয়াছিল, "ওমা! আমি আর থানার মেয়ে পৌঁছাতে যাব না! ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলেছেন, 'তোমাদের গাড়ী আটক দিব, আর কোচম্যান্‌কে ফটক দিব!" তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" —"ঘোড়ার পা খোঁড়া।" তবে তুমি বলিও "ঘোড়াকে আটক দিন, আর সইসকে ফাটক দিন!" কিন্তু সন্ধ্যায় 'কলিকাতা পশু-ক্লেশ-নিবারণী সভা'র পত্র আসিয়াছে যে, ৩ নম্বর এবং ৫ নম্বর 'বাস'-এর ঘোড়া খোঁড়াইয়া চলে সেজন্য তাঁহারা স্কুলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবেন। দুইজন সইসের বিরুদ্ধে ঘোড়ার দানা চুরির অভিযোগ। ৭নং বাস' গাড়ীখানা অপরাহ্নে ট্রামের ধাক্কায় চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল—ইত্যাদি নানাবিধ গোলমালে তারিণী ভারি ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় মিস্ বিভা চক্রবর্তী সংবাদ দিলেন যে, নৈহাটী হইতে সেই অজানা মেয়ে-মানুষটি আসিয়াছেন।

তারিণী। তুমি আজ রাত্রে তাহাকে তারিণী-ভবনে রাখ, আমি এখন তাহার সংবাদ লইতে পারিব না। আগামী কল্য প্রভাতে সর্বপ্রথমে তোমাদেরই দরবার করা যাইবে। এখন যাও—আমি বড় ব্যস্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারিণী-ভবন

বিভা সিদ্দিকাকে (সেই অপরিচিতা মহিলাকে) তারিণী-ভবনে লইয়া গেলেন।

সাধারণতঃ 'তারিণী-ভবন' বলিতে তৎসলগ্ন বিদ্যালয়, কর্মালয় এবং আতুরাশ্রমও বুঝায়।

বিদ্যালয়-বিভাগে ব্রাহ্ম, হিন্দু, খ্রীস্টান, শিক্ষয়িত্রী ত ছিলেনই। ক্রমশঃ মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের ধর্মশিক্ষার জন্য দুই তিন জন মুসলমান শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করা হয়। কি সুন্দর সাম্য!—মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান, সকলে যেন এক মাতৃ-গর্ভজাতা সহোদরার ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া কার্য করিতেছেন।

বিদ্যালয়ে গবর্নমেন্ট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া "সরকারী" পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাভুক্ত কোন পুস্তক অধ্যয়ন করান হয় না। দেশের সুশিক্ষিতা মহিলাদের সহিত পরামর্শ করিয়া দীন-তারিণী নিজেই পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচন করেন। ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র—সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তাহারা আত্ম-নির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই এ বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য করেন। বিশেষতঃ দেশীয় করদ ও মিত্ররাজ্যের রাজন্যবর্গের ভিক্ষা গ্রহণ করা হয় না।

আতুরাশ্রমে 'পথে পড়িয়া পাওয়া' নিঃসহায়, নিঃস্ব রোগী আশ্রয় পায়। আরোগ্য লাভ করিবার পর তাহারা চলিয়া যায়। কেবল কুষ্ঠ ও অক্ষম রোগী রহিয়া যায়।

আতুরাশ্রম বিভাগে অনেকেই অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন, অনেক মুসলমান মহিলা গোপনে অর্থদান করেন। নাম প্রকাশে পুণ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় এ দান-ক্রিয়া অতি গোপনে সম্পন্ন হয়।

'নারী-ক্লেশ-নিবারণী সমিতি'র সাহায্যে তারিণী-ভবনের অধিকাংশ ব্যয়-নির্বাহ হয়। অনেক মুসলমান মহিলা গোপনে এই সমিতির সভ্যা হইয়াছেন। বৃদ্ধা ও রোগ-হেতু কার্য করিতে অক্ষম দরিদ্র বিধবা ও সধবাগণ তারিণী-ভবনে বাস করেন।

কর্মালয়ে কুমারী, সধবা, বিধবা,—সকল শ্রেণীর লোকই আছেন। তাঁহারা বিবিধ সূচিকর্ম করেন, চরকা কাটেন, হাতের তাঁতে কাপড় বোনেন, পুস্তক বাঁধাই করেন, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। কেহ শিক্ষয়িত্রী-পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন; কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগী-সেবা শিখেন। ফল কথা, এ বিভাগে রমণীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করিয়া থাকেন। এই বিভাগে তারিণী-বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষয়িত্রী এবং আতুরাশ্রমের জন্য নার্স প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের অন্যান্য হিতকর কার্য, যথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং মহামারী-পীড়িত লোকদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বিভাগ হইতে মহিলাগণ তণ্ডুল, বস্ত্র ও ঔষধ-বিতরণ এবং রোগী-সেবা করিতে গিয়া থাকেন।

সিদ্দিকা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া গৃহশোভা দেখিতে লাগিলেন। পরিষ্কার ঝরঝরে পাথরের মেজে; বিলাসিতার কোন সরঞ্জাম, যথা টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি নাই; প্রত্যেক ভগিনীর জন্য এক একখানা শয্যা মাত্র। দেওয়ালে বড় একটা ঘড়ি নিয়মমত নিজের কার্য করিয়া যাইতেছে।

'ভগিনী'দের পোষাক সকলের প্রায় একই প্রকার; শ্বেতবস্ত্র শীঘ্র মলিন হয় বলিয়া এখানে তাহা ব্যবহার করা হয় না। সকলের পরিধানে নীলবর্ণ বা গৈরিক শাড়ী আর জামা। সভ্যতার পরিচায়ক জুতা, মোজা নাই। অলঙ্কারের আড়ম্বর কাহারও নাই; কাহারও কাহারও হাতে বালা কিংবা শাঁখা আছে

মাত্র। অহঙ্কার নাই, বিলাসিতা নাই—কেবলই যেন সরলতা ও উদারতায় ভূষিতা। যেন মুনিকন্যাগণ তপোবন ছাড়িয়া সংসারক্ষেত্রে আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই নিরাভরণ বেশেই কত না রূপ! 'ভগিনীগণ' সকলেই যেন সাক্ষাৎ করুণা!

এখানে সকলেই বয়স বিচার না করিয়া পরস্পরে "তুমি" সম্বোধনে কথা বলেন। একে অপরকে 'দি' (দিদি) এবং মুসলমানদের 'বু' (বুবু অর্থাৎ ভগিনী) বলেন। কোরেশা পাটনার অধিবাসিনী, বাঙ্গলার 'বু'র মর্ম্ম বুঝেন না বলিয়া তাঁহাকে 'বি' বলা হয়। দীন-তারিণী সাধারণতঃ 'মিসিস্ সেন' নামে পরিচিতা। তাঁহাকে সকলে "আপনি" সম্বোধন করেন; তিনিও কয়েকজন মহিলা ব্যতীত অপর সকলকে "আপনি" বলিতেন।

বিভা নিম্নলিখিত মহিলাত্রয়ের সঙ্গে সিদ্দিকার আলাপ করাইয়া দিলেন:

(১) চারুবালা দত্ত—চিরকুমারী, বয়স ৩৮ বৎসর।

(২) সৌদামিনী—সধবা, বয়স ৪৩ বৎসর; গৌরবর্ণা এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। বয়স অধিক হওয়াতেও লাবণ্য নষ্ট হয় নাই।

(৩) মিসিস্ হেলেন হরেস,—ইংরাজ মহিলা, বয়স ৪১ বৎসর, বিধবা বলিয়া পরিচিতা।

সিদ্দিকা ইঁহাদের আদর-যত্নে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন: ভাবিলেন, এমন স্থান পাইলে স্বর্গেরও প্রয়োজন নাই। অত্যন্ত ক্লান্তিবশতঃ সিদ্দিকা নৈশ-ভোজনের পর অচিরে নিদ্রাভিভূত হইলেন, সুতরাং 'ভগিনীগণ' ভালরূপে তাঁহার পরিচয় লইতে পারিলেন না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এবং কর্ম্মালয়ের ভগিনীদের বাসস্থান সম্বন্ধে পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তাগণ প্রত্যেকে এক একটি স্বতন্ত্র কামরা পাইয়া থাকেন, আর তাঁহারা গৈরিকবাসা সন্ন্যাসিনীও নহেন। 'ভগিনী'দের কাহারও স্বতন্ত্র কামরা নাই—বৃহৎ দালানে পাথরের মেজের উপর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র শয্যা, একটা আল্না এবং একটি ট্রাঙ্ক আছে। সিদ্দিকা এই কর্ম্মালয়ে সৌদামিনীর শয্যায় রাত্রিযাপন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদ্মরাগ

নির্বিঘ্নে রজনী যাপন করিবার পর সিদ্দিকা বেশ প্রফুল্ল হইলেন, এবং আপন স্বাভাবিক কান্তি ফিরিয়া পাইলেন। প্রাতঃরাশের পর বিভা ও উষারাণী সিদ্দিকাকে তারিণীর কক্ষে লইয়া গেলেন।

দীনতারিণীর সম্মুখে আনীতা হইয়া সিদ্দিকা সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

—"সিদ্দিকা।"

—"সিদ্দিকা, না পদ্মরাগ? তুমি দেখিতে ঠিক পদ্মফুলের মত টুকটুকে। এখানে রাত্রে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত?"

—"আজ্ঞে না, আমি বেশ আরামে ঘুমাইয়াছি। আপনার কাছে আশ্রয় পাইলে আবার কষ্ট কি?"

—"আহা! তুমি এমন কথা বলিও না। এ তোমার নিজের ঘর। এখানে তিনজন মুসলমান শিক্ষয়িত্রী আছেন, তুমি তাঁহাদের নিকট থাকিবে। কোন অসুবিধা হইলে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিও না। তোমাকে এখানে রাখিয়া তোমার ভাই কোথায় গেলেন?"

—"বিদেশে।"

—"তা বিদেশে গেলেই ভগ্নীকে এখানে রাখিতে হইবে, ইহার কারণ কি?"

—"আমাদের বাড়ীতে আর কেহ নাই যে।"

—"বিভা! তোমাকে ইহার ভাই কি বলিয়া গেলেন?"

বিভা।—"আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি নীচে যাইবার পূর্বেই নাকি তিনি ইঁহাকে গাড়ীতে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

—"তা বেশ লোক ত! কুমারী ভগ্নীকে একটা অপরিচিত স্থানে রাখিয়া গেলেন, অথচ সেখানকার লোককে দু'টি কথাও বলিয়া গেলেন না!"

বিভা।—"ইহাতে বুঝা যায়, আপনার প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভরসা যথেষ্ট আছে।"

তা।—"কিন্তু তুমি কিরূপে বিশ্বাস করিলে যে, এই মেয়ে নৈহাটীর সেই ভদ্রলোকের ভগ্নী?"

সিদ্দিকার মুখের দিকে চাহিয়া বিভা বলিলেন, "ইনি দেখিতে ঠিক তাঁহারই মতো মনে হয়, যেন জমজ-ভ্রাতা-ভগ্নী। আর আমি যে কাগজ-খণ্ডে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহাও ইঁহার নিকটই পাইলাম, আর যে হ্যাণ্ডব্যাগটা—"

উচ্চহাস্য করিয়া তারিণী বলিলেন, "বেশ! বেশ! আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই। তুমি ইঁহাকে তারিণী-ভবনে না দিয়া আপাততঃ কোনো শিক্ষয়িত্রীর কামরায় রাখ। তাহা হইলে, ইঁহাকে জাফরী খানমের জিম্মায় দিবে, না, কোরেশা বি'র সঙ্গে রাখিবে?"

—"কোরেশা বি'ই অধিক সভ্য-ভব্য; আর তিনি নিজেই সিদ্দিকাকে রাখিতে চাহিয়াছেন।"

—"তা, এই যে কোরেশা বি'ও আসিয়াছেন। বেশ, এই নিন্, এ মেয়েটিকে পরম যত্নে রাখিবেন।"

কোরেশা বিবি বলিলেন—"তাহা আর বলিতে? আমি ত সেই জন্য আসিয়াছি। (সিদ্দিকার প্রতি) আসুন, আপনার নাম কি?"

বিভা। "মিসিস্ সেন উঁহার নাম রাখিয়াছেন—পদ্মরাগ!"

কোরেশা।—'পদম্‌রাজ'? এ আবার কি নাম?

তারিণী।—"আপনি বিভার দুষ্টামী শুনিবেন না; এ বিবির নাম সিদ্দিকা খাতুন।"

বিভা।—"কোরেশা বি! আপনি আমাদের বাংলা নামগুলির বড় লাঞ্ছনা করেন; আপনি পদ্মরাগকে বলিলেন, 'পদম্‌রাজ'; আপনার এ ভারি অন্যায়।"

মিসিস্ ঊষারাণী চ্যাটার্জি বলিলেন, "এ জন্য আর দুঃখ কেন? তুমি প্রথম প্রথম মুসলমান মেয়েদের নামগুলি কেমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিতে,—রাসেখাকে "রসিকা", আর শওকৎ আরাকে "শুকতারা' বলিতে, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ?"

বিভা।—"একদিন জা'ফরী খানমের সঙ্গে ঐ বিষয় লইয়া লাঠালাঠি হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাও মনে আছে; তা আমাদের কোরেশা বি বেশ ভালো বাঙ্গালা বলিতে পারেন।"

উষা।—"নয় ত কি! এখনই তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন যে, "আপনাকে চায় খাবেন'!"

কোরেশা—(তারিণীর প্রতি মৃদুস্বরে) "কথাটি কি ঠিক বাঙ্গালা হয় নাই?"

তারিণী।—"তা সব ঠিক আছে; আপনি ও বাঙ্গালীন্‌দের কথায় কান দিবেন না।"

সান্ধ্য উপাসনার পর উষারাণীর কামরায় কোরেশা ব্যতীত অপর শিক্ষয়িত্রীদের এবং কর্মালয়ের 'ভগিনী'দের একটা সভা বসিল। আলোচ্য বিষয় ছিলেন—সিদ্দিকা।

জা'ফরী খানম বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার সুরে বলিলেন, "কোনো ভদ্রলোকের কন্যা এভাবে কোথাও আইসে না।"

চারুবালা।—"যদি সহোদর ভ্রাতা সঙ্গে আনিয়া রাখিয়া যায়?"

জা'ফরী।—"ঐ কথাই ত বলিতেছি, কোন ভদ্রলোক এমন করে না।"

উষা।—"কোন একটা ব্যবস্থা-পুস্তকে এরূপ আছে কি, যাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে,—'ভদ্রলোক কেবল এই এই কাজ করে' আর 'এই কাজ করে না'?"

বিভা।—"জ্বালাতন করিলেন দেখি; ভদ্রলোকে প্রবঞ্চনা করা, মিথ্যা বলা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা ইত্যাদি সব দোষ করিতে পারে; আর পারে না কেবল কোন সম্ভ্রান্ত জায়গায় ভগ্নীকে রাখিতে?"

চারু।—"ভদ্রলোকে না করেন কি? ডাকাতী, জুয়াচুরি, পরস্বাপহরণ, পঞ্চ 'মকার' আদি কোন্ পাপের লাইসেন্স্ তাঁহাদের নাই?"

উষা।—"যদি বিধবা মাসী-পিসির সর্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহার হাতে কমণ্ডলু দিয়া পথে না বসাইলেন, তবে আর তিনি কিসের বনিয়াদী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক? তাঁহার হজ্, তীর্থ, পুণ্য সবই বৃথা! যাক্ সে কথা। বলুন দেখি খানম সাহেবা, সিদ্দিকাকে দেখিয়া কি ধারণা হয়? কোনো কুলি-মজুরের মেয়ে, সাঁওতাল না কোল?"

জাফরী।—"আমি 'এল্‌মে কেয়াফা' (মুখদর্শনে মানুষ-চেনা বিদ্যা) জানি না। তবে ভদ্রঘরের মেয়ের মতো ইঁহার মুখশ্রীতে কোমলতা আছে।

নলিনী।—"বলি, খানম সাহেবা, আপনার লক্ষ্ণৌয়ী ভদ্রলোকেরা কি কাজ করেন?"

বিভা।—"তাঁহারা গোঁফে আতর আর কাপড়ে ঘি মাখেন।"

জাফরী।—"যাও বিওয়া (বিভা) দি! আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না।"

সৌদামিনী।—"অভাগিনী পদ্মরাগ নিশ্চয় সংসারের নির্ম্মম পেষণে বাধ্য হইয়াই বৃন্তচ্যুত কলিকার ন্যায় এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। সে যদি ভদ্র গৃহস্থের কন্যা নাও হয়, তবু আমরা তাহাকে 'ভদ্র' করিয়া লইব।"

নলিনী।—"তারিণী-কর্ম্মালয়-রূপ পরশ-পাথরের স্পর্শে সে সোনা হইয়া যাইবে।"

ঊষা।—"সোনা না হইয়া 'পদ্মরাগ' হইলেও আপত্তি নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিতান্ত একাকিনী

সিদ্দিকা ৯।১০ মাস হইতে তারিণী-কর্ম্মালয়ে আছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই। তাঁহাকে 'ভগিনী'গণ (তারিণী-কর্ম্মালয়ের মহিলাগণ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ সাধারণতঃ 'দরিদ্রের ভগ্নী' নামে পরিচিতা, সংক্ষেপে তাই কেবল 'ভগিনী' বলা হয়) অনেক আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় উঠিয়া পলাইতেন, নয়, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতেন, "ক্ষমা করিবেন, আমি কিছুই বলিতে পারিব না—আমি নিতান্ত একাকিনী। জগতে আমার কেহ নাই"।

আবার যদি প্রশ্ন হয়,—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"আমার বাড়ী সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ তারিণী-ভবন"।

এ দীর্ঘকালে সিদ্দিকা কাহাকেও একখানি পত্র লিখেন নাই, তাঁহার নামেও কাহারও চিঠি-পত্র আইসে নাই। সুতরাং তাঁহার পরিচয় জানিবার কোন উপায় নাই। তাঁহার ভ্রাতা যে তাঁহাকে মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য রাখিয়া গেলেন, তিনিও এযাবৎ একখানা পোস্টকার্ড দ্বারা ভগ্নীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই। আর সে ভ্রাতাকে তারিণী-ভবনের কোন লোকই দেখে নাই। সিদ্দিকা হ্যাণ্ডব্যাগটিসহ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিজেই গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছেন। পরে বিভা আসিলে, তাহার সহিত উপরে গিয়াছেন; যাহা হউক,

কোন প্রকারেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইত না। তিনি সর্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতেন। "ভগিনী"গণ তাঁহাকে হাসাইবার জন্য অনেক প্রকার হাস্য-কৌতুক করিতেন কিন্তু তিনি অটল পর্বতের মত স্থির, গম্ভীর। সময় সময় বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার ঈশান বাবু বলিতেন, "বাবা! অনেক দেখেছি—এমন মেয়ে দেখি নাই! এ যে সাক্ষাৎ পাষাণীর মেয়ে পাষাণী!!"

শিক্ষয়িত্রী এবং রোগী-সেবিকাগণ পরস্পরে সিদ্দিকার সমালোচনা করিয়া বলিতেন,—"পদ্মরাগ কি সত্যই মনুষ্য নহেন,—মানবের ভাষা বুঝেন না? কোন অজ্ঞাত স্বর্গ হইতে শাপভ্রষ্টা দেবী এখানে আসিয়াছেন কি? আহা! এমন শাপ কে দিয়াছে?"

"অথবা স্বর্গের দেবী পথ ভুলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। যেন সংসারের গতি মতি কিছু জানেন না।"

"তাই বটে; প্রভাতের ম্লানমুখী পূর্ণশশীটির মত; কিম্বা শুষ্কপ্রায় গোলাপ-মুকুলটির মত। আহা! কেন ওর গায় এত শীঘ্র সংসারের উত্তাপ লাগিল!"

"এ আশ্রমটি বেশ তাপদগ্ধ জীবনের দাঁড়াইবার স্থান হইয়াছে। দিদি, আমরা ত সংসারের নিষ্ঠুর নির্মমতায় চূর্ণ হইয়া সংসার ছাড়িয়া জুড়াইবার জন্য তারিণী-ভবনে আসিয়াছি। কিন্তু এ কিশোরী বালিকা সংসারের কি জানে যে, এই বয়সে সন্ন্যাসিনী হইতে আসিয়াছে?"

সৌদামিনী। কি জানি ভগিনী, কাহার মনের ব্যথা কে বুঝিতে পারে? জান, অনেক জিনিস অকালেই পরিপক্ক হয়। ভেবে দেখ, আবার অনেক কলি অকালে শুকায়। এ বিশাল সংসার-আকাশে ছোট বড় কত তারা—

নীরবে উদয় হয়, নীরবেই যায় অস্তাচলে;
কে তার হিসাব রাখে, কে রাখে সংবাদ?

নলিনী। হাঁ, সেই কবির বচন মনে পড়ে—

সাগরের সুগভীর আঁধার গহবরে
উজ্জ্বল রতন কত রয়েছে লুকায়ে;
ফুটিয়া কুসুম কত বিজন প্রান্তরে
শুকায় সৌরভ তার বায়ুতে মিশায়ে!

সৌদামিনী। তোমার রোগীর অবস্থা কিরূপ? আজ তুমি বোধ হয় একবারও তাহার নিকট যাও নাই।

নলিনী। না দিদি, তাহাও কি হয়? এই এখনই দেখিয়া আসিলাম। বেশ সুখে নিদ্রায় আছে।

চারুবালা। নার্স নলিনী কর্তব্য ভুলিবার পাত্রী নহেন! তোমরা হীরা মাণিকের আলোচনা কর, আমি ভাবি নলিনীর কথা; সে যে—

"ভ্রমর-গুঞ্জনে কতই শুনিত
আশার মোহিনী বাণী;
রচি কল্পনায় প্রসূন রাজত্ব
তাহাতে ছিল সে রানী!—"

বাল-বিধবা নলিনী সত্যই পদ্মফুলের মত প্রফুল্ল; বয়স ১৮ বৎসর হইবে। তিনি কপট বিরক্তির সহিত বলিলেন, "ছি! চারু-দি'! একটু গম্ভীর হইতে শিখ।"

চা। বেশ তবে—

"জীবন-সরসে কমল-কলিকা
আশার অরুণ পানে চাহিল—
নলিনীর পূর্ণ-বিকাশ দিবসে
মধ্যাহ্ন না এসে, সন্ধ্যা আইল!"

কিছু দিন পরে সিদ্দিকা বলিলেন, "আমাকেও কোন একটি কাজ দিন।"

সৌদামিনী। তুমি কি কি কাজ জান?

সিদ্দিকা। বিশেষ কোন কাজই জানি না; যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব।

সৌদা। যদি কাঠ কাটিতে বলি?

সিদ্দি। কাঠ কাটিতে পারিব না—এমন কাজ দিন যাহাতে শারীরিক বলের দরকার না হয়। সেলাই করিতে দিন না?

সৌদা। সেলাই—কি কি রকম জান? আমাদের জামা প্রস্তুত করিয়া দিবে? পেটিকোট, ব্লাউস, শার্ট ইত্যাদি ভাল মত ছাঁটিতে কাটিতে পার?

সিদ্দিকা কারচুবি ইত্যাদি উচ্চদরের সেলাই জানিতেন বটে, কিন্তু নিত্য-প্রয়োজনীয় কাপড় সেলাই করিতে শিখেন নাই। লেখা-পড়া যাহা শিখিয়াছেন, তাহাও এক্ষেত্রে অর্থকরী নহে। ফল কথা, জমিদার-পরিবারের কন্যাগণ যেমন লেখাপড়া—শুধু ভাষাশিক্ষা এবং নানারূপ সূক্ষ্ম সূচিকার্য, উল বুনান ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া থাকেন, সিদ্দিকাও তাহাই জানিতেন। সুতরাং সিদ্দিকা

দেখিলেন, তাঁহার কোন বিদ্যাই পয়সা উপার্জন করিবার উপযোগী যোগ্যতা লাভ করে নাই। অঙ্ক না জানার জন্য লেখাপড়া কাজে আসিল না। শেষে সেলাই করিতে চাহিলেন, তাহাতেও কাটা ছাঁটার হেঙ্গাম। অবশেষে স্থির হইল, তিনি দরিদ্র রোগীদের জামা, পর্দা, চাদরের মুড়ি, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি সেলাই করিবেন।

সেই দিন হইতে সিদ্দিকা সর্বদা সুচ সুতা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। অন্যান্য কার্যেও যথাসাধ্য যোগদান করিতেন। ঔষধের মিক্‌শ্চার (mixture) প্রস্তুত করিতেন; পথ্য রাঁধিতেন। ছোট ছোট কার্য যাহা করিতে অন্য সেবিকাদের অবসর হইত না, তাহা সিদ্দিকা করিতেন। কোন কার্যেই তাঁহার ঔদাস্য দেখা যায় না—কার্যে তিনি বড় মনোযোগী। রীতিমত অভ্যাস (practice) না থাকায় প্রথম প্রথম কোন কার্যই সুচারুরূপে করিতে পারিতেন না।

একদিন তারিণীর 'আফিস' কামরায় গিয়া কতিপয় মহিলাকে টাইপ (type) করিতে দেখিয়া সিদ্দিকা ভাবিলেন, এ কাজটি বেশ সহজ। তিনি রাফিয়া বেগমের নিকটে গিয়া টাইপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি প্রশ্ন করিলেন— "তুমি টাইপ করিতে পার?"

সি। কখনও করি নাই বটে, কিন্তু পারিব; দেখুন না—

কিন্তু তাঁহার টাইপ করা দেখিয়া সকলে হাসিয়া ফেলিলেন।

সিদ্দিকা লজ্জা পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"ইংরাজী জানি; টাইপ-রাইটারের চাবিতে লিখিত অক্ষরও পড়িতে পারি, তবু আমার হাতের অঙ্গুলিগুলি ঠিক চলিল না কেন?" পরে তিনি যথাবিধি টাইপ শিক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, (blind system অনুসারে) সামান্য দুই অক্ষরের একটি শব্দ, যথা "is" লিখিতে গেলেও একবার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি এবং পরে বাম হস্তের অঙ্গুলি ব্যবহার করিতে হয়!

যদিও দৈনন্দিন কার্যের অনুরোধে তারিণী-ভবনের সকল পুরুষ কর্মচারীদের সঙ্গে সর্বদা দেখা হইত, তবু সিদ্দিকা তাঁহাদের নিকট সুপরিচিতা ছিলেন না। সিদ্দিকাকে মিতভাষিণী জানিয়া তাঁহারা ইঁহার সঙ্গে অনাবশ্যক কথা বলিতে প্রয়াস পাইতেন না।

সন্ধ্যার সময় কার্য শেষ হইলে, রমণীগণ নদীতীরে বা মাঠে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। প্রথম প্রথম সিদ্দিকা তাঁহাদের সঙ্গে বাহির হইতেন না। পরে সকিনা ও নলিনী তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া সঙ্গে লইতে লাগিলেন।

শরৎ নামক একটি বালক এখানে আতুরাশ্রমে আসিয়াছে। তাহাকে সিদ্দিকা খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে সিদ্দিকা রোগী-সেবা শিক্ষা করেন। পূর্বে তিনি রোগী দেখিলে ভয় পাইতেন; শরৎ তাঁহাকে সেবাধর্ম শিক্ষা দিলেন। শরতের সেবা-শুশ্রূষার সময় সৌদামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বেশী হইল, কারণ সৌদামিনী শরৎকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রোগী

গ্রীষ্মাবকাশের সময় তারিণী-বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কতিপয় শিক্ষয়িত্রী সমভিব্যাহারে তারিণী কারসিয়ঙ্গে আসিয়াছেন। কোরেশা এবং সিদ্দিকাও আসিয়াছেন।

একদা অপরাহ্ণে ঊষারাণী, কোরেশা এবং সিদ্দিকা একটা উপত্যকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। বোডিলন রোড ধরিয়া ফিরিয়া আসিতে প্রায় রাত্রি হইল। বিভার মাতা পীড়িতা ছিলেন। তাঁহার জন্য ঔষধ লইয়া একটি 'শর্ট-কাট্' পথ দেখিয়া ঊষা বলিলেন,—"এই পথে চল, শিগ্‌গির যাওয়া যাইবে।"

'শর্ট-কাট্' পথে আসিতে আসিতে একটা ঝোপের নিকট মানুষের মত কি একটা জিনিসের উপর তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—এ কি! সত্যই একজন মানুষ রুধিরাক্ত কলেবরে পড়িয়া আছে। ঝোপের ভিতর জ্যোৎস্নালোক স্পষ্ট পোঁছিতে পারে নাই, তাই কিছু অন্ধকার ছিল। তাঁহাদের শরীর কন্টকিত হইল! তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, কি করা উচিত? ঊষা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মানুষটি এখনও জীবিত আছে—যত্ন করিলে বাঁচিতে পারে। কিন্তু যত্ন অতি শীঘ্র হওয়া আবশ্যক।

হাসপাতাল এখান হইতে অনেকটা দূর, আর তাঁহাদের বাসা অতি নিকটে। বিভা বলিলেন, "আপাততঃ আমরা ইঁহাকে বাসায় লইয়া গিয়া প্রাথমিক প্রতিবিধান (first-aid) করি, পরে যাহা হয়, করা যাইবে। কিন্তু মিসিস্ সেন যদি বিরক্ত হ'ন!"

কোরেশা। তিনি নিশ্চয় বিরক্ত হইবেন না ; যদি হ'ন ত আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিব।

উষা। মরণাপন্ন লোকের সাহায্যে মিসিস্ সেন আপত্তি করিবেন না। এখন তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি একটা 'ডাণ্ডি' লইয়া আসি।

'ডাণ্ডি' শিবিকার ন্যায় বাহন বিশেষ। দুই বা তিন জন কুলি স্কন্ধে বহন করে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় দার্জিলিঙ্গে 'রিক্শ', অশ্ব এবং 'ডাণ্ডি' ব্যতীত অপর কোন প্রকার বাহন ছিল না।

সৌভাগ্যবশতঃ 'ডাণ্ডি' শীঘ্রই পাওয়া গেল ; তাঁহারা মৃতপ্রায় লোকটিকে লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

* * * *

তারিণী। স্ত্রীলোক হইলে আমার চিন্তা ছিল না। কিন্তু এ পুরুষ মানুষের যত্ন কে করিবে ? তোমরা জানই ত, আমার এখানে পুরুষ চাকর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; বয়টা ছেলে মানুষ ; বেহারা ও পানিওয়ালা এ বাড়ীতে রাত্রিবাস করে না। একমাত্র বাবর্চি—সে ত রান্নাঘর ছাড়িয়া নড়িবার পাত্র নয়!

কোরেশা। তা কি করা যাইবে ? এখন ত ইহাকে আনিয়া ফেলিয়াছি।

তারিণী। তা বেশ, আপনারাই শুশ্রূষা করিবেন। আমি এ দায়িত্বের মধ্যে নই। বিভা ত খাটিবেই। কোরেশা-বি! আপনারও পর্দা করা চলিবে না—আপনি এ রোগীকে যথাবিধি দেখিবেন। আর পদ্মরাগ! তুমিও—

সিদ্দিকা। আমি যে 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' (first-aid) বা রোগী-সেবার কিছুই জানি না।—

তারিণী। জান না—শিক্ষা কর। বিভা, যাও শিগ্গির। তোমার মাতাকে দেখিতে ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া এ বেচারাকে দেখাও।

বিভা দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবু আসিলেন। কোরেশা গরম জল আনিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। উষা ডাক্তার বাবুকে রোগীর ক্ষত পরীক্ষায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন, সিদ্দিকা হরিকেন্ লণ্ঠন তুলিয়া আলো দেখাইতে লাগিলেন, পরিচারিকাদ্বয় ঔষধ জল ইত্যাদি সম্মুখে বাড়াইয়া

দিতেছিল। আর তারিণী?—তিনি কিছু করিবেন না বলিয়াছিলেন, কিন্তু এখন পুরাতন বস্ত্রের ব্যাণ্ডেজ প্রস্তুত করিয়া দিতেছিলেন।

* * * *

একটি কক্ষে একজন রোগী ঘুমাইতেছিলেন; তাঁহার শয্যার নিকট একটা চেয়ারে বসিয়া সিদ্দিকা একখানি বই দেখিতেছিলেন। বই দেখা হইতেছিল বটে, কিন্তু পড়া কত দূর হইল, বলা যায় না। তিনি জাগিয়া থাকিবার জন্য কখনও বই দেখিতেছিলেন, কখনও উন্মনা হইয়া উল্ বুনিতেছিলেন। কিন্তু কোন কাজই যে ঠিকমত হইতেছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য; কারণ তাঁহার চক্ষু দু'টি নিদ্রাভারাক্রান্ত ছিল।

একবার রোগী পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়া কাতরধ্বনি করিয়া উঠিল। রোগীর জ্ঞান হওয়াতে সিদ্দিকা একটু আহ্লাদিত হইলেন।

রোগী ডাকিল,—"করিম বখশ্—ও করিম বখশ্—"

সিদ্দিকা রোগীর কথায় বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "করিম বখশ্ ঘুমাইয়াছে।"

রোগী। তবে কি রাত হইয়াছে? কত রাত্রি হইবে?

সি। প্রায় তিনটা।

রো। তবে তুমি জাগিয়া আছ কেন? তুমি কে?

সি। আমি 'দরিদ্র ভগিনী', আপনি কিছু খাইবেন কি না তাহাই জানিতে আসিলাম।

রো। রফিকা। তুমি কখন আসিলে?

সি। আপনার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিন দিন হইল, আসিয়াছি।

রো। আমি পীড়িত নাকি? ও। তাইতে আমি উঠিতে পারি না, আমার সর্বাঙ্গে ভারী ব্যথা হইয়াছে।

"সেজন্য চিন্তা নাই, আল্লাহ্ চাহে আপনি শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবেন।" এই বলিয়া সিদ্দিকা এক বাটি দুধ আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন।

রোগী উঠিয়া বসিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—"এ কাহার বাড়ী? এ ত সে সেনিটেরিয়ম্ নয়।" সিদ্দিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর কই, আপনিও ত রফিকা নহেন। অনুগ্রহ করিয়া বলুন দেখি, আমি এখানে কিরূপে আসিলাম?"

সি। সে কথা পরে বলিতেছি; এখন আপনি বড় ক্লান্ত আছেন, এই দুধটুকু খান দেখি। আপনার কোন চিন্তা নাই।

রোগী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দুগ্ধ পান করিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে নলিনী আসিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া সিদ্দিকা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

নলিনী পাশ করা নার্স; তিনি সময়োপযোগী দুই-চারিটি মিষ্ট কথায় রোগীকে তুষ্ট করিলেন। অতঃপর সিদ্দিকার সাহায্যে তাঁহার ক্ষতস্থলে ঔষধ লাগাইয়া দিলেন।

রোগীকে যথাবিধি শয্যায় রাখিয়া নলিনী যাইতে চাহিলেন। সিদ্দিকা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন,—"একটু ব'স না, রাত ত আর বেশী নাই।"

নলিনী। তাই ত যাইতেছি, একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিব।

সিদ্দিকা। সে কি—তুমি জাগিয়াছিলে নাকি? আজ ত—

নলিনী। হাঁ, আজ রাত্রে ত আমার কোন কাজ ছিল না; কিন্তু পোড়া চক্ষে ঘুম নাই, তাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তোমাদেরও দেখিতে আসিলাম।

সি। আর আমার চক্ষে তোমাদের সকলের নিদ্রা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে,—আমি যেন চক্ষু খুলিতেই পারি না। আমি তোমার মত জাগিতে পারি না কেন?

নলিনী। অভ্যাস হইলেই পারিবে। এখন ছাড়—যাই।

তখন রজনী প্রভাত হইয়াছিল। সিদ্দিকা একটি জানালা খুলিয়া দেখিলেন, ঊষার রক্তিমচ্ছটায় আকাশমণ্ডল আরক্ত হইয়াছে। প্রভাত হইয়াছে শুনিয়া রোগী একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন, কিন্তু কিছু কহিলেন না। আবার পূর্ববৎ চক্ষু বুঁজিয়া রহিলেন।

আরও কত দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। এ পর্যন্ত কেহ রোগীকে নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নাই। অভাগা রোগী নীরবে সবই দেখিতেন, শুনিতেন, স্বয়ং কিছু বলিতেন না। যেন কি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। প্রতিদিন দেখেন—সেবিকা বদল হয়। আজ রাত্রে নলিনী জাগেন ত কাল রাত্রে সিদ্দিকা কিম্বা ঊষা জাগেন। রাত্রে যখনই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখনই দেখিতে পান, এক দেবীমূর্ত্তি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। তখন মনে করেন, ইঁহারা যথার্থই "ভগিনী"। রফিকা কি এত যত্ন করিতে পারিত?

একদিন অপরাহ্নে সিদ্দিকা তাঁহার নিকটে বসিয়া ক্রুশে কি বুনিতেছিলেন, সেই সময় রোগী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য বলুন দেখি, আমি কোথায়? এ কাহার বাড়ী? আমি কি প্রকারে এখানে আসিয়াছি?"

সি। আপনি কারসিয়ঙ্গে মিসিস্ সেন নাম্নী এক ব্রাহ্ম মহিলার বাসায় আছেন। আমরা সকলে তাঁহারই বাসার লোক। আপনি বোর্ডিলন রোডের পার্শ্বে একটি শর্ট্ কাট রাস্তার ধারে আহত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইয়া আপনাকে এখানে আনিয়াছি।

এমন সময় কে বাহির হইতে ডাকিল,—"সিদ্দিকা, শুনে যাও!"

সিদ্দিকা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। রোগীর সহিত আর কোন কথা হইল না। রোগী ভাবিলেন, 'এ মেয়েটি তবে মুসলমান। ব্রাহ্ম-বাড়ীতে মুসলমান—এ কি প্রহেলিকা! যাক্—আমার কি?'

তারিণী আসিয়া দেখিলেন, রোগী অনেকটা সবল ও সুস্থ হইয়াছেন এবং উঠিয়া বসিয়াছেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

রোগী। আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! আপনাদের যত্নে আমি জীবন ফিরিয়া পাইলাম! এখন আমার মনে পড়ে, আমি কিরূপে আহত হইয়াছিলাম। আমি দার্জিলিং হইতে সেদিন কারসিয়ঙ্গে আসিয়াছিলাম; হোটেলে রাত্রিযাপন করিবার মানসে সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। পথে তিন জন লোক আমাকে ধরিল। তাহারা আমার ঘড়ি, চেন, চশমা ইত্যাদি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। আমি 'পুলিশ! পুলিশ!' বলিয়া চীৎকার করায় তাহারা ছোরা ও লাঠির দ্বারা আমাকে আক্রমণ করিল, আমি অজ্ঞান হইয়া ভূতলশায়ী হইলাম। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারাই জানেন।

তারিণী। অত্যধিক রক্তস্রাব হওয়ায় আপনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। এখানে আনিবার পর আপনার অবস্থা এমন ভীষণ ছিল যে, আমরা আর আপনাকে কষ্ট দিয়া হাসপাতালে পাঠাইতে সাহস করি নাই। আমাদের প্রধান চিন্তা ছিল, আপনার প্রাণরক্ষা করা। যাহা হউক, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমরা আপনার 'দরিদ্র ভগিনী', আমাদের সাধ্যমত আপনার সেবা যত্ন করিব। আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

রোগী। 'লতীফ আল্মাস্'। আপনাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, জানি না। মাতা, ভগিনীও এতটা যত্ন করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

মিঃ লতীফ আল্মাসের যখন রোগের কিছু উপশম হইল, তখন আর 'ভগিনী'গণ তাঁহার নিকট বড় একটা আসিতেন না। কেবল কম্পাউণ্ডার ঈশানবাবু দুই বেলা তাঁহার ক্ষত অঙ্গে প্রলেপ দিয়া যাইতেন। এইরূপে ঈশানবাবুর সঙ্গে লতীফের বেশ আলাপ হইল; তিনি ইঁহার নিকট 'ভগিনী'দের

সংক্ষিপ্ত এবং দীনতারিণীর বিস্তৃত পরিচয় পাইলেন। তিনি কেবল সিদ্দিকার পরিচয় দিতে পারিলেন না।

ল। আপনারা এরূপ অজ্ঞাতকুলশীলা স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হন না? হইতে পারে, তিনি খুন করিয়া আসিয়াছেন; হইতে পারে, তিনি নিতান্ত জঘন্য স্থান হইতে আসিয়াছেন।

ঈ। যিনিই যাহা করিয়া আসুন না কেন, আমাদের 'তারিণী-ভবন' গঙ্গা—ইহাতে এক ডুব দিলেই সকলে পবিত্র হইয়া যায়।

ঈশানবাবুকে সকলে 'ঈশান-দা' বলিয়া ডাকেন। লতীফও তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শরৎকুমার

শরৎকুমার নামক একটি ৯ বৎসরের বালক তারিণী-ভবনে আসিয়াছে। ধীরেন্দ্রবাবু অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্ম। পূর্বে তিনি ধনী লোক ছিলেন। কালের কুটিল আবর্তে এখন দরিদ্র হইয়াছেন। শরৎ এক বৎসর বয়সে মাতৃহীন হয়, সুতরাং পিতার বড় আদরের ধন। ধীরেন্দ্র বাবুর নিকট সমস্ত জগৎ—ঐশ্বর্য-বিভব একদিকে, আর শরৎ একা একদিকে। শরৎকে পাইয়া ধীরেন্দ্র ভাবিতে পারিতেন না যে, জগতে ইহার অপেক্ষা আরও কিছু মূল্যবান জিনিস আছে।

দুই বৎসর যাবৎ শরৎ ম্যালেরিয়া, প্লীহা প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছে। ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী—সকল প্রকার চিকিৎসাই শরৎ অতিক্রম করিয়াছে। ধীরেন্দ্র আর ডাক্তার হাকিম বিশ্বাস করেন না।

হতভাগ্য ধীরেন্দ্রের বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নাই—তাঁহার মাতা ভগ্নী ইত্যাদি কেহই নাই। দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়াগণ দরিদ্রের বাড়ী আসিবেন কেন? যাহার কপাল পোড়ে, তাহার বিপদও শতাধিক। ধীরেন্দ্র স্বয়ং দিবারাত্রি শরতের শুশ্রূষা করিয়া হতাশ ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে

অধিকতর ও যথোপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার আশায় শরৎকে তারিণী-আতুরাশ্রমে আনিয়া রাখিলেন। আশ্রমবাসিনীগণ যথাসাধ্য তাহার যত্ন করিতে লাগিলেন। শেষে বায়ু-পরিবর্তনের নিমিত্ত তাহাকে লইয়া কারসিয়ঙ্গে আসিলেন।

শরৎকে লইয়া তারিণীর আসিবার ৮ দিন পরে লতীফ আসিয়াছেন। তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন।

লতীফ অনেকটা সুস্থ হইলেন ; ধীরে ধীরে হাঁটিতে পারেন। তিনি সময় সময় শরতের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। শরৎ এখন নিতান্ত শীর্ণ অবস্থায়। একদিন বাল-স্বভাবসুলভ হাস্যমুখে সে সৌদামিনীকে বলিল,—"পিসিমা! বাবা কখন আসিবেন ?"

সৌদামিনী। তোমার বাবা ত এখনই গেলেন। আবার বাবাকে দেখিতে চাও কেন ? আমাদের উপর বুঝি তোমার মায়া নাই ? বাবাই সব ? বাবা আসিলে কি হয় ?

শরৎ। বাবা ত কিছু করেন না, তবু বাবা আসিলে অসুখ সারে—জ্বর কমিয়া যায়। আরও কত কি হয়। বাবাকে দেখিলে কত সুখ হয়।

সিদ্দিকা। তবে তোমার বাবাকে ডাকিতে পাঠাই ?

শ। না। এখন আর বাবাকে কষ্ট দিয়া কাজ নাই। বাবাকে বেশী কষ্ট দিলে ঈশ্বর বিরক্ত হইবেন।

ল। (ঈষৎ হাস্যে) তাও তুমি জান ? আর কি জান ?

শ। গান জানি। আপনারা গান শুনিবেন ?

সৌ। না, তুমি এখন চুপ কর। বেশী কথা কহিলে তোমার কাশি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ঈশ্বর দুঃখিত হইবেন।

শ। আমি তবে কবিতা পাঠ করি ?

সৌ। এখন না।

শ। আমার গান আপনাদের ভাল লাগে না ?

নলিনী। ভাল ত লাগে, কিন্তু তোমার কষ্ট হয় যে। তুমি এখন একটু ঘুমাও দেখি।

শ। আমি একটু কষ্ট স্বীকার করিলে—কষ্ট করিয়া গান গাহিলে আপনাদের সুখী করিতে পারি, তবে সে কাজ করিব না কেন ? মানুষ কয়দিনের জন্য ? পরের জন্য কষ্টভোগ করিব না, তবে কি করিব ?

লতীফ ভাবিলেন, এ বালক কে ?—এ যে মূর্তিমান প্রেম। ধীরেন্দ্রবাবু এমন রত্ন কোন্ তপস্যার ফলে পাইয়াছেন ? তিনি বালকের তেজঃপূর্ণ উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া মোহিত হইলেন।

শরৎ এবার গান আরম্ভ করিল ; কিন্তু এক পদ গাহিতে না গাহিতেই কাশিতে কাশিতে অস্থির হইল। সৌদামিনী বলিলেন, "তুমি কথা শুন না ; তুমি ভারি দুষ্ট ছেলে ! তোমার সব গুণ আছে, কেবল বাধ্যতা নাই।"

শ। পিসিমা ! অবাধ্যতার শাস্তি যথেষ্ট হইল, আর কেন—(কাশি)।

অত্যধিক দুর্বলতাবশতঃ শরৎ আর তাহার অতি সাধের গান "এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে—" গাহিতে পারে না। তবু সময় সময় ভৈরবী বা বেহাগের গৎ আবৃত্তি করিত। নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে ঐ কণ্ঠে—ঐ শরৎকুমারের সুমধুর কণ্ঠস্বরে সেই সাধারণ 'সা-রে-গা-মা' যে কত মধুর শুনাইত, তাহা যে শুনিয়াছে, সেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। স্বর্গীয় সঙ্গীত কি তাহা হইতে অধিক সুন্দর ?

ক্রমে শরৎ বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িল ; আর তাহার সঙ্গীতে রুচি নাই। যে সৌদামিনী তাহাকে গাহিতে নিষেধ করিতেন, তিনিই এখন এক একবার মিনতি করিয়া বলেন,—"বাবা, একটি গান গাও ত।" বাবা উত্তর করে, "না—ভাল লাগে না।" সৌদামিনী মুখ ফিরাইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করেন।

১লা আষাঢ় তারিণী-বিদ্যালয়ের ছুটি শেষ হইবে বলিয়া কেবল সৌদামিনী, নলিনী ও সকিনাকে লতীফ ও শরতের শুশ্রূষার জন্য তথায় রাখিয়া, অপর সকলকে লইয়া তারিণী কলিকাতায় গিয়াছেন। সিদ্দিকা স্বয়ং সুস্থ সবল নহেন বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। ঈশানবাবুও রহিলেন। এই কথা স্থির হইল যে, শরতের অবস্থা কিরূপ হয়, দেখিয়া, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি অবশিষ্ট সকলে কলিকাতায় যাইবেন।

সন্ধ্যার পর লতীফ আবার শরৎকে দেখিতে আসিলেন। তাহার আকর্ষণী-শক্তি এমনই প্রবল যে, কেহ তাহাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারে না। এ সময় ধীরেন্দ্রও আসিয়াছিলেন। শরৎ ক্ষীণ ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "কেমন আছ বাবা ? আজ তুমি হয়ত কিছু খাও নাই, তোমার মুখ শুক্‌নো।"

ধী। (পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া) আমি বেশ আছি। আমার জন্য চিন্তা নাই। তুমি ভাল হইলে জীবন ফিরিয়া পাই।

শ। বাবা, মরণ ত একদিন আছেই, তবে সে নাম শুনিলে তোমরা ভয় পাও কেন? জীবন অল্পদিনের জন্য, মরণ ত চিরদিনের জন্য! তুমি আমাকে যত ভালবাস, সে ভালবাসা ঈশ্বরকে—

ধী। বাবা, চুপ কর! তোমার বক্তৃতা বন্ধ কর শরৎ! বার বার ঐ কথা! আর কোন কথা নাই?

শ। অন্য কথা থাকিতে পারে, আমি জানি না। (ঈষৎ হাস্যে) তুমিই না বলিয়াছ, ঈশ্বরকে সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে হয়? তবে তুমি শরৎ—ক্ষুদ্র শরৎকে ঈশ্বরের চেয়ে বেশী ভালবাস কেন?

ধী। তুমি চুপ করিবে না? এখন একটু ঘুমাইবে না? তবে আমি চলিলাম।

ধীরেন্দ্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া শরৎ ডাকিয়া বলিল—"বাবা! বাবা! ফের! তুমি রাগ কর কেন? আর একদিনের জন্য এত মান অভিমান কেন?" "আর এক দিনের জন্য"—কথাটা ধীরেন্দ্র তখন বুঝিতে পারেন নাই—পরদিন বুঝিলেন!!

অদ্য শরৎ বড়ই কাতর। কাশিতে কাশিতে মূর্চ্ছিতপ্রায়। সকলেই তাহার জন্য দুঃখিত। সৌদামিনী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন সে মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন মুখ আর দেখিতে পারেন না। সে দৃশ্য নিতান্তই অসহ্য! শরৎ উদ্‌গ্রীব ছিল—পিতার জন্য; যেন পিতা আসিলেই বিদায় লইয়া যাইতে পারে। হতভাগ্য পিতা আসিলেন। শরৎ অধীরভাবে বলিল, "বাবা! আর বাঁচি না!"

ধী। বাবা! তুমি অমন কথা বলিলে আমি বিবাগী হইয়া বনে যাইব। তুই ছাড়া আমার আর কে আছে? আমার জগৎ আঁধার হইবে যে বাবা! তাহা কি তুই বুঝিস্ না?

আর শরৎ 'আহাটি' বলে নাই। সে জানে, তাহার জন্য তাহার পিতার কত কষ্ট হয়। তাই আর নিজের যন্ত্রণা পিতাকে জানিতে দেয় নাই। নীরবে ছটফট্ করিয়া মরণ-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল। নিতান্ত অসহ্য হইলে শয্যায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ গড়াগড়ি করিত—কিন্তু 'উঃ' পর্যন্ত বলে নাই। কি মহতী সহিষ্ণুতা!! এ কি মানবে সম্ভবে? মানব এমন ধৈর্য পাইবে কোথায়?

তারপর? তারপর আর কি—শরৎ পিতাকে কোলে লইতে ইঙ্গিত করিল, পার্থিব পিতার ক্রোড় হইতে বিশ্বপিতার ক্রোড়ে গিয়া অনন্ত বিশ্রাম লাভ

করিল !! শ্রাবণের মেঘ গভীর গর্জনে বৃষ্টির ছলে কাঁদিয়া ফেলিল !—সমীরণ চিৎকারস্বরে 'হায় হায়' বলিয়া উঠিল !! গগনে শশী তারা কিছুই নাই—জগৎ ঘোর অন্ধকার !!!

সৌদামিনী ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, শরৎ যেন মরিতেছে। মৃত্যুকালে যেন সে তাহাকে বলিল,—"পিসিমা! আমি এখনও মরি নাই—তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" সৌদামিনী জাগিবা মাত্রই পাগলিনী-প্রায় মুক্তকেশে দৌড়িলেন। শরৎকে ডাকিলেন—শরৎ একটু চক্ষু খুলিল; কিছু বলিল না—তখন তাহার বাক্‌শক্তি ছিল না। আবার চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইল। যাও সৌদামিনী! আর কি দেখ? এ তোমার শরৎ নহে, এ কেবল মৃন্ময় পুতুল মাত্র—তোমার শরৎ এখানে নাই—নাই !!

* * * *

ধীরেন্দ্র সৌদামিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সৌদামিনী চিনিয়াছিলেন, ধীরেন্দ্র চিনেন নাই। তিনি ১৭ বৎসর হইতে ভগিনীকে দেখেন নাই, সুতরাং চেনা অসাধ্য। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী সৌদামিনী কথাবার্তায় ভ্রাতাকে চিনিয়াছেন, কিন্তু নিজের পরিচয় দেন নাই। শরৎকে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আপন' বলিতে একটি লোক পাইয়া দগ্ধপ্রাণ জুড়াইবেন। কিন্তু পোড়া-কপালে তাহাও হইল না। সেই জন্য ভ্রাতাকে আর পরিচয় দিলেন না। কি জানি, ভাইটিকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিলে যে আনন্দ হয়, তাহাতেও যদি বিধাতার হিংসা হয়, তাহার ফলে ভাইটিও যদি না থাকে? তবে কাজ কি? দগ্ধ-হৃদয়ের আগুন কণামাত্র নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করাও বৃথা—জ্বলুক হৃদয় তবে জ্বলুক! জ্বলুক !!

শরৎকুমারের মৃত্যুর পর ধীরেন্দ্র আর দেখা দেন নাই। কোথায় গিয়াছেন, আল্লাহ্ জানেন। যাও ধীরেন! যোগী হইয়া গহন কাননে, হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে শরতের অনুসন্ধান,—না, শরতের নির্মাতার অনুসন্ধান কর গিয়া! নিষ্ঠুর জগৎ তোমাকে অনায়াসে ভুলিয়া থাকিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

পরার্থপরতা

মানুষ সময় সময় কোন একটি জিনিসের প্রতি কেন যে আকৃষ্ট হয়, তাহা তাহারা নিজেই বুঝিতে পারে না। সেই অজ্ঞাত কারণটা কি? লতীফের পীড়ার সময় তিনি সর্বদা সিদ্দিকাকে আপন শিয়রে উপবিষ্টা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। অন্যান্য ভগিনিগণ নানাপ্রকার গল্প পরিহাস দ্বারা তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন, আর সিদ্দিকা কেবলই নীরবে বসিয়া থাকিতেন। লতীফ ঐ মৌনভাবই ভালবাসিতেন। এখন লতীফ অনেক পরিমাণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, সুতরাং সিদ্দিকা আর নিকটে আসিয়া বসেন না।

এমন স্বর্গতুল্য স্থান ছাড়িয়া যাইতে লতীফের মনে একটু কষ্ট হইতেছিল; কিন্তু যাইতে হইবেই। শরতের জন্য 'ভগিনি'গণ শ্রাবণ মাসের ১৫ই পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু শরৎ-কাহিনী শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহেই শেষ হইয়াছে। 'ভগিনি'গণ এখন কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন; তাঁহারা কেবল লতীফের গৃহ-গমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লতীফ হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাথেয় ইত্যাদিতে ২৫০৲ টাকার কম লাগিবে না। কাপড় দুই এক যোড়া প্রস্তুত করিতে হইবে। আশ্রমে তাঁহার জন্য যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাও শোধ করা উচিত, কারণ তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট লোকে আতুরাশ্রমের দান গ্রহণ করিলে দান দিবে কে? তিনি ৩০০৲ টাকা পাঠাইবার জন্য বাড়ীতে চিঠি লিখিলেন।

যথাসময় লতীফের পত্রের উত্তর আসিল। পত্রখানি রমণীর কোমল হস্তলিখিত ছিল বটে, কিন্তু ভাষার কোমলতায় লতীফ সন্তুষ্টি অনুভব করিতে পারিলেন না। পত্রের মর্ম এই:

"তোমার পত্রে জানা যায় যে, একদল দস্যু তোমার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে; এবং দুই মাস তুমি পীড়িত থাকায় আমাদের পত্র লিখিতে পার নাই। কিন্তু তোমার সঙ্গী এখানে আসিয়া আমাদের জানাইয়াছেন যে, দস্যুগণ তোমাকে হত্যা করিয়াছে। তিনি তোমার জিনিস-পত্র ফেরৎ আনিয়াছেন। সুতরাং তোমার চিঠি দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, আর কেহ তোমার হস্তাক্ষর জাল করিয়া টাকার জন্য লিখিয়াছে। আমরা তোমাকে স্বচক্ষে না দেখিলে, তুমি বাঁচিয়া

আছ বলিয়া বিশ্বাস করিব না। আমি ভাইকে এ বিষয় লিখিয়াছি। তিনি তোমাকে দেখিতে যাইবেন, তাঁহার সঙ্গেই তুমি আসিও।"

লতীফ পত্রখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। কি পাগল, এমন কথা শুনিলে কাহার না রাগ হয়? সালেহার কোন কাজ করিবারই যোগ্যতা নাই; সন্দেহ যে করিবেন, সে সন্দেহ করিবার যোগ্যতাও তাঁহার নাই। লতীফ ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করি? টাকা না পাইলে গৃহে গমন করি কি করিয়া? এমন সময় মৃদু পদ-বিক্ষেপে সৌদামিনী তথায় উপস্থিত হইলেন।

সৌদামিনীকে দেখিয়া লতীফের মনে কেমন যেন একটু আনন্দ-সঞ্চার হইল। যেন নিরাশার মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল, হঠাৎ আশা-সৌদামিনী দেখা দিলেন। লতীফের হস্তে ছিন্ন পত্রখণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর চিঠি মিঃ আলমাস্? কি খবর? সকলে ভাল আছেন ত?"

ল। ভাল ত আছেন।

সৌ। তবে কিসের ভাবনা?

ল। কই, ভাবনা ত নাই।

সৌ। কিন্তু আপনি যে ভাল সংবাদ পান নাই, এ-কথা নিশ্চিত। অন্ততঃ আশানুরূপ সন্তোষজনক উত্তর পান নাই।

ল। আপনার কথাই ঠিক। আমি কিন্তু চিন্তান্বিত নহি।

সৌ। আপনি চিন্তান্বিত না হইতে পারেন, কিন্তু রাগান্বিত হইয়াছেন।

ল। (লজ্জিতভাবে) আপনি দেবী, আপনার নিকট কিছু গোপন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। সত্যই আমার রাগ হইয়াছে। আমি টাকা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাঠাইবেন না। আমার টাকা আমিই পাইব না।

সৌ। সেজন্য দুঃখ কেন? আপনি যত টাকা প্রয়োজন, ধার লইতে পারেন, সুবিধামত শোধ করিবেন।

ল। আমাকে এখানে কে চিনে যে টাকা ধার দিবে?

সৌ। আমরা দিব। উপস্থিত আমাদের কয় ভগিনীর হাতে যত টাকা আছে, তাহাতে না কুলাইলে, মিসিস্ সেনকে লিখিয়া তারিণী-ভবন হইতে টাকা আনাইব। আপনার কত টাকার দরকার?

লতীফ বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। টাকা এমন জিনিস—সেই টাকা এ অজ্ঞাতা রমণীগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া দিতে প্রস্তুত। আর তাঁহার স্ত্রী ৩০০৲ না হউক, অন্ততঃ ৫০টি টাকাও পাঠাইতে সাহস করেন নাই। লতীফ সকৃতজ্ঞ স্বরে

বলিলেন, "ভগিনী! আমি আপনাদের দয়ায় ডুবিয়া আছি। বাস্তবিক আপনাদের অতি-অনুগ্রহে আমি লজ্জিত হই। আমি আপনাদের এত দয়া স্নেহের যোগ্য নহি। আমি পাথেয় অভাবে বাড়ী যাইতে পারিতেছি না। আপাততঃ ১০০৲ টাকা হইলেই হইবে।"

সন্ধ্যার সময় ভগিনিগণ বাগানে বসিয়াছিলেন। সমস্ত দিনের বৃষ্টির পর আকাশ এখন কিঞ্চিৎ মেঘমুক্ত ছিল। দশমীর শশী প্রাণ খুলিয়া তারাকুমারীদের সঙ্গে হাস্যামোদ করিতেছিল। তাহার রূপের ছটায় ধরণী রজতস্রোতে ভাসিতেছিল। এক একবার একখণ্ড মেঘ আসিয়া সুধাকরকে ঢাকিয়া কৌতুক দেখিতেছিল। সিদ্দিকা এক কোণে বসিয়া ঐ গগনে অলকমালার লুকোচুরি, চারুচন্দ্রমা ও নক্ষত্রের সমাবেশ সমালোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় লতীফ ও সৌদামিনী তথায় উপস্থিত হইলেন। সৌদামিনী সকৌতুকে বলিলেন, "কি সিদ্দিকা! তারা গণিতেছ নাকি?"

সি। (সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কি দিদি! তুমি কিছু বলিতে চাও?

সৌ। হাঁ, মিঃ আলমাস্ বাড়ী যাইবেন, কিন্তু অন্যত্র টাকার যোগাড় হয় নাই; সুতরাং আমাদিগকে চাঁদা তুলিয়া তাঁহার পাথেয় ধার দিতে হইবে। অন্ততঃ ১০০৲ টাকার প্রয়োজন। তুমি কত টাকা দিতে পার?

সি। আমি মাত্র ৫০৲ কি ৬০৲ দিতে পারি।

সৌ। দেখুন মিঃ আলমাস্, আপনার ৬০৲ টাকা হইল।

লতীফের অপরিমিত কৃতজ্ঞতা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। সে নীরব কৃতজ্ঞতার ভাষা সিদ্দিকা এবং সৌদামিনী বুঝিলেন।

পরদিন প্রাতঃরাশের পর সৌদামিনী সিদ্দিকাকে টাকা দিতে বলিলেন। সিদ্দিকা টাকা আনিবার জন্য উঠিয়া গেলে লতীফ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

সিদ্দিকা একটি একটি করিয়া ৬০টি টাকা লতীফের হস্তে গণিয়া দিলেন। লতীফ ভাবিতেছিলেন,—যদি স্বর্গ নামে কোন স্থান থাকে তবে এই স্বর্গ! ইহারা কেমন সরল লোক; টাকা কাহাকে দিতেছেন,—এ টাকা ফিরিয়া পাইবেন কি না সে বিষয় একটু চিন্তাও করেন না। তিনি মুগ্ধনেত্রে অর্থদাত্রীর হাত দুইটি দেখিতেছিলেন—সে হাত কেমন স্বাধীন! সিদ্দিকা সস্নেহ কোমল-স্বরে বলিলেন, "আর আপনার কত টাকার প্রয়োজন?"

ল। যদি পারেন ত ১০০৲ টাকা পূরণ করিয়া দিলে বাধিত হইব।

সি। আমার যাহা ছিল, সব দিয়াছি; বাকী টাকা অপর ভগিনীরা দিবেন।

'আমার যাহা ছিল সব দিয়াছি' কথাটা লতীফের হৃদয়ে গিয়া বাজিল। যে ভাবে, যে অপরূপভাবে কথাটা বাজিল, সেরূপ বাজা উচিত ছিল না; কারণ তাঁহার যে সালেহা আছেন। তিনি বক্তার মুখপানে চাহিলেন,—সে মুখ দেখিয়া কিছু অর্থ বুঝা গেল না—সে মুখ কেবলই দেবতুল্য সুন্দর, সদয়, সরল। লতীফ নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আপনার সুবিধার জন্য কিছু টাকা রাখিলেন না?"

সি। আমার কোন অসুবিধা হইবে না, আপনি সেজন্য ভাবিবেন না।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী-দি। তোমার ভাগের চাঁদার টাকা দিলে না?

চঞ্চলস্বভাবা বাচাল নলিনী বলিলেন, "দিব বই কি, তবে আমাদের 'পথে কুড়ান ভাইটি' এখন দেশে চলিলেন; জানি না, আবার কবে দেখা হইবে।"

লতীফ। আপনারা দয়া করিয়া স্মরণ রাখিলেই দেখা হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমি কলিকাতায় প্র্যাক্‌টিস্‌ করি না। (লতীফ একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার এবং অবস্থাপন্ন জমীদার।)

নলিনী সকিনা খানমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা আনিয়া দাও ত দিদি! এই যে চাবি—"

সকিনা ২০৲ টাকা আনিয়া নলিনীর হস্তে দিলেন। নলিনী টাকা গণিয়া বলিলেন, "দশ বেশী কেন?"

স। চাঁদার টাকা দিবার অধিকার কি আর কাহারও নাই? আমি গরীব মানুষ, বেশী দিতে পারিলাম না।

ল। (সকৃতজ্ঞস্বরে) আপনাদের সৌজন্য দেখিয়া আমার হিংসা হয়,—আমিও কেন আপনাদের মত তারিণী-ভবনের একজন 'ভগিনী' হই নাই।

ন। এক জোড়া চুড়ি আর একখানা গৈরিক শাড়ী পরিলেই ত 'ভগিনী' হইতে পারেন!

স। খোদাতালার সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব পুরুষ হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি বাঞ্ছনীয়? লেডী ডাক্তার নলিনীর ব্যবস্থা অনুসারে ঐ শাড়ী ও চুড়ি জোড়াই কি বড়?

(ঈশান বাবুর প্রবেশ)

ঈশান। সৃষ্টি সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে ?

ন। মিঃ আলমাস্ মেয়ে মানুষ হন নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন।

ল। যে-সে মেয়ে ত নহে, আপনাদের ন্যায় দেববালা হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

ঈ। অবশ্য। (ভগিনীত্রয়ের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া লতীফের প্রতি) কিন্তু ইঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা আপনি জানেন কি ?

ল। না।

ঈ। তবে শুনুন :—

"দু:খীদের রোদনের ধ্বনি
একদা পশিল গিয়া স্বরগ-দুয়ারে।
জগদীশ সদয় হইয়া
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন তাহাদের 'পরে।
স্বরগের বিচিত্র সুন্দর
ফুলদল ধরাতলে পতিত হইল ;
ইতস্তত: যে যেখানে পায়—
মানুষের উপবনে ফুটিয়া উঠিল।
মানুষেরা নিতান্ত পামর,
আদর করিতে ফুলে নাহি ভালবাসে।
ফুলগণ কহিল বিধিরে,
"মোদের পাঠালে কেন মানব-আবাসে ?"
তাই প্রভু দয়ার সাগর
স্বর্গচ্যুত ফুল ল'য়ে গাঁথিলেন মালা।
তদবধি তারিণী-ভবনে
'দরিদ্র-ভগিনী' নামে রহে সুরবালা।"

ল। ঈশান-দা, আপনি চমৎকার কবি। আমি মনে করিতাম, 'বেরিয়াম্ সাল্‌ফেট্' ও 'বেরিয়াম সাল্‌ফাইড্'*এর পার্থক্য-চিন্তায় যে মস্তিষ্ক অহরহ ব্যস্ত থাকে, সে আর অন্য বিষয় ভাবিবার অবসর পায় না ; এখন দেখি, বিবিধ ঔষধের শিশির সঙ্গে এক শিশি 'সাল্‌ফেট অব্ কবিত্ব'ও থাকে।

* বেরিয়াম্ সাল্‌ফেট্ বলকারক ঔষধ বিশেষ আর বেরিয়াম্ সাল্‌ফাইড হলাহল বিষ।

ঈ। তা থাকিবে বই কি। কম্পাউণ্ডারকে সকল প্রকার ঔষধই নাড়াচাড়া করিতে হয়। বিশেষতঃ আমাদের মিসিস্ সেন যেখানেই যান, হাসপাতাল তাঁহার সঙ্গে যায়। নার্স নলিনী এবং আমি আপনার শুশ্রূষার জন্য আহূত হইয়াছি। আমাদের সঙ্গে একটা 'ডিসপেনসরী বক্স'ও আসিয়াছে।

এমন সময় সৌদামিনী আসিয়া বলিলেন, "কিসের আলোচনা হইতেছে?"

ঈ। কিছু না, দিদি! অদ্য ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে মিঃ আলমাস্‌কে একমাত্রা 'বাই-কার্‌বনেট্ অব্ কবিতা' দিলাম।

সৌ। তা বেশ করিয়াছেন। টাকা পাইলেন মি° আলমাস্?

ল। হাঁ, ৮০ টাকা পাইলাম।

সৌ। বেশ, বাকী ২০৲ টাকাও পাইবেন।

বিদায়ের দিন লতীফ অতি প্রত্যুষে জাগিলেন; জাগিবা মাত্র তাঁহার কর্ণে দূরাগত সঙ্গীত-ধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়, সুতরাং সঙ্গীতের রাগ লয় চিনিলেন—মধুর ভৈরবী রাগিণী। আর ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না—সেই হারমোনিয়মের সুর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। অদ্য তাঁহার বিদায়ের দিন—

তাই কি দেবতাগণ (স্বরগপুরে)
গাহিছে বিদায়-গীতি করুণ সুরে?

তিনি বাহির হইয়া জনৈক চাকরানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—সিদ্দিকা হারমোনিয়ম্ বাজাইতেছেন। তিনি কান পাতিয়া আশা করিলেন যে, গায়িকার কণ্ঠস্বরও শুনিবেন; কিন্তু তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। ক্রমে সঙ্গীত থামিল। গায়িকা কি হৃদয়ের গভীর বেদনা এই সঙ্গীতরূপে বাতাসে মিশাইয়া অনন্ত আকাশে ঢালিতেছেন? তাঁহার প্রাণটা গলিয়া তরল হইয়া ঐ সঙ্গীতস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল কি? না, এ কেবল তাঁহাদের প্রাত্যহিক প্রাতঃসঙ্গীত?

লতীফ মধ্যাহ্নে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। সকলেই নানা প্রকার স্নেহসূচক ভাষায় তাঁহাকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। কেবল সিদ্দিকা একটিও কথা বলেন নাই। লতীফ ভাবিলেন, "তিনি পাষাণ-প্রতিমা!"

দশম পরিচ্ছেদ

গৃহ-জীবন

লতীফ বাড়ী যাইবার চিন্তায় সুখী হন নাই। লোকে বিদেশ হইতে গৃহে যাইতে যেরূপ আনন্দিত হয়, লতীফ তদ্রূপ আহ্লাদে আত্মহারা হন নাই—বরং বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে যাইতে বিষাদ কেন? গৃহে কি শান্তি নাই? শান্তি নাই বলিয়াই ত এ গৃহযাত্রা—শুভযাত্রায় আনন্দ নাই।

লতীফ শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছেন। পিতামহ বর্তমানে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি ও তাঁহার ভগিনীদ্বয় রশীদা ও রফীকা সম্পত্তির অংশে বঞ্চিত হইলেন। পিতামহের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হাজী হবীব আলম জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি বিধবা ভাদ্রবধূ ও তাঁহার শিশু দুইটিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। লতীফের মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন; তিনি দেখিলেন, মুষ্টিঅন্ন ত যথাবিধি লাভ হইতেছে, কিন্তু লতীফের সুশিক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। তিনি দাসীর অধম হইয়া ভাশুর-পত্নীর মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন; তাহার ফলে তিনি (ভাশুর-পত্নী) স্বামীকে বলিয়া কহিয়া লতীফকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

লতীফ ক্লাসের পর ক্লাস উল্লঙ্ঘন করিয়া ২২ বৎসর বয়সে এম. এ. পাশ করিয়া ফেলিলেন। এই সময় তাঁহার মাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা রশীদার ননদের সহিত লতীফের এবং অন্যত্র রফীকার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। রফীকার বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু লতীফের তিন বৎসর পরে বিবাহ হওয়ার শর্তে কেবল "আক্‌দ্‌বস্ত" হইয়া রহিল।*

অতঃপর লতীফ পিতৃব্যের অনুগ্রহে ইংলণ্ড গেলেন। তথা হইতে তিন বৎসর পরে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিলেন।

হাজী হবীব আলম অত্যন্ত জমিদারী-পিপাসু ছিলেন। তিনি দেখিলেন, 'লতীফ ব্যারিস্টার' কন্যাদায়গ্রস্ত লোকদের জন্য বেশ একটি মনোরম 'প্রলোভন'। তাঁহার জনৈকা আত্মীয় একমাত্র কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছেন, এই কন্যাটিকে হস্তগত করিলে বিধবার সম্পত্তিও করায়ত্ত হয়। কিন্তু বোকা লতীফ সহজে

* প্রচলিত ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, লতীফের ভাবীপত্নী 'বাগ্‌দত্তা হইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হইবার পাত্র নহেন। এই জন্য তিনি রশীদার স্বামীর সঙ্গে এক 'চাল' চালিলেন। জমীদার হইলেও মহম্মদ সোলেমান ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ন্যায়, সাধুতা ও ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন।

"আক্‌দ্‌বস্ত"-এর তিন বৎসর পরে হাজী সাহেব জামাতাকে লিখিলেন যে, তাঁহারা বিবাহের জন্য প্রস্তুত কিন্তু বিবাহের পূর্বেই কন্যাকে যেন তাহার ভাগের সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়া হয়।

সোলেমান উত্তরে লিখিলেন যে, তিন বৎসরের শর্ত অনুসারে তাঁহারা বিবাহের জন্য প্রস্তুত আছেন। যথাবিধি বিবাহের দিন তারিখ ধার্য হউক। দ্বিতীয়তঃ, কন্যা যখন বয়োপ্রাপ্তা (অর্থাৎ ১৮ বৎসরের) হইবে, তখন সে নিজের সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়া লইবে। তিনি স্বয়ং কিছু লিখিয়া দিবেন না।

তদুত্তরে হাজী সাহেব জানাইলেন যে, সম্পত্তি লিখিয়া না দিলে ও মেয়েকে বিবাহ করা হইবে না। অতএব তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ অন্যত্র ঠিক করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর যেন তাঁহাকে দোষ দেওয়া না হয়।

সোলেমান তাঁহাকে লিখিলেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। সেই দিন তিনি লতীফকেও পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কি বক্তব্য আছে।

পল্লীগ্রামের ডাকঘর জমীদারদের করায়ত্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হাজী-সাহেব দৃষ্টি রাখিলেন, যাহাতে লতীফ সোলেমানের সহিত পত্রব্যবহার করিতে না পারেন। লতীফের নামে সোলেমানের যে রেজেস্ট্রী পত্র আসিয়াছিল, তাহা তিনি জাল স্বাক্ষর দিয়া চুরি করিলেন। সুতরাং লতীফ সোলেমানের পত্রই পাইলেন না আর উত্তর দিবেন কি।

এদিকে সোলেমান লতীফের কোন উত্তর না পাইয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। ইহার পক্ষকাল পরে যখন শুনিলেন, লতীফ পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল।

হতভাগ্য লতীফ দ্বিতীয় বিবাহে মোটেই সম্মত ছিলেন না। কিন্তু পিতৃব্য, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "বাবা! তুমি দুই বিবাহ করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। না করিলে হাজী সাহেব রাগ করিয়া তোমাকে এক কড়ার সম্পত্তিও দিবেন না।"

ন। আমি তাঁহার এক কানাকড়ির সম্পত্তিও চাহি না। তিনি অনুগ্রহপূর্বক সুশিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট।

লতীফের মাতা। তুমি সম্পত্তি না চাহিলে কিছু আসে যায় না। হাজী সাহেবের কথার অবাধ্য হইলে সকলেই তোমাকে কৃতঘ্ন পামর মনে করিবে।

ল। তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া সব গোল চুকাইয়া দিই।

মাতা। শুধু আত্মহত্যা কেন, মাতৃহত্যাও কর। আইস, মাতা পুত্রে হাত ধরাধরি করিয়া পুকুরে ডুবি।

লতীফের জনৈকা মাসী কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা! আমার ত আর কেহ নাই, একমাত্র আশা-ভরসা তুমি! তোমরা মাতা পুত্রে আত্মহত্যা করিলে আমার কি গতি হইবে?"

অপর কক্ষ হইতে জনৈকা পিসি আসিয়া সক্রোধে বলিলেন, "বাবা! আজি-কালিকার ছেলেদের কথা শুনিলে মরা মানুষের পিত্তি জ্বলিয়া যায়। হাজী সাহেব সম্পত্তি লিখিয়া চাহিয়া কি এমন দোষ করিলেন? সম্পত্তি হইলে তোমার হইবে, ভোগ করিবে তুমি! বাহাত্তরে বুড়ো হাজী সাহেব কবরে লইয়া যাইবেন না। সোলেমানকে একটু শাস্তি দেওয়া দরকার, তাই আবার বিবাহ করিতে বলেন।"

ল। শাস্তি ত সোলেমান সাহেবের হইবে না; শাস্তি দেওয়া হইবে একটি নিরীহ জীবকে।

পিসি। (স্বগত) এখনও তাহাকে চক্ষে দেখা হয় নাই, তবু এত মায়া! (প্রকাশ্যে)

'নিরীহ জীব'টির এমন কি ক্ষতি হইবে? আর কেহ সপত্নী লইয়া ঘর করে না কি? লোকে শুনিলে মনে করিবে, হাজী সাহেব না জানি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছেন যে, ইহারা মাতাপুত্রে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইল! ঐ দেখ, রফীকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু মুখ ফুলাইয়াছে; কালি হইতে সে অন্নজল গ্রহণ করে নাই।

লতীফ চাহিয়া দেখিলেন, রফীকা সত্যই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, "তবে আমাকে কি করিতে বল?"

পিসি। বলি আমার মাথা মুণ্ডু! (যুক্তকরে) বলি, সব দিক বজায় রাখ, গুরুজনের কথা রাখ!

লতীফ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিদানের ছাগলের মত বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অর্থপিপাসু হাজী সাহেব কিন্তু বেশ ঠকিলেন। লতীফের শাশুড়ীকে তিনি যেরূপ বৃহৎ সম্পত্তিশালিনী মনে করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা নহেন।

সমস্ত জমিদারী ঋণজালে আবদ্ধ। ইঁহারা কিছু লাভ করিবেন, দূরে থাকুক, বৃথা মোকদ্দমায় আরও ঘরের টাকা নষ্ট করিতে হইল।

সালেহা (লতীফের স্ত্রী) জানিতেন যে, তাঁহার সম্পত্তির জন্যই বিবাহ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার আর অন্য গুণের প্রয়োজন নাই। তিনি অত্যন্ত মুখরা ও কলহ-প্রিয়া ছিলেন। তাঁহার দৈনিক কার্য ছিল, দাসী প্রহার করা। লতীফও তটস্থ থাকিতেন।

লতীফ বাহির হইতে আসিলে প্রথমে মাতার নিকট যাইতেন; সেখানে বসিয়া সালেহার গতিবিধি জানিয়া তবে তাঁহার ঘরে যাইতেন। আর যদি মাতার ঘরে আসিয়া শুনিতে পাইতেন যে, সালেহা রাগান্বিতা আছেন, অথবা 'জেল-দারোগা'র মত কোন দাসীকে প্রহার করিতেছেন তবে অমনি বাহিরে ফিরিয়া যাইতেন। কিন্তু যদি সালেহা ঐ ফিরিয়া যাওয়া দেখিতে পাইতেন, তবে আর নিস্তার নাই!

এবার কারসিয়ঙ্ হইতে আসিয়াও লতীফ পূর্বে মাতার নিকট গেলেন। জননী ত হারাধন—বিশেষতঃ যাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরিয়া পাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। লতীফ আশা করিয়াছিলেন যে, সালেহাও এবার তাঁহার আগমনে ষোল আনা না হউক অন্ততঃ বারো আনা আনন্দ প্রকাশ করিবেন। তাঁহার ওরূপ আশা করা স্পর্দ্ধা! এক কথায় দুই কথায় তাঁহাদের ঝগড়া আরম্ভ হইল।

লতীফ। তুমি আমাকে টাকা পাঠাও নাই, সে জন্য আমার কাজ বন্ধ থাকে নাই। এ কলুষিতা পৃথিবীতে অনেক দেববালা আছেন, যাঁহারা না চাহিতে দান করেন। বাস্তবিক, তুমি যে টাকা পাঠাইলে না, তবে আমি আসিতাম কিরূপে? আমার ত অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল—আমি আর এখানে আসিতাম না।

সালেহা। তবে আসিলে কেন? তোমাকে পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া কে ডাকিয়াছে?

ল। মা ও হামিদ (লতীফের শিশুপুত্র) আছে বলিয়া আসিলাম।

সা। এতদিন বেশ ছিলাম—তুমি আসিলে আর দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

"এতদিন বেশ ছিলাম" কথাটা লতীফের হৃদয়ে আঘাত করিল। "এতদিন"—লতীফের অনুপস্থিত সময়ে, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া,—লতীফ মরিয়াছেন জানিয়া, এতদিন বেশ ছিলেন! তিনি মনোভাব গোপন করিয়া মুখে প্রফুল্লতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, তোমার যে দীর্ঘ কর্ণ তাই বক্তৃতার অবয়বও দীর্ঘ হইয়া দাঁড়ায়।

সা। কি বলিলে, আমি দীর্ঘকর্ণা ? বেশ থাক, গাধা আর এখানে থাকিবে না—এই চলিলাম। (গমনোদ্যতা)

ল। না, থাম। (দৌড়াইয়া যাইয়া অঞ্চল ধরিয়া) আমি ত এমন কিছুই বলি নাই। কেবল এতদিন দুঃখভোগ করিয়াছি, সেই অতীত দুঃখের কথা বলিতেছিলাম। তাহা তুমি শুনিতে না চাও—বলিব না।

সা। দুঃখ আবার কিসের,—দেববালাদের সঙ্গে স্বর্গে ছিলে। তাহারা পথ-খরচের টাকা দিয়াছে। দুঃখটা কোথায় ছিল ?

ল। টাকার অভাবে আমি দ্বীপান্তরে আটক ছিলাম।

সা। এখন দ্বীপান্তর ছাড়িয়া আসিয়াছ ত, আর কি চাও ?

ল।. পাঁচশত (৫০০৲) টাকা চাই। শ্রীমতী দীনতারিণীকে অদ্যই ঐ টাকা পাঠাইয়া দাও।

সা। তোমার আসিতে ৫০০৲ ব্যয় হইয়াছে ? তবে তএ 'বাদশাহী সফর' আর কি !*

ল। আমার আসিতে ১০০৲ কিম্বা ৫০০৲ ব্যয় হইয়াছে কিনা সে হিসাবে তোমার প্রয়োজন কি ? যেদিন তোমার টাকা ব্যয় করিব, সেদিন তোমাকে হিসাব নিকাশ দিব।

সালেহা টাকা আনিয়া দিয়া রাগে গর্ গর্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময় রফীকা তাঁহাদের ঝগড়া থামাইতে আসিয়া টাকার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় লতীফ বলিলেন, "আমার আসিতে ১০০৲ ব্যয় হইয়াছে, দুই মাস আমার ঔষধ পথ্যের জন্য অনুমান ২০০৲ ব্যয় হইয়াছে এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারিণী-ভবনে ২০০৲ দিব—যাহাতে আমার ন্যায় হতভাগ্য নিরাশ্রয়দের সাহায্য হয়।"

লতীফের আগমন-সংবাদ পাইয়া রফীকা আসিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর-বাড়ী নিকটেই, সুতরাং ইচ্ছামাত্রেই আসিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া সালেহা লতীফের অনেক নিন্দা করিলেন। ইহা আজ নূতন নহে ; রফীকা চিরকালই জানেন যে, ভ্রাতৃবধূর নিকট যাইবা মাত্রই তিনি এক থলি ভ্রাতা-নিন্দা উপহার পাইবেন। কেবল রফীকা কেন, সালেহা যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেন, তাঁহারই সাক্ষাতে স্বামী-নিন্দা করিতেন।

লতীফ সর্বদা ভাবিতেন, "সুখই বুঝি মানব-জগতে নাই।" সালেহা তাঁহার প্রত্যেক কার্যে ও বাক্যে দোষ ব্যতীত গুণ দেখিতে পাইতেন না। আজ পাঁচ

* 'সফর'—ভ্রমণ। বিদেশে যাওয়া, প্রবাস ইত্যাদি।

(৫) বৎসর হইতে লতীফ ও সালেহা এক গাড়ীর দুইটি চাকার ন্যায় এক পথের পথিক হইয়াছেন, কিন্তু উভয়ের মতের ঐক্য কখনও হয় নাই। লতীফ যদি বলেন, "শীতকাল ভাল," সালেহা বলিবেন, "গ্রীষ্মকাল ভাল।" লতীফ যখন শিশু হামিদকে আদর করেন, সালেহা তখন কোনমতে পুত্রকে কাঁদাইতেন। এসব অত্যাচার লতীফ নীরবে সহ্য করিতেন। তাঁহার হৃদয়খানি সর্বদাই শূন্য—আশ্রয়-হীন থাকিত।

এই গৃহজ্বালা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লতীফ ব্যারিস্টারী উপলক্ষে অধিকাংশ সময় শহরে থাকিতেন। অন্য ব্যারিস্টারদের ন্যায় তিনি সপরিবার শহরে বাস করিতেন না। দুই বৎসর কাল এদিক ওদিক থাকিয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন; কিন্তু গৃহিণী তাঁহাকে ছয় মাসের অধিক তিষ্ঠিতে দেন নাই। বলিয়াছি ত, এবারও বাড়ী আসিবার সময় লতীফ নিরানন্দ ছিলেন।

নিরন্তর দগ্ধ হইয়া লতীফের জীবন তিক্ত বিষাক্ত হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেন, "হয় আমি মরি, নয় সালেহা মরুক—দুইজনে আর একই সংসারে থাকিতে পারি না।" কখনও বা সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু তাঁহার কঠোর কর্তব্য-নিষ্ঠতা তাঁহাকে নিরস্ত করিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গভীর হৃদয়

যাহার হৃদয় গভীর হয়, তাহাকে দেখিয়া সহসা তাহার মনোভাব বুঝা যায় না। যাঁহারা মানুষের মুখ দেখিলে মন বুঝিতে পারেন, তাঁহারাও গভীর হৃদয়ের অবস্থা সহজে বুঝিতে পারেন না। সিদ্দিকার হৃদয় অতিশয় গভীর ছিল। তিনি ত আত্মপরিচয় দেন নাই। তিনি কর্তব্য-পালনে অত্যন্ত যত্নবতী ছিলেন, তিনি পরিশ্রমে কাতর হইতেন না।

লতীফের দেশে যাওয়ার পর হইতে দেখা যায়, কাজে আর সিদ্দিকার তত উৎসাহ নাই। এখন তিনি নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসেন। এখন তিনি জীবনের মধ্যে অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাইলেন। এ পরিবর্তনটুকু অন্যলোকে জানিবে কিরূপে? তিনি ত সর্বদাই গভীর চিন্তামগ্না—মূর্তিমতী

বিষাদ। অথবা পর্বতের মত অটল, অচল—বিষাদময়ী পাষাণপ্রতিমা। সেই অটল পর্বতসমা সিদ্দিকা—তাঁহার হৃদয়ে ঝড়-বৃষ্টি? অসম্ভব। তবে কি পাষাণে রেখা অঙ্কিত হইয়াছে?

তাঁহার উপাধানের যদি বাক্‌শক্তি থাকিত তবে সে বলিতে পারিত প্রতি রজনীতে তাহার উপর কত বিন্দু অশ্রুপাত হয়। আর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সংখ্যাও সে বলিতে পারিত। কিন্তু সিদ্দিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুঃখ-সুখের হিসাব রাখিবার যে কেহ নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বিশ্বস্ত প্রিয়বন্ধু ত কেহ ছিল না—তিনি নিতান্ত একাকিনী। সুতরাং আশার বিদ্যুৎ, নৈরাশ্যের ঝড়—সবই হৃদয়-প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ।

সাধারণতঃ লোকে প্রিয়পাত্রকে নিকটে পাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সিদ্দিকা তাঁহার প্রিয়পাত্রকে নিকটে পাইতে ইচ্ছা করিবেন ত দূরের কথা, সে নামটি পর্যন্ত অগ্নিতুল্য মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইতেন।

তাঁহার হৃদয়ের আর একটি কার্য বৃদ্ধি হইয়াছে। একটি একটি করিয়া লতীফের কার্যকলাপ ও কথা তাঁহার মনে পড়িত আর তাঁহার হৃদয় তাহারই ব্যাখ্যা, টীকা ও সমালোচনা করিত। তিনি হৃদয়কে যে-পথ হইতে ফিরাইতে চাহিতেন, অবাধ্য হৃদয় সেই পথে বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় শতধারে ধাবিত হইত। হৃদয়ের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া সিদ্দিকা শেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন।

সাকিনা সিদ্দিকার চিন্তাশীলতা দেখিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছেন "সুফিয়া"; ঈশান বাবুও তাঁহাকে "তপস্বিনী" বলেন। কিন্তু তাঁহার সাধনার ধন যে কি, তাহা কি কেহ জানে?

লতীফ বাড়ী গিয়া ভদ্রতার অনুরোধে তারিণী এবং অন্যান্য ভগিনীদিগকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের সহিত গৃহীত ঋণের ১০০৲ পরিশোধ করিয়া আরও চারিশত (৪০০৲) টাকা তারিণী-ভবনে চাঁদা পাঠাইয়াছেন। সিদ্দিকাও ঐরূপ একখানি ধন্যবাদ-লিপি পাইয়াছেন।

পত্রের ঠিকানায় "রসুলপুর গ্রাম, জিলা—* *" এবং লতীফের মনোগ্রাম দেখিয়া সিদ্দিকার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তবে ইনি সেই রসুলপুরের লতীফ? মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, "একই নামের অনেক লোক থাকে; একই নামের অনেক গ্রাম থাকে। এ রসুলপুর সে রসুলপুর নহে, এবং এ লতীফও সে লতীফ নহেন। আর তিনি যদি বাস্তবিক সেই ব্যক্তি হন, তাহাতেই বা আসে যায় কি? 'বেল পাকিলে কাকের বাপের কি?' "তিনি ত সালেহার স্বামী,

তোমার কে ?" কিন্তু মন যদি সব সময় যুক্তি-তর্ক মানিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক যন্ত্রণার লাঘব হইত।

* * * *

এক দিন সিদ্দিকা আপন ট্রাঙ্কটা ঝাড়িয়া গুছাইতেছিলেন, সেই সময় তথায় সৌদামিনী কোন কার্য উপলক্ষে আসিলেন। ট্রাঙ্কে ছোট একটি কাগজের কৌটা দেখিয়া সৌদামিনীর কৌতূহল হইল; তিনি সেই কৌটাটি হাতে লইয়া খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে সরু একটি সোনার হার—তাহার মধ্যস্থলে চুণী, মুক্তা ও হীরক-খচিত একটি বহুমূল্য 'লকেট'। 'লকেট' খুলিয়া দেখেন, তাহাতে লতীফের ফটো!! তিনি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সিদ্দিকার দিকে চাহিলেন।

প্রকৃতপক্ষে হতভাগিনী সিদ্দিকা এ লকেটের আভ্যন্তরীণ ফটো সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। কিন্তু সৌদামিনীর নিকট যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে ধরা পড়িয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কোন কথাই খাটিবে না জানিয়া আরক্তিম বদনে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলেন। সৌদামিনী তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

'রসুলপুর' ও তাহার অধিবাসী সম্বন্ধে যাহা কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা এই লকেটের ফটো দর্শনে সম্পূর্ণ দূর হইল। সিদ্দিকা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন,—

"জগত এখন কর্মক্ষেত্র তার,
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী আশা;
সে কেন স্মরণ রাখিবে গো বল,
বালিকার ভালবাসা ?"

"আমি কি পাগল! এ ক্ষেত্রে তিনি 'বালিকা'কে জানেনই না, তবে আর মনে মনে রাখিবেন কি?" বিধাতার কি নিষ্ঠুর খেলা! যে ব্যক্তি বিনা কারণে সিদ্দিকাকে অতি নির্মমভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন,—যাঁহার বিষয় তিনি কোন দিন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই, সেই ব্যক্তিই এখন সিদ্দিকার ধ্যান-জ্ঞানের বিষয় হইলেন। তিনি দারাপুত্র লইয়া পরম-সুখে কালযাপন করিবেন, আর ইনি চিরজীবন দুঃখানলে দগ্ধ হইবেন!! ইহাই বিধাতার বিধান!!! সিদ্দিকা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। বিধির বিধান অতি কঠোর হইলেও শিরোধার্য, সুতরাং—

"চিরদিন এ জীবনে তারি তরে কাঁদিব,
অন্তিমে তাহারি দুঃখে দু'নয়ন মুদিব।"

রাত্রে সৌদামিনী তাস খেলিবার জন্য সিদ্দিকাকে ডাকিলেন। সিদ্দিকা বিনীতভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, "দিদি! হাস্যামোদ বা খেলা আমার ভাল লাগে না। আমার হাসির উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। তোমাদের প্রফুল্লতা, হাস্যকৌতুক দেখিয়া আমার হিংসা হয়,—সেই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়ঃ

"Could my heart be light as thine,
I'd gladly change with thee."

সৌদামিনী। (স্মিতমুখে) আহা! আমার সঙ্গে হৃদয় বদল করিবে? তবে ত আমার মঙ্গলই হয়। তুমি জান না ইহা কত ভয়ঙ্কর, ভগিনী! তুমি কি সত্যই মনে কর যে, সৌদামিনীতে আগুন নাই? দেখ না মেঘের অঙ্কে বিদ্যুতের হাসি কত সুন্দর মনোহর, কিন্তু কত ভয়ানক! আমি হাসি,— তোমাদিগকে হাসাইবার জন্য। ইহাও এখন অভ্যাস হইয়াছে।

সিদ্দিকা সবিস্ময়ে চাহিলেন। দেখিলেন, সৌদামিনী এখন হাস্যময়ী নহেন,—গম্ভীর বিষাদময়ী। তিনি ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমাকে তোমার আগুন দেখাইবে?"

সৌদামিনী নীরব।

সিদ্দিকা ধীরে ধীরে পুনরায় বলিলেন,—"দিদি! আমাকে তোমার আগুন দেখাও। আমি দুঃখের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসি।"

সৌ। তবে তুমি দুঃখের মর্ম বুঝিয়াছ?

সি। তোমার গল্প আরম্ভ কর।

সৌ। আরম্ভ করি; কিন্তু পদ্মরাগ, সকল জিনিসেরই বিনিময় আছে। তুমি প্রতিদান দিবে ত?

সি। দিব, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেহ যেন না শোনে।

সৌ। তাহাই হইবে। আমি তোমাকে আমার আগুন দেখাইব, তুমি আমাকে তোমার লকেটের ইতিহাস বলিবে।

তাস খেলা আর হইল না। নলিনী ডাকিতে আসিলে সৌদামিনী তাঁহাকে ঘুমাইতে উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

নলিনী। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া) তোমরা গোপনে কিছু পরামর্শ করিবে, বোধ হয়! আমিও থাকিতে পারি না?

সৌ। না, তুমি যাও। তাস খেলা অপেক্ষা নিদ্রা অধিক উপকারী।

ন। আর তোমাদের জন্য ?

সৌ। আজি অনিদ্রা বিধান। তুমি নিদ্রা আরম্ভ কর গিয়া, আমিও যোগদান করিব।

নলিনী চলিয়া গেলে সৌদামিনী বলিলেন,—"নিশ্চয় শুনিবে ? শুনিলে তুমি পুরস্কার কি দিবে ?"

সি। দুই চারি বিন্দু অশ্রু।

সৌ। তাহাই ত চাই। আহা! নিষ্ঠুর জগতের নিকট—এমন কি মাতার নিকটও আমি কোন দিন একটি বিন্দু অশ্রু পাই নাই। জগৎ আমার প্রতি এমনই কৃপণ ছিল!

সি। বল কি, মাতাও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই ?

সৌ। মাতাও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি দেবী, মানুষের কলুষ বুঝিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর আগুন

সৌদামিনী বলিলেন,—আমার পিত্রালয় গোরস্থান লেনে ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমরা কলিকাতায় ভাড়াটে বাড়ীতে থাকিতাম। কুলীনের কন্যা ছিলাম এবং পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন না বলিয়া অধিক বয়সে—প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। যাঁহাকে মাতা বলিয়া জানিতাম, তিনি যে আমার গর্ভধারিণী নহেন, তাহা বিবাহের পরে জানিয়াছি। আমি অত্যন্ত বোকা মেয়ে ছিলাম ; ৭ বৎসর বয়সে মাতৃহীনা হইয়াছিলাম, তবু বুঝিতাম না যে মা নাই। বিমাতাকেই মাতা বলিয়া জানিতাম।

আমার বিবাহের কিছু দিন পরে পাশের বাড়ীর কয়েকটি মেয়ে মানুষ আমার চুল বাঁধিতেছিল, মা নিকটে বসিয়াছিলেন। তাহারা পরস্পর বলিল,—"এর মাথায় 'সতীন-চুল' আছে।" মা তাড়াতাড়ি মনকে প্রবোধ দিবার জন্য

বলিলেন,—"তা সতীন হয়ে ত মরে গেছে, এখন আর ভয় কি ?" কিন্তু আমার ভাগ্যে যে সতীনের সতীনত্ব রহিয়া গিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না।

শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় মা আমাকে সতর্ক থাকিতে এবং আমার বরের ছেলে-মেয়ের যত্ন করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং বিমাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হইয়াছি,—সুতরাং 'বিমাতা' হওয়া যে জীবনের অভিশাপ, তাহা জানিতাম না।

আমার স্বামীর ছেলে ও মেয়ের নাম, নগেন্দ্র ও জাহ্নবী। আমি যখন সেখানে যাই, তখন তাহারা তাহাদের দিদিমার নিকট ছিল। তাই তাহাদের দেখিতে পাই নাই। তাহাদের সঙ্গে পাঁচ বৎসর পরে দেখা হইয়াছিল।

আমি স্বামী-গৃহে যাইবামাত্র চতুর্দিক হইতে আমার প্রতি বিষবাণ বর্ষণ হইতে লাগিল। যাহারা 'বউ' দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাই মধুর বাণী বলিয়া নববধূর প্রাণে অমৃত ঢালিয়াছিল। 'ক' বলিল,—"এখন হইতে নগেন ও জাহ্নবী পর হইল।"

'খ'। আহা, তাই ত, বাছারা আর কি আসিবে ?

'গ'। তাঁহারাই বা কোন্ প্রাণে বাছাদের এখানে পাঠাইবেন ?

'ঘ'। এখন তাহারা পিতৃহীন হইল।

'ঙ'। এ বাড়ী ঘর দালান কোঠা যে উহাদের ভাগ্যে ছিল না, তাহা কে জানিত ?

'চ'। যার মা নাই, তার কিছুই নাই।

আমার ননদদ্বয় সেই সময় কাঁদিতে বসিয়াছিলেন। কান্নার সুর ছিল—"লক্ষ্মী ত গিয়াছে, এখন ডাকিনী আসিল—" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি খুনী আসামীর মত ভয়ে, চিন্তায় আকুল হইলাম। যেন এ সব দুঃখের মূল আমিই। আমিই যেন সে স্বর্গীয়া লক্ষ্মীকে হত্যা করিয়াছি।

ক্রমে পাঁচ বৎসর অতীত হইল, আমার সন্তান-সন্ততি হইল না। নিতান্তই একলা ছিলাম। স্বামী উপার্জন উপলক্ষে প্রায়ই বিদেশে থাকিতেন। আমার ননদ দুইজন সময় সময় আসিতেন, কিন্তু তাঁহাদের উপস্থিতি আমার বাঞ্ছনীয় ছিল না।

ঈশ্বর সন্তান দেন নাই, তাহাও যেন আমারই দোষ! ললিতা (আমার ছোট-ননদ) বলিত—"তা হ'বে কেন ? ও মাতৃহীন বাছাদের তাড়াইয়া, তাহাদের ভাগ যে ভোগ করিতে চাহিবে, সে ভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে কেন ? ঈশ্বর উহাদের সহায়—উহাদের ভাগ কম করিতে চেষ্টা করিলে তা হইবে কেন ?"

পাঁচ বৎসর পরে বাছারা আসিল। তাহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা-ভগ্নী। তাহাদের মাসীমাও সঙ্গে আসিলেন। এখন হইতে ঐ শ্যামাদিদি আমার জন্য সুন্দর চিতা সাজাইয়া আমাকে পরতে পরতে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এখন বলিতে লজ্জা করে, আমি বাছাদের পাইয়া যত সুখী হইব মনে করিয়াছিলাম, তত সুখী হইতে পারি নাই। স্বীকার করি যে, আমায় মনের সেরূপ ভাব হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ করে। কিন্তু কি করিব? আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই। যে অভাব আমার হৃদয়ে ছিল,—যে অভাব নগেন ও জাহ্নবীকে কোলে পাইলে দূর হইবে ভাবিতাম, সে অভাব যেন আরও শতগুণ বৃদ্ধি হইল।

শাশুড়ী আমাকে কখনও কটু-কাটব্য বলেন নাই। এখন দিদির মুখে সর্বদা শুনিতেন, "ছেলেদের খাওয়ার যত্ন হয় না, ছেলেদের কাপড় নাই," ইত্যাদি। সুতরাং তিনিও এখন আমাকে বেশ দু'কথা শুনাইতে লাগিলেন।

স্বামী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; তিনি আমাকে সরল প্রকৃতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ভীষণ অন্ধকারে আমি কেবল তাঁহার চরণ দুইটি দেখিতে পাইতাম। আমার মরুময় জগৎ সংসারে ছায়া কেবল তিনিই ছিলেন। শ্যামাদিদি আমার বিরুদ্ধে সকলকে বিষাক্ত করিয়া তাঁহারও হৃদয়ে বিষ ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে দিদির কথায় বিশ্বাস করেন নাই; বরং তাঁহাকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দিদি কাঁদিতে বসিলেন,—নগেন জাহ্নবীকে ডাকিনীর হাতে দিয়া কিরূপে যাইবেন? আর যাইতেনই বা কোথায়? তিনি নিরাশ্রয়া বিধবা ছিলেন।

দিদি বাছাদের কাপড় চুরি করিয়া নিজের মাতার নিকট পাঠাইতেন, আর কর্তাকে বলিতেন, "তোমার স্ত্রী ছেলেদের কাপড় কিনিয়া দেয় না।" সেই সব কাপড় আবার প্রকাশ্যে দিদির ছেলের জন্য ফিরিয়া আসিত। শুনিতাম "শ্বশুর পিসি দিয়াছে। শ্বশুর দিদিমা দিয়াছে," ইত্যাদি।

খাবার জিনিস সর্বদা চুরি হইত; কি হইত, জানিতাম না, তাই বাছাদের খাইতে দিতে পারিতাম না। খাবার জিনিস বন্ধ করিয়া রাখিলে দিদি ও প্রতিবেশিনীগণ কপালে করাঘাত করিত—"ছেলেদের খাবার সময়, তারাই খেতে পায় না!" একদিন কর্তাও বলিলেন, "তবে বল ত—ওরা না খেলে খাবে কে?" উহাদের যে যত্ন করিয়া খাওয়াইতাম, তাহা কেহই অন্ধচক্ষে দেখিত না। দেখা যাইত, সন্দেশ প্রভৃতি উপাদেয় মিষ্টান্ন ঘরের কানাচে পড়িয়া আছে। দিদি চুরি করিয়া ফেলিয়া দিতেন—আর সকলকে ডাকিয়া দেখাইতেন—"দেখ, ফেলে দেয়, তবু

বাছাদের খেতে দেয় না!" আমার কথা কেহ বিশ্বাস করিত না। দিদির কথাই বেদবাক্য।

কত বলিব? এরূপ ঘটনা ত দৈনিক ব্যাপার ছিল। একবার শীতকালে আমার ভয়ানক সর্দি-কাসি হয়,—দিবা রাত্রি ঘরে আগুন থাকিত। একদিন তন্দ্রা হইতে জাগিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইলাম,—রেশম পোড়ার গন্ধ! আর দেখিলাম, দিদি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। কর্তাও তখনই আসিলেন। তিনি দুর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া ঘরের আগুন বাহির করিতে বলিলেন। দিদি পুনরায় আসিয়া বলিলেন, "দেখি এতে কি? কিসের এমন গন্ধ?" তিনি কাপড়ের দগ্ধাবশিষ্ট খণ্ড বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখেছ! এই যে বাছাদের জামার সেই কিংখাপ কাপড়! ওঁর একখানা শাড়ী হয় নাই, উনি বাছাদের এ কাপড় পর্‌তে দিবেন কেন! তাই ত বলি,—বাছাদের কাপড় সব হয় কি?"—এই সঙ্গে কান্না আরম্ভ হইল। কর্তা নীরবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—একটিও কথা কহিলেন না। সেই নীরব তিরস্কার যে কত বিষাক্ত, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিবে, পদ্মরাগ?

সিদ্দিকা গল্পের গতিরোধ করিয়া বলিলেন, "তুমি কেন কর্তাকে বল নাই যে, দিদিই কাপড় পোড়াইয়াছিল?"

সৌ। সে কথা বলিলে বিশ্বাস করিত কে? সে আপন মাসী—আমি বিমাতা। আমার হিংসায় বস্ত্র দগ্ধ হয় নাই, তবে কি তাহাদের মাতার সহোদরা অমন কাজ করিবে? তাঁহার রক্তের টান, অগাধ স্নেহ—আমি কি? এ কথা বলিলে একটা তুমুল সংগ্রাম বাধিত; পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সকলে আমার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিত। দিদির অত সৈন্য-সামন্তের সঙ্গে একা আমি কিরূপে যুঝিতাম? বিশেষতঃ আমি তখন শাপগ্রস্তা ছিলাম—সুতরাং আমি যাহাই করিতাম ফল বিপরীত হইত।

একদিন নগেন দৌড়িয়া আসিয়া আমার কোলে বসিল। আমি সাদরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম,—অমনি সে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা গো—মলুম গো!" আমি ত অবাক্! এ কি সরল সুকুমার শিশু? কে যেন উত্তর দিল—আমার হৃদয়ে যেন বাজিয়া উঠিল, 'না,—সতীনের সতীনত্ব!!'

ললিতা দৌড়িয়া আসিয়া নগেনকে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "হতভাগা! ওখানে মরতে গিয়েছিলি কেন? তোর মা নাই,—মায়ের মমতা কোথায় পাবি?" আমি স্বীকার করি, যে নগেনকে 'মায়ের মমতা' দিতে পারি নাই। তাই বলিয়া তাহাকে গলা টিপিয়া মারিতেও যাই নাই ত। অনেক সত্য ঘটনায় মাতার নিষ্ঠুরতার কথাও শুনা যায়। 'সৎ' সম্বন্ধটাই বড় ভয়ানক। যে কাজ

মাতা করিলে দোষ নাই, সেই কাজ 'বিমাতা' করিলে জগৎ তাহার উপর খড়্গহস্ত হয়।

আর একদিন আমি ভাঁড়ার-ঘরে একটা বড় সিন্দুক খুলিয়া জনৈক অতিথিকে সিধা দিলাম। সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া রন্ধনশালায় তৈল আছে কি না দেখিতে গেলাম—সিন্দুকে তালা বন্ধ করা হয় নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সিন্দুক সেইরূপ বন্ধই আছে। আমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে গোলাপের মা (ঝি) আসিয়া বলিল—"দেখসে মা! তোমার সিন্দুকের ভিতর কি যেন ধুপ-ধাপ করে!" আমি বলিলাম,—"দূর, আমি এখনই যে সিন্দুক বন্ধ করিয়া আসিলাম।"

কৌতূহল-পরবশ হইয়া কর্তাও আমার সঙ্গে সিন্দুক দেখিতে চলিলেন। আমি সিন্দুক খুলিয়া দেখি—নগেন্দ্র!! আমার ত চক্ষুস্থির! শ্যামা তাড়াতাড়ি নগেনকে তুলিল। তখন যে ঝড়-তুফান আরম্ভ হইল, তাহা অনুমান করিয়া দেখ।

এইখানে সৌদামিনী থামিলেন। যেন সেই অতীত ঘটনা-রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে সিদ্দিকা কহিলেন—"নগেন কিরূপে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলে?"

সৌ। না। সেই দিন হইতে স্বামী আমার সঙ্গে কথা কহা বন্ধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার দোষ দিতে পারি না; তিনি কি করিবেন? এতকাল সকলের বাক্যজ্বালা, বিষবাণ অকাতরে সহিতেছিলাম.—বেশী দুঃখ হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার অনাদর অবহেলা অত্যন্ত অসহ্য হইল। সপ্তাহকাল নীরবে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমার মাতার নিকট যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

আবার সেই শান্তিপ্রদ মাতৃক্রোড়ে যাইয়া জুড়াইলাম। দুঃখের বিষয়, আমার দুঃখে কেহই সহানুভূতি করিত না। জগতে আমার জন্য কেহ আহাটি বলিত না! এমন কি মা—যে মা আমার (বিমাতা হইলেও) সুধা-স্বরূপিনী ছিলেন, তিনিও আমার দুঃখ বুঝিতেন না। তিনি বলিতেন—"মা! তোর কথা আমি বুঝতে পারি না—তুই ছেলে দু'টোকে—পোষ মানিয়ে নিতে পারলি না? আমি তোর চেয়ে কম বয়সে তোদের মানুষ করলেম কি ক'রে? আমি তোর চেয়ে মোটে পাঁচ বছরের বড়!" হা অদৃষ্ট! কেমন করিয়া বুঝাইব,—কেন ছেলেদের পোষ মানাইতে পারি নাই? সেইদিন বুঝিলাম—জগৎ অন্ধ! আমার দুঃখ দেখিবার চক্ষু জগতের নাই। আমার যন্ত্রণা দেখিবার—বুঝিবার কেহ নাই!

যখন সেই স্নেহময়ী মা বুঝিলেন না, তখন আর কে বুঝিবে? হৃদয়ের তারে তারে যেন কেমন স্বরে বাজিত—

ভাবি মনে নিশিদিন, কি রূপে কাটিবে দিন
এ ভব-রাক্ষস-পুরে—মরু সাহারায়?
হেথা স্নিগ্ধ ছায়া নাই, পরদুঃখে মায়া নাই,
কিরূপে কাটাব দিন,—হায় এ কারায়!"

প্রায় এক বৎসর পরে স্বামী-গৃহে আসিলাম। আবার নূতন করিয়া নগেন ও জাহ্নবীর সহিত সুখের ঘর রচনার চেষ্টা করিলাম। এখন আমার জন্য নূতন অপবাদের সৃষ্টি হইল। জাহ্নবীর তিন চারিখানা মূল্যবান অলঙ্কার চুরি গিয়াছিল। আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিতাম—"শ্যামা চুরি করিয়াছিল;" কিন্তু বলা হয় নাই। শ্যামা ও ললিতা আমাকে চুরির অপবাদ দিল। আমি কেবল বলিতাম,—"হরি হে, তুমি সত্য!"

সিদ্দিকা। উঃ! এত নিপীড়ন!!

সৌ। ইহাই শেষ নহে—আরও শুন। পাড়ায় ত রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, আমি দুইবার নগেনের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয় বারের ঘটনার পর হইতে আমার নাম 'রাক্ষসী' হইল। ক্রমে আমার বিবাহ-জীবনের দশ বৎসর অতীত হইল। আমার বাছাদের বয়স তখন ১২ বৎসর। এই সময় আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। আমি প্রাঙ্গনস্থিত বাঁধা কূপের ধারে দাঁড়াইয়া আছি। একবার সাধ হইল, ঐ কাল জলে লীন হই। অমনি কে যেন বলিল,—"অমন কাজ করিও না—আর কয়দিন অপেক্ষা কর!" বোধ হয়, এ বক্তা সেই জন, যিনি বলেন—'সতীনের সতীনত্ব'।

জাহ্নবী কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া কূপের দেওয়ালের উপর উঠিল। আমি সভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিব, মনে করিলাম; সে কিন্তু আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি বলিলাম, "করিস্ কি বাছা! পড়ে যাবি!" সে বলিল, "তবে আমাকে ধরে নাবিয়ে দাও।" যেই তাহাকে ধরিলাম, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মাসিমা দেখ! মা আমায় ফেলে দিল!" আমি তখন কি যে করি ভাবিয়া পাই নাই—চক্ষে আঁধার দেখিতাম। শ্যামা আসিবার পূর্বে কর্তা আসিলেন। তিনি স্বয়ং আমাকে জাহ্নবী-বধের চেষ্টা করিতে দেখিলেন। তিনি বলিলেন—"আজ ত আমি স্বচক্ষে তোমার কাণ্ড

দেখিলাম।" আমি কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তিনি শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না—জাহ্নবীকে লইয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিলেন।

দশদিক্ অন্ধকার দেখিলাম—একদণ্ড নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইবারও স্থান নাই। কূপের ধারে একটু দাঁড়াই, তাহাও বিধাতার অসহ্য। আমি প্রতিদিন পলে পলে অনুভব করিতে লাগিলাম: আপন সন্তান স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করে, কিন্তু সপত্নী-সন্তান স্ত্রীকে স্বামীর হৃদয় হইতে দূর করে। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, স্বামীর হৃদয় হইতে অনেক দূর সরিয়াছি, এবং ক্রমশঃই দূর হইতেছি। অথচ তাঁহাকে আবার আমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দেয়, এমন কেহও ত ছিল না! হইতে পারে—আমার এ ধারণা ভ্রান্ত।

সি। আমার বিশ্বাস, তোমার ধারণা ভ্রান্ত নহে, কারণ কোরেশা-বিও ত ঐ কথা বলেন। তিনি পাটনা-ত্যাগিনী হইয়া তারিণী-বিদ্যালয়ে কেন? ঐ দুঃখেই ত! তিনি ঝাড়া আট বৎসর স্বামীর সহিত দুর্বিসহ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন! তাঁহার সপত্নী-পুত্র, দশমবর্ষীয় বালক কমরজ্জামান ওলাউঠা রোগে মারা পড়িবার পর হইতে স্বামীর ঔদাস্য এমন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল যে, তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ট্রেনিং স্কুলে পড়িতে গেলেন। তাহার পর শিক্ষয়িত্রীরূপে গয়া, মুজফ্‌ফরপুর ইত্যাদি বালিকা-স্কুলে ঘুরিয়া শেষে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সৌ। এই যে যত্র-তত্র চাকুরী করা—বিশেষতঃ এখানে চাকুরী-গ্রহণও ত তাঁহার স্বামীর অভিপ্রেত ছিল না; কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ তিনি বাধা দেন নাই। ইহাতে কোরেশা-বির পক্ষে শাপে বরই হইয়াছিল।

সি। কোরেশা-বির ভাশুর, দেবর, জায়েরা ও কমরুর সহোদরা—সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রবাসী স্বামীকে বুঝাইলেন যে, ওলাউঠায় আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা অভাবেই কমরু মারা গেল। বেচারী যদিও সেই রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় পাটনার অন্যতম বিখ্যাত ডাক্তার ডাকিয়া কমরুকে দেখাইয়াছিলেন, তবু তাঁহাকে চিকিৎসা না করার অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল।

সৌ। কেবল ইহাই নহে,—সেই দিন অপরাহ্নে অপর ছেলেদের সঙ্গে কমরু যেই লুচি-পুরি কিনিয়া খাইয়াছিল, তাহা কিনিবার দু'গণ্ডা পয়সা কোরেশা-বিই দিয়াছিলেন। আর সে ডাক্তারও ছিলেন তাঁহার পিতৃ-বন্ধু। আমি কোরেশা-বির স্বামীর কোন দোষ দেখি না, তিনি বেচারা কি করিবেন?—"দশচক্রে ভগবান ভূত"! তবু তিনি স্ত্রীর সহিত বেশ ভদ্র ব্যবহার করেন। এখানে প্রায় সর্বদাই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। গত বৎসর ছুটির সময় কোরেশা-বিও বাড়ী গিয়াছিলেন।

সি। ইহার কারণ, আমার বোধ হয় যে, এখন তিনি স্বয়ং পুত্রবতী হইয়াছেন, তাই ১১ বৎসর পরে তাঁহার কপাল ফিরিয়াছে। যাক্, দিদি, এখন তোমার কাহিনী চলুক্।

সৌ। বলিয়াছি ত, আমার জগৎ-সংসার ঘোর অন্ধকারময় মরুভূমি ছিল। যিনি এই মরুভূমিতে কেবল একবিন্দু সুধা,—সেই অন্ধকারে একটি মাত্র ক্ষীণ জ্যোতির্ম্ময় তারকা—তিনিও দূরে—বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং আমি জীবনে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম।

সি। তোমার নগেন ও জাহ্নবী ছেলেমানুষ বই ত নয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ কি?

সৌ। তাহা সত্য। এই জন্যই ত এসব কথা এতকাল কাহাকেও বলি নাই; তুমি শুনিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে বলিয়া তোমাকে বলিতেছি। নচেৎ এসব কথা কি বলিবার? এ কেবলই নীরবে সহিবার—আর হৃদয়ের পরতে পরতে দগ্ধ হইবার ব্যাপার! বাছারা ত সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, তাহাদের কার্য্যের জন্য তাহারা দায়ী ছিল না, কেবল আমারই দায়িত্ব গুরুতর ছিল। উহাদের কর্ম্মফল আমাকে ভোগ করিতে হইত। আর সেই কর্ম্মফল কত ভীষণ, তাহা একবার কল্পনা-সহায়ে মানস-চক্ষে দেখ।

সি। তোমার ঐ দিদিই সব সর্ব্বনাশের মূল ছিল। তাহাকে তাড়াইতে পারিলে তুমি নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিতে।

সৌ। ও হরি! বল কি! তাহাই ত অসম্ভব ছিল। তাহাকে তাড়াইবে কে? সেই গিন্নী, সেই সর্ব্বেসর্ব্বা,—সে যে দয়া করিয়া আমাকে তাড়ায় নাই, তাহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য! শ্যামা দূর হইলেই ত ছেলেমেয়ে, ঘর-দ্বার সমস্তই আমার হইত।

সি। এখন বল কিরূপে শাপমুক্তা হইলে। আর অভিশাপের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

সৌ। এখন দেখিলে ত—আগুন আছে কি না? মানুষ যখন নিতান্ত নিরুপায় হয়, জীবনে মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করে, তখন পরম দয়াল ঈশ্বর মানবের প্রতি দয়া করেন।—

"নিদাঘের তীব্র তাপ অসহ্য যখন,
জলদ তখনি করে সলিল বর্ষণ।"

ঈশ্বর পতিতপাবন, পতিত মানবকে উদ্ধার করেন। কাহারও জন্য মৃত্যু বিধান, কাহারও জন্য অন্য কিছু—যাহা হয় একটা উপায় করিয়া দেন। আমারও উপায় হইল।

আমরা তীর্থযাত্রা করিলাম। ললিতা পুত্রের কল্যাণে মথুরায় কোন ঠাকুরের পূজা মানিয়া ছিল। সেই উপলক্ষে মথুরায় যাওয়া হয়। আমরা যেখানে ছিলাম, তথা হইতে ললিতার মানিত ঠাকুরের মন্দির কিছু দূরে ছিল, তাই সেখানে জলযানে যাইতে হইয়াছিল। ললিতা ছোট একটা বজরা ভাড়া লইল। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক যাত্রী ছিল। কর্তা স্বয়ং নগেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া শ্যামাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, জাহ্নবীকে যেন খুব সাবধানে রাখে। তাঁহার অতি-সতর্কতার কথা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—মনে হইল, জাহ্নবী যদি ডুবিয়া যায়?

সেই দিন কর্তা আমারও প্রতি যেন একটু প্রসন্ন হইলেন; স্বয়ং হাত ধরিয়া বজরায় তুলিলেন, বসিবার স্থানটা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার মুখের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল—সে দিন সে মুখ বড় সুন্দর লাগিয়াছিল—চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। মনে হইল, এই বুঝি শেষ দেখা—আর ও মুখ দেখা হইবে না—যদি আর না দেখিতে পাই—ভালমতে দেখিয়া লই! সে সময় সুখানুভব করিতে পারি নাই—কেমন যেন গভীর বিষাদে মগ্ন হইতেছিলাম।

সৌদামিনী থামিলেন। সিদ্দিকা ভাবিলেন, সৌদামিনী বুঝি রোদন করিতেছেন। কিন্তু না, সে চক্ষু শুষ্ক—অনেক অশ্রু বিসর্জনে অশ্রুর উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি স্থির-শান্তভাবে পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন:

যমুনার শীতল বাতাস পাইয়া শ্যামা ঘুমাইয়া পড়িল। চঞ্চলা জাহ্নবীকে আমিই "এদিকে এস, ওদিকে যেও না" ইত্যাদি বলিয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। সেদিন সে প্রতি কথায় আমার সহিত তর্ক করিতে লাগিল; ক্রমে আমাকে ছাড়িয়া সে ললিতাকে আক্রমণ করিল। তাহারা ঝগড়া করিতে লাগিল। আমি মুক্ত বাতায়ন হইতে যমুনার কাল জল দেখিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম,—

জগৎ-জননি!
জুড়াতে জগৎ-জীবে স্নিগ্ধ করুণায়
শীতল যমুনা-রূপে বিরাজ ধরায়

সহসা জাহ্নবী আমার গায়ের উপর দিয়া একেবারে জানালায় আসিয়া বসিল। আমি ভারী ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—'মা। করিস্ কি।' সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"কেন, তুমি এম্নি কর; নিজে বুড়ো মাগী তামাসা দেখ—আমার দেখা তোমার সহ্য হয় না। আমি একেবারে খুকী না কি যে ভয় করছ?" এই বলিয়া উচ্চহাস্য করিল। অতঃপর কহিল,—"দেখ, আমি আরও—" কথাটা শেষ হয় নাই—সে নদীর জলে পড়িয়া গেল। আমি সহসা অজ্ঞান হইলাম।

যখন প্রথম চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম জাহ্নবী ও আমি পাশাপাশি ধরাতলে পড়িয়া আছি, আর পাঁচ সাত জন লোক আমাদের শুশ্রূষা করিতেছে। তাহাদের যত্নে আমি বাঁচিয়া উঠিলাম; জাহ্নবী বাঁচিল না। আমি সংজ্ঞালাভ করিয়াছি দেখিয়া তাহারা আমাকে লইয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিল। আমি কেবল দীননয়নে জাহ্নবীর প্রতি চাহিয়া রহিলাম—চক্ষের জলে বুক ভাসাইলাম—যাহার মরণে সঙ্গিনী হইয়াছিলাম, তাহাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? জেলেরা মাছ ধরিতে গিয়া আমাদের ধরিয়াছিল—আমরাই উহাদের জালে উঠিয়াছিলাম।

সি। মাছ দুইটা মন্দ নহে! কিন্তু দিদি! জাহ্নবীকে ও তোমাকে উহারা একসঙ্গে পাইল কিরূপে?

সৌ। আমিও তখনই ডুবিয়াছিলাম যে, কোন মতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। তাহাকে দৃঢ়ভাবে বক্ষে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম, যদি ডুবি ত একসঙ্গেই ডুবিব; যদি উঠি, তবে দুইজনে একসঙ্গেই উঠিব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল; তাই যদিও উভয়ে একত্রে জালে উঠিলাম, তবু তাহাতে আমাতে চির-বিচ্ছেদ হইল। (এইবার সৌদামিনীর চক্ষে জল দেখা দিল—হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল। বলিলেন)—ধীবরেরা আমাকে তাহাদের সঙ্গে লইল। আমি পূর্ব-পশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাদের সঙ্গে গেলাম। দুই একদিন পরে আমি পাগল হইয়া তাহাদের দ্বারা বাতুলাশ্রমে প্রেরিত হইলাম। প্রায় এক বৎসর পরে প্রকৃতিস্থ হই। সে আজ ১৭।১৮ বৎসরের ঘটনা।

আমি আরোগ্য লাভ করিলে বাতুলালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে একটা সম্ভ্রান্ত ঘরে 'গবর্নেস্'-এর কাজ যোগাড় করিয়া দিলেন। সেখানে যাইবার এক বৎসর পরে আমার ছাত্রীর বিবাহ হইলে, তাঁহারা আমাকে সরযূর সঙ্গে

কলিকাতায় পাঠাইলেন। কিছুদিন পরে সরযূ তাহার ছোট ননদকে তারিণী-বিদ্যালয়ে ভর্তি করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গেল। এই উপলক্ষে মিসিস্ সেনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হইল; তাহার ফলে আমি তারিণী-কর্ম্মালয়ে চলিয়া আসিলাম। আমি এখানে ১৫।১৬ বৎসর হইল আছি। এখন দেখি হৃদয়টা বৃহৎ—বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। এখন আর ওরূপ ক্ষুদ্র ঘটনায়—সামান্য অনাদর অবহেলায় হৃদয় আলোড়িত হয় না।

সি। তাহা হইলে এখন আবার ঐ গৃহে ঐ সব লোকের সহিত স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার? তবে যাইতে বাধা কি?

সৌ। আহা! কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব, শ্যামা দিদি সে গৃহ কেমন বিষাক্ত—কালকূটময় করিয়া তুলিয়াছিল। তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে না, বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

সি। আল্লাহ্‌তালার রাজত্বে কিছুই অসম্ভব নহে। ক্ষুদ্রকায় সুকুমার শিশু দ্বারা বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট হইতে না পারিবে কেন? অতিকায়ের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়েরই অত্যাচার অধিক হয়। তাই দেখনা,—মৌমাছির হুল অতিশয় তীক্ষ্ণ, যন্ত্রণাপ্রদ বটে,—যখন তুমি তাহার মধুর ভাণ্ডার লুটিতে যাও! নতুবা সে তোমাকে বিনা কারণে আক্রমণ করে না। আর ক্ষুদ্রকায় মশক তোমাকে নিতান্ত নির্দোষ—নিদ্রিতাবস্থায় দংশন করে। মশার অত্যাচারে মশারি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে—কিন্তু মধুকরের জ্বালায় ত কোন প্রকার 'দুর্গ' নির্ম্মাণ করিতে হয় নাই!

প্রায় রাত্রি শেষ হইল দেখিয়া উভয়ে বিষন্নহৃদয়ে শয়ন করিলেন। সৌদামিনী ঘুমাইয়াছিলেন কি না, জানি না। সিদ্দিকা কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই। তিনি সৌদামিনী-আগুনের তরঙ্গে ওৎপ্রোত হইতেছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক সৌদামিনী-আগুনে পরিপূর্ণ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আবার দেখা

লতীফ মুঙ্গেরে আসিয়াছেন। ডাক্তারের উপদেশ-মতে তাঁহার মাতাকে লইয়া বায়ু-পরিবর্তনের নিমিত্ত মুঙ্গেরে আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার সেই মাসী (যাঁহার কেহ নাই) এবং রফীকাও আছেন। রফীকা এক বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন।

রফীকা সীতাকুণ্ড দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় একদিন তাঁহাদিগকে লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে লতীফ সীতাকুণ্ডে চলিলেন। তখন দিনমণি পশ্চিমে অস্ত যাইতেছিল, স্নুতরাং অন্ধকার তখনও গাঢ়তর হয় নাই। তাঁহারা পদব্রজে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছুদূর লক্ষ্মণকুণ্ডের নিকট আরও কয়েকজন মহিলাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিকটবর্তী হইলে লতীফ দেখিলেন, সিদ্দিকা এবং তাঁহার 'ভগিনি'গণ। কিন্তু সিদ্দিকা লতীফকে দেখিয়াও না দেখার ভাণ করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া গেলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে হেলেন ছিলেন ; তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"কেমন আছেন মিষ্টার—?"

লতীফ অগত্যা দাঁড়াইলেন। যথারীতি অভিবাদনের পর বলিলেন, "মিসিস্ হরেস আমার নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।"

সৌদামিনী। চেহারাখানি কিন্তু মনে আছে!

হেলেন। আপনার নামের শেষভাগটা আমি ঠিক উচ্চারণ করিতে পারি না। আপনার সঙ্গিনীদের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন না?

লতীফ। 'সঙ্গিনী' বলিলেই হয় না?

হে। না, তাহা কি হয়? তবে আপনার পরিচয়ের ইচ্ছা না থাকিলে আমি জোর করি না।

ল। ইনি ভগিনী, ইনি মাসী। (তাঁহাদের প্রতি) ইঁহারা আমার পরম-হিতকারিণী—ইঁহারাই সেই তারিণী-ভবনের 'দরিদ্র ভগিনী'।

রফীকা। ভাল হইল, ইঁহাদের সহিত দেখা হইল।

হে। আমরাও কৃতার্থ হইলাম।

র। ভাই-এর বাচনিক আপনাদের সৌজন্যের কথা শুনিয়া অবধি আপনাদের দেখিতে আগ্রহ ছিল ; এত দিনে সে সাধ মিটিল।

সৌ। সময় সময় অনেকেরই তীর্থযাত্রা সফল হয়। আমি জীবনে একবার সার্থক তীর্থভ্রমণ করিয়াছিলাম। অদ্য (রফীকার প্রতি) আপনিও একটি বাঞ্ছনীয় বস্তু পাইলেন—অর্থাৎ আমাদের দেখিলেন। (লতীফকে দূরবর্তিনী সিদ্দিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে দেখিয়া) মিষ্টার আল্‌মাস্‌, আপনারও কোন ইষ্টলাভ হইয়াছে কি? আমরা ত আপনার ভগিনীকে পাইলাম। আপনি কিছু পাইলেন কি?

ল। আপনাদের সঙ্গে দেখা হইল, এই যথেষ্ট লাভ, আর কি চাই?

(কিন্তু যাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে আনন্দলাভ হইত, তিনি এখনও দূরে আছেন—তাঁহার সঙ্গে একটি কথাও হয় নাই।)

সৌদামিনী ঊষাকে দূরে দেখিয়া ডাকিলেন। সিদ্দিকা ও ঊষা তখন ফিরিয়া আসিলেন।

উ। আমরা দেখিলাম যে, মিঃ আলমাস্‌ পলাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাই আমরাও দেখিয়া না দেখার ভাণ করিয়া দূরে যাইতেছিলাম।

ল। আপনারাই অতিক্রম করিয়া গেলেন বলিয়া আমিও পশ্চাৎপদ হইতে-ছিলাম। এখন বলুন, আপনারা ভাল আছেন ত?

উ। আমি ভাল আছি, ধন্যবাদ! সিদ্দিকা কিন্তু প্রায়ই অসুস্থ থাকেন।

র। (সিদ্দিকার প্রতি) ভাই-এর নিকট আপনার অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনার কি অসুখ?

মৌনী সিদ্দিকার প্রতি প্রশ্ন হইল দেখিয়া তিনি বিপদ গণিলেন। "না, এমন কিছু অসুখ নয়"—এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া অন্যদিকে চাহিলেন।

উ। চল, আমরা ওদিকে গিয়া বসি।

সকলে একখণ্ড পাথরের উপর উপবেশন করিলেন। রফীকা প্রথম দৃষ্টিতেই সৌদামিনীকে ভক্তি করিতে শিখিলেন। সৌদামিনীর এই ভক্তি-আকর্ষণের গুণটা কেবল তাঁহার স্বামী প্রভৃতির হৃদয়েই কার্যকরী হয় নাই।

র। আরও যে কয়েকজন ভগিনীর নাম শুনিয়াছি, কোরেশা, বিভা—এখন তাঁহারা কোথায়?

সৌ। তাঁহারা সকলে এখন কলিকাতায়। এবার পূজার সময় কেবল আমরা কর্মালয়ের কয়েকজন 'ভগিনী' আসিয়াছি। বিদ্যালয় হইতে কেবল ঊষা, অসুস্থতার জন্য ছুটি লইয়া আসিয়াছেন।

র। (হেলেনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) ও মেমও কি তারিণী-ভবনে থাকেন?

সৌ। হাঁ, উনি কর্মালয়-বিভাগের ইংরাজী শিক্ষয়িত্রী। কলিকাতায় উঁহার স্বতন্ত্র বাসাবাড়ী নাই বলিয়া তারিণী-ভবনেই বাস করেন।

লতীফের মাতা কিছু অসুস্থ আছেন শুনিয়া সৌদামিনী তাঁহাকে দেখিতে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রফীকা সিদ্দিকাকে বলিলেন, "আপনিও আসিবেন।"

সি। আমি যাইব না, ক্ষমা করিবেন।

র। কেন, আমি আপনাদের তাঁবুতে যাইব, আপনি আসিবেন না কেন? যাওয়া আসাই ত নিয়ম।

সি। আপনারাই ত আমার যাইবার পথ রাখেন নাই।

র। আপনার কথা আমি ভালমতে বুঝিলাম না। পথ রাখি নাই কেমন?

সি। আমরা সামাজিক মানুষ নহি, সুতরাং ও নিয়ম আমাদের জন্য নহে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল দেখিয়া সকলে যাইতে উদ্যত হইলেন। বিশেষতঃ রফীকার সঙ্গে একটি চারি বৎসরের শিশু ছিল, সে নিদ্রায় কাতর হইল। রফীকা ছেলেটিকে কোলে লইতে লইতে বলিলেন, "এ ভাইএর ছেলে। আজ এক বৎসর হইল, ইহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই অবধি এ আমার সঙ্গে আছে।"

ঐ কথাটা শুনিয়া বিদ্যুতের মত হঠাৎ একটু দুরাশার আলোক সিদ্দিকার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইল। সেই আলোকে তিনি মুহূর্তের জন্য লতীফকে স্বাধীন—বন্ধনমুক্ত দেখিতে পাইলেন। তখনই আবার একখণ্ড নিরাশার মেঘ আসিয়া সে আলোটুকু ঢাকিয়া ফেলিল। সিদ্দিকার হৃদয়ের এই আশাবিদ্যুৎ ও নৈরাশ্যমেঘ কেহই জানিতে পারিল না। কেবল লতীফ ও সৌদামিনী তাঁহার মুখভাবের এই ক্ষণিক পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করিলেন।

রফীকা কিছু লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন—"আমি নিজের ছেলে মেয়ে রাখিয়া আসিয়াছি—ইহাকে ছাড়িতে পারি নাই।"

ল। তুমি হামিদকে আদুরে করিয়া তুলিতেছ, এতটা ভাল নহে। শেষে তাহার মাতার মত একগুঁয়ে না হইলেই রক্ষা।

এইবার সকিনা বলিলেন—"ছেলেটি ঠিক মিঃ আল্‌মাসের মত। দেড় বৎসর পরে আবার আপনাকে দেখিলাম—সেই রকমই আছেন।"

ল। আমি কি শিশু ছিলাম যে, এখন আমায় বড় দেখিবেন?

সৌ। রোগাটে ছিলেন, সবল সুস্থ হওয়া উচিত ছিল।

উ। তা হইতেন, কিন্তু একটা গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন যে।

সৌ। (সিদ্দিকার কানে কানে) তুমিও ত মোটা-সোটা হও না, ঐ আঘাতের ভাগ তুমিও পাইয়াছ না কি?

ইহাতে সিদ্দিকা রাগ করিয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া গেলেন।

সিদ্দিকাকে অপর ভগিনীদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একা দেখিয়া, লতীফ ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে কিছু বলিবেন মনে করিতেছিলেন, কিন্তু কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া নীরবে তাঁহার দর্শনসুধা পান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সুখটুকুও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, কারণ রফীকা ও সৌদামিনী তথায় আসিলেন।

রফীকা (বাসায় ফিরিয়া যাইতে যাইতে সিদ্দিকার হাত ধরিয়া) আপনি নিশ্চয় আমাদের বাসায় আসিবেন; আপনার কোন আপত্তি আমি শুনিব না।

সি। বেশ; কিন্তু আপনাকে আমাদের "নারী-ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি'র সভ্য হইতে হইবে। বার্ষিক চাঁদা ১২৲ টাকা মাত্র।

র। (উচ্চ-হাস্যে) 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি?' এমন নাম ত কখনও শুনি নাই! 'পশু-ক্লেশ-নিবারণী-সভা' আছে জানিতাম। বেশ বেশ। আমি নিশ্চয় সভ্য হইব।

ল। এমন সমিতির প্রতি সমস্ত নারীজাতির সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। (সিদ্দিকার প্রতি) আমার মাতাকেও সভ্য করুন; এই নিন্ তাঁহার চাঁদার টাকা।

সি। সৌদামিনী দিদি এ সমিতির সম্পাদিকা, টাকা তাঁহাকে দিন।

সৌ। না, সকিনাবু কোষাধ্যক্ষ, টাকা তিনিই লইবেন।

ল। তাহা হইলে দেখিতেছি যথাবিধি সভার কার্য সম্পন্ন হয়।

সৌ। তাহা নহে ত কি ছেলেখেলা? এবার সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে, আপনি দয়া করিয়া নূতন সভ্যদের সহিত যোগদান করিবেন।

উ। হাঁ, মিঃ আলমাস্, আপনি নিশ্চয় সকলকে লইয়া কলিকাতায় আসিবেন; সেই সময় তারিণী-বিদ্যালয়ের কুড়ি বৎসরের জুবিলী এবং পুরস্কার বিতরণ হইবে।

ল। বহু ধন্যবাদ। আল্লাহ্ চাহে নিশ্চয় যাইতে চেষ্টা করিব।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আগুনের সৌন্দর্য

সিদ্দিকা আর কোথাও বাহির হয়েন না। যদি লতীফের সহিত দেখা হয়,—এই ভয়ে বাহির হইতে ইচ্ছা করেন না। কয়দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে ভীষণ তুফান চলিতেছে। তাঁহার অবাধ্য হৃদয় আপন মনে একদিকে বহিয়া যাইতে চাহে—তিনি বারণ করেন।

সিদ্দিকা বাহির না হইলে কি হইবে? লতীফ প্রায় প্রতি সপ্তাহে মাসী ও ভগিনীসহ 'ভগিনী'দের তাঁবুতে আসিতেন। এই সময় 'ভগিনী'দের সহিত তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। রাফিয়া এবং সকিনা তাঁহার আত্মীয়া—রাফিয়া সম্পর্কে মাসতুতো ভগ্নী এবং শ্যালক-পত্নী; আর সকিনা এক সম্পর্কে ভগ্নী, অন্য সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ। উষা এবং সৌদামিনী তাঁহার 'দিদি' হইয়া তাঁহার সহিত 'তুমি' সম্বোধনে কথাবার্তা কহিতে সম্মতা হইয়াছেন। তিনি কেবল সিদ্দিকাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু সিদ্দিকা-জয়ের চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই।

অভাগিনী সিদ্দিকা ভাবেন, তারিণী-ভবনে ত সকলেই সুখে আছেন, কেবল তাঁহার মনে শান্তি নাই কেন? সৌদামিনীও জ্বলিয়া পুড়িয়া এখন শান্তি লাভ করিয়াছেন। সিদ্দিকার এ দাহক্রিয়া কতদিনে শেষ হইবে? আরও ভাবিতেন, ইংরাজ ভগিনীদের কোন জ্বালা-যন্ত্রণা নাই। তাঁহারা পরম সুখী।

সকাল বেলা তাঁবুর বারান্দায় বসিয়া হেলেন সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন—অন্যমনস্কভাবে সহসা বলিয়া উঠিলেন:—"Oh poor thing! (আহা! গরীব বেচারী!)"

"কেন দিদি! ও কথাটা বলিলেন কেন?" নিকটে যে আর কেহ ছিল, হেলেন তাহা লক্ষ্য করেন নাই। সিদ্দিকার প্রশ্ন শ্রবণে চকিতের ন্যায় ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ও! সিদ্দিকা, তুমি তাহা শুনিয়া কি করিবে?"

সিদ্দিকা। বলুন না, "poor thing" কাহাকে বলিলেন?

হেলেন। মনে কর, তোমাকে বলিলাম।

সি। আমাকে বলিলেন কেন? আমি কিসে দয়ার পাত্রী?

হে। এই দেখ না, মিস্ স্টার এতকাল অবিবাহিতা থাকিয়া এখন বিবাহ করিয়াছেন।

সি। তাহাতে তিনি দয়ার পাত্রী হইলেন কেন?

হে। ঈশ্বর করুন, তিনি সুখী হউন। আমার ভুক্তভোগী হৃদয় কাহারও বিবাহের সংবাদ শুনিলে স্বতঃই আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে।

সি। কেন দিদি, কিসের আশঙ্কা? বিবাহ-সংবাদ ত আনন্দের বিষয়।

বারান্দার অপর প্রান্তে রাফিয়া, সকিনা ও উষা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; হেলেন তাঁহাদের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, উহারা সকলেই বিবাহিতা—"

তাঁহাদের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ হইল দেখিয়া রাফিয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কি নিন্দা করিতেছেন, হেলেন দিদি?"

হেলেন সিদ্দিকার হাত ধরিয়া তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"এই দেখ, ইঁহাদের সকলেরই বিবাহ-জীবন 'ফেল' (fail) হইয়াছে। এই যে রাফিয়া বেগম, ইনি বড়ঘরের কন্যা, ততোধিক বড়লোকের স্ত্রী; কিন্তু তোমাদের দেশীয় প্রথা অনুসারে সধবার চিহ্নস্বরূপ হাতে একগাছি চুড়ি পর্যন্ত নাই! ঐ যে সকিনা খানম, উনিও অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা, নোয়াখালীর জনৈক প্রসিদ্ধ উকিল, মিষ্টার কি 'খান'—নামটা এখন আমার মনে পড়ে না,—তাঁহার স্ত্রী; কিন্তু দেখ অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই। কেবল উষারাণী শাঁখা খুলিতে পারেন নাই—"ছাড়ব না হাতের শাঁখা, ঐটি সধবার নিশানা!"—

উষা। হেলেনদি! তুমি আজ আমাদের 'বিয়ে ফেল্'এর আলোচনা লইয়া বসিলে কেন?

সকিনা। সম্ভবতঃ সিদ্দিকাবুকে সাবধান করিতেছেন।—আমিও বলি, ভাই পদ্মরাগ! তুমি বিবাহ করিও না, সাবধান!

রাফিয়া। কিন্তু 'আল্মাস্' আসিয়া জুটিলে তোমার সতর্কবাণী মনেও থাকিবে না—

উ। মিঃ আল্মাস্ আসিলে দূর হইতে নমস্কার করিও,—ধরা দিও না পদ্মরাগ!

সিদ্দিকা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে যাইয়া বলিলেন,—"উষাদি! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। 'আল্মাস্' শব্দের অর্থ হীরক। সকিনাবু আমায় 'পদ্মরাগ' বলিলেন কি না, তাই রাফিয়াবু পরিহাস করিয়া 'আল্মাস্' বলিয়াছেন।"

উ। হাঁ, হাঁ, আমিও তাহাই বলি, হীরা আসিলে চুণী যেন দূর হইতে নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়ে!

হে। সিদ্দিকা, এখন তুমি বুঝিলে ত যে, বিবাহ আনন্দের বিষয় নহে। নতুবা ইঁহারা গৈরিকবসনা ও নীলাম্বরধারিণী সন্ন্যাসিনী হইতেন না।

সি। ইঁহাদের বিবাহ কিরূপে বিফল হইয়াছে, তাহা ত শুনিলাম না।

উ। উনি একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহেন। পদ্মরাগ সহজে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী নহেন।

হে। তবে শুন। এই যে রাফিয়া বেগম, ইনি জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টারের পত্নী। বিবাহের তিন বৎসর পরে ইঁহাকে মাত্র দুইটি শিশু কন্যা-সহ রাখিয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সাধারণতঃ লোকের ব্যারিস্টারী শিক্ষা করিতে তিন বৎসর লাগে। কিন্তু উঁহার প্রিয়তম ঝাড়া দশটি বৎসর ইংলণ্ডে রহিলেন। ইনি পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান করিয়া বিরহের সেই সুদীর্ঘ দশ বৎসরের দিন একটি একটি করিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। এই দশ বৎসর ইনি দুধের সর ও আম্রফল খান নাই—যেহেতু তাঁহার প্রিয়তম ইংলণ্ডে ঐ দুইটি জিনিসে বঞ্চিত ছিলেন—

রা। যান, হেলেন দি! আপনি ও-সব কি বলেন—

হে। সত্য ঘটনা বলিতেছি—কাব্য উপন্যাস নহে। ইঁহার প্রিয়তম ইংলণ্ড গিয়া প্রথম বৎসর সপ্তাহে ৭ খানি পত্র পাঠাইতেন; দ্বিতীয় বৎসর সপ্তাহে ৩ খানি—পর বৎসর সপ্তাহে ১ খানি, ক্রমে মাসে দুই মাসে ১ খানি পত্র পাঠাইতে লাগিলেন। রাফিয়া বেগম তাহাতেও দুঃখিত ছিলেন না। জ্যেষ্ঠা কন্যাটি ৫।৬ বৎসরের হইলে শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গে নিজেও পিয়ানো, সেতার প্রভৃতি বাজাইতে এবং প্রাণপণে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যাহাতে ইংলণ্ড-প্রত্যাগত স্বামীর উপযুক্তা ভার্যা হইতে পারেন,—স্বামীর সহিত ইংরাজীতে প্রেমালাপ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই সকল সাধনা।

রা। ও হেলেন দি! আপনি চুপ করিবেন না?

হে। এই চুপ করিতেছি, আর অধিক কিছু বলিবার নাই। স্বামীকে চমৎকৃত করিবার জন্য সুমার্জিত ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিলেন। স্বামী দুইমাস পরে একটা যেন-তেন সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া চরিতার্থ করিলেন। ইনি তবু দুঃখিত হন নাই। ক্রমে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের সময় নিকটবর্তী হইতে লাগিল। আর দুই বৎসর পরে আসিবেন, আর এক বৎসর বাকী। এখন ছয় মাসেও একখানা পত্র আইসে না—না আসুক, তিনি আসিলে একেবারে সুদে আসলে শোধ লওয়া যাইবে। ইহার কি চমৎকার ধৈর্য! প্রিয়তমের আগমনের আর মাত্র ১৫ দিন বাকী। এই সময় তাঁহার দেবর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, যেন তিনি কোন রেজেষ্ট্রি পত্র গ্রহণ না করেন। স্বামীর আগমনের ১২ দিন পূর্বে তাঁহার ইনশিওর

করা পত্র আসিল। ছয় মাস পরে এত বড় একখানি ইনশিওর-করা পত্র—ইহা কি ফেরত দেওয়া যায়? দেবর হয়ত অন্য লোকের পত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। স্বামীর পত্র স্ত্রী গ্রহণ করিবেন না, এ কি কথা? তবু তিনি ডাক-পিয়নকে পরদিন আসিতে বলিয়া পত্রখানি ফেরত দিলেন। অপরাহ্নে দেবরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে সে পত্রের বিষয় বলিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন,—"না, ভাইএর পত্রও গ্রহণ করিবেন না! ঈস্! ছয় মাস পরে পত্র লেখা হইয়াছে! আপনি পত্র ফেরত দিলে তিনি শিক্ষা পাইবেন যে, আপনিও রাগ করিতে জানেন।"

হতভাগা ডাক-পিয়ন আবার পরদিন এমন সময় আসিল, যখন কোন পুরুষ মানুষ বাড়ীতে ছিলেন না। রাফিয়া বেগম ভাবিলেন, এতকাল পরে পত্র আসিল, ইহা প্রত্যাখান করি কোন্ প্রাণে? আর দশ দিন পরেই ত তিনি আসিবেন, তখন বুঝিয়া লইব। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পত্রে না জানি কতই ভালবাসার কথা আছে। দীর্ঘকাল নীরব থাকার বিস্তারিত কৈফিয়ৎ আছে। সুতরাং তিনি যথাবিধি স্বাক্ষর দিয়া পত্র গ্রহণ করিলেন। অতি আগ্রহে তৃষাতুরা চাতকীর ন্যায় পত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন—

রাফিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হেলেনও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। সিদ্দিকা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ঊষা এবং সকিনাও বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"থাক্, আমি আর শুনিতে চাহি না।"

হেলেন অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন—"এই টুকুই ত গল্পের প্রাণ। শুন—তিনি পত্রের মোড়ক খুলিয়া দেখিলেন, তাহা সুবিস্তৃত ত্যাগপত্র (তালাকনামা)। তিনি ত্যাগপত্র দিয়াছেন, ইনি স্বাক্ষর দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—সুতরাং তাঁহাদের বিবাহ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল!! এইরূপে ১৩ বৎসরের বিবাহ-বন্ধন কলমের এক আঁচড়ে শেষ হইল! তিনি ত ইংলণ্ড হইতে মেম লইয়া আসিলেন, রাফিয়া পাগল হইয়া গেলেন!—"

সকিনা। আততায়ী একবার দেখিল না ফিরে,
অর্ধমৃত কি প্রকারে ছট্‌ফট্ করে।*

* "না মোড় কর্ বে-দরদ্ কাতিল্ নে দেখা-
তড়পতী রহী নীম্‌জান্ কেয়সে কেয়সে"।

হে। সুচিকিৎসার ফলে প্রায় তিন বৎসর পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। পরে কি জানি কি কৌশলে তিনি ও সকিনা একত্রে তারিণী-ভবনে আসিয়াছেন। পাঁচ বৎসর হইতে তাঁহারা এখানে আছেন। রাফিয়া মিসিস্ সেনের প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছেন। সকিনা রোগী-সেবা (নার্সিং) শিক্ষা করিয়াছেন।

সি। আর তাঁহার কন্যাদ্বয় ?

হে। যথাকালে তাহাদের উভয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

স। মিসিস্ হরেস, আপনি ত রাফিয়া-বুর ইতিহাস বলিলেন, কিন্তু নিজের পাগলটার গল্প বলেন না কেন ?

উ। হঁা, সে গল্প তুমি বল ; তুমি সে সংবাদপত্রের পাতা কাটিয়া (কাটিং) রাখিয়াছ।

হে। তাহা হইলে সকিনাবু, আমি তোমারও বিবাহ-রহস্য বলিয়া দিব।

স। বলিবেন, সে ত আর প্রেম-কাহিনী নয়। তবে শুন :—

হেলেন-বিবাহ কথা অনল যেমতি
ব্যথিতা সকিনা ভণে শুনে দয়াবতী।

দয়া এবং মমতার প্রতিমা হৃদয়বতী সিদ্দিকা সত্যই ঐ কথা—ঐ অনলের তরল বৃষ্টিধারা তৃষিতা চাতকীর ন্যায় পান করিতেছিলেন।

সকিনা। বিবাহের তিন বৎসর পূর্ব হইতে হেলেনদি মিঃ জোসেফ হরেস্‌কে জানিতেন। তিন বৎসরের পরিচয়ের পর তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এক বৎসরকাল পরম সুখে অতিবাহিত হইল। তখন জানিতেন না, সে 'ফুলের মালা'—প্রকৃত ফুলের মালা ছিল না, কিছু দিনের জন্য রূপান্তরিত হইয়াছিল মাত্র।

বিবাহের দ্বিতীয় বৎসর হইতে তিনি সুরাসক্ত এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কুক্রিয়াসক্ত হইলেন। রাত্রি ১২।১টার পর বাড়ী আসিয়া দিদির উপর 'মাতলামী' ঝাড়িতেন। রাগারাগি, গালাগালি দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। সময় সময় প্রহারও চলিত। অদ্যাপি ইঁহার অঙ্গে প্রহার-চিহ্ন আছে। ইনি সে সব শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া তাঁহাকে সৎপথে আনিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই পলায়ন করিতেন, ইঁনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধরিয়া আনিতেন।

সি। পলায়ন করিতেন কেন ?

স। মরিতে। অপরিমিত সুরাপানে অজ্ঞান হইয়া থাকিতেন। ইনি

সেই অবস্থায় ধরিয়া আনাইতেন। অবশেষে হাজারীবাগ হইতে যে পলায়ন করিলেন, তখন আর ইনি কোনও সন্ধান পাইলেন না।

বহুদিন পরে জনশ্রুতি শুনা গেল, তিনি কানপুরে নরহত্যা করিয়া পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়াছেন। দিদি সেইখানে গেলেন। যাইয়া শুনিলেন, হরেস্ নামক এক ব্যক্তি বদ্ধ-পাগল বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে। হেলেনদিও পাগলিনী-প্রায় সেই পাগলের অনুসরণে 'ঘটী বাটী' বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।

ইংলণ্ডে গিয়া জানিতে পারিলেন, মিঃ হরেস্ মিস্ রিভা সওার্স নাম্নী কোন যুবতীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে ধরা পড়িয়াছেন এবং আরও একজন লোককে হত্যা করিয়া ব্রোডমুরে 'ক্রিমিন্যাল্ লুনাটিক্ এসাইলামে' ('অপরাধী-বাতুলাশ্রমে') বন্দী আছেন। তখন ইঁহার মাতা জীবিত ছিলেন। তিনি এই সুযোগে হরেসের বিরুদ্ধে নালিশ করাইয়া হেলেনদিকে আদালত কর্তৃক 'ডিক্রী নিসি' দেওয়াইলেন। কিন্তু রীভা উক্ত কলঙ্কের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া নির্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইল। এদিকে রীভার মুক্তিতে হেলেনের 'ডিক্রি নিসি' পণ্ড হইল। আহা! বলিহারি যাই ইংরেজ আইনের! হেলেনদি আবার আপীল করিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, আপীলের লর্ড চতুষ্টয় একবাক্যে বলিলেন—"মিসিস্ হেলেন্ মেরী হরেস্ তাঁহার স্বামী লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল সিসিল্ জোসেফ্ হরেস্ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না।"

তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রায় তিন বৎসর হইল সংবাদপত্রে "পাগলের সহিত চিরজীবনে বাঁধা" ("Tied for life to a lunatic") শীর্ষক একটি 'বিলাতী বিচারের' সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দেখ, আমি সে কাগজখণ্ড সযত্নে রাখিয়াছি। কোন কোন বিচারকের একটু হৃদয় আছে, তাই লর্ড বার্কেনহেড্ স্বীয় রায়ে বলিয়াছেন,—"**আমাদের বিবাহ-আইনের** এই হতভাগিনী-'বলি'র প্রতি অবশ্যই আপনাদের সহানুভূতি আছে। * * * ইহা বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ বেচারী চিরজীবন একটা নরঘাতক, ভয়ঙ্কর অত্যাচারী নিষ্ঠুর বাতুলের সহিত আবদ্ধা থাকিবেন।* * অনেকে আমাদের এই বিচার নিষ্পত্তিকে কঠোর ও অমানুষিক মনে করিবেন—কিন্তু ইহাই হইতেছে **ইংলণ্ডের আইন**! * * ইহার প্রকৃত প্রতিকার আইন আদালতের বাহিরে।"

ফল কথা, ইংলণ্ডের আইন হেলেনদিকে বাতুলের বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতে পারিল না। হরেসের বাতুলতার বিষময় ফল হেলেনকে ভোগ

করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা অবিচার অত্যাচার আর কি হইতে পারে? এই ইংলণ্ড—এই পূঁতিগন্ধময় পচা ইংলণ্ড আবার সভ্যতার দাবী করে।

হে। এজন্য তুমি দুঃখ কর কেন সকিনাবু? তুমিও ত তোমাদের দেশের আইন ও আচার-পদ্ধতির উৎসর্গীকৃতা 'বলি'!

স। আমাদের দেশ ত অসভ্য পরাধীন দাসাধম দাস—তাহার সর্বাঙ্গে কলঙ্ক-কালিমা। কিন্তু তোমাদের যে সাদা ধব্‌ধবে দেশ! এখন আমি 'ইতি' করি—এইরূপে হেলেন'দির সুখের দিন বড় শীঘ্র ফুরাইল। 'গাঁথা না হইতে মালা—ফুলদল শুকাইল।' সূর্যোদয়ের আনন্দটুকু অনুভব করিতে না করিতে সূর্যাস্ত হইল। আশালতা সবে মুকুলিত হইতেছিল, তখনই সমূলে উৎপাটিতা হইল।

হে। ভগিনী! আমি ভাবিয়া দেখিলাম,—না পুড়িলে কিছুই পবিত্র হয় না। ধর্মের পথ কন্টকময়, তাই প্রেমে ক্ষণিক সুখ নাই। যত সুন্দর বস্তু দেখ, সকলের মধ্যেই আগুন আছে। যদি জোসেফের সহিত বিচ্ছেদ না হইত, তবে আমি এ বিশ্বপ্রেম শিখিতাম না। এখন এ জ্বালা-পোড়া সুন্দর বোধ হয়। জ্বলিতেই সুখ বোধ হয়। জগৎ-সংসার কেবলই জ্বলিতেছে।

সি। (অন্যমনস্কভাবে) তাই ত সৌদামিনীতেও আগুন আছে।

হে। শুধু সৌদামিনীতে কেন,—প্রফুল্ল-নলিনীতেও আছে!

সিদ্দিকা সবিস্ময়ে হেলেনের মুখ দেখিতে লাগিলেন,—এ কি, হেলেন কি বলেন? ইহা রূপক না কি? তিনি কি সিদ্দিকার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন?

হে। কি ভাবিতেছ?

সি। ভাবিতেছি—আপনি এমন সুন্দর মানুষ, আপনার বুকে আগুন আছে!

হে। তোমার মনে কি আগুন নাই?

সি। (ত্রস্তভাবে) না।

এই "না" যেরূপ জোরের সহিত উচ্চারিত হইল, তাহাতেই যেন শত "হাঁ" প্রকাশিত হইল। সকলে হাসিলেন। সিদ্দিকা অপ্রতিভ হইলেন।

এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল—"মাঠাক্‌রুণরা, আজ না'বেন খা'বেন না? বড় মাঠাক্‌রুণ (সৌদামিনী) রান্না-ঘরে একলাটি বসে আছেন।"

উ। তাই ত, বেলা যে ১২টা! কিন্তু এদের যে "প্রেমসুধা-পানে ক্ষুধা তিরোহিত হয়েছে।" এখন উঠা যাক্‌।

হে। হাঁ উঠি, কিন্তু সকিনা-বু ও উষা-দির গল্প বাকী রহিল।

সি। তাহা আজি রাত্রে শুনিব।

• • • •

নৈশ-ভোজনের পর সিদ্দিকা হেলেনকে উষা ও সকিনার গল্পের জন্য ধরিলেন।

হে। সকিনার কথা রাফিয়া বেগম ভাল জানেন, তিনি তাঁহার আত্মীয়া। তাঁহাকে অনুরোধ কর।

রাফিয়া বেগম আরম্ভ করিলেন :—সে আজ প্রায় ১৭ বৎসরের ঘটনা। বিবাহের সময় সকিনার বয়স ১৫ বৎসর ছিল। উনি সম্পর্কে আমার ভ্রাতৃবধূ এবং ভগিনীও বটেন। আবদুল গফুর খাঁ তখন খুলনায় একজন উদীয়মান উকিল। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার চরিত্রদোষ ঘটে; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার চরিত্র সংশোধনের অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন। অবশেষে বিবাহ-রূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। পরিচিত লোকেরা কেহ কন্যাদানে সম্মত হইলেন না। ভ্রাতা তখন দূরদেশে শিকারের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এদিকে আবদুল গফুর বাঁকিয়া বসিলেন, কিছুতেই বিবাহ করিবেন না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর সম্মত হইলেন যে, নিখুঁৎ সুন্দরী পাইলে বিবাহ করিবেন।

(শ্রোত্রীগণ একযোগে সকিনার প্রতি চাহিলেন, সত্যই ত তিনি পরমাসুন্দরী, যেন ডানাকাটা পরী।)

তখন বড় ভাই বলিলেন যে, চরিত্র-সংশোধন হওয়া উচিত। তিনি নিজে বেশ ভাল লোক ছিলেন; কনিষ্ঠের দুষ্ক্রিয়ার জন্য মর্মপীড়িত থাকিতেন। এবার গফুরের দয়া হইল; তিনি সুবোধ বালকের মত সুরা এবং অন্যান্য কুক্রিয়া ত্যাগ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা বর্ধমানে গিয়া সকিনার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। কিন্তু একটা পরিচারিকা যে গুপ্তভাবে তাঁহার রক্ষিতা ছিল, তাহা কেহই জানিত না।

যথাসময় আমরা বরযাত্রী লইয়া গেলাম। বেলা (সেই পরিচারিকা)ও আমাদের সঙ্গে গেল। বিবাহ অনুষ্ঠানের পর যখন বরকন্যার শুভদৃষ্টির নিমিত্ত বর অন্তঃপুরে আহূত হইয়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়াছেন, সেই সময় বেলা বরের কানে কানে কি বলিল।

আমার বলিতে লজ্জা হয়,—দূর-সম্পর্কের হইলেও তিনি আমার ভাই,—সেই ভাইয়ের অমানুষিক কাণ্ডের কথা বলিতে আমি লজ্জায় অধোবদন হই। তোমরা বিশ্বাস করিবে ?—বর তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কন্যার মুখ দর্শন করিবেন না।

কারণ বেলা বলিয়াছে, "বিবি-সা'ব্ ত সোন্দর না।" কন্যাপক্ষীয় লোকেরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বরের ভ্রাতা রাগ করিয়া বলিলেন, তিনি খুন করিবেন। উপস্থিত লোকেরা বলিলেন, "তুমি স্বচক্ষে দেখ, পাত্রী সুন্দরী কি না।"

বর-কন্যার শুভ-দৃষ্টি হইল। পরদিন বর নব-বধূর সমস্ত অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিলেন। বাড়ী গিয়া ভাইকে শাসাইলেন যে, তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া একটা কুৎসিতা পাত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, এজন্য তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে 'ড্যামেজ সুট' আনিবেন। সকিনার ভাগ্যে আর স্বামীগৃহে যাওয়া ঘটে নাই।

ভ্রাতা গফুরের মুখদর্শন বন্ধ করিলেন। কিছুদিন পরে সে বেলা মরিল। গফুর একজন বিধবাকে বিবাহ করিলেন। প্রায় তিন বৎসর পরে সকিনার ভ্রাতৃত্রয় 'দেন মোহর' (স্ত্রীধন)-এর জন্য নালিশ করিয়া গফুরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এ সব গোলমালে আরও দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। গফুর বে-গতিক দেখিয়া শ্যালকদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইলেন।

গফুর আমাকে এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়া মহিলাকে সঙ্গে লইয়া বউ আনিতে চলিলেন। আমরা নানাবিধ বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি অনেক উপঢৌকন লইয়া ক'নেকে ফুস্‌লাইতে গেলাম—"আরসী আন্‌ছি, কাঁকই আন্‌ছি, চুল বান্ধনের ফিতা আন্‌ছি।"

কিন্তু সে সব দেখে কে?—সকিনার তখন ভয়ানক জ্বর।

গফুর স্বয়ং বধূর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, মাথা টিপেন, বাতাস করেন ইত্যাদি। কিন্তু বদ্‌রসিক সকিনা তাঁহার প্রতিদান কি দিলেন, জানেন? তাঁহার জ্বর ছাড়িলে আমরা বউ লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলাম। যাত্রার পূর্বদিন বউ বরকে পত্র লিখিলেন। গফুর আমাকে সে পত্র দেখাইলেন। আজি পর্যন্ত সে পত্রের প্রত্যেকটি শব্দ আমার বেশ স্মরণ আছে। তাহা এই:

"আদাব জানিবেন,—

"আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু স্পষ্ট কথা এই: আপনার সহিত ইহজীবনে আমার মিলন অসম্ভব। আপনি একটা পরিচারিকার কথায় আমাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার স্মরণ নাই? আপনার "বেলা যারে 'সোন্দর' কইব, সেই হইবে 'সোন্দর'।" সে

আমাকে 'সোন্দর' বলিয়া সার্টিফিকেট না দেওয়াতে যে আমার বিবাহ 'পাশ' হয় নাই,—এ অপমান,—আমার মতে সমস্ত নারীজাতির প্রতি এই অপমান, আমি অদ্যাপি ভুলিতে পারি নাই। অধিক বলা বাহুল্য। ইতি—

"আপনার পদ-দলিতা
সকিনা।"

* * * *

সকিনার ভ্রাতৃগণ পত্রের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। সকিনার হাত পা বাঁধিয়া 'প্যাক্' করিয়া আমাদের সহিত পাঠাইবেন বলিয়া শপথ করিলেন। অভাগিনী সকিনা দেখিলেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার বিরোধী ; তখন অনন্যোপায় হইয়া সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে কূপে ঝাঁপ দিলেন। ভাগ্যহীনাদের জন্য মৃত্যু এত সহজ নহে। একটি দাসী তাহা দেখিতে পাইয়া কোলাহল করিল, ফলে সকিনা কূপ হইতে উত্তোলিতা হইলেন।

* * * *

আমি বহুকষ্টে ভ্রাতৃত্রয়কে বুঝাইলাম যে, তাঁহারা আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, সকিনার মন ভাল হইলেই আপনি পতি-গৃহে যাইবেন।

অগত্যা আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

উক্ত ঘটনার ৭ বৎসর পরে সকিনা স্বীয় ভ্রাতৃবধূদের সহিত কলিকাতায় আসিলেন। সে সময় আমিও উন্মাদ রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলাম। সেই সময় দুইটি সম-দুঃখিনীতে—অর্থাৎ সকিনাতে ও আমাতে বেশ ভাব হইল। তিনি আমাকে একটি সংবাদপত্রে তারিণী-ভবনের বিবরণ দেখাইলেন। অতঃপর আমরা উভয়ে তারিণী-কর্মালয়ে আসিলাম। আত্মীয়গণ প্রাণপণে বাধা দিলেন, কিন্তু আমরা শুনিলাম না।

সকিনা-কাহিনী বিবৃত হইলে পর সৌদামিনী ঊষার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখন ঊষাদি'র পালা!"

ঊ। আমার ত প্রেম-কাহিনী নহে, তাহাতে বিরহ-বিকারও নাই। সন্ধিও নহে, বিচ্ছেদও নহে।

সৌ। তবুও "কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন-কাননে?"

ঊ। রাফিয়াদি'র পাষণ্ড, হেলেনদি'র উন্মাদ, সকিনাদি'র লম্পট মাতাল, কিন্তু আমারটির এ তিন গুণের এক গুণও নাই—

সৌ। "কোন গুণ নাই তার মুখেতে আগুন।"

স। আহা! অমন কথা বলিও না,—বেচারী এই দীর্ঘ ২০ বৎসরের বিরহেও শাঁখা খুলেন নাই। এখন ভূমিকা ছাড়, উষাদি'। তোমার 'তিনি'র গুণগান কর।

উ। আমার 'তিনি' কাপুরুষ।

সৌ। বাহবা! নহিলে কি—"ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে তারিণী-ভবনে?"

উ। আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। তাহারা 'ভদ্রলোক' ডাকাত ছিল,—পিস্তলহস্তে আক্রমণ করিয়াছিল। আমার কামরায় কেবল আমার স্বামী ও আমি ছিলাম। ডাকাতেরা পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমার পতি-দেবতা জানালা টপ্‌কাইয়া পলায়ন করিলেন!! আমি তখন ছেলে মানুষ, বয়স মাত্র ১৭ বৎসর—সেই ডাকাতদের হাতে আমি একা!! আমি তবু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইলাম,—অঞ্চল হইতে চাবির রিং খুলিয়া তাহাদের দিলাম; অঙ্গে যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল—শাঁখা ব্যতীত সমস্ত উন্মোচন করিয়া দিলাম। প্রথমে তাহারা আমার সহিত মাতৃ-সম্বোধনে কথা বলিতেছিল; একজন বলিল—"মা লক্ষ্মি, আর কোথায় কি আছে, বল দেখি?" অন্য একজন বলিল—"তুমি বেশ লক্ষ্মী মেয়ে।" অতঃপর সম্ভবতঃ আমাকে সম্পূর্ণ একাকিনী পাইয়া তাহারা ইংরাজীতে কি পরামর্শ করিল। তখন আমি ইংরাজী মোটেই জানিতাম না, সুতরাং তাহাদের কথা বুঝিতে পারি নাই।

দস্যুগণ আমার মুখে কাপড় বাঁধিয়া এবং হাত বাঁধিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। গৃহদ্বার অতিক্রম করা পর্যন্ত বাড়ীর কোন লোককে দেখিতে পাইলাম না—অথচ আমার দেবর, ভাশুর প্রভৃতি ছিলেন চারি জন। আমি হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া, একমাত্র বিপদভঞ্জন—অসহায়ের সহায় পরমেশ্বরকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলাম। আহা! তেমন করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে আর কখনও স্মরণ করি নাই।

অন্ধকার রাত্রি, বন্যপথ দিয়া কাঁটা-জঙ্গলে পদতল রুধিরাক্ত করিয়া দস্যুদের সহিত চলিলাম। সেই পথে তিনজন লোক লণ্ঠনহস্তে যাইতেছিল,—তাহারা আমাদের দেখিতে পাইল। দস্যুগণ তখন আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সে লোকেরা দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়া আমার বন্ধনমোচন করিয়া বলিল—"মা! কোন ভয় নাই, আমরা কংগ্রেস কমিটির ভলাণ্টিয়ার। তোমার বাড়ী কোথা বল; চল, তোমায় রাখিয়া আসি।"

সেই লোক তিনটি আমাকে গৃহাভিমুখে লইয়া চলিল; একে ত পদব্রজে চলিবার অভ্যাস নাই, দ্বিতীয়তঃ কন্টকাঘাতে পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল,

সুতরাং বাড়ী পৌঁছিতে ভোর হইয়া গেল। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ডাকাডাকি করিলে আমাদের পুরাতন ঝি কেষ্টার মা আসিল। তাঁহারা আমাকে কেষ্টার মা'র হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রথমে শাশুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাকে দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড়-জা বলিলেন—"সেজ বউ! তুমি কোন্ আক্কেলে আবার এখানে ফিরে এলে?" মেজ-জা বলিলেন—"পীরিত জমেছিল ভালই, চার জনে নিয়ে গেল; তিন জনে দিয়ে গেল!" তখন আমি শ্বশ্রূমাতার ক্রন্দনের কারণ বুঝিলাম। সমস্ত দিন স্বামীর দর্শন পাইলাম না। জায়েরা বিদ্রূপ-টিট্‌কারী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা কহিলেন না। শাশুড়ী কেবল ক্রন্দন-ক্রিয়াই করিতে থাকিলেন। আমি আকাশ পাতাল ভাবিয়া কর্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। আত্মহত্যা ব্যতীত অন্য কোন পথ সম্মুখে দেখিলাম না। অনলে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

হে। যে কাপুরুষ আপন স্ত্রীকে রক্ষা না করিয়া জানালায় লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল, তাহার জন্য কোন দণ্ড তোমাদের সমাজে নাই?

সৌ। না—ইহ-জগতে নাই; আশা করি, পরলোকে নিশ্চয় সুবিচার আছে।

উ। সন্ধ্যার সময় কেষ্টার মা আমাকে বলিল, "বউ-দি! চল আমার সঙ্গে।" আমি বলিলাম—"তোমার সঙ্গে যাইব কেন?" কেষ্টার মা বলিল—"তুমি যে ডাকাতের সঙ্গে গেলা, ওনারা আর তোমাকে ঘরে নেবেন না।" আমি তাহাকে আমার আত্মহত্যার সঙ্কল্প জানাইলে সে বলিল—"আভাগি! নিজে ম'রে পেত্নী হ'বি কেন? ওনাদের মুখে কালী দিয়া পরের বাড়ী রাঁধুনীর কাজ কর।" ঝির কথায় আমারও সাহস হইল; সত্যই ত, নিজে মরিব কেন? যাঁহারা আমার এ লাঞ্ছনার কারণ, তাঁহাদের মুখে কালী দিব। আমি হাতের নিকট আর কিছু না পাইয়া আমার সপ্তমবর্ষীয়া ননদ, ঘুমন্ত মিনির হাতের বালা দুইটি লইয়া ঝির সঙ্গে এক বসনে চলিলাম।

চারি পাঁচ দিন পরে ঝি আমাকে বলিল যে, আমার জন্য রাঁধুনীর কাজ ঠিক করিয়াছে, আগামী পরশু তথায় লইয়া যাইবে। কিন্তু কেষ্টার বউ আমাকে চুপি চুপি বলিল যে, আমাকে তাহার শাশুড়ী কোন পতিতা স্ত্রীলোকের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কিঞ্চিৎ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া

দীননয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম—"বউ। তবে আমার কি হবে?" সে কাঁদিয়া ফেলিল। পরে সে আমাকে বলিল, তাহারা কলিকাতায় যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে।

পরদিন কেষ্টা চাকুরী উপলক্ষে বউ-সহ কলিকাতায় যাইবে, আমি লুকাইয়া তাহাদের সঙ্গী হইলাম। কেষ্টার শাশুড়ী একটা স্কুলে দাসীবৃত্তি করে, আমি তাহার সহিত সেই বালিকা-স্কুলে রাঁধুনীর কাজে গেলাম। পরে জানিলাম, সে "স্কুল" তারিণী-কর্মালয়। আমি ত এক বসনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম; সে কাপড়খানি অত্যন্ত মলিন হইয়াছিল। অন্য কাপড় কিনিবার সুবিধা হয় নাই, কারণ সেই বালা দুইটির বিনিময়ে কেষ্টার বউ আমাকে কলিকাতায় আনিয়াছে, এই যথেষ্ট।

আমি কেষ্টার শাশুড়ীর সহিত মিসিস্ সেনের সম্মুখে আনীতা হইলে, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। আমি ত অবাক্। এত স্নেহ আমার জন্য! আমি অত্যধিক কৃতজ্ঞতায় আনন্দে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম। তিনি তখনই আমাকে স্নানাগারে পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় পক্ষকাল পরে স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম।

* * * *

মিসিস্ সেন আমাকে নিজ ব্যয়ে উচ্চশিক্ষা দান করিলেন। মাত্র তিনটি নম্বরের জন্য আমি বি-এ ফেল হইয়াছি। অতঃপর ট্রেনিং পাশ করিয়াছি, এখন আমি তারিণী-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী।

সি। সমাজের এইসব নালীঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধা থাকিতে হইবে, বিনা কারণে পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘনে পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে,—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

সৌ। আছে! সে প্রতিকার এই তারিণী-ভবনের 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি'। এস, যত পরিত্যক্তা, কাঙ্গালিনী, উপেক্ষিতা, অসহায়া, লাঞ্ছিতা,—সকলে এস। তারপর সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা! আর তারিণী-ভবন আমাদের 'কেল্লা।'

হে। রাফিয়াবু'র অকারণ 'তালাকের' বিরুদ্ধে কোন আইন নাই কি?

রা। থাকিলেও আমি তাহার শরণ লইতে ঘৃণা বোধ করি। যে নিষ্ঠিবনের মত পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার তাহার দিকে ফিরিয়া দেখা কেন?

স। আমিও ত ঐ জন্যই তারিণী-ভবনে আসিয়াছি। আমিও দেখাইতে চাহি যে, দেখ, তোমাদের 'ঘর-করা' ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে। স্বামীর 'ঘর করাই' নারী-জীবনের সার নহে। মানব-জীবন খোদাতালার অতি মূল্যবান দান,—তাহা শুধু "রাঁধা-উননে ফু-পাড়া আর কাঁদার" জন্য অপব্যয় করিবার জিনিস নহে। সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হইবে।

উ। তাহা হইলে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অশান্তির চিতা জ্বলিবে যে।

রা। চাহি না, শান্তি। চাহি না, মৃত্যুর মত নিষ্ক্রিয় ক্লীব শান্তি!! আর এই 'অবরোধ'-প্রথার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে *—এইটাই যত অনিষ্টের মূল। লাথি ঝাঁটা হজম করিয়া 'অবরোধ'-প্রথার সম্মানরক্ষা,—আর নহে।

হে। আমিও একবার আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া দেখিব, ইংলণ্ডের এই জঘন্য আইন পরিবর্তিত হয় কি না।**

রাত্রি অধিক হওয়ায় সকলে শয়ন করিলেন। সিদ্দিকা আগুনের সৌন্দর্য ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

* "অবরোধ প্রথার মস্তক চূর্ণ" কথাটা শুনিয়া পাঠক-পাঠিকা কর্ণে অঙ্গুলী দিবেন না, দোহাই। আমাদের 'শরীয়ত' অনুযায়ী অন্তঃপুর এবং ভারতীয় 'অবরোধ'—ইহা সম্পূর্ণ দুইটি বিভিন্ন বস্তু। ছয় বৎসর পূর্বে "আল-এসলাম' পত্রিকায় কোরআন্ শরীফ ও হাদিসের দলিল-সহ এ সম্বন্ধে একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে যে, "পর্দার" সহিত "অবরোধ' প্রথার কোন সম্পর্ক নাই। 'শরীয়ত' আমাদিগকে "পর্দায়" (বস্ত্রাবৃতা) থাকিতে বলে,—"অবরোধে' বন্দিনী থাকিতে কখনও বলে না। এই কথা লাহোরের জ্ঞানবৃদ্ধ মওলানা সৈয়দ মমতাজ আলী সাহেবও বলেন। যাহা হউক, এস্থলে সে সব বিষয় আলোচ্য নহে।

** ইংরাজী সংবাদপত্রের সেই কাটিং হইতে এই অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথা:—

'Referring to Lord Birkenhead's sympathy she said:—"He could hardly say less, could he? But I refuse to be down-hearted. • • But now I feel if it is required of me I must come forward and help in securing alteration of the law. I'll do anything to secure that." ইংরাজ-ললনার উপযুক্ত উক্তি।

এখন—"গৃহ-কারা বন্দিনী, লাঞ্ছিতা জাগো!
বাংলার ভগিনী, বাংলার মা গো!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

স্বয়ং কবিতা

অপরাহ্নে ঊষা, রাফিয়া, সিদ্দিকা ও সৌদামিনী পীরপাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন। সৌদামিনী ও সিদ্দিকা একখণ্ড পাথরের উপর উপবেশন করিলেন; রাফিয়া ও ঊষা অন্যদিকে গেলেন।

সৌ। আর কতক্ষণ বসিবে?

সি। আজি একটু দেখিতে চাই সূর্যটা অস্তকালে কেমন দেখায়। পাহাড়-ভ্রমণ ত এই শেষ।

সৌ। তবে অনেকক্ষণ বসিতে হইবে। আমার আপত্তি নাই। দেখি, ঊষারা কোন্ দিকে গেলেন।

সি। দিদি, তুমি যদি একটু জল আনিতে পারিতে—আমার বড় তৃষ্ণা—

সৌ। তবে তুমি বস, আমি দেখি, এখানে কাহারও নিকট জল পাই কি না।

সৌদামিনী চলিয়া গেলে সিদ্দিকা নিবিষ্টচিত্তে মুগ্ধনেত্রে প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া মোহিত হইতেছিলেন। আকাশে নানা বর্ণের অলকমালা, পশ্চিমে স্বর্ণ রবি, নীচে এই বিবিধ তরুলতা-শোভিত সৌম্য মহান পীরপাহাড়—এত সব কাব্য দেখিয়া সৃষ্টিকর্তার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া কি থাকা যায়?

অদ্য সিদ্দিকা বড়ই ম্রিয়মানা; কত কি ভাবিতেছেন, সে দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। কি যেন ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন· চক্ষে দুই চারি বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিতেছেন, পিপাসাও ক্রমে প্রবল হইতেছে। সৌদামিনী কখন ফিরিবেন, সেই আশায় পথ দেখিতেছেন।

কাহার মৃদু পদশব্দ শ্রুত হইল,—বুঝি সৌদামিনী আসিতেছেন। সিদ্দিকা অভিমানে মাথা তুলিয়া না দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি এখন আসিলে। আমি ত ভাবিয়াছিলাম, তুমি আর আসিবে না। তোমার জন্য পথ দেখিতে দেখিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—" বলিতে বলিতে সহসা মুখ তুলিয়া দেখেন, সে ত সৌদামিনী নহেন—সে যে লতীফ।

লতীফ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।—একি! সিদ্দিকা, যাঁহাকে তিনি পাষাণ-প্রতিমা বলিয়া জানেন—সেই পাষাণ-প্রতিমা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন?—

কেন ? অত আশা করা যাইতে পারে না। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সিদ্দিকা। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলে ? ইহা কি সত্য না আমার শুনিবার ভুল ?"

সিদ্দিকা নিস্তব্ধ হইলেন। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন যে, না দেখিয়া কেন কথা কহিলেন। এখন যদি পর্বত বিদীর্ণ হইত তবে বেশ হইত—সিদ্দিকা তন্মধ্যে লুকাইতেন। কিন্তু পর্বত দুর্ভেদ্য পাষাণ। ভাল হইত, যদি লতীফ উত্তর না পাইয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহাও ত হইল না—লতীফ সম্মুখস্থিত শিলাখণ্ডে বসিলেন।

সিদ্দিকা। (মৃদুস্বরে) আমি আপনাকে বলি নাই।

লতীফ। তবে কাহাকে বলিলে ? এখানে ত আমি ছাড়া আর কেহ নাই।

সি। আমি সৌদামিনীদি'র জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি আপনাকে তিনি ভ্রমে ও-কথাগুলি বলিয়াছি—ক্ষমা করিবেন। সে যাহা হউক, আপনি এভাবে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন কেন ? আর এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে আমাকে "তুমি" বলিতেছেন কেন ?

ল। তোমাদের তারিণী-ভবনে ত সকলেই পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন এবং "তুমি" সম্বোধনে কথা কহেন। তুমি কি সে নিয়মের বাহিরে ?

সি। আমি সে নিয়মের বাহিরে নহি সত্য, কিন্তু আপনি ত তারিণী-ভবনের কোন 'ভগিনী' নহেন।

ল। 'ভগিনী'গণ আমাকে 'পথে কুড়ান ভাই' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

সি। আমি কখনও আপনাকে 'পথে কুড়ান ভাই' বলি নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ল। তুমি প্রতিবাদ না করিয়া প্রতিশোধ লও—অর্থাৎ তুমিও আমাকে 'লতীফ' এবং 'তুমি' বল।

অনেকক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন, কেহ কিছু বলিলেন না—যদিও বলিবার অনেক কথা ছিল। অতঃপর লতীফ মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"অমন করিয়া পশ্চিম আকাশে কি দেখিতেছ ?"

সি। অস্তমান্ রবি।

ল। (ঈষৎ হাস্যে) সূর্যের ত প্রতিদিন উদয় ও অস্ত হয়, তাহাতে আর নূতনত্ব কি ?

সি। নূতনত্ব নাই বটে, কিন্তু দেখুন, আজিকার এ দৃশ্য বড় মনোহর। সূর্য যাইতেছে—যেন বড় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া গৃহে গমন করিতেছে। আর বিষাদিনী ধরণী ম্লানমুখে তাহার দিকে করুণ-নয়নে চাহিয়া আছে—যেন বলিতেছে, 'আমায় আঁধারে ফেলিয়া কোথায় যাও? একবার এদিকে দেখ!' অন্য দিকে নবোদিত চন্দ্রমা ঈষৎ হাসিয়া মেদিনীকে সান্ত্বনার স্বরে বলিতেছে,—'চিন্তা কি? আমি আছি। আমি শীতল বিমল চন্দ্রিকা দিব।'

ল। তুমি যে এমন সুন্দর কবি, তাহা জানিতাম না। আমি জানিতাম, তুমি নিজে কবিতা। তোমার নিজের সম্বন্ধে এমনই একটা কবিতাপূর্ণ গল্প বল না।

সি। আপনার জীবনের কোন গল্প বলুন, আমি তাহাই শুনিব।

ল। আমার জীবনের এক গল্পে ত তোমরাই নায়িকা। উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা নাই। তুমি স্বয়ং কবিতা—তোমার গল্প মনোরম হইবে।

সি। আপনি ব্যারিস্টারী উপলক্ষে কত জায়গায় বেড়ান, তাই একটা কিছু বলুন না। (সৌদামিনী আসিলেন, দেখিয়া) দিদি! তুমি বড় শীঘ্র আসিলে,—আমি ত এখনও মরি নাই!

সৌ। বালাই! মরিবে কেন? জল আনিতে বিলম্ব হইয়াছে সত্য। তা তুমি ত একা ছিলে না যে, দেরীটা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল!

ল। একাই ত ছিলেন, আমি সবেমাত্র আসিয়াছি।

এই সময় তথায় রাফিয়া এবং ঊষা আসিলেন।

ল। (রাফিয়াকে নমস্কার করিয়া) বেগম সাহেবাকে সেদিন প্রথম-দর্শনে চিনিতে পারি নাই; পরে মা ও রফীকার মুখে সব শুনিয়াছি।

রা। তাহাতে কি হইল?

ল। কিছু না; আপনার সঙ্গে আলাপ হইল।

রা। আপনার সঙ্গে আলাপের জন্য কেহ লালায়িত ছিল কি?

ল। ইয়া আল্লাহ্! আমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য কেহ লালায়িত হইবে কেন? আমি শাপগ্রস্ত হতভাগা!

রা। অত বৈরাগ্য দেখাইবেন না,—গৃহ শূন্য হওয়া বরং সুখের বিষয়, কারণ অন্য একটি নবীনা গৃহিণী আসিবেন!

ল। (সিদ্দিকার প্রতি) তবে শুন, একটি গল্প মনে পড়িল। একবার একটা মোকদ্দমায় বালিকা আসামী ছিল।

সৌদামিনী নীচে নামিয়া তাঁহাদের গাড়ীর সংবাদ আনিতে গিয়াছেন দেখিয়া সিদ্দিকা বলিলেন, "এখন আমরা তাঁবুতে ফিরিয়া যাইতেছি, আর একদিন শুনিব।

রা। গল্পটা অবশ্যই মনোহর হইবে ; আজই শুনা যাউক।

ইতিমধ্যে বালক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ীওয়ালা আর অপেক্ষা করিতে চাহে না।

সি। (লতীফের প্রতি) আপনার গল্প আর একদিন শুনিব।

সৌদামিনী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন,—"এস পদ্মরাগ!"

ল। 'পদ্মরাগ!'—কে?

সৌ। আমরা সিদ্দিকাকে 'পদ্মরাগ' বলিয়া ডাকি।

ল। (সিদ্দিকার সলজ্জ রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া) সৌন্দর্য হিসাবে নামটি ঠিক হইয়াছে ; কিন্তু প্রস্তরবৎ কাঠিন্যে 'পদ্মরাগ' না হইলেই রক্ষা।

সৌ। শুনিয়াছি 'আল্‌মাস্‌' শব্দের অর্থ হীরক। তবে হীরাও কি পাথর নহে?

উ। হাঁ দিদি! পাথরে পাথরেই টক্কর!

তাঁহারা চলিয়া গেলে লতীফ সিদ্দিকার সেই দূরগামী মূর্তি অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন ; এবং সিদ্দিকা যে বলিয়াছেন, "আমি কখনও আপনাকে 'পথে কুড়ান ভাই' বলি নাই" সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন। সত্যই ত সিদ্দিকা অন্যান্য 'ভগিনী'দের ন্যায় কখনও তাঁহাকে ভ্রাতৃ-সম্বোধন করেন নাই! কেন? আরও মনে পড়িল, সেদিন তাঁহার পত্নীবিয়োগ সংবাদে সিদ্দিকার মুখের ভাবান্তর হইয়াছিল। লতীফ ঐ গল্প উপলক্ষে সিদ্দিকাকে আরও কিছুক্ষণ আটক রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন :—

"পূজা উপাসনা সকলি যে ফাঁকি,
এই উপলক্ষে, দেবি! তোমারে দেখি!"

আর সিদ্দিকা ভাবিলেন, ঐ গল্প উপলক্ষে আর একদিন লতীফের সহিত কথা কহিবার সুযোগ হইবে। আজি গল্পটা শুনিয়া ফেলিলে ভবিষ্যতের জন্য আর আশা থাকিবে না!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বীরবালা

অদ্য লতীফ বিশেষ করিয়া রাফিয়া, সকিনা ও সৌদামিনীকে ডাকিতে আসিয়াছেন। লতীফের মাতা তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। কার্যবশতঃ তাঁহাদের যাইতে বিলম্ব হইল; বিশেষতঃ রাফিয়ার টাইপিং কিছুতেই যেন শেষ হইতেছিল না, তাই লতীফ প্রায় দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করিলেন। ভগিনীগণ সকলেই স্ব স্ব কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। কেবল ঊষা একবার আসিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন:—

"আমরা এখন বড় ব্যস্ত আছি। তুমি কাল আবার আসিও, ভাই! আমরা এখানে আর বেশী দিন থাকিব না। আগামী শুক্রবারে কলিকাতায় যাইব।"

পথে যাইতে যাইতে লতীফ বলিলেন—"বেগম সাহেবা ত চমৎকার টাইপ করিতে শিখিয়াছেন।"

রা। আপনাদেরই জুতার প্রসাদে।

ল। ওহো! কেবল টাইপিং নহে, অস্ত্র-চিকিৎসায়, অর্থাৎ মিছরীর ছুরিকা প্রয়োগেও আপনি সিদ্ধহস্তা!

স। তাহাও ত আপনাদেরই কল্যাণে!

ল। তা বেশ, আমাদের কৃপায় সকিনা খানম 'সিভিল সার্জন', রাফিয়া বেগম 'টাইপিস্ট', আর (সিদ্দিকাকে কিছু দূরে দেখিয়া) সিদ্দিকা খাতুন কি হইয়াছেন?

রা। কবি।

সৌ। সিদ্দিকা অতি চমৎকার কবিতা লিখেন; ইংরাজী কবিতা লিখিয়া—ইংরাজ মহিলাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিন বার পুরস্কার পাইয়াছেন। তুমি তাঁহার লেখা কখনও দেখ নাই?

ল। না, আমার সে সৌভাগ্য হয় নাই।

এদিকে সিদ্দিকা ভাবিলেন, আর বুঝি লতীফের সহিত দেখা হইবে না। আগামী পরশ্বঃই ত তাঁহারা যাইবেন। আজ তিনি লতীফের সহিত একটি কথাও কহেন নাই। কিছু ত বলা উচিত ছিল। লতীফও তাঁহাকে কিছু বলেন নাই যে, সেই কথার উত্তর-ছলে তিনি কোন কথা বলিতেন। লতীফ হয়ত এই জন্য বিরক্ত আছেন যে, তাঁহার 'তুমি' বলার অনুরোধ রক্ষা করা হয় নাই।

কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন, সিদ্দিকা তাহাই ভাবিতেছিলেন।—এদিকে লতীফ সৌদামিনী প্রমুখ সহ চলিয়া গেলেন। তখন অগত্যা পশ্চাৎ হইতে ডাকিবেন মনে করিয়া তিনিও অনুগমন করিলেন।

লতীফ বুঝিয়াছিলেন, সিদ্দিকা কিছু বলিতে চাহেন,—তাই আরও একটু বেশী ঔদাস্যভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন সিদ্দিকা অনুসরণ করিয়া এতদূর আসিলেন দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

সি। সেদিন যে গল্প বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যে আর শুনাইলেন না?

ল। তুমি কি সত্যই শুনিতে চাও?

সি। হাঁ, নিশ্চয় শুনিব।

ল। আগামীকল্য বলিব।

সৌ। না, আজই সন্ধ্যায়। আমাদের বিশেষ কোন কাজ নাই, তোমার কষ্ট না হইলে আসিও।

* * * *

সন্ধ্যার সময় লতীফ গল্প আরম্ভ করিলেন। শ্রোত্রী মাত্র চারিজন,—সিদ্দিকা, ঊষা, রাফিয়া ও সৌদামিনী।

ল। প্রায় আড়াই বৎসর হইল, আমি একবার চুয়াডাঙ্গায় গিয়াছিলাম। সেখানে তখন রবিন্‌সন্ সাহেব নীলের চাষ করিতেন।—

রবিন্‌সন সাহেবের নাম শুনিয়া সিদ্দিকা শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সে ভাব গোপন করিলেন। তাঁহার ভাব-পরিবর্তন লতীফ লক্ষ্য করিলেন বটে, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ববৎ বলিয়া যাইতে লাগিলেন:—

রবিন্‌সন্ জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদারের সহিত বিবাদ করেন। ঐ বিবাদ ক্রমে বর্দ্ধিত হইল। সেই সময় মহম্মদ সোলেমান সাহেব (সেই জমীদার) হঠাৎ খুন হইলেন। তাঁহার বিধবা, একটি শিশুপুত্র ও জনৈকা কুমারী ভগ্নী ছাড়া আর কেহ ছিল না। তাঁহার ১৯ বৎসর বয়স্ক পুত্রটিও সেই রাত্রে নিহত হয়।

সৌ। ইস্! একেবারে জোড়া খুন!!

ল। তাহাই ত হইয়াছিল। প্রতিবেশিগণ বলে, সে রাত্রে তাহাদের বাড়ী ডাকাতি হয়; সেই দস্যুরা তাহাদের হত্যা করিয়াছিল। আর তাঁহার অসহায়া

বিধবা ও ভগিনী বলেন যে, সে ডাকাত আর কেহ নহে—স্বয়ং রবিন্‌সন্ সাহেব ও তাঁহার দলবল। কারণ কোন জিনিস চুরি হয় নাই—ভাঙ্গিয়া নষ্ট করা হইয়াছিল মাত্র ; তবে এ ডাকাত আর কে ?

রবিন্‌সন্ কয়েকবার সোলেমান সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাই রবিন্‌সন্‌কে তাঁহাদের চাকরেরা চিনিত।

রবিন্‌সন্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, মিসিস্ সোলেমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার মোকদ্দমা আনিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত জমিদার, তাঁহার সম্পত্তিতে ভগিনী অংশভাগিনী হইবেন বলিয়া, নামমাত্র বিবাহ দিয়া ভগিনীকে চিরকাল অবিবাহিতা রাখিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বামীর সহিত মিলন হইতে দেন নাই, এই কারণে ভ্রাতা ভগ্নীতে সর্বদা মনান্তর ছিল। সেই জন্য ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়কে হত্যা করিয়া তাঁহার ভগ্নী নিজের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

রবিন্‌সন্ প্রাণপণে সেই অসহায়া বালিকাকে আসামী সাজাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'সাহেব'লোক—কি না করিতে পারেন ? রবিন্‌সনের সহিত পূর্ব হইতে আমার আলাপ ছিল, তিনি আমাকে বেশ শ্রদ্ধা-সমাদরও করিতেন। তিনি আমাকে সময়ে সাহায্য করিতে ডাকিলেন। আমি তখন রবিন্‌সনের ব্যারিস্টার হইয়া সেখানে গেলাম ; আমার দৈনিক ফি ২০০৲ শত টাকা।

সৌদামিনী প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—মেয়েটির বয়স কত ছিল ?

ল। রবিন্‌সন্ আমাকে বলিয়াছিলেন, ২৮ বৎসর ; আর স্থানীয় লোকেরা বলিয়াছিল, ১৮।১৯ বৎসর।

সৌ। 'সোনায় সোহাগা' বলিতে হয় ; নিজে হত্যা করিয়া দোষ চাপাইলেন —ভ্রাতৃহারা ভগ্নীর উপর। (সিদ্দিকার প্রতি) কি বল পদ্মরাগ, তোমার কি বিশ্বাস হয় যে, ভগ্নী ভ্রাতৃবধ করিবেন ?

সি। শুনাই যাউক না, কি হইল। বিশ্বাস না হইলেও 'সাহেবলোক' ত অপরাধী হইতে পারেন না !

উ। কিন্তু ভগ্নীর বিরুদ্ধে প্রমাণ কি ছিল ?

ল। রবিন্‌সন্ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সোলেমান সাহেবের পুত্র যে ছোরায় নিহত হন, সে ছোরাখানি শ্রীমতি জয়নবের সম্পত্তি। জয়নবদের চাকরদিগকে উৎকোচ দ্বারা রবিন্‌সন্ বশীভূত করিয়াছিলেন। পুলিশও তাঁহার করায়ত্ত ছিল। পুলিশকে ত খুনী আসামী ধরিতেই হই:ব ; তাহারা সহজে একটি

অসহায়া বালিকাকে 'আসামী' বানাইতে পারিলে অনর্থক অন্য আসামী ধরিবার কষ্ট স্বীকার করিবে কেন ?

এই সময় সকিনা তথায় আসিলেন দেখিয়া লতীফ তাঁহার দিকে চাহিয়া সকৌতুকে বলিলেন,—"আপনার মনে আছে ত, 'বেলা যা'রে সোন্দর কইব, সেই হইব 'সোন্দর'? এ ক্ষেত্রেও 'পুলিশ যা'রে আসামী কইব, সেই হইব আসামী' !!!"

স। হাঁ, আরও মনে আছে, 'পুলিশ যা'রে আসামী সাজাইল, সেই ব্যক্তি খুনের দায় হইতে বে-কসুর মুক্তি পাইলেও, পুলিশ পাইল পুরস্কার দশ হাজার ট্যাকা'।

ল। রবিন্‌সন্ আরও দেখিলেন, জয়নব থাকিতে তিনি তাঁহাদের জমিতে সহজে নীলের চাষ করিতে পারিবেন না। কারণ, জয়নব অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সোলেমান সাহেব ভগ্নীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং জয়নবকে ঠকান সহজ নহে। অতএব তিনি যাহাতে কোন মতে দেশান্তরিতা হন, রবিন্‌সন্ তাহাই করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আমি রবিন্‌সনের ব্যারিস্টার-রূপে তাঁহার সমুদয় অভিসন্ধি ও সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া ছদ্মবেশে জয়নবদের বাড়ী গেলাম। বহু কষ্টে তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে উপদেশ দিলাম। শুধু উপদেশ নহে,—গোপনে গোপনে তাঁহাদের পলায়নের উপায়—অর্থাৎ নৌকা ও পাল্কী ঠিক করিয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, রবিন্‌সন্ থানায় যথাবিধি সংবাদ দিবার পূর্বেই ইঁহারা সরিয়া পড়ুন ; পরে ওয়ারেন্ট বাহির হইলে দেখিয়া লইব। রবিন্‌সন্ যাহাতে আমার উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন, আমি সেজন্যও সচেষ্ট রহিলাম।

উ। তোমার মক্কেলের সহিত তুমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা কেন করিলে ?

ল। তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।

রা। তাহা লতীফ সাহেবের 'গুপ্তকথা'।

স। অথবা 'প্রাণের দারুণ ব্যথা' (তিনি ও রাফিয়া অপরের অলক্ষ্যে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন)।

দ্বিতীয় দিন আবার যখন মিসিস্ সোলেমানকে জানাইতে গেলাম যে, সমস্ত প্রস্তুত, অদ্য গভীর রজনীতে তাঁহাদের যাইতে হইবে, তখন তিনি বলিলেন যে,

জয়নব আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তিনি পলায়ন করিবেন না। আমি বলিলাম—"কোন ধর্মই আত্মহত্যা অনুমোদন করে না। বিশেষতঃ মুসলমান কখনই আত্মহত্যা করিতে পারে না। অতএব তাঁহাকে এ পাপচিন্তা হইতে নিবৃত্ত করুন; এবং আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন, আমি রাত্রি বারটার সময় পাল্কীসহ আসিব। মাত্র দুই জন দাসী সঙ্গে লইবেন।"

যথাসময়ে সকলকে লইয়া ঘাটে পেঁৗছিলে জানিতে পারিলাম, জয়নব বিবি আইসেন নাই। আমার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইল, কিন্তু তখন কিছু ভাবিবার সময় নহে। মিসিস্ সোলেমানকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া সেই পাল্কীসহ আবার জয়নবের সন্ধানে ছুটিলাম। তখন বর্ষাকাল, ভাদ্রমাসের শেষ, পথে জল-কাদার অন্ত নাই; শারদীয় শুক্লপক্ষ হইলেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন,—অমাবস্যা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকার। আমি কোন বাহন সংগ্রহ করিতে পারি নাই; সুতরাং আমাকে পদব্রজেই মিসিস্ সোলেমানের পাল্কীর অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। আপনারা আমার সেই কর্দমাক্ত মূর্তি অনুমান করিয়া দেখুন!

বাড়ী গিয়া দেখি, দালানের সমস্ত দ্বার-জানালা ভিতর হইতে বন্ধ, বাহির হইতে কোথাও কিছু দেখা যায় না। জয়নব বিবি কামরার ভিতর কি করিতেছেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। আমি হাত-পা-বাঁধা লোকের মত ছটফট করিতে লাগিলাম—আমার সকল চেষ্টা পরিশ্রম ব্যর্থ হইল!—অবশেষে রবিন্‌সনের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হইল, অর্থাৎ জয়নব অপসারিতা হইলেন!!

জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাঙ্গণে গেলাম! সেই মুহূর্তে শশীও মেঘমুক্ত হইল; সেই ক্ষণিক চন্দ্রালোকে দেখি, একটি দ্বার খুলিয়া অনেকগুলি কাপড় লইয়া একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল। আমি তাহার অনুগমন করিতে মনস্থ করিলাম; কিন্তু আকাশ আবার মেঘাবৃত হওয়ায় আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সে বাড়ীর পথ-ঘাট আমার পরিচিত ছিল না বলিয়া ঘোর অন্ধকারে আমি তাহার অনুসরণ করিতে না পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হইতে পারে, জয়নবের কর্তব্য কঠোর—উদ্দেশ্য মহান্। আর আমি কেবল ভূতের বোঝা বহন করিলাম।

সহসা আলোক দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। একটা খড়ের ঘরের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল। আমার ত মাথা ঘুরিয়া গেল। অতি কষ্টে বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম; যাহা দেখিলাম, তাহা মনে হইলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দেখি কি, সেই কাপড়গুলি চতুর্দিকে দাউ দাউ

করিয়া জ্বলিতেছে, আর বীরবালা জয়নব সেই অনলের মাঝখানে অটলভাবে দাঁড়াইয়া !!

সৌ। উঃ! ছুঁড়ীর কি সাহস! যদি আত্মহত্যাই উদ্দেশ্য ছিল, তবে বিষ খাইতে পারিত, গলায় দড়ী দিলেও হইত। কিন্তু পুড়িয়া মরা!—কি ভয়ানক মৃত্যু!

সিদ্দিকা কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ধীর শান্তভাবে বলিলেন,—"কেন দিদি, পুড়িয়া মরণটা তোমার পসন্দ হইল না?"

সৌ। না, অত নিষ্ঠুর মৃত্যু উচিত নহে। জলে ডুবিলে হইত।

ল। আমি এখন বলি যে আমার বিবেচনায়, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই করা উচিত ছিল।

সৌ। কেন উচিত ছিল, কারণ বল।

ল। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন, অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করিলে দেহ নষ্ট হইত না। পুলিশ ও ডাক্তার তাঁহার শবদেহ পরীক্ষা করিবে—এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য ছিল।

সৌ। ঠিক—ঠিক বলিয়াছ! আমার মাথায় অত কথা আইসে নাই!

ল। আমি কিরূপে তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির করিলাম, বলিতে পারি না। যখন সংজ্ঞা লাভ করিলাম, তখন দেখি, তিনি ও আমি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া—তাঁহার হাতখানি আমি ধরিয়া আছি। জয়নব তীব্রস্বরে বলিলেন—"হাত ছাড়ুন—যাইতে দিন!" যেন আমি তাঁহার নিতান্তই আজ্ঞাবহ দাস।

আমি ব্যস্তভাবে বলিলাম,—"আমি আপনাকে ছাড়িতে পারি না, আপনি আমার—" কথাটা শেষ না হইতেই আবার হুকুম হইল—"ছাড়ুন!"

আমি পুনরায় বলিলাম, "ছাড়িব কি,—চলুন; আপনার জন্য পাল্কী আনিয়াছি—আপনার ভাবীজান আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন—আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।" কিন্তু তিনি আর এক হেঁচ্কা টানে হাত ছাড়াইয়া দৌড়িলেন, আমিও পিছু পিছু ছুটিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিলাম। পোড়া অঞ্চল (অঞ্চল দগ্ধ হইয়াছিল) আমার হাতে ছিঁড়িয়া আসিল। তিনি দালানের ভিতর গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

আমি কতক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনন্তর অন্যান্য লোক আলোক দেখিয়া ঘরের আগুন নিবাইতে আসিল। যৎকালে তাহারা আগুন নিবাইতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময়টা জয়নবের অনুকূলে ছিল। তিনি কি করিতেছিলেন, জানিতে পারিলাম না।

বাহিরে আসিয়া দেখি, আমার আনীত সে পাল্কীখানা অন্তর্হিত হইয়াছে। বেহারাদেরও দেখিতে পাইলাম না। আমি আর সে পাল্কীর সন্ধান না করিয়া আপন বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া স্নান করিলাম। তখন রাত্রি অনুমান ৪টা। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম—ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন আমি আপন মনে বনে-জঙ্গলে খুঁজিয়া নিবিড় বনে একটি কূপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। বোধ হয়, ঐ কূপে ডুবিয়া জয়নব বিবি জীবনের জ্বালা জুড়াইয়াছেন।

আমার ব্যারিস্টারীর এইটি উল্লেখযোগ্য করুণ কাহিনী।

উ। (দুঃখিতভাবে) আজি পর্যন্তও জান না, জয়নব বিবি মরিয়াছেন কি না?

ল। না। কিন্তু এখনও আমার মনে হয়, জয়নব সেই পাল্কীতে কোথাও গিয়াছিলেন—হয়ত তিনি বাঁচিয়া আছেন।

রা। কবি বলেন, 'প্রণয়ীর হৃদয় দর্পণস্বরূপ—প্রণয়িনীর অবস্থা জানিতে পারে।'

ল। বেগম সাহেবা যদি মিছ্‌রীর ছুরী সম্বরণ না করেন তবে আর আমার গল্প বলা হইবে না।

সৌ। না ভাই, তুমি বল। রাফিয়া-বু, তুমি মন দিয়া শুন। (লতীফের প্রতি) আর তাঁহার ভ্রাতৃবধূ?

ল। তিনি এখন শান্তিতে আছেন। জয়নবকে দূর করাই রবিন্‌সনের উদ্দেশ্য ছিল। জয়নব হইতে অভিনয় শেষ হইয়াছে। এ প্রকার আত্মত্যাগ তোমাদের সেবাব্রত অপেক্ষা কম প্রশংসনীয় নহে। খানম্‌ সাহেবা সিভিল-সার্জনরূপে মানুষকে কাটিয়া কুটিয়া শান্তিদান—অর্থাৎ আরোগ্যদান করেন—আর জয়নব আপনাকে ধ্বংস করিয়া চুয়াডাঙ্গাকে শান্তিদান করিয়াছেন।

স। ঐ দেখুন, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সিভিল-সার্জন যাহাকে কাটিয়া ক্ষত-বিক্ষত করেন, তাহার ক্ষত অঙ্গে আমি প্রলেপ দিয়া পটি বাঁধি—কাটাকাটি আমার কাজ নহে।

উ। রমণী শৈশব হইতেই আত্মত্যাগ শিক্ষা করে। কুমারী-জীবনে পিতা ও ভ্রাতার জন্য স্বার্থত্যাগ করে, বিবাহিত জীবনে স্বামীর জন্য এবং শেষে সন্তানের জন্য আত্মত্যাগ করে। কাহারও আত্মত্যাগ কেবল গৃহজীবনে সীমাবদ্ধ থাকে—কাহারও আত্মত্যাগ সংসারময় ব্যাপ্ত হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

'জুবিলী' ও পুরস্কার বিতরণ

তারিণী-ভবনে ভারী ধূম পড়িয়াছে। এ বৎসর চারি পাঁচটি বিষয়ের অনুষ্ঠান এক সঙ্গে হইবে। প্রথম দিন বিদ্যালয়ের বিংশবর্ষীয় জুবিলী, দ্বিতীয় দিন 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী সমিতি'র অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন, তৃতীয় দিন কর্মালয়ের মুসলমান ভগিনীগণ 'মিলাদ শরীফ' পাঠ ও শ্রবণ করিবেন, চতুর্থ দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পুরস্কার-বিতরণ, পঞ্চম দিন বিদ্যালয়-পরিত্যক্তা পুরাতন 'বালিকা'দের 'চিরহরিৎ সম্মিলনী'র অধিবেশন হইবে, এবং দুই দিন বিশ্রামের পর তারিণী-ভবনে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী হইবে। এ প্রদর্শনী এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রদর্শিত হইবে। ইহাতে বিদ্যালয়ের সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কর্মালয়ের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের স্বহস্ত-নির্মিত দ্রব্যসমূহ থাকিবে।

'চিরহরিৎ সম্মিলনী' কেবল তারিণী-বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রীদের সমিতি; তাহাতে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রী ব্যতীত অপর কাহারও সম্বন্ধ নাই। তারিণী উহার নাম এইজন্য 'চিরহরিৎ' রাখিয়াছেন যে, কালে উহাতে মাতা-পুত্রী উভয় শ্রেণীর মহিলাগণ সমভাবে যোগদান করিবেন। সম্মিলনীর দিন 'মাতা-কন্যা' সম্বন্ধ ভুলিয়া, উভয়ে যে এই বিদ্যালয়ের 'ছাত্রী' এই সম্বন্ধ স্মরণ রাখিতে হইবে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ঝি-চাকর পর্যন্ত সকলের মুখেই একটা উৎসব আনন্দের প্রফুল্লতা। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্তব্যসাধনে তৎপর; প্রত্যেকেরই ইচ্ছা—তাহার ভাগের কাজ আগে সমাধা হউক। যেন 'বিয়ে-বাড়ীর কোলাহল'।

লতীফ পুরস্কারের খেলনা ইত্যাদি ক্রয় করিবার ও ঘর সাজাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পুরস্কার বিতরণ-কারিণী মহিলাও তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে। সেজন্য তিনি দেশের রাণী মহারাণী প্রভৃতির সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিতেছেন।

একবার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখা যাউক, কে কি করিতেছেন:—মিস্ চারুবালা দত্ত একটা আলমারী খুলিয়া পরিচারিকাদের দ্বারা তাহার অভ্যন্তরস্থ জিনিস বাহির করাইতেছে ব্যস্ত আছেন।

ঝি। ক্যাতাবগুনো কোথায় রাখবো মা? একটু দেখিয়ে দাও।

চারু। এস আমার সঙ্গে।

জনৈকা শিক্ষয়িত্রী।—কই, মিস্ দত্ত কোথা? ঐ যে। মিস্ দত্ত, দেখুন ত এই মেয়ে দুইটিকে 'বনদেবী' সাজাইলে কেমন হয়?

চারু। বেশ হইবে। আর তিনটি মেয়ে সংগ্রহ করুন।

অপর একজন শিক্ষয়িত্রী।—শুনুন মিস্ দত্ত, এ মেয়েরা বলে কি! এরা 'প্রাইজে'র দিন আসিবে না; কে নাকি ইহাদের বলিয়াছে যে ইহারা 'প্রাইজ' পাইবে না!

চারু। সে কি! 'প্রাইজে'র দিন আসিবে বই কি!

মেয়েরা। না, আমাদের মা বারণ করিয়াছেন।

চারু। বেশ, আসিও না।

শিক্ষয়িত্রী। 'আসিও না' বলিলে চলিবে কেন, মিস্ দত্ত? ওরা যে 'চি:হ্ন'র মেয়ে!

চারু। আপনি অন্য মেয়ে ধরুন।

ঊষা। অমিয়া! তোমার বোর্ডার ছাত্রীদের লিখিত সে পদ্য আমাকে কখন দেখিতে দিবে?

অমিয়া। আজ্ঞে, কাল পাইবেন।

ঊষা। বেহারা, জা'ফরী খানম্‌কো সালাম দোও। (জা'ফরী খানম্ আসিলে, তাঁহার প্রতি) কেয়া খানম্ সাহেবা, আপ্‌কি মুসলমান লাড়কীয়োঁকা 'নজম্'* কাহাঁ তক্ হুয়া?

জা। কেয়া বাতাওঁ! কল্‌কাত্তেকি লাড়কিয়াঁ কেয়া উর্দু বোল্‌নে সক্‌তী হ্যায়ঁ? হর্ লফ্‌জ্** মেঁ বাংলা লহ্‌জা।*** ময়ঁ তো থক্ গেয়ী।

বিভা। ও ভাই মিস্ দত্ত! মুসলমান মেয়েদের বাঙ্গালা পদ্য বলা শুন আসিয়া! যেন কি বিপদে পড়িয়াছে!

চারু। আসি; এই আলমারীটা বন্ধ করি আগে।

ঊষা। চারু-দি'! তোমার কামরাটা কবে খালি করিয়া দিবে?

চারু। আর দুই দিন পরে।

ঊ। তুমি আজ চারি দিন হইতে আমাকে বলিতেছ—'দুই দিন পরে।'

* 'নজম'—কবিতা।

** 'লফজ্'—শব্দ।

*** 'লহ্‌জা—উচ্চারণভঙ্গী।

চা। কি করি দিদি! একদণ্ড নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া জিনিস পত্তরগুলা গুছাইতে পারি না—সমস্ত দিন—'মিস দত্ত দেখুন', আর 'মিস দত্ত শুনুন'।—আমি দশভুজা দুর্গা হইলে বেশ হইত!

উ। আমি কিন্তু দশমুণ্ড রাবণ হইতে চাই—তাহা হইলে এক একটা মাথাকে এক একটা বিষয় চিন্তা করিবার ভার দিতাম!

তারিণীর 'আফিস'-কামরাও টাইপ-রাইটারের শব্দে মুখরিত। তারিণী নিরুপমা নাম্নী শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন,—"নিরু! তোমার জুবিলী-ইতিহাস লেখা কি শেষ হইল?"

নিরু। আজ্ঞে হয়েছে। একবার ভাল ক'রে প'ড়ে দেখে দিই।

তা। বড্ড দেরী করিয়া ফেলিলে, আজই ছাপাখানায় পাঠাইতে হইবে। ও রাফিয়া-বু! তোমার টাইপিং কত দূর?

রা। এখনও বহুদূরে।

(রাজমিস্ত্রী দ্বারদেশ হইতে)

"মাইজী! চূণা খট্ট গিয়া।"

তা। আর কয় কামরা বাকী?

রাজমিস্ত্রী। আউর পাঁচ কামরা বাকী। চূণেকা রুপেয়া দিজিয়ে।

তা। সরকার বাবুসে মাঙ্গো।

(সরদার কোচম্যান দ্বারদেশ হইতে)

"হুজুর! সাত নম্বর গাড়ীকা চাক্কা বদ্‌লী হোগা।"

তা। বদ্‌লো যা'কে!

কোচ। পিত্তল পালিশ্ কা দাম দিজিয়ে।

তা। সরকার বাবুসে মাঙ্গো।

(উড়ে মালী দ্বারদেশ হইতে দন্তবিকাশ করিয়া)

"মাইজী, ম'তে আগে রঙের টঙ্কা দিউ না।"

তা। সরকার বাবুকে বল টঙ্কা দিতে।

মালী। সরকার বাবু টঙ্কা দিউছি না—মুই কিমতি ফুলের টব রঙ্গিবুঁ? এত্তেগুলা টব!

তা। আহ্ জ্বালালে! ডাক ত সরকার বাবুকে!

মালী। (সরকার বাবুকে আসিতে দেখিয়া) সরকারবাবু আসুছন্তি!

তা। সরকারবাবু! আজ এদের সবাইকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন কেন?

সরকার। না মা! ওরা বড় দুষ্টু! আমি বল্লেম, সবুর কর, মা'র কাছ থেকে টাকা এনে দি। তা ওরা শুনলে না, উপরে চলে এল। পূর্বে যে টাকা দিয়েছেন, এই তার হিসাব নিন্। আমাকে এখন আর কিছু টাকা দিন।

তা। পদ্মরাগ, তুমি এ হিসাবের খাতাটা এখন রাখ, অন্য সময় দেখা যাইবে! আর সরকার বাবুকে ১০০৲ টাকা আনিয়া দাও।

বেহারা কোন আগন্তুক ভদ্রলোকের কার্ড আনিয়া দিল।

তা। (কার্ড পড়িয়া) মিঃ আল্‌মাস্—আচ্ছা সাহেবকো সালাম দোও!

লতীফ অনেকগুলি খেলনা ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছেন। উষা অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে সেগুলি যথাস্থানে রাখিয়া বলিলেন, "ভাই! আরও গোটা চল্লিশ পুতুল কিনিতে হইবে।"

বিভা। হাঁ, ছোট মেয়েই ত বেশী।

কোরেশা। বাঁশী, ঝুনঝুনিও আনিবেন!

ল। বেশ। একটা ফর্দ লিখিয়া দিন।

তা। মিঃ আল্‌মাস্, আপনি আবার এখনই চলিলেন? একটু বসুন, বিশ্রাম করুন।

সৌদামিনী পরিচারিকাকে লতীফের জন্য চা আনিতে ইঙ্গিত করিলেন।

তা। সৌদামিনী-দি', তোমাদের সব ঠিক হইল ত?

সৌ। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না! অনেকগুলি সেলাই এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

তা। উষা-দি', তুমি আমায় শেষে লজ্জা দিবে নাকি? তোমাদের মেয়েদের কি কত দূর? শুনিতেছি, মুসলমান মেয়েরা নাকি ঠিক-মত বাঙ্গালা উচ্চারণ করিতে পারে না?

উ। তাহারা উর্দূও ত পারে না! যাহা হউক, চিন্তা করিও না—সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে। তোমাদের পুরস্কার-বিতরণকারিণীও ত এখনও ঠিক হয় নাই।

তা। (চা-পানরত লতীফের দিকে মিষ্টান্নের থালা অগ্রসর করিয়া দিয়া) হাঁ, মিঃ আল্‌মাস্, আপনার সে মহারাণীর কি সংবাদ?

ল। সকালে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, দেখা হয় নাই। আবার পরশ্বঃ যাইব। মহারাণীরা বড় ভোগান, কোন লাট-মহিষীর চেষ্টা করিব?

তা। আমরা দীনা কাঙ্গালিনী—লাট-মহিষী চাহি না। অন্য কোন রাজ-কর্ম্মচারীর পত্নী হইলে চলিবে। যথা লেডী চ্যাটার্জি বা তদ্রূপ কেহ—

ল। লেডী চ্যাটার্জি এখন দিল্লীতে।

উ। ভাই বিভা, যাও ত এই মোড়ের কনেস্টবলকে বল, তাহার স্ত্রী আসিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে পুরস্কার দিয়া যাউক।

বি। কিন্তু তাহার বেতন যে মোটে ৮৲ আট টাকা। সেও রাজ-কর্ম্মচারী বটে, তবে বেতন অল্প।

উ। ক্ষতি কি? এই আট টাকার কনেস্টবল কালে আটশত টাকা বেতনের রায় বাহাদুর ইন্‌স্‌পেক্‌টর হইতে পারে! আমরা অগ্রিম সম্মান দিয়া রাখিতে চাই!

সৌ। রায়-বাহাদুর হউকই আগে।—

তা। ওহো! তখন আমাদের বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ করিতে আসিলে তাঁহার সম্মানের ব্যাঘাত হইবে যে! আর তাঁহার স্বাস্থ্যও তখন ক্ষণভঙ্গুর হইবে।

বি। চল ভাই পদ্মরাগ, মেয়েদের গান শুনিবে।

সি। আমি যে গানের 'গ' বুঝি না।

বি। তবে আমি একা কি করিয়া উহাদের গান ঠিক করিব?

কো। ও আর ঠিক হইবে না, উহার ভিতর 'ইন্দুর' প্রবেশ করিয়াছে!

সি। এ কি কোরেশা-বি! উহা পারমার্থিক গান—উহা লইয়া বিদ্রূপ করা উচিত নহে।

কো। এই না তুমি বলিলে—তুমি গানের 'গ' বুঝ না?

সি। গানের তান-লয় বুঝি না বটে, শব্দ ত বুঝি। 'তার মাঝে ইন্দু'কে আপনি 'ইন্দুর' বলেন!

বি। এস উষা-দি'! আর সময় নাই। যদি রাহিলা নিতান্তই স্বর মিলাইতে না পারে, তবে উহাকে ছাড়িয়া দিব।

উ। চল—আমার ভাগের কাজে কিন্তু কেহই সাহায্য কর না। ইংরাজী কবিতা লইয়া একাই বকিয়া মরি!

কো। না, উষা-দি'! তুমি আগে আমার ড্রিল্‌এর অভ্যাস (rehearsal) দেখ। মিসিস্ সেন আমাকে যত সব কচি কচি মেয়ে দিয়াছেন, তাহারা না পারে ঠিকমত পা ফেলিতে, না পারে হাত তুলিতে। গান রাত্রে শুনিলেও চলিবে।

বি। কক্ষণও না!—গান বেশী মুস্কিল, কারণ তাহা হাত ধরিয়া দেখান যায় না!

তা। বিভা, তুমি ব্যস্ত হও কেন? ঊষা-দি' ড্রিল্ ঠিক করুন। তোমার গানের অভ্যাস এইখানে মিঃ আলমাস্-এর সমক্ষে করাও; তিনি একজন ওস্তাদ।

বি। মুসলমান মেয়েরা ত উঁহার সম্মুখে আসিবে না।

ল। হাঁ, মেয়েদের এখানে আনিবার প্রয়োজন নাই। (সিদ্দিকার প্রতি) সিদ্দিকা! তুমি স্বয়ং গাহিয়া উহাদের গান কয়টা ঠিক করিয়া দাও।

সি। বেশ বলিয়াছেন, আমি কিন্তু গানের 'গ'ও জানি না।

ল। কারসিয়ঙ্গে থাকা কালীন আমি স্বকর্ণে তোমার হারমোনিয়ম বাদ্য শুনিয়াছি।

সি। (সলজ্জভাবে) একটু সুর তাল জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু গলা ভাল নয় বলিয়া গাহিতে পারি না।

ল। (রাফিয়ার প্রতি) আপনি একটা গান করুন।

রা। আমি চেঁচাইতে পারি বটে, কিন্তু আমার সুর তাল জ্ঞান নাই।

ল। বেশ।—আপনার কণ্ঠস্বর এবং সিদ্দিকার সুর-তাল—এই দুই একত্রে করিয়া আপনারা উভয়ে মিলিয়া গাহিবেন। দোহাই আপনার, আর কোন আপত্তি শুনিব না। মিস্ চক্রবর্ত্তী! আপনি এই দুইজনকে ধরুন ত, আপনার গান ঠিক হইয়া যাইবে।

এ বৎসর বিদ্যালয়ের পুরস্কার ভাণ্ডারে লতীফ স্বয়ং ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং চাঁদা তুলিয়া আরও দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। 'নারীক্লেশ-নিবারণী সমিতি'তেও তিনি ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মরীচিকা

যথাকালে তারিণী-বিদ্যালয়ের জুবিলী ও শিল্প-প্রদর্শনী ইত্যাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লতীফের মাতা, ভগ্নী ও মাসীমা এখনও কলিকাতায় আছেন। মাতা অনেকটা হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রায়ই তারিণী-ভবনে বেড়াইতে যান। তাঁহার অমায়িক স্নেহে তারিণী-ভবনের সকলেই তাঁহার ভক্ত হইয়াছে। বোধ হয় তিনি যেন তারিণী-ভবনে কোন হারান বস্তুর অনুসন্ধান করিতে আইসেন অথবা মরীচিকা লক্ষ্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার বিশেষ মনোযোগ সিদ্দিকার প্রতি ; পক্ষান্তরে সিদ্দিকা যথাসম্ভব তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতেন। এক দিন তিনি সিদ্দিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, "একি মা! তুমি হাতে দু'গাছি চুড়ি পর্যন্ত রাখ না, বড় বিশ্রী দেখায়।"

তারিণী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, "সুশ্রী দেখান ত বাঞ্ছনীয় নহে। এখানে কয়েক জন হিন্দু মহিলা আছেন, তাঁহারা কুসংস্কারবশতঃ শাঁখা ছাড়িতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, আপনাদের মুসলমান সমাজে কোন কুসংস্কার নাই।"

লতীফের মাতা।—তুমি বেশ মুসলমান-ভক্ত মেয়ে। তোমার মত যদি আর ২০।২৫ জন মেয়ে থাকিতেন তবে বাঙ্গালার সৌভাগ্য হইত।

লতীফের মাতা প্রায় প্রতিদিন তারিণী-ভবনের 'ভগিনী' ও শিক্ষয়িত্রীদের ছয়জন করিয়া এক এক দলকে মধ্যাহ্ন কিম্বা নৈশ-ভোজনে নিমন্ত্রণ করিতেছেন—তারিণী হইতে আরম্ভ করিয়া কোরেশা, বিভা, জা'ফরী প্রভৃতি সকলের নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল শেষ ছয় জন—রাফিয়া, সকিনা, সিদ্দিকা, সৌদামিনী, ঊষা ও নলিনী—বাকী আছেন।

অদ্য রফীকা তাঁহাদিগকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমিত্ত লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। সকলেই সানন্দচিত্তে যাইতে সম্মতা হইয়াছেন ; কেবল সিদ্দিকা যুক্তকরে অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রফীকা অনুনয় বিনয় আরম্ভ করায় সিদ্দিকা বলিলেন—"আপনি একবার অশ্রু-বিসর্জনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কি বারম্বার সেরূপ আশা করেন?"

রফীকা। আমি আপনার কথা বুঝিলাম না। 'অশ্রু-বিসর্জনে সিদ্ধিলাভ' কেমন? আপনার কোন কোন কথা আমার নিকট হেঁয়ালীবৎ বোধ হয়।

সেদিন মুঙ্গেরে বলিয়াছিলেন—"আপনারাই ত আমার যাইবার পথ রাখেন নাই।" সে কথারই বা কি অর্থ?

রাফিয়া। (সহাস্যে) পদ্মরাগ-প্রহেলিকা,—

"পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু' চারি দিবসে,
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।"

র। ভাবীজান, পায়ে পড়ি,—আপনি একটু বুঝাইয়া দিন।

রা। আমি নিজেই বুঝি না।

অতঃপর সিদ্দিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং বিভাগে রন্ধন ও বাজারের তদন্ত করিতে গেলেন। মেট্রনের অসুখ, তাই সিদ্দিকা তাঁহার ভাগের কাজ করিতে আসিয়াছেন। রফীকাও সঙ্গে আসিলেন।

তারিণী-ভবনে যেমন নানা জাতি, নানা ধর্ম এবং নানাশ্রেণীর লোক আছে, সেইরূপ নানাদেশেরও পরিচারিকা—ভুটিয়া, নেপালী, বেহারী, সাঁওতাল, কোল, মান্দ্রাজী ইত্যাদি আছে। একজন গাঞ্জামী আয়া বাজার সওদা বাহির হইতে আনিয়া দিতেছিল, আর সিদ্দিকা ফর্দ দেখিয়া সে সব বুঝিয়া লইতেছিলেন। কি একটা জিনিস কম হওয়ায় তিনি আয়াকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; সে সহজে না বুঝায়, তিনি স্বর কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া বলিলেন—"বাঙ্গালী দুম্বল কই?" সে তৎক্ষণাৎ বলিল—"এই এখন আনিতে যাই।"

র। (উচ্চহাস্যে) 'বাঙ্গালী দুম্বল'! এ আবার কি?

সি। আলু। উহারা আলুকে 'বাঙ্গালী দুম্বল' বলে। আপনি পানির কোন শ্রুতিকটু নাম জানেন কি?

র। মনে হয় না ত। 'জল', 'সলিল', 'মা-আ', 'আব', 'বারি',—ও সব নামেই ত বেশ কোমল তরল ভাব আছে; কেবল ইংরাজী 'ওয়াটার' একটু কটমটে শুনায়।

সি। ইহা অপেক্ষা আর কোন শ্রুতিকঠোর নাম বলিতে পারিলেন না?

র। না। আপনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন—আপনি বলুন।

সি। 'মাইচুরেড়ো।'

র। ও বাবা!

এমন সময় সৌদামিনী প্রভৃতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তথায় আসিলেন। রফীকা আর একবার সিদ্দিকাকে অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় অপর সকলকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

o o o o

আহারান্তে সকলে গল্প করিতেছিলেন। সৌদামিনী লতীফের মাতাকে বলিলেন—"না, না! আমরা সিদ্দিকার প্রকৃত পরিচয় জানি না।"

ল-মা। রাফু মা! তুমি জান?

রা। না, খালা আম্মা, সিদ্দিকা আমাকে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

ল-মা। বাপু! এক সঙ্গে তিন বৎসর আছ, অথচ পরিচয় জান না।

উ। আমরা একসঙ্গে আছি বটে, কিন্তু আপন আপন কাজে ব্যস্ত থাকি—কে কাহাকে জিজ্ঞাসা করে—"তুমি কোন্ গগনের তারা, কিম্বা কোন্ বাগানের ফুল?"

ল-মা। আমি ১২।১৩ বৎসর পূর্বে একটি নবমবর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত সিদ্দিকার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাই।

স। মানুষের মত কি মানুষ হয় না?

র। একেবারে অবিকল নাক চোখ এক প্রকার হইবে কি?

স। তাহা ঠিক বলা যায় না। আমাদের বিদ্যালয়ে কয়েক জোড়া বালিকা আছে,—তাহারা দুই দুইটি একই প্রকার; ফজীলা ও মাহমুদা—কে কোন্টি তাহা আমি সহজে চিনিতে পারি না।

ল-মা। বেশ বাপু! তোমরা কেহ সিদ্দিকার পরিচয় না জান, তাই সই। কিন্তু তাহাকে আমার পুত্রবধূ করিয়া দাও।

সৌ। সে বিষয়ে আমাদের হাত কি?

ল-মা। মিসিস্ সেনকে বলিয়া এই বিবাহ ঘটাইয়া দাও।

উ। সিদ্দিকা আপনাদের জাতের মেয়ে, তাঁহার বিবাহ মিসিস্ সেন কি করিয়া দিবেন?

ল-মা। তিনি যে সকলের অভিভাবিকাস্বরূপা।

ন। তাই বলিয়া তিনি কাহারও বিবাহ দিতে পারেন না।

র। তিনি কাহারও বিবাহে বাধাও ত দিতে পারেন না।

ন। অবশ্যই না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনারা তাঁহাকে কি করিতে বলেন?

র। কন্যা-কর্ত্রী সাজিয়া বিবাহ দিতে বলি।

রা। আর রফীকা, আমি আজই তোর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।

র। আমার বিয়ে আর আপনাকে দিতে হয় না।

রা। তবে সিদ্দিকার বিবাহ দিতে পারে, কাহার সাধ্য ? সিদ্দিকা স্বয়ং সম্মতা না হইলে কেহ তাহার বিবাহ দিতে পারে না।

স। ভাল কথা, খালা আম্মা। আপনি কি আর পাত্রী পান না ? অমন সচ্চরিত্র, ধনে মানে শ্রেষ্ঠ সুপুরুষকে কে না কন্যাদান করিবে ?

উ। তাই ত ; এ অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ে লইয়া আপনারা কি করিবেন ? ধনে মানে আপনাদের সমকক্ষ পরিবারে চেষ্টা দেখুন।

ল-মা। লতীফ যে আর কোথাও বিবাহ করিতে চাহে না।

স। বেশ ত। এ পোড়া ভারতবর্ষে অনেক বিধবা আছে, দুই চারিটি বিপত্নীকও থাকুন।

রা। তাই ত, বিবাহের জন্য আবার তাঁহাকে পীড়াপীড়ি কেন ? জোর করিয়া বিবাহ দেওয়ার সাধ কি আপনাদের মিটে নাই ?

র। ওঃ। এতক্ষণে আমি সিদ্দিকা বিবির হেঁয়ালী বুঝিলাম। ভাইজানকে বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য আমি যে কাঁদিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সে কথার খোঁটা দিয়াছেন।

ল-মা। এবার আমি পীড়াপীড়ি করিতেছি না। সে নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করুক—আমি তাহাকে সংসারী দেখিয়া নিশ্চিন্ত হই।

ন। তবে আপনি পাত্রী খোঁজেন কেন ?

ল-মা। আমি তাহাকে পাত্রীর সন্ধান দিয়া বলিব, "দেখ বাপু, এখানে এক ঘর, সেখানে এক ঘর,—যে ঘরে তোমার ইচ্ছা বিবাহ কর।"

রা। কিন্তু আপনার মনোনীত ঘরগুলির তালিকায় সিদ্দিকার নাম কেন ? তাঁহার না আছে জমিদারী বিষয় সম্পদ, না আছে নগদ টাকা ও অলঙ্কার। তিনি কর্ম্মালয়ে প্রতি মাসে ২০০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন ; তাহা হইতে অতি সামান্য ৩০৲।৪০৲ টাকা খাওয়া-পরায় ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট টাকা তিনি আবার তারিণী-ভবনের অর্থভাণ্ডারে চাঁদা দেন। এ হেন দীনা কাঙ্গালিনী তপস্বিনী আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল কিসে ?

ল-মা। আমরা টাকার প্রার্থী নহি।

রা। আপনার বাবার এরূপ বৈরাগ্য কবে হইতে হইয়াছে ?

ল-মা। চুয়াডাঙ্গার সে কন্যার বিবাহের সময় হাজীসাহেব সম্পত্তির কথা তুলিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের কোন হাত ছিল না। সে কথার খোঁটা আমাকে দাও কেন ?

সৌ। মা, অনুমতি দিন, আমরা এখন আসি।

র। সিদ্দিকা-লাভের কোনও উপায় বলিয়া দিয়া যান।

স। আব্দার মন্দ নহে!—আমরা কি সিদ্দিকাকে ধরিয়া দিব? তাঁহার কোন অভিভাবক থাকিলে হয়-ত তিনি সিদ্দিকাকে বাঁধিয়া তোমাদের হাতে সমর্পণ করিতেন।

সৌ। সিদ্দিকা হয়ত একজনকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তবে?

র। তাহা হইলে আমরা তাঁহার মন ফিরাইতে চেষ্টা করিব।

স। ঈশ্! আস্পর্দ্ধা দেখ! তুমি সিদ্দিকার পিছনে লাগিয়াছ কেন? সে বেচারী কোন অজ্ঞাত কারণে সর্বত্যাগিনী হইয়া তারিণী-ভবনে একটু জুড়াইতে আসিয়াছেন।

র। জুড়াইতে থাকিলে ত আপত্তি ছিল না,—এখন যে পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

রা। যে দাহ্য, সে দগ্ধ হইবে, সেজন্য দুঃখ কি? পতঙ্গ চিরকাল পুড়িবে।

র। আর আমরা কি সিদ্দিকা বিবির ধরা পাইব না?

সৌ। বোধ হয়, না। বৃথা মরীচিকার অনুসরণে ফল কি?

ল-মা। মা! তুমি কিরূপে জানিলে সে মরীচিকা? সে কি স্পষ্ট বলিয়াছে যে বিবাহ করিবে না?

র। বিশেষতঃ আমার ভাইকে বিবাহ করিবেন না, এই কথা বলিয়াছেন কি?

উ। ইচ্ছা হয়, অনুসরণ করিয়া দেখুন।

লতীফ পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে থাকিয়া ইঁহাদের সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিতে-ছিলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "সত্যই এ মরীচিকা! খোদাতালা আমাকে সবই দিয়াছেন—দিলেন না কেবল 'সুখ'! আমার ভাগ্যে 'সুখ' মরীচিকা হইয়া গেল!!"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে দরবার

তারিণী 'অফিস'-কামরায় অনেকগুলি খাতা-পত্র লইয়া ব্যস্ত আছেন। সিদ্দিকা তাঁহার 'পার্সনাল্ এসিস্টান্ট', সুতরাং তিনিও উপস্থিত আছেন। রাফিয়া এবং সিদ্দিকা তারিণীর দক্ষিণহস্তস্বরূপা। কিঞ্চিৎ দূরে আর একটি টেবিলে রাফিয়া, সকিনা, সৌদামিনী ও ঊষা স্ব-স্ব কার্যে ব্যাপৃতা আছেন। এমন সময় সরকার বাবু আসিয়া বলিলেন,—

"দোহাই মা! আমি আর এখানে কাজ করিব না।"

তারিণী। কেন, সরকার বাবু?

সর। মার খাইয়া যে চাকুরী করিতে পারিবে, সেই এখানে থাকিবে। বাহিরে এত হট্টগোল হইয়া গেল, আপনারা তাহা শুনিতে পান নাই কি?

তা। বলুন শুনি, ব্যাপারখানা কি? কে আপনাকে মারিতে আসিয়াছে?

সর। আপনার কয়েকজন ছাত্রীর অভিভাবকেরা দল বাঁধিয়া আজ আমাকে মারিতে আসিয়াছিলেন। শৈলবালার খুড়া বলিলেন—"শৈল পুরস্কার পায় নাই কেন?" আমি বলিলাম—'হয় ত পাশ হয় নাই, তাই।' তিনি তখন চীৎকার স্বরে গালি দিয়া বলিলেন, "পাজি ব্যাটা। নচ্ছার ব্যাটা! তুই বসে বসে কি করিস্? মেয়েগুলোকে পাশও করাতে পারিস্ না?" আমি তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, মেয়ে পাশ হওয়া—না হওয়ায় আমার কোন হাত নাই। তদুত্তরে তাঁহারা আমায় মারিতে আসিলেন। আমার নাক লক্ষ্য করিয়া হরিমতির পিতা যে ঘুষি তুলিয়াছিলেন—

বেহারা। আমি মাঝে এসে না পড়লে সরকার মশায়ে'র নাক ভেঙ্গে দিত আর কি!

তা। আমার এখানকার কাজ ছাড়িলেই কি আর ওরূপ ঘটনা হইবে না, মনে করেন? আপনি ব্যাটা ছেলে, আপনাকে ত ঘুষির বদলে লাথি দিয়াই জীবন-সংগ্রাম করিতে হইবে।

উ। বলিহারী যাই বাঙ্গালী বাচ্ছা! নাক লক্ষ্য করিয়া ঘুষি তুলিয়াছিল বলিয়া চাকুরি ছাড়িতে হইবে!!

সর। অনুযোগ করেন কেন মা? কেবল ইহাই কি একমাত্র ঘটনা? সুশীলার পিতা বলিলেন—"তোর কি বাবার গাড়ী?—আমার মেয়েদের জন্য গাড়ী পাঠাস্ না কেন? আমার বাছারা প্রাইজের সময় স্কুলে যেতে পেলে না।"

তা। উষা-দি'। প্রাইজের দিন কি সুশীলারা তিন ভগ্নী উপস্থিত ছিল না ?

উ। (হাজিরা-বহি দেখিয়া) না, সেদিন উহারা ছিল না। প্রায় একমাস হইতে উহারা আইসে না।

তা। সুশীলাদের জন্য গাড়ী কেন পাঠান না, সরকার বাবু ?

সর। উহারা যখন ভর্ত্তি হইয়াছিল, তখন আপনি অতদূর গলির ভিতর 'বাস্' পাঠাইতে অস্বীকৃতা হওয়ায় মেয়েরা গোরাচাঁদ রোডে জহুর চামড়াওয়ালার বাড়ী আসিয়া অপেক্ষা করিত ; প্রতিদিন তাহারা সেইখান হইতে গাড়ীতে উঠিত এবং বিকালে তাহাদের ঐ খানেই নামাইয়া দেওয়া হইত। এখন সুশীলার বাবা নিজের বাসার দ্বারে গাড়ী লইয়া যাইতে বলেন। তাহা ত আপনি বারণ করিয়াছেন, কাজেই গাড়ী যায় না।

তা। (ছাত্রীদের ঠিকানার খাতা দেখিতে দেখিতে) আমি ত রাসেখাদের বাড়ীও 'বাস' পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু রাসেখা ও জমীলা ত আসিতেছে ; ইহার কারণ কি ?

সর। রাসেখার পিতা কোচম্যান ও সইসকে বখ্‌শিশ দিতে অস্বীকার করায় তাহারা দুষ্টামী করিয়া আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল যে, সে বাড়ীর হাতার ভিতর গাড়ী যাইবার পথ নাই। পরে আমি আপনার আদেশে তাহাদের বাড়ী দেখিয়া আসিয়া বলিলাম, "বেশ পথ আছে।" সেইদিন হইতে গাড়ী যায়।

তা। সরকারবাবু, আপনি এখন যাইতে পারেন। আমাদের অনেক কাজ আছে—এক রাশি চিঠি পড়িতে ও তাহাদের উত্তর লিখিতে হইবে।

উষা সরকারবাবুর হস্তে এক দীর্ঘ তালিকা দিয়া বলিলেন—"এই মেয়েদের বাড়ী দেখিয়া পথ সম্বন্ধে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন।"

তা। ও জানকি, ও নীহার, তোমাদের টাইপিং একটু স্থগিত রাখ। পদ্মরাগ, তুমি এখন চিঠি পড়া আরম্ভ কর।

সি। এই শুনুন ১ নম্বর চিঠি :—"সবিনয় নিবেদন মাননীয়াসু—"*

তা। রক্ষা কর পদ্মরাগ। পাঠগুলা ছাড়—কেবল পত্রাংশ এবং লেখকের নাম ধাম পাঠ কর।

* অনেকগুলি পত্র নানা ছন্দের ইংরাজী ভাষায় লিখিত ছিল, তাহাদের অনুবাদ দেওয়া গেল।

সি। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করতঃ) "আমার মেয়ে উর্মিলা এবার প্রাইজ পাইল না কেন ? আপনাদের ত বাঁধিগৎ—উত্তর আসিবে, 'পাশে প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় হয় নাই।' কিন্তু 'প্রথম' না হওয়া কাহার দোষ ? আপনারা বৎসর ভরিয়া টাকা লইতে জানেন, আর কিছু কর্তব্য আছে কি না, তা জানেন না। আপনি মেয়েমানুষ, তাই কিছু বলিলাম না।"

২নং চিঠি :—"আমার মেয়ে জুলেখা পাঁচ বৎসর হইতে আপনার স্কুলে পড়ে ; প্রতি বৎসর সে পরীক্ষায় প্রথম হইত। এবার তাহার অসুখের জন্য ৮।৯ মাস কামাই করিয়াছে বলিয়া তাহাকে একটা প্রাইজ দিলেন না। এ কেমন আপনাদের বিবেচনা ? মেয়েলী বুদ্ধি লইয়া আর কত ভালরূপে কাজ করিবেন ? স্কুলের কর্ম-নির্বাহক সভায় যদি কোন পুরুষ থাকিত তবে দেখিতেন, স্কুল পরিচালনা কিরূপে হয়।"

৩নং চিঠি :—"আমার মেয়ে নিরুপমার নাম কাটিয়া দিবেন। সে প্রাইজের দিন গোল করিয়াছিল বলিয়া আপনাদের বিভা নাম্নী গুরুমা তাহার প্রতি চক্ষু রাঙাইয়াছিল। হাতের কাছে পাইলে আমি বিভার চক্ষু উৎপাটন করিতাম।"

উ। কে আছ, বিভা-দি'কে একবার ডাক ত !

তা। এখন না, আরও চিঠি শুনি আগে।

৪নং চিঠি :—"স্কুল করিতে জানেন না ত রাখিয়াছেন কেন ?—কেবল নাম কিনিবার জন্য ? আমার মেয়ে প্রভাবতী তিন মাস হইতে পড়িতেছে ; না হ'ল সে পাশ, না পেলে সে একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু।"

৫নং চিঠি :—"আমার মেয়ে আব্বাসী তিন মাস হইতে স্কুলে পড়িতেছে, এখনও হিজ্জি করিতে পারে না।"

৬নং চিঠি :—"আমার মেয়ে আতিফা বেগম এখনও রাত্রে বিছানা ভিজায়, তাহাকে একটু শাসন করিতে পারেন না ? তবে আপনারা স্কুলে কি শিক্ষা দেন ?"

৭নং চিঠি :—"আক্ষেপ যে, আপনার বিদ্যালয়ে গবর্নমেন্টের হাত নাই ; নচেৎ মজা দেখাইতাম। আমার মেয়ে মনোরমা দুই মাস হইতে স্কুলে যায়, এখনও পর্যন্ত তাহার 'আকার' 'ইকার' শিক্ষা হয় নাই।"

৮নং চিঠি :—"আমার মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী কাহারও কথা শুনে না, মাতাকে গালি দেয়। পড়া-লেখাও তথৈবচ। দেখি—এডুকেশন মিনিস্টারকে বলিয়া কোন প্রকারে আপনার স্কুলের অনিষ্ট করিতে পারি কি না। এমন নামের স্কুল থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।"

৯নং চিঠি :—"আমার মেয়ে সরমাসুন্দরী আপনাদের মেট্রিক ক্লাসের ছাত্রী ; সে প্রাইজের দিন অপর মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করিতেছিল, এই অপরাধে আপনাদের জনৈক জুনিয়র শিক্ষয়িত্রী সারদা তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। সারদা আপনার নিকট রিপোর্ট করিতে পারিত ; তাহা না করিয়া নিজের হাতে আইন লইল কেন ? যাহা হউক, সরমাকে এরূপ গুরুতর আক্রমণ (Criminal assault) করার জন্য আমি সারদার বিরুদ্ধে ফৌজদারী 'কেস্' করিতে ও আপনাকে সাক্ষী মানিতে বাধ্য হইলাম।

"পুনশ্চ—আপনি সারদাকে যথাবিধি শাস্তি দিয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অব্যাহতি পাইতে পারেন।"

১০নং চিঠি :—"আমার দুধের বাছা লীলা একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু পায় নাই। সে কাঁদিয়া খুন হইল। আপনার স্কুল গবর্নমেন্টের অধীন নহে, নচেৎ দেখাইয়া দিতাম কেমন স্কুল! আমার পিসে মহাশয়ের খুড়তাতো ভাগিনেয়ের শ্বশুরের আপন মেসো স্বয়ং এডুকেশন মিনিস্টারের শালা!"

উক্ত প্রকারের আরও অনেক পত্র পঠিত হইল। পরে কোরেশা, জা'ফরী ও বিভাকে ডাকিয়া উষা ছাত্রীবৃন্দের অভিভাবকদের অভিযোগ-পত্র দেখাইলেন। বিভা ও কোরেশা "আসি" বলিয়া আবার বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কোরেশা একদল মুসলমান বালিকা লইয়া এবং বিভা ও সারদা একদল নানা-ধর্মাবলম্বিনী ছোট বড় বালিকা লইয়া আসিলেন।

কোরেশা। (১) আব্বাসী গত নভেম্বর মাসে স্কুলে আসিয়াছে। সে সময় আমরা বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি করাইতেছিলাম, কাহাকেও নূতন পড়া দেওয়া হইত না। ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধ পরীক্ষায় এবং শেষার্ধ প্রাইজের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় ব্যয়িত হইয়াছে। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ প্রাইজ ও জুবিলীর হেঙ্গামে অতিবাহিত হইয়াছে। অদ্য জানুয়ারীর ২১শে তারিখ—আব্বাসী এই দুই সপ্তাহে কি পরিমাণ লেখাপড়া শিখিয়াছে, পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

জা। রাফিয়া-বু, আপনি উহার 'বোগ্দাদী কায়দা' পাঠের 'হিজ্জে' 'মতন' ইত্যাদি পরীক্ষা করুন।

রাফিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "পাঁচ বৎসরের মেয়ে, দুই সপ্তাহে যাহা শিখিয়াছে, তাহা আশাতীত।"

কো। (২) আতিকা ১২ বৎসরের মেয়ে—বাড়ীতে রাত্রে বিছানা ভিজায়, সেজন্য স্কুল দায়ী। (৩) জুলেখা এ বৎসর ৯ মাস অনুপস্থিত ছিল, তবু পাশ

হওয়া এবং প্রাইজ পাওয়া চাই। তার পর দেখুন, (৪) মরিয়ম্ ডাকাতের মত দুর্দান্ত মেয়ে, অষ্টপ্রহর তাহার কোঁদল নিবৃত্ত করিতে হয়, পড়া করিবে কখন? (৫) আলিয়া আধ-পাগলী মেয়ে, স্কুলে আসিতে 'বাস'এর জানালা ভাঙ্গিত, অপর মেয়েদের মারিত, খামচাইত, কামড়াইত,—বহু কষ্টে তাহাকে ৮ মাসের পরিশ্রমে সোজা করিয়া পথে আনিয়াছিলাম; ইদানীং অঙ্ক ইত্যাদি বেশ শিখিয়াছিল; সেই সময় তাহাকে ছাড়াইয়া দেশে লইয়া গেলেন। দুই বৎসর ঘরে রাখিয়া পূর্ণমাত্রায় পাগলী সাজাইয়া আবার স্কুলে দিয়াছেন। আজি পত্র দিয়াছেন যে, তিন বৎসর হইতে তাঁহার মেয়ে স্কুলে আছে, কিন্তু কিছুই শিখে নাই। (৬) আমিনা পাঞ্জাবী মেয়ে, তাহার ভাষা কেহ বুঝিত না. সেও আমাদের কথা বুঝিত না। বহু কষ্টে দুই মাসে সে যখন আমাদের ভাষা বুঝিতে আরম্ভ করিয়া কিছু কিছু পড়িতে লাগিল, তখন "পড়া ত কিছু হয় না" অজুহাতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। (৭) জাহেদা কচদেশীয় মেয়ে—তাহার সম্বন্ধেও ভাষা না বুঝিবার বিড়ম্বনা ছিল। তিন মাস পরে যখন তাহাকে অনেকটা সুপথে আনিলাম, তখন "পড়া হয় না" বলিয়া ছাড়াইয়া অন্য স্কুলে দিলেন।

সারদা। কোরেশা-বি, আপনার কৈফিয়ৎ এখন রাখুন। আমার নিবেদন একটু শুনুন:—(১) এই যে নিরুপমা তৃতীয়—এ মিডল্ ক্লাসের ছাত্রী—কলহ-বিদ্যায় চূড়ামণি; ইহার মাথায় দেখুন, কত উকুন, পায়ে ঘা, কাপড় মলিন,—কিছুতেই এ সব শোধরাইতে পারিতেছি না। ইহার মাতাকে চিঠি দিলে, তিনি ঝির প্রতি দাঁত-মুখ খিচাইয়া বলেন, "গুরু-মা'রা আছে কি কর্তে?" (২) এখনও দেখুন, ঊর্মিলার গায়ে অনুমান ১০২ ডিগ্রী জ্বর, পেটে প্লীহা কত বড়, প্রত্যহ বিদ্যালয়ে আইসে, আমরা বেঞ্চের উপর শোয়াইয়া রাখি, কখনও আতুরাশ্রমে রাখিয়া আসি। এ মেয়ে কিরূপে পাশ হইবে, বলুন ত? (৩) প্রভাবতীর বয়স সাড়ে তিন বৎসরের অধিক নহে, সে কি পাশ করিবে? (৪) সরমা পুরস্কার বিতরণের পরক্ষণেই অপর মেয়েদের সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া ও মারামারি আরম্ভ করিল—তখনও লেডী চ্যাটার্জি বিদায় হন নাই। অন্য মেয়েরা ধমক মানিল, সরমা কিন্তু আমার সঙ্গে মুখামুখি আরম্ভ করিল—তখন অগত্যা আমি তাহার গালে এক চড় মারিলাম। সে সময় ঊষা-দি' ও আপনি ৮০০ লোকের ভীড়ের মধ্যে, তখন আমি কোথায় যাইতাম আপনাদের নিকট রিপোর্ট করিতে? আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা হইবে, হউক;—আমিও দেখিয়া লইব, তিনি কত বড় 'পুলিশ-ছানা'! (৫) মনোরমার পিতা স্কুলের প্রবীন

ইন্‌সপেক্টর কি না. সেইজন্য দুই মাসে (গত ডিসেম্বর এবং বর্তমান জানুয়ারী) মেয়ের 'আকার' 'ইকার' জ্ঞান চাহেন। মেয়ের যে বই নাই, স্লেট-পেন্সিল নাই. সারা গায়ে পাঁচড়া ভরা—বেঞ্চে বসিতে পারে না. গায়ে ১০২ ডিগ্রী জ্বর, সে খোঁজ রাখেন না!

বিভা। এখন আমার নিবেদন শুনুন:—(১) এই যে আতিফা, ইহার নিশ্চয়ই কোন রোগ আছে, সেই জন্য রাত্রে বিছানা ভিজায়। লেডী ডাক্তার মিস্ বোস সপ্তাহে দুইবার বোর্ডার ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে আইসেন। তিনি দুই তিন মাস হইল, আতিফাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ইহার শীঘ্র চিকিৎসা করান দরকার। সেই হইতে ক্রমাগত ৪।৫ বার আতিফার মাকে চিকিৎসার জন্য লিখিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা কেবল আমাদিগকেই শাসন করিতে বলেন (৬নং পত্র দেখুন)। (২) এই যে একদল কচি খুকি, ইহাদের বয়স ৩½ হইতে ৪ বৎসরের অধিক নহে; ইহাদের একমাত্র কাজ—ক্লাসে কাপড় নষ্ট করা! (৩) এই যে এক শ্রেণী, ইহাদের মাথা খারাপ—অনুক্ষণ ছুটোপাটি ও মার-ধর করে, ইহারা কোন গুরু-মা'র কথার বাধ্য নহে। (৪) এই যে এক গুচ্ছ—ইহাদের জামা খুলিয়া দেখুন, সর্বাঙ্গে পাঁচড়া, মাথায় উকুন, গায়ে ১০১ হইতে ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। ইহারা প্রায় সমস্ত দিন আতুরাশ্রমে থাকে, সেখানে যথানিয়মে ইহাদের ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হয়।

তা। 'ঊষা-দি'! তুমি এ জ্বরগ্রস্তা, পাঁচড়া-বিক্ষতা বালিকাদের বিদ্যালয়ে আনাও কেন?

উ। আমি ত ইহাদের আনিতে বারণ করি; কিন্তু ঐ সকল বাড়ী হইতে অন্যান্য মেয়ে এবং উহাদের দিদি, মাসী, পিসীকে আনিতে 'বাস্' যায়। সেই সময় উহাদের মাতা জোর করিয়া উহাদের পাঠান। ঝি আনিতে না চাহিলে কর্ত্রীরা তাহার সঙ্গে ঝগড়া করেন—"তোর বাবার কি? আমরা মাসে মাসে মাইনে দিই—মেয়ে নিয়ে যাবি নে? মেয়ের জ্বর হয়েছে ত তোর বাবার কি?"

সৌদামিনী। মিসিস্ সেন, তুমি দয়া করিয়া তারিণী-ভবনের আর দুইটি শাখা বৃদ্ধি কর—একটা 'তারিণী-নার্সারী', আর একটা 'তারিণী-বাতুলালয়'।

বিভা। তাহা হইলে 'তারিণী-সূতিকাগৃহ'ই বাকী থাকে কেন?

উ। কোন চিন্তা করিও না—ঈশ্বরেচ্ছায় মিসিস্ সেন বাঁচিয়া থাকুন, কালে তাহাও হইবে!

তা। ঊষা-দি'! তুমি আর ব্রহ্মশাপ দিও না! তুমি এখন তোমার দল-বল লইয়া বিদ্যালয়ে যাও, আমি এ পত্রগুলির উত্তর লিখাই। জানকী ও নীহার, তোমরা স্ব স্ব টাইপিং শেষ কর। রাফিয়া-বু, আপনি আমার সঙ্গে পাঠাগারে আসুন; পদ্মরাগ, তুমি চিঠিগুলি লইয়া আইস, মণি।

বিংশ পরিচ্ছেদ

লকেট রহস্য

এখন বহুদিন হইতে সিদ্দিকা কোরেশার সঙ্গে না থাকিয়া রাফিয়া ও সকিনার সহিত একটা স্বতন্ত্র কামরায় বাস করেন। রাত্রি অনুমান সাড়ে নয়টা; তাঁহারা কম্বলাবৃতা হইয়া স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, কেহ নিদ্রা যান নাই। সৌদামিনী আসিয়া দ্বারে আঘাত করায় সিদ্দিকা উঠিয়া দ্বার খুলিলেন।

সৌ। ভাই পদ্মরাগ! আমি তোমাকেই বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, কিছু মনে করিও না।

সি। স্বচ্ছন্দে বল।

সৌ। সেই যে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তোমার 'লকেট রহস্য' বলিবে, জুবিলী ইত্যাদি হেঙ্গামে এতদিন তাহা শুনিবার সুবিধা হয় নাই—আজি শুনিতে চাই।

সি। বেশ। তুমি বস দিদি! আমি আলোটা নিবাইয়া আসি, কারণ সকিনাবু'দের ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে।

সৌ। আমি এখানে বসিব না; চল, মিসিস্ সেনের কামরায়, তিনিও শুনিবেন।

সি। সে কি দিদি! তুমি একা শুনিবে বলিয়া কথা ছিল! আমি মিসিস্ সেনের সম্মুখে বলিতে পারিব না!

সৌ। কথাটা তাঁহারও শুনা প্রয়োজন, কারণ তিনি আমাদের সকলের উপর বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, এবং ইহা তাঁহার কর্তব্যও বটে। জান ত, মেয়েমানুষকে মাটির হাঁড়ীর সঙ্গে তুলনা করা হয়—যেহেতু মৃণ্ময় পাত্র অতি সামান্য কারণেই অপবিত্র হয়।

সি। কিন্তু আমার ইতিহাস—

"এ হ'তে পবিত্র প্রেম জীবের সংসারে
হয় নাই, হইবে না লোক-লোকান্তরে।"

সৌ। তবে আর সঙ্কোচ কিসের? চল, সে লকেটটাও লইয়া চল, মিসিস্ সেনকে দেখাইবে।

সিদ্দিকা কাগজের কৌটা শুদ্ধ লকেট আনিয়া সৌদামিনীর হাতে দিলে. তিনি তাহা সিদ্দিকার গলায় পরাইয়া দিলেন।

সি। (সজলনয়নে) এ কি করিলে দিদি! এটা যে অপয়া জিনিস।

সৌদামিনী সিদ্দিকার রোদনে অপ্রতিভ হইয়া সস্নেহে বলিলেন, "ভগিনী! তোমার মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। কিন্তু এটা ত কণ্ঠে—বক্ষে রাখিবারই বস্তু!"

তারিণীর কামরার দ্বারদেশে আসিয়া সৌদামিনী অতি ধীরে ধীরে কড়া নাড়িলেন। তারিণী আরাম-কেদারায় উপবেশন করিয়া একখানি পুস্তক দেখিতেছিলেন; কড়ার শব্দ শুনিয়া ডাকিলেন—"আইস।"

সৌ। সিদ্দিকার সেই লকেটের ইতিহাস অদ্য শুনিতে হইবে, কিন্তু তোমার সম্মুখে বলিতে লজ্জা করে।

তা। (স্নেহসিক্ত স্বরে) না, আমাকে লজ্জা করিতে হইবে না—এখানে তুমি আমাকে সর্বাপেক্ষা অকপট সহৃদয়া বন্ধু বলিয়া জানিবে। আমার হৃদয়ভরা সহানুভূতি পাইবে।

সিদ্দিকার অশ্রু তখনও বিন্দুর পর বিন্দু ঝরিতেছিল।

সৌ। এ কি পদ্মরাগ! তোমাকে আমরা অতি গভীরহৃদয়া বলিয়া জানি—আজি তোমার এ দুর্বলতা কেন?

তা। থাক, এত কষ্ট করিয়া তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না।

সি। (অশ্রুসম্বরণ করিয়া) না, কষ্ট কিসের? শুনুন:—আমার বয়স যখন মাত্র ১২ বৎসর, সেই সময় আমার ভ্রাতার শ্যালকের সহিত আমার বিবাহ হইল। আমি অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম, এক মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার অভিভাবক ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সমবয়স্কা ছিলাম বলিয়া তিনি আমায় অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমি তাঁহার কল্যাণে কখনও পিতৃ-অভাব অনুভব করি নাই। ভাইজান আমার এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু মাতা বলিলেন, এমন সর্বগুণালঙ্কৃত বর সহজে পাওয়া যাইবে না, অন্ততঃ

ইহাকে আটক করিয়া রাখা যাউক। সুতরাং তিন বৎসর পরে বিবাহ হওয়ার শর্তে আমার 'আক্‌দ্‌' হইল। 'আক্‌দ্‌' একরূপ সম্পূর্ণ বিবাহই, কেবল বর-ক'নের সাক্ষাৎ হয় না। আমার সম্প্রদান-ক্রিয়া ঐ তিন বৎসর পরে অনুষ্ঠিত হইত।

তা। 'হইত'—ইহার অর্থ কি ?

সি। তাহা আজি পর্যন্ত হয় নাই। বিবাহের কিছুকাল পরে মাতার মৃত্যু হইল। সে সময় "আছে" বলিতে আমার ভাইজান এবং তাঁহার পরিবার ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

যথাকালে বরপক্ষ হইতে বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য তাকিদ-পত্র আসিল। কিন্তু বরের জ্যেষ্ঠতাত আমার ভাগের সম্পত্তি পূর্বে লিখিয়া চাহিলেন। তাঁহাকে অবিশ্বাস করা হইতেছে ভাবিয়া ভ্রাতা উক্ত প্রস্তাবে বিরক্ত হইলেন এবং সম্পত্তি লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন। প্রত্যুত্তরে বরের পিতৃব্য স্পষ্ট জানাইলেন যে, সম্পত্তি না পাইলে তাঁহারা আমাকে গ্রহণ করিবেন না এবং তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ অন্যত্র দিতে বাধ্য হইলেন।

ভাইজান এরূপ নিষ্ঠুর অবমাননার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন। আমারও মনে হইল যেন আমাকে পদাঘাতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

তা। তোমাদের সামাজিক প্রথানুসারে তাঁহারা তোমার মত অমূল্যরত্নকে বধূরূপে বরণ করিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন ? তোমার বরের মতও কি তাহাই ছিল ?

সি। বরের মত কি ছিল, বলিতে পারি না। ভাইজান বরকে রেজেষ্ট্রি পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত মত কি ? তিনি সে পত্রের উত্তর দিলেন না। ইহার পক্ষকাল পরে আমরা শুনিলাম, তিনি আবার বিবাহ করিয়াছেন। এ সংবাদে আমি যতটা মর্মাহত হইলাম, ভাইজান তদপেক্ষা শতগুণ ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি মাস দুই পর্যন্ত একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাকে দেখিলেই উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে রোদন করিতেন।

কিয়ৎপরিমাণে আত্মসম্বরণ করিয়া ভাইজান আমাকে বলিলেন, "আয় জয়নু"—আমার প্রকৃত নাম জয়নব—"তুই জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ। মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য যাহাতে তোকে কোন দুরাচার পুরুষের গলগ্রহ না হইতে হয় আমি তোকে সেইরূপ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিব। তোকে বাল-বিধবা কিম্বা

চিরকুমারীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতে হইবে ; তুই সেজন্য আপন পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়া !"

তা। আহা! "পতন না হ'তে তনু
দাহন হইল আগে !"

সি। (অশ্রুমোচন করিয়া) ভাইজান আমাকে প্রাণপণে জমীদারী সংক্রান্ত সকল বিষয় শিক্ষা দিলেন। তিনি সর্বদা বলিতেন, জমীদারের প্রধান কর্তব্য— প্রজা-পালন ; প্রজা-শোষণ বা প্রজা-দহন নহে। তাঁহার সাধ্যানুসারে আমাকে সকল প্রকার সুশিক্ষা দিলেন।

যে দিন আমার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইল, সেইদিন ভাইজান আমাকে আমার ভাগের সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া দলিল-পত্র সমস্ত আমাকে দান করিলেন।

ভাইজান বলিলেন, "তোমার সম্পত্তিলাভের বিষয় আপাততঃ গোপন থাকুক। আমি একবার সে নরাধমের বন্ধন হইতে তোমাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখি। যদি তিনি তোমাকে 'তালাক' দেন তবে ত পরম মঙ্গল, তোমার জীবনের গতি অন্য দিকে ফিরিবে। আর যদি 'তালাক' না দেন তবে আর গতি কি—তোমাকে 'চিরদিন এ জীবন তারি তরে কাঁদিতে' হইবে,—অর্থাৎ তুমি নিজেকে বাল-বিধবা জ্ঞান করিবে।"

সে সময় বরের পিতৃব্য পরলোকগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভাইজান তাঁহাকে যত পত্র লিখিতেন, সব আমাকে দেখাইতেন ; এবং তাঁহার যত চিঠি আসিত, তাহাও আমাকে পড়িতে দিতেন। তদবধি আমি তাঁহার 'মনোগ্রাম', হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর চিনি।

তা। কিন্তু তাঁহাকে সশরীরে কখনও দেখ নাই ?

সি। (নতমস্তকে) তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি কারসিয়ঙ্গে—আপনার বাসায়। কিন্তু তখন তাঁহাকে চিনিতাম না।

তা। আমার বাসায়—কারসিয়ঙ্গে—কে তিনি ?

সৌ। সম্ভবতঃ মিষ্টার আল্‌মাস্। তোমার লকেটে তাঁহারই ফটো আছে না ?

সি। হাঁ। কিন্তু লকেট ও ফটো আমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হই নাই।

সৌদামিনী তারিণীকে সিদ্দিকার কণ্ঠস্থিত লকেট দেখাইলেন।

তা। মিঃ আল্‌মাস্ তোমার ভাইকে কি উত্তর দিলেন ? তিনি তোমাকে 'তালাক' দিতে সম্মত হইলেন ?

সি। না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। প্রায় ছয় মাস পত্র লেখালেখির পর তাঁহার মাতার এক মাতুল মৌলবী জোনাব আলী আমাদের বাড়ী আসিলেন। একদা ভাবীজান আমার হাত ধরিয়া তাঁহার কামরার বাহির দিকের রুদ্ধ জানালার নিকট লইয়া গেলেন। আমরা তথায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ভাইজান ও জোনাব আলী মিয়াঁর কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম। ভাইজান ক্রুদ্ধভাবে যাহা বলেন, জোনাব আলী অতি বিনীতভাবে তাহাতেই সায় দিয়া বলিতেছিলেন—

"হাঁ, আপনি যাহা বলিতেছেন সব সত্য। আমি আপনার সব কথা মাথায় রাখি। বৃদ্ধের প্রার্থনা এই যে, আপনি লতীফকে এই বিবাহ-রজ্জুতে বাঁধিয়া স্বহস্তে ইচ্ছানুরূপ শাস্তি দিন!"

ভাইজান একটি পাঁচনলী পিস্তল তুলিয়া বলিলেন,—

"আমার মনোমত শাস্তি এই,—দেখুন ইহাতে মাত্র তিনটি গুলি আছে,—প্রথম গুলিতে লতীফ আল্‌মাস্‌কে শেষ করিব, দ্বিতীয়টিতে জয়নবকে এবং তৃতীয় গুলিতে আমি আত্মহত্যা করিব।—"

জোনাব আলী তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"দোহাই আল্লার! অমন সঙ্কল্প করিবেন না!"

* * * *

ভাবীজান নিজের ভাইয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভাইজানকে সবিনয় মিষ্টভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, লতীফের কোন দোষ নাই, তিনি গুরুজনের পীড়নে নিতান্ত বাধ্য হইয়া আবার বিবাহ করিয়াছেন। তোমার এ কি একগুঁয়েমী—লোকে কি সপত্নী লইয়া ঘর করে না? 'পিয়া যাকে চায়, সেই সোহাগিনী'—আমাদের জয়নু যে 'সোহাগিনী' হইবে, ইহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই।"

ভাইজান বলিলেন, "উহার স্ত্রী বর্তমানে আমি কিছুতেই জয়নুকে সম্প্রদান করিব না। আমার একমাত্র ভগ্নী—আমার অতি আদরের জয়নুকে উপেক্ষা করিল!—এজন্য লতীফকে চিরজীবন কাঁদিতে হইবে!!"

সৌ। বেচারা ত এখন সত্যই কাঁদিতেছেন!

সৌদামিনীর কথায় সিদ্দিকা কিঞ্চিৎ বিজয়গর্বে মৃদু হাস্য করিলেন।

তা। অভিসম্পাতটা হাড়ে হাড়ে লাগিয়াছে!

সি। একদিন ভাবীজান আমাকে ডাকিয়া পাঁচটি মূল্যবান অলঙ্কার দেখাইয়া বলিলেন, "একজন সওদাগর এগুলি বিক্রয় করিতে আনিয়াছে, ইহার মধ্যে তুমি যেটি পসন্দ কর, আমি কিনিয়া দিব।" ভাইজান মৃদুহাস্যে বলিলেন, "যদি জয়নু সবগুলি পসন্দ করে?" ভাবীজান উত্তর দিলেন, "চিন্তা নাই—আমি

সবই কিনিয়া দিব।” আমি এই লকেটটাকে সর্বাপেক্ষা স্বল্পমূল্যের মনে করিয়া উহার দিকে ইঙ্গিত করিলাম।

সৌ। তুমি লকেটের বহিরাংশের মণি-মুক্তাখচিত কারুকার্য দেখিয়া মনোনীত করিয়াছিলে, না, তাহার আভ্যন্তরীণ ফটো দেখিয়া?

সি। তখন আমি ফটো দেখি নাই। ভাবীজান সহাস্যে তৎক্ষণাৎ উহা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। আমি লকেট খুলিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “খবরদার! এখন ওটা খুলিস্ না—যেদিন তোর বর আস্‌বে, সেইদিন খুল্‌বি।” ভাইজানও সহাস্যে বলিলেন, “ওটা খুলিস্ না।” বহুদিন পরে সেইদিন ভাইজানকে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে দেখিয়াছিলাম।

পরে জানিলাম, বাস্তবিক সে অলঙ্কারগুলি কোন সওদাগর বিক্রয়ার্থ আনে নাই,—তাহা জোনাব আলী মিয়াঁ আমার জন্য আনিয়াছিলেন। সে সময় উভয় পক্ষে সম্ভবতঃ সন্ধি হইয়া যাইত। কিন্তু সেই রাত্রে এক লোমহর্ষক দুর্ঘটনা হইল। ভাইজান ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মারা পড়িলেন—(সিদ্দিকার বাক্‌রোধ হইল)।

কিয়ৎক্ষণ পরে তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার পর?”

সি। তাহার পর ঘটনাচক্রের আবর্তনে আমি গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কণ্ঠস্থিত লকেটের বিষয় আর আমার মনেই ছিল না। এখানে আসিয়া প্রথম দিন স্নান করিবার সময় উহা আমার হাতে ঠেকিল। আমি উহাকে ‘অপয়া’ জ্ঞানে তাচ্ছিল্যভাবে একটা বাক্সে ফেলিয়া রাখিলাম।

আমরা কারসিয়ঙ্ হইতে ফিরিয়া আসিবার এক মাস পরে আমি এক দিন ট্রাঙ্ক ঝাড়িয়া গুছাইতেছিলাম, দৈবাৎ সেই সময় সৌদামিনী দিদি সেখানে গিয়া লকেটটাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কৌতূহলবশতঃ তাহা হাতে লইয়া খুলিয়া দেখিলেন,—লকেটের আভ্যন্তরীণ ফটো আমি সেই দিন প্রথম দেখিয়াছি। ইহাই আমার ‘লকেট-রহস্য’।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সমাজের প্রতিদান

"ভাই বানু! তুমি এবার পুরস্কার বিতরণের দিন আসিলে না কেন? তাহার পর আমাদের 'চিরহরিৎ-সম্মিলনী'তেও আসিলে না, এজন্য তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি না। এখন আবার নূতন করিয়া কোণের বউ হইয়াছ না কি?" এই বলিয়া শাহিদা বানুর গাল টিপিয়া দিলেন।

তারিণীর বসিবার ঘরে (ড্রয়িং-রুমে) বসিয়া এই তরুণীদ্বয় গল্প করিতেছিলেন। ইঁহারা উভয়ে তারিণী-বিদ্যালয়ে এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। ছয় সাত বৎসর হইল ইঁহারা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বিবাহিতা হইয়াছেন। বানু তাঁহার প্রথম কন্যা পঞ্চমবর্ষীয়া জরিনাকে বিদ্যালয়ে দিতে আসিয়াছেন।

তারিণী জরিনাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, "তাই ত, আশ্চর্য্যের বিষয়! মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এই রেজিয়া বানুই আমাদের সর্বপ্রথম ছাত্রী—সেই বানু এত সাধের জুবিলীর দিন অনুপস্থিত! কেন মা?"

বানু। (সাশ্রুনয়নে) মাসীমা! এজন্য আমি দায়ী নহি—আমার শাশুড়ী আমাকে আসিতে দেন নাই।

শাহিদা। জ্বালা'লে দেখি! প্রতি বৎসর প্রাইজে ও 'চিরহরিৎ-সম্মিলনী'তে আসিয়া থাক, এবার তৃতীয় ছেলের মা হইলে পর আসিতে বাধা দিলেন! অন্যান্য বার আসিতে কিরূপে?

বা। প্রতি বৎসর—প্রতি মাসেই 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী' সমিতির অধিবেশনের দিন তারিণী-ভবনে আসিবার সময় ঝগড়া হইত। এবার তিনি বাড়ী ছিলেন না বলিয়া আমার শাশুড়ীর জয় হইল। আম্মা আমার এখানে আসায় ঘোর আপত্তি করেন, বলেন—"তারিণী-ভবনে পর্দা নাই।"

কামরার অপরপ্রান্তে সকিনা ও রাফিয়া নিম্নস্বরে গল্প করিতেছিলেন। তাঁহারা বানুর শেষ কথাটি শুনিতে পাইয়া এদিকে 'মনোযোগ' দিলেন। রাফিয়া বলিলেন,—

"হাঁ মা বানু! তোমার শাশুড়ী উঠানে বসিয়া পুরুষ চাকরদের সমক্ষে স্নান করিয়া 'পর্দা' রক্ষা করেন, আর আমরা সর্বদা বস্ত্রাবৃতা থাকিয়াও 'বে-পর্দা'!"

স। তোমরা যে বাহিরের চাকরের সম্মুখে বাহির হও,—তাঁহারা কেবল 'গৃহ-পালিত' চাকরের সঙ্গে মিশামিশি করেন।

রা। আমরা চাকরের সম্মুখে বাহির হই—তাহাদের দ্বারা পা টিপাই না ত।

শা। ওঃ! আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, পুরুষ চাকরেরা নাকি বানুর ননদদের গা-মাথা টিপে, পা টিপে, তাহাতে 'পর্দার' ব্যাঘাত হয় না!

বা। আর তোমার ননদ ও জায়েদের পোষাকের কথা বল না! সেই নেটের 'আঙ্গিয়া' আর পাতলা ফিন্‌ফিনে হাওয়ার সাড়ী!—সেই বেশে তাঁহারা দেবর নন্দাই—সকলের সম্মুখে বাহির হন। শাশুড়ী লম্বা হইয়া খাটে শুইয়া আছেন, আর জামাই আসিয়া সেই খাটে বসিলেন!

স। বাপু! তোমরা যে বড় বোকা! অবরোধে (চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে) উলঙ্গ থাকিলেও কেহ 'বে-পর্দা' হয় না।

উ। আচ্ছা বাপু বানু! এখানে 'পর্দা নাই' বলিয়া না হয় না আসিলে; কিন্তু তোমার শাশুড়ী ত খুব বড়লোক, দুই চারি শত টাকা জুবিলী-ফাণ্ডে দিলেন না কেন?

বা। টাকা চাহিয়াছিলাম বলিয়াই ত ঝগড়াটা বেশী পাকিল। মাসীমাকে এমন সব বিশ্রী কথা বলিলেন, যাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়!

শা। বটে? মাসীমাকে বিশ্রী কথা—কি বলিলেন, শুনি?

বা। আমি বলিতে পারিব না।

শা। আমার কানে কানে বল, লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার!

বানুর কথা শুনিয়া শাহিদা ক্রোধে অধর দংশন করিয়া বলিলেন—"বটে! তাঁহারা এমন ছোটলোক! মাসীমাকে এমন কথা! বানু অমন নিরীহ শান্ত মেয়ে, তাই ও সব কথা সহ্য করিয়াছে! আমি হইলে খুনাখুনি হইয়া যাইত।"

সৌ। আচ্ছা বাপু! শুনিই না, কি কথাটা?

শা। আমি মুখে আনিতে পারিব না, বানু বলুক।

বা। বাজি, * তুমি লিখিয়া দাও।

শাহিদা অপরের অগোচরে লিখিয়া কাগজখণ্ড ভাঁজ করিয়া উষার হাতে দিলেন। উষা উচ্চহাস্যে একটি শব্দ বানান করিয়া পড়িলেন—"ব-এ একার, তালব্য শ-এ য-ফলা আকার।"

* পার্শী ভাষায় বড় ভগ্নীকে 'বাজী' বলে। বানু মোগলকন্যা।

সৌদামিনী কাগজখণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন, "........."র মত বলিয়াছে, মিসিস্ সেনকে ত 'পতিতা' বলে নাই, তবে এত রাগ কেন ?

তা। ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা ত আমাকে স্পষ্ট "—"ই বলে ; মুসলমান সমাজ এখনও পর্যন্ত আমাকে তত ভালবাসেন না !

সিদ্দিকা কয়েকখানি পত্রহস্তে আসিয়া বলিলেন, "মাফ করিবেন, এই চিঠিগুলি নিন।"

সিদ্দিকাকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া তারিণী বলিলেন—"বস পদ্মরাগ ! ইঁহারা আমাদের পুরাতন ছাত্রী—ইঁহাদের সহিত আলাপ কর।"

উ। পদ্মরাগ, আগে পত্রগুলি পড়িয়া শুনাও—পরে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিও।

বা। গুরু-মা ! আপনি নিজেই পড়ুন না।

উ। ইহার অধিকাংশই আমার প্রেম-লিপি হওয়া সম্ভব। সে রকম চিঠি একা পড়িতে সুখ বোধ হয় না।

তারিণী ১০।১২ খানা পত্র ঊষার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, "এইগুলি তোমার প্রেম-লিপি।" (অর্থাৎ ছাত্রীবৃন্দের অভিভাবকদের অভিযোগ-পত্র।)

পত্রগুলি পঠিত হইলে শাহিদা বলিলেন, "অনেকেই ধমকাইয়াছেন যে মেয়ে ছাড়াইয়া লইবেন। তাহাতে মাসীমার কি ক্ষতি হইবে ?"

উ। এই সমস্ত সানাউল্লাহ্, পানাউল্লাহ্, ঘোষ, বোসের মেয়ে তারিণী-বিদ্যালয় ত্যাগ করিলে মিসিস্ সেনের চৌদ্দপুরুষ নরকে যাইবে !

বিভা কয়েকখণ্ড কাগজহস্তে আসিয়া বলিলেন, "এ অমূল্য কাগজগুলি আমি স্বহস্তে আপনাদের দিতে আসিলাম। আমিও একখানা পাইয়াছি।"

শা। কাগজগুলি 'সমন্'এর মত দেখাচ্ছে ; কিসের 'সমন্' ?

বি। ইন্‌সপেক্টর অমূল্যধন বাগচী সারদা শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। মিসিস্ সেন এবং আমরা সাক্ষী। ইহা সেই সাক্ষীর 'সমন্'।

শা। বটে ? হাঁ, আমিও ত কিছু কিছু শুনিয়াছি। তিনি না কি দরখাস্তে লিখিয়াছেন যে, সারদা গুরু-মা সরমাকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিয়া মাথায় ও পৃষ্ঠে সবলে চপেটাঘাত করিয়াছেন ; তাহার ফলে সরমা মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, তিন ঘন্টা অজ্ঞান ছিল। বাড়ী গিয়া সমস্ত রাত্রি প্রবল জ্বরে ছট্‌ফট্ করিয়াছে, একটুও ঘুমায় নাই।

বা। আমিও শুনিয়াছি, তিনি নাকি ঐ মর্মে তিন জন ডাক্তারের সার্টিফিকেটও দাখিল করিয়াছেন।

সৌ। তাহা করিবেনই ত। "পুলিশের অসাধ্য ক্রিয়া নাহি চরাচরে।"

বি। সরমা সেই তিন বৎসর বয়স হইতে স্কুলে আসিত, আমরা তাহার কত উপদ্রব, দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছি; এখন সে মেট্রিক্ ক্লাসে আসিয়া আমাদের এই প্রতিদান দিল।

তা। সেজন্য দুঃখ কেন, বিভা? তুমি ইহাপেক্ষা আর কি আশা করিয়াছিলে?

শা। এই ত বানুর শাশুড়ী বলিয়াছিলেন যে, বড়-মাসীমা রাজ্যের সব টাকা আত্মসাৎ করেন—'তারিণী-ভবন' নামে একটা বিশেষ ব্যবসায়ের দোকান খুলিয়াছেন; বাঙ্গালার বউ-ঝিকে ঘরের বাহির করিয়াছেন। তিনি অতিশয় স্বার্থপর ও অর্থ-পিশাচ। আর—আর—প-তি-তা স্ত্রীলোকদের মত তাঁহার অর্থ-পিপাসা! কিন্তু মাসীমা এই ব্যবসায় না করিলে তিনি বানুর মত অমন সর্বগুণভূষিতা পুত্রবধূ পাইতেন কোথা হইতে?

বা। টাকা আত্মসাৎ করার অপবাদটা আমার মনে সব চেয়ে বেশী লাগিয়াছে। যিনি নিজের সর্বস্ব—চারি লক্ষ নগদ টাকা দেশহিতকর কার্যে ব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন—তিনি পরের টাকা আত্মসাৎ করিবেন?

শা। কেবল টাকা নহে—যিনি তাঁহার মূল্যবান জীবনের ২২টি বৎসর, স্বাস্থ্য, শক্তি, সামর্থ্য—সব দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার প্রতিদানে এই পাইলেন?

বা। "আজীবন পূজিলাম দেব দ্বিজগণে,
তার কি এ ফল বাছা! তুমি যাও বনে?"

এই সময় পরিচারিকা সকলের জন্য চা-খাবার লইয়া আসিল।

তা। (চা ঢালিতে ঢালিতে)—মা! তোমরা এত দুঃখিত হইতেছ কেন? লোকে ওরূপ বলিয়াই থাকে; ও-সব কথা ধর্তব্য নহে। এখন তোমরা চা খাও। কই জরিনা, আয় এদিকে!

সৌ। তাই ত, দেশ ও সমাজ কি মিসিস্ সেনকে কাঁদিয়া পায়ে ধরিয়া বলিতে আসিয়াছিল যে, "দীন-তারিণি! আমাদের তারণ কর! আমাদের জন্য টাকা, স্বাস্থ্য, জীবন উৎসর্গ কর?" ইনি কেন দেশ-সেবা করিতে গেলেন? দেশ কি ইঁহার সেবা চায়?

"তুমি বল মন প্রাণ দিয়াছ তাহায় ;
কেন দাও ? কারে দাও ? সে ত নাহি চায় ।"

রা । সৌদামিনী-দি', তোমার কথা মানিলাম, "মন প্রাণ সে ত নাহি চায়," কিন্তু লইতে আইসে কেন ? মিসিস্ সেন কি দ্বারে দ্বারে "প্রাণ নেবে গো ?" বলিয়া 'ফেরী' করিয়া বেড়ান ? আসল কথা এই যে, আমরা লইব, খাইব, গালিও দিব ।

চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বিভা বলিলেন—"যে যত বড় হয়, তাহার দায়িত্ব তত বেশী । সে তত অধিক গালি শুনে । মিসিস্ সেন এ সব জ্বালা-যন্ত্রণা বহন না করিলে আর কে করিবে ? (বানু ও শাহিদার প্রতি) তোমাদের মনে নেই, সেই যে ইংরাজী পদ্যপাঠে পড়িয়াছিলে,—ইংলণ্ডের কোন রাজা মনোদুঃখে জল-যন্ত্র-পরিচালকের টুপীর সহিত মুকুট বদল করিতে চাহিয়াছিলেন ?"*

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পাষাণ-প্রতিমা

লতীফ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন । প্রায় ৯ বৎসর পূর্বে জয়নবের সহিত তাঁহার যে 'আক্দ' হইয়াছিল, সে কথা ভুলিতে পারেন না । লতীফকে এখন তাঁহার সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, ইহাই হইতেছে তাঁহার কর্তব্য । কিন্তু হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে কে যেন বলে, একবার এক অজ্ঞাতা রমণীকে বিবাহ করিয়া পাঁচ বৎসর বিষময় ফল ভোগ করিয়াছ : জয়নবও সেইরূপ অপরিচিতা । অথচ সিদ্দিকা ত সর্বগুণে বাঞ্ছনীয়া । আর এক কথা, জয়নব অনুপস্থিত আর সিদ্দিকা উপস্থিত । বিবেক বলে—'না, না, সিদ্দিকার বিষয় ভাবা উচিত নহে, জয়নবকে লইয়াই তাঁহাকে ঘর করিতে হইবে ।'

লতীফ জয়নবকে আকাশ-পাতাল খুঁজিতে বিরত হন নাই । কিন্তু জয়নব সম্বন্ধে কোন কল্পনা করিতে গেলে সিদ্দিকা আসিয়া পথরোধ করিতেন—সুতরাং জয়নব ও সিদ্দিকা এক হইয়া যাইত । ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত 'বীরবালা',

* "Thy mealy cap is worth my crown,
Thy mill my Kingdom' sfee."

যাঁহাকে লতীফ অনল হইতে উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন, সেই জয়নব লতীফের 'হারানিধি'। সে রাত্রি তাঁহার সর্বাঙ্গে কাদা-মাখাই সার হইয়াছিল,—মাছ ধরিতে পারেন নাই! কি দুরদৃষ্ট! এ দীর্ঘ আড়াই বৎসরেও যখন জয়নবের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়নবের আশা ত্যাগ করিলেন।

সিদ্দিকার দিক্ হইতে লতীফ যদিও কখনও কোন আশা প্রাপ্ত হন নাই, তবু আশার বিরুদ্ধে আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি নানা ইঙ্গিতে সিদ্দিকাকে মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জানাইতেন; সিদ্দিকা নির্বিকার—নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অটল থাকিয়া. নীরব প্রত্যাখ্যান করিতেন। এমন মূক বধির ভাব দেখাইতেন যে, আর তাঁহাকে কিছু বলা চলিত না।

এবার পাঁচ ছয় মাস মুঙ্গের ও কলিকাতায় ঘুরিয়া লতীফ এখন বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, জমীদারী সংক্রান্ত অনেক অবশ্যকর্তব্য কার্য বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। এত দিন সালেহার অত্যাচারে গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন নাই; এখন গৃহে মনোযোগ দিবেন, মনে করিলেন। বাড়ীর সন্নিহিত উদ্যানটি নদীর ধারের দিকে আরও কিঞ্চিৎ বাড়াইলে এবং তাহাতে ছোট একটি টিনের বাংলো নির্মাণ করিলে, তাহা মনোরম উদ্যান-বাটিকা হইবে। কিন্তু এ সব করিয়া কি হইবে? তাঁহার গৃহলক্ষ্মী কই? ভাল করিয়া অতি স্পষ্টভাষায় আর একবার সিদ্দিকার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেখিলে হয় না?

তাহাই হইল। তিনি সিদ্দিকাকে এক দীর্ঘ পত্র ইন্‌সিওর করিয়া পাঠাইলেন। পত্রের ভাষা এমন সুকৌশলে রচিত হইল যে, সিদ্দিকা—উত্তর—সদুত্তর হউক অথবা অসন্তোষজনক উত্তরই হউক—দিতে বাধ্য হইবেন। উত্তর না দিলে "মৌনং সম্মতি-লক্ষণং" বলিয়া ধরা পড়িবেন। সুতরাং এবার তাঁহার মূক হওয়া খাটিবে না।

বাংলো প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। লতীফ দুইজন মালীর সহিত বাগানের যেখানে যাহা সাজে সেইরূপ লতা-গুল্ম দিয়া বাগান সাজাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, উদ্যান-বাটিকার নাম রাখিবেন—'Ruby কুঞ্জ'। সেই সময় ডাক-পিয়ন একখানি ইন্‌সিওর-করা পত্র আনিয়া দিল। পত্রখানি উন্মুক্ত উদ্যানে বসিয়া পাঠ করিতে সাহস হইল না। পত্রহস্তে লতীফ আপন কামরায় গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। অনেকক্ষণ পরেও সাহেব ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া মালীরা হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা প্রায় তিনটা—এখনও সাহেবের স্নানাহার হয় নাই। চাকরেরা সভয়ে দ্বারে মৃদু আঘাত করিয়া সাহেবের সাড়া-শব্দ না পাইয়া ফিরিয়া

যাইতেছে। তিনি কি ঘুমাইয়াছেন? না, এরূপ অসময়ে তিনি ত ঘুমান না। ভৃত্যবর্গ অনন্যোপায় হইয়া রফীকার সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে দ্বারদেশে আনিয়া "মাম্মা! মাম্মা—" বলিয়া কাঁদিবার জন্য দণ্ডায়মান করিয়া দিল। এই বালকটিকে লতীফ অত্যন্ত ভালবাসেন! কি জ্বালা! নির্জ্জনে একটু কাঁদিবারও সুবিধা পাওয়া যায় না! নিজের কামরায় অবরুদ্ধ থাকিবারও উপায় নাই! তাঁহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ভাষা ছিল—

"প্রাণ কাঁদে প্রিয়া লাগি ভীম যাতনায়!
ইচ্ছা হয় ছুটে যাই, যেথা জীব-জন্তু নাই,
কেঁদে আসি প্রাণভরে পড়িয়া ধরায়!"

লতীফ সে 'নিষ্ঠুর' পত্রখানি একটা বাক্সে ফেলিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া রোরুদ্যমান বালককে উপেক্ষা করিয়া মাঠে চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতেছেন, সিদ্দিকা কি হৃদয়হীনা পাষাণ!—প্রেম দূরে থাকুক, সাধারণ দয়া মায়া সহানুভূতি পর্যন্ত নাই! সেই যে কবি বলিয়াছেন—

"উত্তরিয়া 'না', পাষাণী বলিল আবার,
'ইথে যদি মর তবে কি করিব আর?"

মানুষ এমন প্রাণহীন অসার পদার্থ হ'তে পারে! তাহা হউক,—আর তাঁহাতে মনে স্থান দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি ত স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে আর কেন? কিন্তু সে কথা ভাবিতেও যে হৃদয় শতধা হয়! তাহাকে ভুলিলে আর থাকে কি? কবি বলেন, প্রেমিক জ্বলিয়া সুখী হয়, তবে প্রেমিক কাঁদে কেন? ঐ রোদনেই ত সুখ! সে সুখ-সাগরে যে একবার ডুবিয়া যায়, সে আর উঠিতে চাহে না!—

"হায় রে হায়! প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালবাসা?
দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা।
প্রেমে চায় ভালবাসি, পরাব না পরব ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনা বেচা—ভালবেসে পুরায় আশা!"

বেশ বেশ, তাহাই হইবে,—

'সিদ্দিকা! তোমায় ভালবাসিব আবার!'

এ পাপ-জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। হইতে পারে, লতীফের রোদন নিষ্ফল হইবে না। হইতে পারে, 'পাষাণ-প্রতিমা' এক সময়ে দয়া-প্রতিমা

হইবে। এ বিচিত্র নাট্যশালারূপ জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। আবার দুই-চারি বিন্দু অশ্রু ঝরিল। ছি! এ কি! অদ্য তাঁহার পুরুষোচিত ধৈর্যরক্ষা অসম্ভব হইল কেন? আত্মসম্বরণ করা অসম্ভব হইল কেন? আশা লইয়াই মানুষ বাঁচে—নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু—

"এমন করিয়া আর বল দেখি কতবার
গড়িয়া আশার মঠ পুনরায় ভাঙ্গিব?"

ক্রমে যে তিনি নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছেন, লতীফ তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। নদীবক্ষে জেলে-ডিঙ্গীর নাবিকদের কোলাহলে তিনি যেন সংজ্ঞালাভ করিলেন। এবার ভালমতে অশ্রুমোচন করিলেন। ছি! লোকে দেখিলে কি বলিবে! তিনি নিবিষ্টচিত্তে দাঁড়াইয়া তরঙ্গিনীর তরঙ্গ গণনা করিতে লাগিলেন। কে একজন পশ্চাৎ হইতে তাঁহার চক্ষু ঢাকিল।

"জোনাব আলী নানা! কি সংবাদ?"

"জোনাব আলীর ত মরণ নাই, তাহার সংবাদ ভালই। কিন্তু তোমার আজ কি হইয়াছে? শুনিলাম, স্নানাহার হয় নাই, রোরুদ্যমান মা'শুককে আদর করা হয় নাই, কেন?"

ল। মানুষের মেজাজ কি সব সময় এক রকম থাকে? তাহা ছাড়া আমার কি একটু হাসিবার কাঁদিবার স্বাধীনতা নাই?

জো। রোদন-ক্রিয়া ত আজি দেড় বৎসর হইতে—অর্থাৎ বউ-কর্ত্রীর মৃত্যুকাল হইতে চলিতেছে, কিন্তু কখনও এরূপ রক্তচক্ষু ক্রন্দন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। নিশ্চয় আমাদের ঘরে আর কেহ সিঁদ দিয়াছে বা ডাকাতী করিয়াছে। কে সে? বল ত, ডাকাত ধরিবার চেষ্টা করি। (লতীফকে পূর্ববৎ নির্বাক্ দেখিয়া) তুমি আশৈশব জোনাব নানাকে বড় ভালবাস—তাহার নিকট কিছু গোপন কর না—আজ আমিও 'পর' হইলাম না কি?

ল। আমরা 'চরের' মোকদ্দমাটা হারিয়াছি, তাহা তুমি শুন নাই কি?

জো। শুনিয়াছি। কিন্তু ইহাও জানি, মোকদ্দমা হারিয়া কাঁদিবে, সে ধাতুতে লতীফ গঠিত হয় নাই।

ল। এ মোকদ্দমায় অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইয়াছে।

জো। আবার চাতুরী! আমি এত বোকা নই। তোমার প্রকৃত দুঃখের কারণ বল। যত দূর জানি, তোমার পরলোকগতা প্রণয়িনীর সঙ্গে তোমার

প্রণয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ 'হিয়া দগ-দগি, পরাণ-পোড়ানি' কাহার জন্য ?

ল। তোমার মস্তিষ্ক উর্বর—যাহা ইচ্ছা কল্পনা করিয়া যাও।

জো। দেখিব দাদা, কখনও ধরা পড় কি না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ লতীফ তখনই ধরা পড়িলেন। তিনি পুনরায় চক্ষু মুছিবার জন্য রুমাল বাহির করিবা মাত্র একখানি পত্র তাঁহার পকেট হইতে পড়িয়া গেল। জোনাব আলী তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইলেন। তিনি বিজয়গর্বে হাসিয়া বলিলেন,—"এখন ?"

ল। 'এখন' কি ? কোন্ গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে ?

জো। আবিষ্কার করিলাম—"সিদ্দিকা"। হুঁ-মা (অর্থাৎ লতীফের মাতা) ও রফীকার মুখে ঐ নাম শুনিয়াছি বটে।

ল। কেবল স্বাক্ষর দেখিয়া বিচার করা উচিত নহে। আদ্যন্ত পাঠ কর, তাহার পর বিচার করিবে।

জো। (পত্র পাঠ করিয়া) হস্তাক্ষর আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। ইহা জয়নব বিবির হস্তাক্ষরের ন্যায়। সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যখন চুয়াডাঙ্গায় ধন্না দিয়া বসিয়াছিলাম, তখন সে বিবির হাতের লেখা অনেকবার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনিই ত সে বাড়ীতে সর্বেসর্বা কর্ত্রী ছিলেন। চাকরেরা 'হুজুর' অপেক্ষা 'সাহেবজাদী'কেই বেশী ভয় করিত।

লতীফের ধমনীতে ধমনীতে তড়িত-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাই ত, জয়নবের কয়েকখানি পত্র তাঁহার নিকটও ত আছে। কিন্তু তিনি কেমন অন্ধ হইয়া আছেন—একবারও সে চিঠি সিদ্দিকার চিঠির সহিত মিলাইয়া দেখেন নাই। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া জোনাব আলীকে বলিলেন, "তুমি নিশ্চয় বলিতে পার—এ পত্রের লেখিকা সেই ব্যক্তি ?"

জো। না ভাই, হলফ্ করিয়া বলিতে পারি না ; আর সে প্রায় তিন বৎসর হইল—তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়াছিলাম। তবে আমার মনে হয়—উভয় হস্তলিপিতে সাদৃশ্য আছে।

ল। এখন চিঠিখানা ফেরত দাও।

জো। পত্রে ত কোন কথাই নাই ; আরম্ভ—"সবিনয় নিবেদন," শেষ—"বিনীতা সিদ্দিকা" ; এরূপ অকর্মণ্য কাগজখণ্ড এত যত্নে রাখিয়াছ কেন ?

ল। কোনরূপে রহিয়া গিয়াছে।

জো। তাহা হইলে একটা বাক্সের মধ্যে অথবা কোন কাগজের স্তূপে পড়িয়া থাকিত—পকেটে থাকিবার ছলে তোমার বুকের উপর থাকিত না।

ল। পকেটে পড়িয়া থাকা কি ভুল হইতে পারে না?

জো। (পুনরায় পত্রের তারিখ দেখিয়া) না, কারণ চিঠিখানি অনেক দিনের,—তুমি যখন দার্জিলিং হইতে আসিয়াছ, সেই সময়ের। যদি তদবধি উহা পকেটেই থাকিত তবে এতদিন রজক-হস্তে প্রাণত্যাগ করিত। আর তুমি আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। আমার চুল রৌদ্রে পাকে নাই—আমিও ত যৌবন অতিক্রম করিয়াই বৃদ্ধ হইয়াছি। এককালে আমিও ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের যুবা ছিলাম।

ল। তোমার বার্ধক্যে কেহ সন্দেহ করিতেছে কি? বক্তৃতা ত অনেক শুনাইলে, এখন পত্রখানি দাও।

জো। এমন রাবিশ চিঠি লইয়া কি করিবে?

ল। যাহাই করি না কেন, তোমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?

জো। নিতান্তই ছাড়িবে না, তবে আর কি করা যায়? আচ্ছা, ঐ স্রোতে ফেলিয়া দিই—তুমি ধর।

ল। এ খেলা সহজ নহে। যদি ধরিতে না পারি,—আর তীরে উঠিব না।

জো। এত গভীর ভালবাসা! কেবল একখানি সাধারণ পত্রের জন্য এতটা উৎসর্গ করা হইবে?

ল। দিবে কি না বল!

জোনাব আলী অগত্যা পত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া বিমর্ষভাবে লতীফের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ল। কি ভাবিতেছ, নানা?

জো। আমি তোমার প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করিতেছিলাম। যদি প্রণয়-লিপি হইত তবে তাহার জন্য এরূপ আগ্রহাতিশয্য শোভা পাইত।

পত্রখানির জন্য এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া এখন লতীফের লজ্জা হইল। কিন্তু তিনি ত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, তখন উচিত অনুচিত বিচার করিবার জ্ঞান ছিল না। ভয় ছিল,—যদি অরসিক জোনাব আলী পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলেন। তিনি নতমস্তকে ভাবিতে লাগিলেন যে নিজের ঘরে,—এমন কি পথে, ঘাটে মাঠে—কোথাও একটু নির্জনে চিন্তা করিবার সুবিধা নাই—

মানুষ এমন পরাধীন! আর সে চিন্তাও ত কিছু সুখ-চিন্তা নহে—একটা নির্ম্মম পাষাণ-প্রতিমার আলোচনা মাত্র।

জো। (সানুনয়ে) সত্যই তোমার জোনাব-নানাকে কিছু বলিবে না? সিদ্দিকা খাতুন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও চুরিবিদ্যা ছাড়েন নাই।

ল। আমাকে ছাড়িয়া এখন তাঁহাকে আক্রমণ কেন?

জো। যেহেতু—এই যে বিরস বদন, সজল নয়ন, উদাস মন—"সিদ্দিকারে! মূলীভূতা তুমিই তাহার।

লতীফ আবার ভাবিলেন,—কি বিপদ! হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে যে বেদনা লুক্কায়িত আছে, এত সতর্কতা সত্ত্বেও তাহা কিরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িল—এখন তাহা মা জানেন, রফীকা জানে, জোনাব নানা জানেন, তারিণী-ভবনেও অনেকেই জানেন। কেবল এ বেদনা বুঝিল না—সেই পাষাণ-প্রতিমা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ঋণ-শোধ

"ঐ শিলাখণ্ড পর্য্যন্ত উঠ ত দেখি।" বরিয়াতু পাহাড়ের একখণ্ড শিলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তারিণী সিদ্দিকাকে বলিলেন—"পাহাড়ের ঐ শিলাখণ্ড পর্য্যন্ত উঠ ত দেখি।"

কার্ত্তিক মাস, পূজার ছুটি। তারিণী মাত্র চারিজন সঙ্গিনীসহ রাঁচীতে পক্ষকাল যাপন করিবার জন্য আসিয়াছেন। এবার তাঁহারা পাচক সঙ্গে আনিতে পারেন নাই, নিজেরাই পালাক্রমে রন্ধন করেন। অদ্য ঊষা ও রাফিয়া রন্ধনের জন্য বাসায় রহিলেন; কোরেশাও শিরঃপীড়া বশতঃ বাহির হইতে পারেন নাই। সহজে একটা পুষ্‌পুষ্* পাওয়া গেল বলিয়া তারিণী কেবল সিদ্দিকাকে লইয়া বরিয়াতু পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

* পুষ্‌পুষ্,—শাম্পানীর মত গাড়ীবিশেষ। ইহা দুই কিম্বা ততোধিক মানুষে টানে; একজন পশ্চাতে ও একজন সম্মুখে থাকে। সম্ভবতঃ পশ্চাদ্দিক হইতে ঠেলা দেওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম 'পুষপুষ' (Push-push) হইয়াছে।

অপর দিকে অশ্বপদ-ধ্বনি শ্রবণে তাঁহারা সেইদিকে চাহিলেন। একজন বৃদ্ধ ইংরাজ অশ্বারোহণে পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সিদ্দিকা স্তম্ভিত হইলেন। তখন সায়াহ্ন রবির রক্তিম ছটায় আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। সিদ্দিকা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া বলিলেন—"বড় দিদি! চলুন, এখন বাসায় যাই।"

তা। হঁা চল; যাইতে যাইতে হয় ত রাত্রি হইবে। পুষ্‌পুষে মাত্র দুইজন কুলী।

তারিণী ও সিদ্দিকা পুষ্‌পুষের জানালা দিয়া পথের দৃশ্য এবং পাহাড় দেখিতেছিলেন। দেখিলেন, সে অশ্বারোহীও ফিরিয়া আসিতেছেন। ঐ যা! ঘোড়াটা কিসে টক্কর লাগিয়া পড়িয়া গেল! ঘোড়া ত উঠিয়া দাঁড়াইল, আরোহী আর উঠিল না। তারিণীর পুষ্‌পুষ্‌ আরও কিছুদূর চলিয়া গেল।

আবার তাঁহারা পুষ্‌পুষের পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, শ্বেতাঙ্গটি তখনও ভূতলে পড়িয়া আছেন, আর ছিন্নরাশ ঘোড়া আরোহীর পাশে দাঁড়াইয়া যেন তাঁহার পতনের জন্য অনুশোচনা করিতেছে। নিকটে একটিও লোক নাই যে তাহাদের সাহায্য করিবে। তখন সায়াহ্ন-গগনে মাত্র একটি তারকা দেখা দিয়াছে। তারিণী ভাবিলেন, লোকটা এ অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে শৃগাল কুকুরে টানাটানি করিবে।

পুষ্‌পুষ্‌ ফিরাইয়া লইয়া তাঁহারা কুলীদ্বয়ের সাহায্যে আহত লোকটিকে গাড়ীতে তুলিলেন। পুষ্‌পুষে কোন প্রকার বেঞ্চ বা উচ্চ আসন নাই—তাহার সমতল মেঝেতে স্বচ্ছন্দে শয়ন করা যায়। মৃতকল্প লোকটিকে সেইখানে শয়ন করাইয়া দিয়া তারিণী ও সিদ্দিকা পদব্রজে চলিলেন।

কিয়দ্দূরে একটি ছোট মসজিদে মগরেব-কালীন (সান্ধ্য) উপাসনা হইতেছিল। তথা হইতে জল আনিয়া তারিণী আহত ব্যক্তির চক্ষু ও মুখে দিয়া তাহার জ্ঞান-সঞ্চারের বৃথা চেষ্টা করিলেন। সিদ্দিকা পথপার্শ্বে সায়াহ্ন নামাজ শেষ করিয়া স্বীয় অঞ্চল ছিঁড়িয়া তাহার মাথায় ও বাহুতে পটী বাঁধিয়া দিলেন। পুষ্‌পুষ্‌-ওয়ালাদের লোকটাকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিতে বলিয়া তাঁহারা পদব্রজে তাহার অনুসরণ করিলেন। পুষ্‌পুষ্‌ মুহূর্তমধ্যে তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

প্রভুভক্ত ঘোড়াটি পুষ্‌পুষের সঙ্গে চলিল। তদ্দর্শনে সিদ্দিকা বলিলেন,—"দেখিলেন, বড়দিদি! ঘোড়াটা আপনিই পুষ্‌পুষের সঙ্গে যাইতেছে।"

তা। তাই ত, এইসব ঘোড়া গরু ভালবাসার যতখানি প্রতিদান দিয়া থাকে, মানুষ যদি ইহার দশমাংশও দিত—

সি। তাহা হইলে আপনার ছাত্রীদের অভিভাবকগণ আপনাকে অমন সুন্দর * উপাধিরত্নে ভূষিত করিতেন না।

তা। (উচ্চহাস্যে) ওহো! সেদিনকার কথা তুমি এখনও ভুলিতে পার নাই? তা 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে'। কাহারও কথায় কি আর গায়ে ফোস্কা পড়ে?

সি। গায়ে ফোস্কা না পড়ুক, মনে ফোস্কা পড়ে!

আহারান্তে রাত্রি ১০টার সময় ঊষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত কষ্ট করিয়া বারিয়াতু হইতে তিন চারি মাইল পথ পদব্রজে আসিলে কেন? তোমাদের সে পুষ্‌পুষ্‌ কি হইল?"

তারিণী তখন সেই পথে-কুড়ান আহত ইংরাজের কথা বলিলেন।

কোরেশা বঙ্গভাষায় কথা বলিতে ভালবাসেন; তিনি বলিলেন—"পুষ্‌পুষ্‌-ওয়ালা ভাড়া লইতে আসিলে জানা যাইবে, তাহাকে হাসপাতালে দিয়াছে, না, কোথায়।"

সি। পুষ্‌পুষ্‌-কুলীদের অগ্রিম ভাড়া এবং বখশিশ চুকাইয়া দেওয়া গিয়াছে। তাহারা আর আসিবে না।

কো। মিসিস্‌ সেন! আপ্‌লোক এমন কাচ্চা কাম করিলেন কেন? কুলীরা জখমী লোকটাকে রাস্তা মেঁ ফেলিয়া দিয়া আপ্‌না ঘর গিয়াছি।

তা। পাটনা কিম্বা কলিকাতার ঠিকা-গাড়ীওয়ালা হইলে সেরূপ করিত। রাঁচীর কোল, সাওঁতালেরা এখনও তত সভ্য হয় নাই। যাক্‌, হাসপাতাল ত এখান হইতে অনেক দূরে নহে, আমি এখনই মালীকে পাঠাইয়া সংবাদ আনিতেছি।

পরদিন প্রাত:কালে তারিণী, ঊষা ও সিদ্দিকা সেই আহত ইংরাজটির সংবাদ লইতে গেলেন। তাঁহার পকেটে কিছু টাকা, নোট-বহি ও কার্ড-কেস পাওয়া গিয়াছে। সিদ্দিকা তাঁহার একখানি কার্ড চাহিয়া লইয়া দেখিলেন। কার্ড-দর্শনে তিনি পুনরায় রোমাঞ্চিত হইলেন,—কার্ডে নাম ও ঠিকানা ছিল,—

"মিস্টার চার্লস জেম্‌স্‌ রবিনসন,
প্লেন্টার এণ্ড জমিনডার,
চুয়াডাঙ্গা।"

---

* "বেশ্যা"।

সিদ্দিকা তারিণীর অনুমতি লইয়া হাসপাতালে মিঃ রবিনসনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় রাত্রিবাস করিতেন না, কেবল সমস্ত দিন থাকিতেন। তাঁহার সহিত পালাক্রমে তারিণী ও অপর মহিলাগণ হাসপাতালে থাকিতেন। একদিন রাফিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"মিসিস্ সেন, এবার সিদ্দিকাকে আতুরাশ্রমের ভার দিবেন, রোগীসেবা করিয়া উহার সাধ মিটুক!"

তা। কি করি বোন্। 'নেপাল যাও—কপাল সাথেই'। এখানকার হাসপাতালে যত্ন করিবার তেমন লোক নাই। আমি পদ্মরাগের এই মহৎ দয়াধর্মে বাধা দিতে চাহি না।

একদিন পরেই রবিন্সনের জ্ঞান হইল; তাঁহার মস্তকের আঘাত তত গুরুতর ছিল না। বাহু এবং উরুদেশের আঘাতই সাঙ্ঘাতিক ছিল। তিনি আর্তনাদ করিতেছিলেন, "হায় মৃত্যু! মৃত্যু হয় না কেন?"

রেভারেণ্ড হেনরী হোয়াইট নামক একজন পাদ্রী, রবিনসনকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। রবিনসনের যন্ত্রণা,—শারীরিক ক্ষতের জন্য তত নহে, কিন্তু তাঁহার কলুষিত আত্মা পাপ-তাপে দগ্ধ, সেই যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্ করেন। তিনি পাদ্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন,—"যদি আমি মরিতেছি, তবে আমাকে অবশ্য পাপ স্বীকার করিতে হইবে। আহা! আমি মরিতেছি!! ও হোয়াইট! পিতা! আপনি আমার পাপস্বীকার শুনিবেন?"

হোয়াইট তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। রবিনসন উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তীব্রস্বরে বলিলেন,—"সত্যই আমি মরিব? আমার মরণ বড় শীঘ্র আসিল—"

সিদ্দিকা এক পাত্র দুধ-ব্রাণ্ডি আনিয়া রোগীকে খাইতে দিলেন। রবিনসন বলিলেন,—"নার্স! তুমি জান না, আমি কেমন হৃদয়হীন পাষণ্ড। একবার আমার পাপের বোঝা একটি নিরীহ বালিকার স্কন্ধে দিয়া—তাহাকে মারিয়া,—আমি বাঁচিয়া আছি।"

ছয় দিন হইতে রবিনসন হাসপাতালে আছেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে; আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। অপরাহ্নে শ্বেতশ্মশ্রু রেভারেণ্ড হোয়াইট আসিলেন। রবিনসনকে অধীর দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে বলিলেন।

রবিন। (উচ্চৈঃস্বরে) আমার ঘুম নাই—আমার শান্তি নাই। হোয়াইট, আপনি জানেন না, আমি কি! আমি রাগে অন্ধ হইয়া নরহত্যা করিয়াছি!—

হাঁ, ঐ দেখ, তাহার আত্মা আমাকে ভয় দেখাইতেছে! ও হোয়াইট! আমাকে রক্ষা করুন!—

রোগী এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। ঊষা তাঁহাকে একটু টনিক ঔষধ পান করাইলেন। সিদ্দিকা বাতাস করিতে লাগিলেন।

জ্ঞান হইলে রবিনসন উঠিয়া বসিলেন। বিনীতভাবে পাদ্রীকে বলিলেন, "পিতা, সকলকে বিদায় দিন, কেবল আপনাকে আমার মনের কথা বলিব।" হোয়াইট সকলকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

এখন কেবল পাপী ও পাদ্রী রহিলেন। ইহাদের এই গুণটা বেশ যে, মৃত্যুকালে পাপ স্বীকার করে। ইহাতে পরলোকে মুক্তি হয় কি না, আল্লাহ্ জানেন; কিন্তু আমাদের একটি লাভ এই যে, লোকটার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে পারি।

রবিন। আমি চুয়াডাঙ্গায় অনেক দিন নীলের চাষ করিতেছিলাম। কত লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই দরিদ্র লোকদের অভিশাপে আমার এই দশা হইয়াছে। কত শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র নষ্ট করিয়াছি, সংখ্যা নাই। পাপের মাত্রা ক্রমে গুরু হইতে গুরুতর হইয়া চলিল। শেষে স্থানীয় জমীদার মহম্মদ সোলেমানের নিকট ৫০ বিঘা জমী চাহিলাম। তিনি দিলেন না। ভয় প্রদর্শন করিলাম, তিনি ভীত হইলেন না। তিনি অতি মহৎ লোক ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহী করিতে চেষ্টা করিলাম, তাহাও ব্যর্থ হইল। তখন আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলাম না—আর সহ্য হইল না—

পাদ্রী। তুমি অত উত্তেজিত হইও না, ধীরে ধীরে কথা কও।

রোগীর মাথাটা ঢলিয়া পড়িল। হোয়াইট আর একটা বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার নীচে দিলেন।

র। আমাকে বাধা দিবেন না, বলিতে দিন, যাহা বলিবার আছে, বলিব। ইচ্ছা হইল, সোলেমানকে ডাকিয়া আনিয়া কুকুরের মত গুলী করি! তাহা তখন ঘটিল না। সোলেমানকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলাম, তিনিও সমান সমান উত্তর দিলেন। আমাকে 'সাহেব লোক' মনে করিয়া কিছুমাত্র ভয় করিলেন না। ইহা কি আমার সহ্য হয়? কি?—তিনি কি মোগল রাজ্যে বাস করিতেছিলেন যে, তাঁহার এমন নির্ভীক স্বভাব?

আমি সেই রাত্রে দলবল লইয়া গিয়া প্রথমতঃ সোলেমানের গলা কাটিলাম! তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র আজিজ আমার প্রতি এক খানা ছোরা নিক্ষেপ করিল—

ছোরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। সেই ছোরা লইয়া তাহাকে হত্যা করিলাম!! তাহাকে বধ করা আমার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু সে কেন পিতার হইয়া যুঝিতে আসিল? কেন আমার প্রতি ছোরা নিক্ষেপ করিল? পিতা! ঐ দেখুন সোলেমান!—আমাকে রক্ষা করুন! রক্ষা—

হোয়াইট। ক্ষান্ত হও, আর ও সব কথা বলিও না। এখন শান্ত হও, ঘুমাইতে চেষ্টা কর।

র। না, এখন আর ভয় নাই,—আমি যাহা বলিতেছিলাম, শুনুন, আমি ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিলাম, একটি বালিকাকণ্ঠ আমাকে ইংরাজী ভাষায় শাসন করিয়া বলিল,—"আমি সব দেখিলাম মিঃ রবিন্‌সন্‌! আপনার নিস্তার নাই!" তখন আর ফিরিয়া গিয়া বালিকার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি বীরের মত দ্রুতপদে চলিয়া আসিলাম।

হোয়াইট। (স্বগতঃ) কি বীরত্বের প্রশংসা!

র। পরদিন হইতে তাহাদের ওখানে ডাকাতির তদন্ত আরম্ভ হইল। সোলেমানের ভগ্নী ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সেই আমাকে তিরস্কার করিয়াছিল। আজিজ আমা-কর্ত্তৃক যে ছোরায় নিহত হইয়াছিল, সে ছোরাখানি জয়নব বিবির, এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি জয়নবকেই নরহত্যার জন্য আসামী করিতে চেষ্টা করিলাম।

আমার জনৈক বন্ধু ব্যারিস্টার ছিলেন, তাঁহাকে আমার পাপকার্যে সহায়তা করিবার জন্য ডাকিলাম। ব্যারিস্টার মিঃ লতীফ আল্‌মাস্‌ আমার অভিসন্ধি অবগত হইয়া খুব উৎসাহের সহিত জয়নবকে আসামী সাজাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি রাত্রিকালে ছদ্মবেশে সোলেমানের বাড়ী গিয়া দেখিলেন, জয়নব চিতা সাজাইয়া মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছে। সে সময় মিঃ আল্‌মাস্‌ তাহাকে রক্ষা করিলেন। পরদিন তাহার আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। হয়-ত সে অগাধ জলে ডুবিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে। পিতা—

রবিন্‌সন্‌ হঠাৎ নীরব হইলেন। তিনি ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। আবার চীৎকার করিয়া বলিলেন—"পিতা, পিতা! আমায় রক্ষা করুন। আপনি কি মনে করেন, আমি মুক্তি পাইব? আহা! না,—আমার মুক্তি কোথায়?"

হোয়াইট অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চয় মুক্তি পাইবে, ঈশ্বর দয়ার সাগর।" রোগী ক্ষীণ করুণ স্বরে বলিলেন,—

"নরহত্যা করিয়া আমার যত পরিতাপ হইতেছে, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ পরিতাপ জয়নবের জন্য হয়। আমি তাহাকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছি। আমি কেন সে নির্দোষ বালিকার প্রতি অত্যাচার করিলাম ?"

হোয়াইট। তবে এখন তুমি কি করিতে চাও? কি করিতে পারিলে তোমার মনে সান্ত্বনা হইবে ?

র। আমি চাই—জয়নব জীবিত আছে, ভাল আছে,—এই কথা শুনিতে। তাহা হইলে সুখে মরিতে পারি।

হো। তুমি আমাকে যাহা বলিলে, এ সব কথা লিখিয়া দিলে জয়নবের উপকার হইতে পারে। লিখিবে ?

র। অবশ্য আমি লিখিব। কাগজ কলম দাও।

লিখিবার সরঞ্জাম আনীত হইলে রবিন্‌সন্ কম্পিতহস্তে লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—লিখিতে না পারিয়া হোয়াইটকে বলিলেন,—"আপনি লিখুন, আমি বলিয়া যাই। পরে আমি স্বাক্ষর করিব।"

তাহাই হইল। সে দিন স্বাক্ষর করা হইল না, কারণ রাত্রি হইয়াছিল। পরদিন দুইজন বিশ্বস্ত উকিল ও ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে রবিন্‌সন্ স্বাক্ষর করিলেন।

অদ্য রবিন্‌সনের অবস্থা বড় শোচনীয়। তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, —পাপী হউক, পাষণ্ড হউক,—যেই হউক, সে এখন মরিতেছে। ক্রমশঃ রবিন্‌সনের ব্যস্ততা বৃদ্ধি হইল—তিনি কেবল এ-পাশ ও-পাশ করিতেছেন আর সময় সময় বলিতেছেন—"জয়নব, তুমি কোথায়? তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি, তাহার যথেষ্ট প্রতিফল পাইলাম।" কতক্ষণ পরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে আছ? তোমরা কেহ জয়নবের সংবাদ বলিতে পার?—এ অন্তিমকালে আমাকে শান্তি দিতে পার?"

সি। আপনি যাহা চাহেন, তাহাই পাইবেন। আপনি আরোগ্যলাভ করুন।

র। (বিকটহাস্যে) আরোগ্যলাভ?—আর না। যাহা চাই, তাহাই দিবে? আচ্ছা, জয়নবের সংবাদ দাও দেখি।

সি। শুনুন, আমি নিশ্চয় জানি, জয়নব জীবিত আছে। সুখে নিরাপদে আছে।

র। (পূর্ববৎ হাসিয়া) আহা! পরদুঃখকাতরা বালিকা! তুমি আমাকে ঠকাইবে? অমন মনগড়া দুই চারি কথা কে না বলিতে পারে?

সি। আপনি কি প্রমাণ চাহেন? সে জয়নব রাঁচীতেই আছে।

র। আমি তাহাকে দেখিতে চাহি।

সি। দেখিলে আপনি চিনিবেন? আপনি তাহাকে কখনও দেখিয়াছেন কি?

র। তাহার কথা শুনিয়াছিলাম; কণ্ঠস্বর চিনিব বলিয়া বিশ্বাস হয়।

সি। ইহাও আপনার ভুল। প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার তাহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা আবার চিনিবেন? তবে চিনিতে পারেন কই?

এবার রোগী বিস্ফারিত-নয়নে সিদ্দিকার মুখপানে চাহিলেন, যেন চিনিতে চেষ্টা করিতেছেন। পরে বলিলেন, "তুমি কিরূপে জান যে তিন বৎসর পূর্বে আমি তাহার কথা শুনিয়াছিলাম?"

সি। জয়নব আমাকে জানাইয়াছে।

র। (সহসা সিদ্দিকার হাত ধরিয়া) এখন বুঝিলাম,—তুমি—তুমি সেই জয়নব। হাঁ বুঝিয়াছি! বল, তুমি নিজ মুখে বল যে, তুমি জয়নব, তবে আমি হাত ছাড়িব।

সি। যদি এই কথার উপর আপনার শান্তি নির্ভর করে, তবে বলি,—আমি সেই অভাগিনী জয়নব।

র। (সিদ্দিকার হাত ছাড়িয়া) আমাকে প্রতারণা করিলে না ত?

সি। আপনার সন্দেহ দূর করিবার জন্য যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।

র। তবে সত্যই তুমি জয়নব। বল, তুমি কিরূপে পলায়ন করিয়াছিলে? আর এখানে কিরূপে আসিলে?

সি। আমি ভ্রাতার ইংরাজী পোষাক পরিয়া ছদ্মবেশে একখানি সাড়ী ও কয়েক শত টাকা একটা হ্যাণ্ডব্যাগে লইয়া বাহির হই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বহির্বাটিতে একটা পাল্কী উপস্থিত ছিল, তাহাতেই আমি স্টেশনে গেলাম। তাড়াতাড়ি যাইয়া ট্রেন পাইলাম। সেই গাড়ীতে নৈহাটীতে আসি। সেখান হইতে হুগলী যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ট্রেন ফেল হওয়ায় সেইখানে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হই। আমি অন্যমনস্কভাবে পদচারণা করিতে করিতে একটা মসজিদের পার্শ্বে আসিয়া পড়ি। সেই পথে তারিণী বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষয়িত্রী,—মিসিস্ ঊষারাণী চ্যাটার্জি, মিসিস্ হরিমতি ঘোষ ও মিস্ বিভা চক্রবর্তী যাইতেছিলেন; তাঁহাদিগকে আমার কল্পিতা ভগিনীকে আশ্রয় দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলাম।

হোয়াইট সেই কক্ষের এক কোণে দাঁড়াইয়া রোগী ও সেবিকার কথাবার্ত্তা মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। সিদ্দিকাকে থামিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"বলিয়া যান, ইতস্তত: করিবেন না। রবিন্‌সন্‌ আর বেশীক্ষণ বাঁচিবেন না।"

সি। তাঁহারা আশ্রয়দানে সম্মতা হইলে আমি সন্ধ্যার ট্রেনে কলিকাতায় গেলাম। ঠিকাগাড়ীতে বসিয়া পুরুষ-বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শাড়ী পরিলাম। এইরূপে আমি তারিণী-ভবনে আসিয়াছি। এতকাল ইঁহারা আমাকে 'সিদ্দিকা' নামে জানিতেন,—আজি আমার প্রকৃত পরিচয় জানিলেন।

সিদ্দিকার গল্প শুনিয়া তারিণী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ যুগপৎ বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। এখন তাঁহারা বুঝিলেন, কেন তারিণী-ভবনের কোন লোক সিদ্দিকার 'ভাই'কে দেখিতে পায় নাই।

র। জয়নব! তুমি আছ, দেখিলাম। এখন আমি সুখে মরিতে পারি। তুমি কিন্তু আশাতীত ঋণ শোধ করিলে। আমি তোমার অশান্তির কারণ হইয়াছিলাম, তুমি আমার শান্তির কারণ হইলে,—স্বহস্তে আমার সেবা করিলে! তুমি ধন্য! তুমি বীরবালা!! আমি তোমাকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দিব।

সি। আমি আপনার এক পয়সাও লইব না। আপনার অন্তিমকালে শুশ্রূষা করিতে পারিলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। এত দিনে আপনার ঋণ শোধ হইল।

র। (পাদ্রীর প্রতি) পিতা! হোয়াইট! এখন আর পার্থিব চিন্তা নাই। পিতা! নিকটে আসুন! এখন আমার আর কোন দু:খ নাই—আর—আমার জন্য প্রার্থনা—

রবিন্‌সন্‌ আর কথা কহিতে পারিলেন না। শয্যায় এলাইয়া পড়িলেন। আর উঠিলেন না—সব শেষ হইয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

সুবর্ণরেখা

তারিণী সদলবলে সুবর্ণরেখা নদীর পুলে বেড়াইতে আসিয়াছেন। অপরাহ্ণ চারিটার সময় সেতুর উপর দিয়া ট্রেন যাইবে, ইঁহারা নীচে থাকিয়া সে দৃশ্য দেখিবেন। পুষ্পুষের কুলীরা বলিয়া গেল যে তাহারা সন্ধ্যা ছয়টায় আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে।

সুবর্ণরেখা এ সময় বর্ষাকালের মত খরস্রোতা না হইলেও তাহার স্রোত এখনও যথেষ্ট বেগবতী। নদী গভীর নহে—সমস্ত নদীর জল 'হরে দরে হাঁটু জল' হইবে, কিন্তু স্রোতের বেগ কি ভীষণ! এ নদী পাহাড়ের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাহাড় উচ্চ নহে, বড় বড় শিলাখণ্ড বিশেষ। নদীতল কর্দম ও উপল খণ্ডে পরিপূর্ণ। নদী প্রশস্তও নহে। এই অল্প-পরিসর নদীটুকু কেহ পদব্রজে পার হইতে পারে না বলিয়া ইহার উপর সেতু নির্মিত হইয়াছে। ট্রেনও এই পুলের উপর দিয়া চলে।

তারিণী সেতুর নিম্নে বালির উপর বড় একটা শতরঞ্জি পাতিয়া সকলকে লইয়া বসিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উষা, কোরেশা ও সিদ্দিকা নদীর জলে নামিলেন। সিদ্দিকা এখন পূর্ববৎ সে গভীর চিন্তামগ্না বিষাদময়ী মূর্তি নহেন। রবিনসনের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার এই শুভ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন তিনি সদানন্দা হাস্যময়ী কিশোরী,—তাঁহার প্রফুল্লতা, হাসির ফোয়ারা ও স্ফূর্তি দেখে কে! সেতুর অনতিদূরে একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিলেন। তাঁহার বিলম্বিত চরণযুগলের উপর দিয়া ঊর্মিমালা বহিয়া যাইতে লাগিল। উষা ও কোরেশা কিঞ্চিৎ দূরে অপর দুই খণ্ড শিলায় উপবেশন করিলেন।

সায়াহ্ণ উপাসনার সময় যৎকালে রাফিয়া ও কোরেশা তারিণীর শতরঞ্জির উপর নামাজ পড়িলেন, সিদ্দিকা সেই শিলাখণ্ডের উপর উপাসনা সমাপ্ত করিলেন। তারিণী সোৎসুকে দেখিতেছিলেন যে, উচ্ছ্বসিত বীচিমালা আসিয়া সিদ্দিকাকে ভিজাইয়া না দেয়। ঊর্মিমালা "ধরি ধরি" করিয়াও সিদ্দিকাকে ধরিতে পারিল না!

কুলিরা তখনও আসিল না। অদ্য কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি, শশাঙ্ক বিলম্বে উদিত হইবে। এই সব ভাবনায় তারিণী উদ্বিগ্ন হইলেন। সেই সময় দেখেন, কোথা হইতে লতীফ আসিয়া উপস্থিত। তারিণী সহর্ষে তাঁহাকে অভিবাদন

করিয়া বসিতে বলিলেন। মাত্র চারি পাঁচ দিন হইল, তিনি রাঁচি আসিয়াছেন। পুষ্পুষ্ আসে নাই শুনিয়া লতীফ বলিলেন,—

"সে জন্য কোন চিন্তা নাই, আপনারা দুইবারে আমার মোটরে যাইবেন। আর একটু বসুন।"

রাফিয়া ও তারিণীর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর লতীফও জুতা মোজা খুলিয়া জলে নামিলেন। তিনি সিদ্দিকার নিকট গেলেন না; কারণ কয়েক মাস হইল, সিদ্দিকা তাঁহার চিঠির উত্তরে যে নিষ্ঠুর পত্র লিখিয়াছেন, তাহা লতীফ অদ্যাপি ভুলেন নাই। তিনি ঊষার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দিদি! ছেলেটিকে (অর্থাৎ কোরেশার তিন বৎসরের পুত্রটিকে) সাবধানে রাখিবে, এ স্রোতের মুখে পড়িলে আর রক্ষা নাই।"

কোরেশা। এখানে আর ডুবিয়া মরিতে হয় না।

উ। ডুবিবে না সত্য, কিন্তু জলের স্রোত এমন ভীষণ যে শিলাখণ্ডের উপর আছাড় খাইতে খাইতে মরিতে হইবে।

লতীফ বসিবার জন্য স্বীয় ছড়ির সাহায্যে একখণ্ড সুবিধাজনক প্রস্তরের অনুসন্ধান করিতে করিতে কিরূপে সিদ্দিকাব উপবিষ্ট প্রস্তরখণ্ডে আসিয়া বসিলেন, তাহা তিনি বুঝিতেই পারেন নাই। তাঁহারা উভয়ে কল্লোলিনীর মধুর সঙ্গীত শ্রবণে আত্মহারা হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহার নৃত্যশোভা দেখিতেছিলেন। এই সুবর্ণরেখা নদীটি তাঁহাদের নীরব প্রেমের অতি সুন্দর মনোরম উপমা—নদী দিবানিশি অবিশ্রান্ত পাহাড়ের চরণে মাথা ঠুকিয়া মরিতেছে,—আর পাহাড় তাহার তরঙ্গ-প্রেমাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত—চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া শতধা হইতেছে। এই যে মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন—ইহা বড় চমৎকার! বড় চিত্তহারী!!

এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কখন্ যে শশী গগনে উদিত হইল, তাহা কেহ জানিতেই পারিলেন না! কোথা হইতে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া সুধাকরকে আচ্ছন্ন করিল। কিছুক্ষণ পরে লতীফ বলিলেন, "এই নদীর মত অনেক বোকা লোকই পাথরে মাথা ঠুকিয়া মরে।"

প্রসন্নবদনা সিদ্দিকা উত্তর দিলেন, "আর পাথর বুঝি চূর্ণ হয় না?"

ল। কিন্তু সাধারণ প্রস্তর অপেক্ষা পদ্মরাগ একটু বেশী মজবুত—

"সেই জন্যই ত পদ্মরাগ এখনও টিকিয়া আছে।"

লতীফ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, তারিণী! তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—তারিণী ওরূপ কথা কেন বলিলেন।

তারিণী হয়-ত তাঁহার কথাটিও শুনিয়াছেন, ভাবিয়া সিদ্দিকাও অতিশয় লজ্জিতা হইলেন।

গগনে পূর্ণচন্দ্র সহসা মেঘমুক্ত হইয়া সকলের মুখের উপর খানিকটা উজ্জ্বল চন্দ্রিকা ঢালিয়া দিল। তারিণী সেই সুযোগে লতীফ ও সিদ্দিকার অপ্রতিভ মুখভাব দেখিয়া আমোদ অনুভব করিলেন। অতঃপর বলিলেন, "চল পদ্মরাগ, পুষ্পুষ্ আসিয়াছে।"

তাঁহারা সকলে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া লতীফ ভাবিলেন, তারিণীর সহিত এ সময় একটিও কথা না বলা অভদ্রতা হইয়াছে। তাই তিনি ত্বরিতপদে জল ছিটাইতে ছিটাইতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "শুনিলাম, মিসিস্ সেন! আপনারা না কি সেদিন আবার একজন আহত লোক কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন?"

তা। হাঁ মিঃ আল্‌মাস্। ঢেঁকীর আর অন্য কাজ কি আছে?

ল। ঈশানবাবু বলেন, আপনি যেখানেই যান, হাসপাতাল আপনার সঙ্গে যায়।

তা। এবার আমার সঙ্গে হাসপাতাল নাই; সেই আহত ইংরাজটিকে স্থানীয় হাসপাতালে দিয়াছিলাম। আজি চারিদিন হইল বেচারা মারা গিয়াছেন।

ল। আপনারা প্রত্যহ তাঁহাকে দুই বেলা দেখিতে যাইতেন, এবং আপনার সঙ্গিনীগণ হাসপাতালে গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

তা। আপনি এত সংবাদ কোথায় পাইলেন?

ল। সমস্ত রাঁচিময় এ কথা রাষ্ট্র। ফুলের সৌরভ কি প্রচ্ছন্ন থাকে?

রাফিয়া। (সিদ্দিকার কানে কানে) সেইজন্য দুষ্ট ভ্রমর পদে পদে অনুসরণ করে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব-প্রেমিকা

বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের সময় তারিণী-ভবনের বাড়ী মেরামত হইয়াছে। এখন জিনিস-পত্র যথাস্থানে গুছাইয়া রাখা হইতেছে। অদ্য সিদ্দিকা দুইজন পরিচারিকার সাহায্যে পাঠাগারের একটি আলমারীতে পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেছেন। বেলা তখন অপরাহ্ণ। তাঁহার মাথার উপর হইতে অঞ্চল সরিয়া পড়িয়াছে, আলুলায়িত অলকগুচ্ছ বৈদ্যুতিক পাখার গরম বাতাসের তাড়নায় বিক্ষিপ্ত হইতেছে; কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি একাগ্রচিত্তে তালিকার সহিত পুস্তকগুলি মিলাইয়া লইতেছেন।

তারিণী বসিবার ঘরে কয়েকজন মহিলা অতিথির অভ্যর্থনায় ব্যস্ত আছেন। এই সময় তাঁহার বালক-ভৃত্য কোন ভদ্রলোকের আগমন সংবাদ দিল। তিনি বালককে বলিলেন, "আফিস কামরা ত বড় অগোছাল রহিয়াছে, ভদ্রলোককে পাঠাগারে বসাও; আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

আদম শরীফ* তদনুসারে অভ্যাগতকে পাঠাগারে লইয়া গেল। তথায় তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনয়নে সিদ্দিকার পুস্তক সাজান দেখিতে লাগিলেন। পরিচারিকাদ্বয় সিদ্দিকাকে সাবধান করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভদ্রলোকটি তাহাদিগকে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন। সিদ্দিকা এমন তন্ময় ছিলেন যে, তাহাদের মৃদু হাস্য এবং চক্ষুর ইঙ্গিত দেখিতে পান নাই। অবশেষে আগন্তুক বলিলেন,—

"সিদ্দিকা, এখন তুমি যোগ শিক্ষা করিতেছ না কি? বড় যে গম্ভীর ভাব দেখি।"

সিদ্দিকা চমকিয়া উঠিয়া এবং ত্রস্তভাবে বস্ত্রাঞ্চল সম্বরণ করিয়া, "এ কি, আপনি এখানে!—বসুন!" বলিয়া আবার পুস্তকসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন।

লতীফ। অতিথির অভ্যর্থনা এই রূপেই হয় নাকি?

সিদ্দিকা। (নম্রস্বরে) ক্ষমা করিবেন, আমার কাজ শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আর আপনি ত আমার অতিথি নহেন!

লতীফ এখন সিদ্দিকার প্রকৃত পরিচয় অবগত আছেন। এই সিদ্দিকা—যাঁহাকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাসেন—তাঁহার সেই ধর্মপত্নী জয়নব। সেইজন্য

---

* বালক-ভৃত্যের নাম "আদমংশরীফ"। গাঞ্জামের (মাদ্রাজের) মুসলমানদের নাম ঐ ধরণের হইয়া থাকে। তত্রত্য জেলেনীদের নাম আরও অদ্ভুত, যথা—'ভাণ্ডাসী'।

অদ্য তিনি একটু জোর করিয়া সিদ্দিকার সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইলেন। সিদ্দিকা অগত্যা তাঁহার সহিত "তুমি" সম্বোধনে কথাবার্তা বলিতে সম্মতা হইলেন। এই যৎসামান্য জয়লাভের পর লতীফ বলিলেন,—

"প্রায় আট মাস পরে দেখা হইল, তবু ত তুমি যথোপযুক্ত আগ্রহের সহিত আমায় স্বাগত সম্ভাষণ করিলে না।"

সি। তুমি এতটা আশা করিলে কেন? তুমিই ত একমাত্র স্নেহভাজন বা চিন্তার বিষয় নহ। যাহার হৃদয়ে কেবল একজনের স্থান থাকে, সে তাহাকে ষোল আনা যত্ন দিতে পারে; যাহার চারিজন বন্ধু থাকে, সে প্রত্যেককে চারি আনা দিবে। এইরূপ যাহার প্রেমে যত বেশী অংশী থাকে, তাহার প্রেমের ভাগ প্রত্যেকের জন্য ততই কম হইয়া পড়ে। হৃদয়টি সীমাবদ্ধ, তাহার পরিমাণ বাড়িতে পারে না। তুমি এ বিশ্ব-প্রেমিকার নিকট এক পয়সা,—না,—এক পাই পরিমিত স্নেহের অধিক আশা করিতে পার না। কত 'পথে কুড়ান' লোকের কথা আমাকে ভাবিতে হয়।

ল। আমি এখন তোমার সেরূপ 'পথে কুড়ান লোকের' তালিকায় নহি। তুমি যাহা বলিলে, তাহা অপরের পক্ষে খাটে—আমার সম্বন্ধে নহে। আমি তোমার নিকট—ষোল আনা না হউক,—একটু অধিক যত্নের আশা করি,—না, দাবী করি; আর তোমার বক্তৃতার উত্তরে বলি, হৃদয় সীমাবদ্ধ হইবে কেন? বিশেষত: বিশ্ব-প্রেমিকার হৃদয় সীমাবদ্ধ হইলে বিশ্ব স্থা[illegible]াইবে কোথায়?

সি। যে স্থান আছে, তাহাতেই থাকিবে। যেখানে—যে ঘরে—পাঁচটি কামরায় দশ জন থাকিত, সেই পাঁচ ঘরে পাঁচশত জনও থাকিবে। এই জন্য স্থান অবশ্য কম হইবে, এবং যত্নের ভাগে টানাটানি পড়িবে।

ল। তর্ক করিতে ইচ্ছুক ছিলে বটে, কিন্তু পারিলে না। না, হৃদয় সীমাবদ্ধ নহে। উহা অনলের মত, যত বাতি জ্বালাও—সমভাবে জ্বলিবে। যত পতঙ্গ পোড়াইতে পার—পুড়িবে।

সি। (স্মিতমুখে) দগ্ধ পতঙ্গের প্রতি দয়া হয় বটে; কিন্তু ইহাও বলি, পতঙ্গের কি কোন দোষ নাই?

ল। দোষ আছে বই কি। সর্বাপেক্ষা প্রধান দোষ এই যে, সে সৌন্দর্য-ভিখারী—প্রেমের ভিখারী। সুতরাং ভিক্ষুকের লাঞ্ছনাই তাহার উপযুক্ত প্রাপ্য। সেইজন্য সে প্রাণদানে প্রায়শ্চিত্ত করে।

সি। ইহা অত্যন্ত দু:খের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু উপায় কি—

বুলবুলে দিলেন প্রভু সুমধুর স্বর,
পতঙ্গের ভাগ্যে হ'ল পুড়িয়া মরণ ;
দিলেন আমার ভাগে শোক-নিপীড়ন,
দেখিলেন,—সব হ'তে যাহা কষ্টকর। *

ল। আর আমার ভাগে দিয়াছেন, মরীচিকার অনুসরণ করা।

সি। যদি জানই "মরীচিকা," তবে বৃথা অনুসরণ কেন ? তোমার জীবনে কি অন্য কাজ নাই ?

ল। মানুষের মন যদি সুবোধ বালকের মত যুক্তি-তর্কের বশীভূত হইত তবে এ পাপ পৃথিবী হইতে অর্দ্ধেক যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইত। যাহা হউক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এখন আমার সিদ্দিকা-লাভে কোন অন্তরায় নাই।

সি। আবার বৃথা আশা। তা তুমি বাতাসে ঘর বাঁধিতেছ—বাঁধ। যত উচ্চ দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে চাও—কর।

ল। আর তোমার ইচ্ছা হইলে আমার অতি সাধের অট্টালিকা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিও।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধির চেষ্টা

"শুন পদ্মরাগ, আমি ত তোমার সহিত কৌতুক পরিহাস করি না, অতি গম্ভীরভাবে বলিতেছি, তুমি সন্ধি করিয়া লও।"

তারিণীর বসিবার ঘরে ঊষা, সিদ্দিকা ও সৌদামিনী গল্প করিতেছিলেন। রবিবার—অবসরের দিন, সুতরাং তাঁহারা খোশগল্প করিতেছিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে তারিণী "মুসলমান" নামক দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র দেখিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ইঁহাদের গল্পে যোগদান করিতেছিলেন। উপরোক্ত কথাগুলি তিনিই বলিলেন।

---

* "বুলবুল কো দিয়া নালা—পরওয়ানে কো জল্‌না,
গম,—হাম কো দিয়া, সব সে যো মুস্কিল নজর আয়া।"

সিদ্দিকা। এ ক্ষেত্রে ত যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই, তবে আর 'সন্ধি' কিসের, বড় দিদি ?

তারিণী। পূর্বে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল—তোমার বিবাহ, বরপক্ষের দুর্ব্যবহার, তুমি সে সব সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও। এখন একটি নূতন মানুষ মিঃ লতীফ আলমাসকে বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালন কর।

সি। নূতন পুরাতন সব একাকার হইয়া গিয়াছে; 'সংসারধর্ম' আমার জন্য নহে। সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না পাওয়ার জন্য 'পদাঘাতে বিতাড়িত' হইয়াছিলাম, সে অবমাননা কি করিয়া ভুলিব ? তাঁহারা আমার সম্পত্তি চাহিয়াছিলেন,—আমাকে চাহেন নাই! আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন ? আমি সমাজকে দেখাইতে চাই যে, 'সুযোগ' জীবনে একবার ছাড়া দুইবার পাওয়া যায় না;—তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সে দিন আর নাই।* আমি আজীবন তারিণী-ভবনের সেবা করিয়া নারী-জাতির কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব।

তা। না, না, না! তারিণী-ভবন এত বড় মহামূল্য জীবনের 'বলি' পাইবার উপযুক্ত নহে। সে রাক্ষসী নহে!

সৌদামিনী। তুমি বরং সংসারী হইয়া তারিণী-ভবনের সেবা অধিক পরিমাণে করিতে পারিবে। এই ত তারিণী-বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রীগণ,—শাহিদা, রেজিয়া বানু, তরঙ্গিনী, জ্ঞানদা—ইঁহারা পূর্ণমাত্রায় তারিণী-ভবনের সেবা করিতেছেন। পরন্তু ইঁহারা সকলেই স্বামীপুত্র লইয়া পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। কেবল বানুর শাশুড়ীটা একটু খিট্‌খিটে মেজাজের লোক, কিন্তু বানুর স্বামী একটি রত্নবিশেষ। আমরা তোমার দ্বারা মিঃ আল্‌মাস্‌-রূপ রত্নের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশা করি।

তা। হাঁ, আমরা তাহাই পরম লাভ জ্ঞান করিব। আমাদের কথা রাখ, পদ্মরাগ!

সি। বড় দুঃখের বিষয়, বড় দিদি! আপনিও ঐ কথা বলেন ? আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকু'মাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, "আর রাখ তোমার পণ ও তেজ—ঐ দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনার

* "মতিচুর" ২য় খণ্ডের "নারীসৃষ্টি" গল্পের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পরে জয়নব আবার স্বামী-সেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।" আর পুরুষ-সমাজ সগর্বে বলিবেন, "নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী, গরীয়সী হউক না কেন,—ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে।" আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী-জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে। পক্ষান্তরে আমার এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আশা করি।

তারিণী আসন ত্যাগ করিয়া আসিয়া সিদ্দিকার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ধন্য মেয়ে! ভবিষ্যৎ নারীজাতির কল্যাণের নিমিত্ত এইরূপ আত্মোৎসর্গেরই প্রয়োজন। বাঞ্ছনীয় বিষয় যত মূল্যবান, তাহার জন্য উৎসর্গও ততই মহার্ঘ হওয়া চাই! অবশ্য ঈশ্বর অন্ধ ও বধির নহেন,—সকিনার জীবনপাত, জয়নবের আত্ম-বলিদান কখনও বিফল হইবে না। ভারত মাতা! কে বলে তুই দীনা কাঙ্গালিনী? তোর এ হেন দুহিতারত্ন থাকিতে তুই কিসের ভিখারিণী?"

উষা। এই যে 'পতি পরম গুরু'—এই ভাবটাই মারাত্মক। পুরুষ যাহাই করুন না কেন,—অবলা সরলার জন্য 'পতি পরম গুরু' 'পতি বিনে নাই গতি'। কেন বাপু? এত বড় বিশাল ধরণী কি তোমাদেরই একচেটিয়া বাসস্থান?

সৌ। সিদ্দিকার এই মহান্ আত্মত্যাগের ফলে মুসলমান পুরুষগণ ভবিষ্যতে কোন 'আক্‌দ' করা মেয়েকে উপেক্ষা-রূপ পদাঘাত করিবার পূর্বে অন্ততঃ একটু ইতস্ততঃ করিবে। আর বিবাহ যেন সম্পত্তি ও অলঙ্কারের জন্য না হয়। কন্যা পণ্যদ্রব্য নহে যে, তাহার সঙ্গে মোটর গাড়ী ও তেতালা বাড়ী 'ফাউ' দিতে হইবে। বেশ বোন্ পদ্মরাগ,—

তবে এই অশ্রুধারা
প্লাবিত করিবে ধরা,
সাহারা উর্বরা করি' ফলাবে সুফল!

সি। আমি তারিণী-ভবনেরও বদনাম করিব না যে 'যত লক্ষ্মীছাড়ীর দল ঐখানে গিয়া জুটিয়াছে।' আমি চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া যাইব। আমার অষ্টমবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র যতদিন 'সাবালক' না হয়, ততদিন তাহার এবং জমীদারির তত্ত্বাবধান করিব; আর সেই সঙ্গে পতিত মুসলমান-সমাজের ললনাবৃন্দকে জাগ্রত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

সৌ। কিন্তু মিঃ আল্‌মাস্ তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তাঁহার জীবনটা অভিশপ্ত করিবে ?

সি। তা আর কি করা যায় ? (অতি নিম্নস্বরে)—না হয় প্রতিদানে আমিও তাঁহাকে ভালবাসিব।

সেই সময় আদম শরীফ আসিয়া লতীফের আগমন-সংবাদ দিল। তারিণী হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ আল্‌মাস্ আসিয়াছেন, এখন তোমরা সম্মুখ-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা কর।"

উ। কি বল পদ্মরাগ, সম্মুখীন হইতে পারিবে ?

সি। সম্মুখ-সমরে সিদ্দিকা পরাঙ্মুখ নহে।

তা। (ভৃত্যের প্রতি) সাহেব কো সালাম দেও।

সৌ। আমি মিঃ আল্‌মাসের পক্ষাবলম্বন করিব।

উ। আমিও তাঁহার সমর্থন করিব।

তা। তাহা হইলে বেচারী পদ্মরাগ যে একেবারে একেলা হইবে।

সৌ। তুমি উঁহার পক্ষে থাকিও।

তা। আমি কোন পক্ষেই থাকিতে পারি না—আমি নিরপেক্ষ।

উ। তবে অদ্য পদ্মরাগের অনল-পরীক্ষা।

সি। 'তামাম্ জাহান যদি হয় এক দিকে,
কি করিতে পারে তার আল্লাহ্ যদি থাকে।'

লতীফ আসিয়া পড়িলেন। যথাবিধি নমস্কার, প্রতি-নমস্কারের পর এদিক্-ওদিক্‌কার দুই চারি কথা বলিয়া তারিণী কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। লতীফও এই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি ঊষাকে বলিলেন,—

"দিদি! শুনিয়াছি মিঃ রবিন্‌সনের মৃত্যুকালে তথায় জয়নব উপস্থিত ছিলেন; পরে তিনি কোথায় গিয়াছেন, বল ত।"

উ। জয়নব বিবির সন্ধান আমি কি জানি ?

ল। ছি দিদি। 'পথে কুড়ান' ভাইকে কি ছলনা করতে আছে ?

উ। সেই জন্য বাস্তবিক ছোট ভাইয়ের মত কথায় কথায় আব্দার কর ! এখন তোমার বায়না কোথাকার জয়নব বিবির সন্ধান বলিতে হইবে।

ল। বড় ভগিনীর মত আদর কর বলিয়া 'আদুরে' হইয়াছি। লক্ষ্মী দিদিটি আমার। এখন আমার আব্দার রক্ষা কর।

সৌ। কিন্তু সে জয়নব বিবির জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

ল। যেহেতু তিনি আমার বিবাহিতা পত্নী।

সি। ওঃ! সেই জন্যই তাঁহার খোঁজ রাখেন না।

সৌ। দেখ বোন, সত্য কথা শ্রুতিকটু হইলেও আমি একটা সত্য কথা বলিব। উনি এখন তোমারই খোঁজে ব্যস্ত আছেন, তাই ধর্মপত্নীর সংবাদ রাখেন না।

এ কথা শুনিয়া লতীফ লজ্জিত হইলেন; সিদ্দিকার বদনমণ্ডলও পদ্মরাগবৎ আরক্ত হইল। লতীফ বলিলেন,—

"দিদি! আর অনুযোগ করিও না, এখন খোঁজ লইতেই আসিয়াছি।"

সৌ। 'খোঁজ লইতে আসা'—তা চুয়াডাঙ্গায় না গিয়া এখানে কেন?

ল। তিনি এখন চুয়াডাঙ্গার বাহিরে।

উ। আর তারিণী-বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে।

ল। (সিদ্দিকার দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া) ঠিক তারিণী-বিদ্যালয়ের না হউক, তারিণী-কর্মালয়ের অভ্যন্তরে বটেন।

সৌ। (উচ্চহাস্যে) এ অপবাদ মন্দ নহে—যত লোকের বউ হারাইবে, তাহারা তারিণী-ভবনে খানাতল্লাসী করিতে আসিবে। আমরা কি লোকের বউ-ঝি-চোর?

ল। আমাকে জোনাব আলী নানা বলিয়াছেন—"তারিণী-ভবনে গফুরের স্ত্রী (সকিনা খানম) আছেন, মুজফ্ফরের স্ত্রী (রাফিয়া বেগম) আছেন; দেখ গিয়া—তোমারটিও সেইখানে আছেন।"

উ। তাহা হইলে একবার সদলবলে তারিণী-ভবন আক্রমণ করিয়া দেখ!

ল। তোমরা ধর্মতঃ বল দেখি, জয়নব এখানে নাই কি?

সৌ। এখানে মাত্র কয়েকটি মুসলমান মহিলা আছেন, যথা—কোরেশাবি, জা'ফরী—

ল। আহা! তাঁহাদের পরিচয় ত সকলেরই জানা আছে। এখানে অজ্ঞাত-কুলশীলা কেবল সিদ্দিকা। লোকে উকিল ব্যারিষ্টারদের বদনাম করে যে, তাহারা নাকি সত্যকে মিথ্যা—কালোকে সাদা বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়—

উ। বদনাম কেন দাদা, অতি সত্য কথা;—এই ত এখনই তুমি সিদ্দিকাকে জয়নব বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছ।

ল। আর তোমরা সমভাবে তাহার বিপক্ষতা করিতেছ! যাহা হউক, সিদ্দিকা কি আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ অস্বীকার করেন? তাহা যে দিবাকরের ন্যায় সত্য ঘটনা।

উ। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। জয়নবের সহিত তোমার বিবাহ ব্যাপার ত তোমার পিতৃব্যের ইচ্ছায় হইয়াছিল—আবার তাঁহারই ইচ্ছায় পণ্ড হইয়াছিল; তাহাতে তোমার নিজের কোন মতামত ছিল না। তবে আর এ বিষয় লইয়া এখন তুমি মাথা ঘামাও কেন?

ল। আমাদের বিবাহ ত পণ্ড হয় নাই—তাহা পণ্ড করাও অপরের ক্ষমতার বাহিরে।

উ। কিন্তু তোমার পিতৃব্যই ত সর্বেসর্বা ছিলেন—তাঁহার সম্মুখে তুমি একটা সাক্ষীগোপাল মাত্র। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমার দ্বারাই বিবাহ ভঙ্গ করাইয়া দিতেন।

ল। পিতৃব্য কি করিতেন, না করিতেন, সে কথা লইয়া এখন তর্ক করা বৃথা। ফল কথা, আমাদের বিবাহ অটুট রহিয়াছে।

সি। উষা-দি'। আমি বলি, তুমি হাতের চুড়িটা ভাঙ্গিবার জন্য দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ, পদদলিত করিয়াছ,—কিন্তু যদি পরমায়ু-বলে চুড়িটা না ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে আর তাহাকে কুড়াইয়া লইতে চেষ্টা কেন?

ল। ইহা তোমার ভুল—চুড়ি ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই, দুর্ঘটনা বশতঃ হস্তস্খলিত হইয়াছিল; কিন্তু উষাদিদির ভাগ্যবলে ভাঙ্গে নাই। এখন তিনি পরম আগ্রহের সহিত উহাকে তুলিয়া লইবেন—ইহাই স্বাভাবিক।

সৌদামিনী সিদ্দিকার মুখের প্রতি চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে কোন ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। তখন মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "আশা করি, তোমার আর কোন উত্তর নাই; সুতরাং 'মৌনং সম্মতি'—"

সি। আইনজ্ঞের সহিত বৃথা তর্কে নষ্ট করিবার মত সময় আমার নাই—আমি চলিলাম।

ল। 'চলিলাম' কি?—হয় তুমি বিবাহ অস্বীকার কর, নয় ধরা দাও।

সি। (স্মিতমুখে) 'ধরা' কি কেহ স্বেচ্ছায় দেয়?

সৌ। তাই-ত ধরিতে পারিলে 'তোমার।' তা ভাই, তুমি আদালতের শরণ লও না কেন? আইন ত চিরদিন তোমাদেরই অনুকূলে।

ল। তাহাতে লাভ কি? আদালতের কৃপায় না হয় সিদ্দিকার উপর দখল পাইলাম, তাহাতে ত তাঁহাকে পাওয়া হইল না। আমি চাই সিদ্দিকার আভ্যন্তরীণ মানুষটিকে।

উ। সিদ্দিকার ভিতরের মানুষটিকে আজি পর্যন্ত জয় করিতে পারিলে না, তবে আর কি করিলে ভাই?

ল। কি জান দিদি! দৈব ঘটনাবলী কতকটা আমাদের বৃটিশ বিচারের মত—রামের পাপের জন্য শ্যামকে ভুগিতে হইবে, আর শ্যামের পুণ্যফল ভোগ করিবে কানাই। আমি যে ভুগিতেছি, ইহা আমার স্বকৃত দোষের জন্য নহে।

সি। মানুষের নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই সব চেয়ে বড় জিনিস নহে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সম্মুখে নিজের ইচ্ছা এবং স্বার্থকে অনেক সময়ে বলি দিতে হয়।

ল। খোদাতা'লা তোমার মঙ্গল করুন—তোমার মুখে একথা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। এখন তুমি বুঝিয়াছ যে, হামিদের মাতার সহিত বিবাহ—আমার ইচ্ছাকৃত ছিল না। আর তোমাকে উপেক্ষাও আমি করি নাই। আমি তোমাকে পাইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম; দুর্ভাগ্যবশতঃ সুযোগের সহিত দুর্যোগও আসিল।

সৌ। সে কিরূপ?

ল। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর আমি যখন দুলা ভাইকে অর্থাৎ সোলেমান সাহেবকে পত্র লিখিতে বসিলাম, সেই সময় তাঁহার পত্র আগে পাইলাম। তিনি জয়নবকে 'তালাক' দিতে লিখিয়াছিলেন। আমি যতই শান্তির কথা লিখি, তিনি ততই রাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বুবুও (তাঁহার স্ত্রী) কেবল দীর্ঘ পত্র লিখিয়া গালি দিতেছিলেন। দুলাভাই লিখিলেন যে, তাঁহার ভগ্নীরও ইচ্ছা 'তালাক' পাওয়া। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে, আমাকে অনুমতি দিলে আমি স্বয়ং জয়নব বিবির সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিব। তিনি অনুমতি দিলেন, আমি জয়নবকে পত্র লিখিলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কিছু বক্তব্য নাই; তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার কৃত নিষ্পত্তিই তাঁহার শিরোধার্য। আমি বড় ফাঁফরে পড়িলাম;—এদিকে দুলাভাই তরবারিহস্তে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে প্রস্তুত; ওদিকে জয়নব বলেন, তাহাই তাঁহার শিরোধার্য। শেষে জোনাব আলী নানাকে চুয়াডাঙ্গায় পাঠাইলাম। তিনি প্রায় দুইমাস ধন্না দিয়া দুলাভাইকে অনেক বুঝাইয়া সন্ধিতে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি যখন সম্মত হইলেন, সেই সময় পাজী রবিন্‌সন্ তাঁহাকে

ও আজিজকে (তাঁহার পুত্র) হত্যা করিল !! তাহার পরবর্তী ঘটনা আমি সেদিন মুঙ্গেরে তোমাদিগকে 'বীরবালা' গল্পে শুনাইয়াছি।

উ। চুয়াডাঙ্গার জয়নবকে উদ্ধার করিতে গিয়াও ত তোমার 'বোকা টিক-টিকির' দশা হইয়াছিল। তুমি সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া পাল্কী লইয়া গেলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে বলিয়া; এদিকে জয়নব তোমারই আনীত পাল্কীতে পলায়ন করিলেন।

ল। তাই ত, সে সব ঘটনার জন্য কি আমিই দায়ী?

উ। ভাই, আমি তোমাদের বিবাহ-পদ্ধতি বুঝি না,—তুমি রইলে রসুলপুরে, পাত্রী রইলেন চুয়াডাঙ্গায়—অথচ উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল; বিবাহ যদি হইল, তবু বরক'নের শুভ-দৃষ্টি বাকী রহিল।

ল। আর 'শুভ-দৃষ্টি' যদি হইল, তবু মিলন বাকী রহিল।

সৌ। তোমাদের 'শুভ-দৃষ্টি' আবার কবে হইল?

ল। কারসিয়ঙ্গে।—যে দিন আমি সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রথম চক্ষু খুলিলাম, সেদিন ইঁহাকেই দেখিলাম।

সৌ। সে দেখা ধর্তব্য নহে—'শুভ-দৃষ্টি'র দৃষ্টিতে তুমি কোন্ দিন সিদ্দিকাকে দেখিয়াছ, তাহাই বল!

লতীফ হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

সৌ। তোমার ভগ্নীপতির হত্যাকারীকে ধরিবার কোন চেষ্টা হইল না? মিঃ রবিন্‌সন্ নির্বিঘ্নে বিচরণ করিতে লাগিলেন?

ল। চেষ্টা হয় নাই—কে বলে? 'সাহেবলোক'কে ধরা ত সহজ ব্যাপার নহে। বুবুকে রসুলপুরে রাখিয়া আমি পুনরায় চুয়াডাঙ্গায় গিয়া রবিনসনের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের যোগাড় করিতে লাগিলাম। তখন চুয়াডাঙ্গার বাতাস বড় দূষিত ছিল—কেহই রবিনসনের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিল না। যাহা হউক, বহু কষ্টে প্রায় তিন বৎসর পরে যখন তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করাইলাম, তাহার পূর্বদিন তিনি রাঁচি যাত্রা করিলেন। আবার রাঁচিতে যেদিন ওয়ারেন্ট পেঁৗছিল, রবিন্‌সন্ তখন মৃত্যুশয্যায়।

সৌ। তারপর তোমার সিদ্দিকা-সমস্যার কি হইল?

ল। তিনি বোধ হয় রাফিয়া বেগম, সকিনা খানম প্রভৃতির অভিশপ্ত বিবাহ-জীবনের কাহিনী শুনিয়া সংসারধর্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের কাহিনী অত্যন্ত করুণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি এ জগতে কেহ বিবাহ করিবে না?

উ। তাই ত হিন্দুসমাজে বাল-বিধবার সংখ্যা অল্প নহে, তবু ত বালিকাদের বিবাহ হইতেছে। স্বয়ং রাফিয়াবু'র কন্যাদ্বয়েরও বিবাহ হইয়াছে।

সৌ। তোমার কি বক্তব্য, পদ্মরাগ?

সি। অভিশপ্ত বিবাহ-জীবনের কাহিনী শ্রবণের বহুপূর্বে আমি যেদিন চুয়াডাঙ্গা ত্যাগ করিতে বাধ্য হই, সেই দিনই জীবনের গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম। এমন কি, যে দিন ভাইজান নিহত হইলেন, সেই দিনই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার সংসারধর্ম-পালন খোদাতালা'র অভিপ্রেত নহে।

ল। আমি ইহাই তোমার শেষ উত্তর বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহি। তোমাকে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য আরও একটু সময় দিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ থাকে ত তাহাও বল। আমার ত একমাত্র অপরাধ—হামিদের মাতাকে বিবাহ করা।

সি। ব্যক্তিগতভাবে তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। তুমি যে গুরুজনের আদেশ পালনের নিমিত্ত নিজের ইচ্ছা ও সুখ বলিদান দিয়াছিলে, সে জন্য আমি তোমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। আর হামিদের মাতাও এখন জীবিত নাই, সুতরাং সে কথায় আর প্রয়োজন কি? আল্লাহ্ জানেন, আমার মনে কোন বিদ্বেষভাব নাই।

উ। তাহা হইলে তোমরা উভয়ে 'করমর্দন করিয়া বন্ধু হও'।

ল। সিদ্দিকা, স্পষ্ট বল, তুমি আমার গৃহিণী হইবে কি না?

সি। না। তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়

বেলা প্রায় ৪টা, সিদ্দিকা আপন মনে ট্রাঙ্কে জিনিসপত্র গুছাইতেছেন। আগামীকল্য প্রত্যুষে তাঁহাকে দেশে যাইতে হইবে। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তিনি রাফিয়ার কন্যা গওহর বেগমের বাসায় অতিথি হইয়াছেন। সিদ্দিকা একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; বাকী আছেন কেবল তারিণী। আশ্রমবাসিনী ভগিনীগণ তাঁহাকে স্ব স্ব স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিয়াছেন এবং তাঁহাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সিদ্দিকার নয়নপল্লব তখনও আর্দ্র ছিল, এমন সময় কে দ্বারে করাঘাত করিল। "আসুন!" বলিয়া সিদ্দিকা চাহিয়া দেখিলেন, তারিণীর সহিত তাঁহার ভ্রাতৃজায়া রশীদা ও উষা আসিয়াছেন।

রশীদা। (সিদ্দিকার মস্তকে হস্তাবমর্শন করিয়া) দেখি, তোমার মাথায় জটা আছে না কি?

তারিণী। আপনি একেবারে জটাধারিণী চাহেন?

র। আমি ইদানিং জয়নুর বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে তাহাকে জটা-জুটধারিণী সন্ন্যাসিনী বলিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছিল। জয়নু, তোমার জিনিস-পত্র ঠিক হইয়াছে কি? গাড়ী আনিতে বলি?

সি। আপনি আর একটু বসুন; চারিদিকে বেড়াইয়া তারিণী-ভবন ভাল করিয়া দেখুন।

র। আমি দুই ঘন্টা ধরিয়া খুব 'সয়ের' করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে মিসিস্ সেনকেও হয়রান করিয়াছি।

তা। আমাদের হাঁটিবার অভ্যাস আছে; আপনিই ক্লান্ত হইয়াছেন।

র। তবে এখন চল জয়নু।

সি। আমি আগামীকল্য প্রাতঃকালে যথাসময়ে আপনার ওখানে হাজির হইব, এখন আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারিব না।

র। অত ভোরে আবার কে তোমাকে লইতে আসিবে?

তা। কাহাকেও আসিতে হইবে না, আমরা সিদ্দিকাকে পৌঁছাইয়া দিব। ভালু আয়া আপনাদের বাসা চিনে, সে এবং ঈশানবাবু সঙ্গে যাইবেন।

উষা। আমিও যাইব। একেবারে ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়া আপনাদের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিব।

র। (সিদ্দিকার প্রতি) তুমি যে বিয়ের ক'নের মত কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছ ! মিসিস্ সেন, আপনারা স্নেহ-মমতার ডোরে জয়নুকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, সে আর আপনাদের ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তা। এরূপ মনে করা আপনার সৌজন্য। পক্ষান্তরে সিদ্দিকাই আমাদের সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন—

উ। এবং বাঁধিয়া রাখিয়া এখন ছাড়িয়া চলিয়াছেন।

রশীদা প্রস্থান করিলে পর অবশিষ্ট কার্য সমাধা করিয়া সিদ্দিকা তারিণীর নিকট বিদায় গ্রহণের নিমিত্ত গেলেন। ভক্তি ও আবেগভরে তারিণীর পদচুম্বন করিয়া সিদ্দিকা কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল—কিছুই বলিতে পারিলেন না।

তারিণী তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমার যাওয়ায় আমি তত দুঃখিত নহি ; কারণ আজি যাইতেছ, দুই মাস কি ছয় মাস পরে আবার আসিবে। তুমি যে সমাজের সমূহ কল্যাণের নিমিত্ত দাম্পত্য জীবনে জলাঞ্জলি দিলে, ইহাতেই আমার অধিক দুঃখ হইতেছে। কৃতঘ্ন সমাজ তোমার এ অমূল্য দানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে না। সমাজসেবা করিতে গেলে আজীবন অভিসম্পাত কুড়াইতে হইবে। এখনও সময় আছে—ঘরে ফিরিয়া যাও পদ্মরাগ।"

সি। না বড়দিদি। আর ফিরিবার উপায় নাই। সেদিন তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছি—"তুমি তোমার পথ দেখ।"

তা। তবে আশীর্বাদ করি, তোমার এ আত্মত্যাগের ফলে তোমার সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক,—তুমি চিরসুখী হও। অতঃপর তারিণী বাষ্পাকুল লোচনে পুনরায় সিদ্দিকার ললাট চুম্বন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

সিদ্দিকা "বিদায়-পর্ব" সমাধা করিয়াছেন বটে, কিন্তু একজনের নিকট বিদায়-গ্রহণ তখনও বাকী। জীবনে আবার তাঁহাকে কখনও দেখিতে পাইবেন কি না, কে জানে ? চুয়াডাঙ্গায় গিয়া আবার আপাততঃ সিদ্দিকাকে সামাজিক অবরোধ-প্রথার বন্দিনী হইতে হইবে, সুতরাং লতীফ সেখানে গেলে দেখা হইবে না। যদি দৈবাৎ অদ্য লতীফ এখানে আসিতেন, তবে শেষ দেখা—জন্মশোধ শেষ দেখা দেখিয়া লওয়া হইত। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে সিদ্দিকা বসিবার ঘরে গেলেন। সে কক্ষটি তাঁহার স্বহস্তসজ্জিত—তারিণী তাঁহারই হাতে ইহার সজ্জাভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিলেন না। নিভৃত চিন্তার অনুকূল বলিয়া এই নির্জন

অন্ধকার কক্ষই তাঁহার নিকট বাঞ্ছনীয় বোধ হইল। তাঁহার স্মরণ হইল, ৪।৫ মাস পূর্বে এই কক্ষে তিনি লতীফকে "তুমি তোমার পথ দেখ" বলিয়া বিদায় দিয়াছেন। তদবধি আর লতীফের সহিত দেখা হয় নাই—হয়-ত জীবনে আর দেখা হইবে না। সিদ্দিকা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা বলিয়াছিলেন, "জয়নু! তুই চিরকুমারী বা বাল-বিধবার ন্যায় জীবন-যাপন করিতে প্রস্তুত হ'।"

সিদ্দিকা নিজেকে 'চিরকুমারী' জ্ঞান করিবেন না, কারণ চিরকুমারী নিঃস্ব; তাহার শূন্য হৃদয় অবলম্বনহীন। তদ্রূপ নিঃসম্বল দরিদ্র জীবনভার অতি দুর্বহ। তিনি নিজেকে বিধবা মনে করিবেন, যেহেতু বিধবার স্বামী-স্মৃতিরূপ বহুমূল্য সম্পদ্ থাকে। পতিধ্যান তাহার জীবনের নিত্যসহচর। তাহা না থাকিলে বিধবা বাঁচিবে কি লইয়া? ভীষণ কন্টকাকীর্ণ সংসারে পতি-স্মৃতি তাহার একমাত্র সহায়। সংসারের কশাঘাতে যখন সে ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন স্বামী-চিন্তাই প্রলেপের মত তাহার দগ্ধহৃদয় শীতল করে; তাহাই তাহার সান্ত্বনা। দেবর, ভাশুর এবং অপর আত্মীয় স্বজন ছলে কৌশলে সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু এই—

"সতীর দেবতা পতি, জীবনের সার,
তেঁই যাচি পূজিবারে চরণ তোমার"—

ভাব কেহ অপহরণ করিতে পারে না। ইহাই বিধবার জীবনসর্বস্ব।

সহসা "হিয়াঁ তস্রীফ লাইয়ে" বলিয়া আদম শরীফ আসিয়া বাতি জ্বালিয়া দিল। সিদ্দিকা দ্বারদেশে চাহিয়া দেখিলেন, আগন্তুক ব্যক্তি লতীফ। অদ্য অতর্কিতভাবে লতীফের সহিত চারি চক্ষুর মিলন হইল।

"আপ বইঠিয়ে, মাইজী আবি পূজা পাট কর্‌তা হায়। পূজা হো জানেসে মাইজী আবি আবেগা" বলিয়া আদম শরীফ লতীফকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল।

লতীফ কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সিদ্দিকা, তুমি আজ বুবুর সঙ্গে যাও নাই?"

সি। আমি যাইতেছি, এ সংবাদ তুমি কোথায় পাইলে?

ল। তুমি আমার সংবাদ রাখ না বটে, কিন্তু আমি তোমার সব সংবাদ রাখি। আমি ত তোমার মত পাষাণ নহি—আমার হৃদয় আছে। হাঁ, ভাল কথা মনে পড়িল,—তুমি সেদিন বলিয়াছিলে যে, তুমি তোমার পথ দেখিবে।

বেশ, চুয়াডাঙ্গার পথ ব্যতীত আরও কোন পথ আছে না কি, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

সি। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

ল। তবে শুন, আমি তোমাকে অনর্থক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া কষ্ট দিতে চাহি না। আমি তোমার পথের কন্টক হইয়া তোমার জীবন বিষাক্ত করিতে ইচ্ছুক নহি। তুমি যাহাতে সুখী হও,—সন্তুষ্ট থাক, তাহাই আমার জীবনের লক্ষ্য। সেই জন্য তোমাকে আমি এখন যথাবিধি ত্যাগপত্র (তালাক্) দ্বারা মুক্তি দিতে চাহি।

সি। (কিঞ্চিৎ ব্যস্তভাবে) না, আমি মুক্তি চাহি না। তুমি এমন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ কেন ?

ল। (নিম্নস্বরে) দেখ, চক্ষুলজ্জা কিম্বা মিথ্যা লোকলজ্জা ভুলিয়া যাও, তোমার মনের কথা বল।

সি। (কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া) সত্য বলিতেছি, আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি না।

ল। কেন, ৪।৫ বৎসর পূর্বে যখন দুলাভাই আমাকে তালাকের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন সে সময় তোমার ইচ্ছাও তাহাই ছিল।

সি। (সলজ্জভাবে) তখন আমি তোমাকে জানিতাম না যে।

ল। আমার সহিত পরিচয় হওয়ার পরেও এই ত সেদিন তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হইতে অস্বীকৃতা হইয়াছ—তুমি তোমার পথ দেখিবে, বলিয়াছ।

সি। কিন্তু তোমায় 'তালাক' দিতে বলি নাই ত ?

ল। আমি তোমার প্রহেলিকা বুঝি না। তবে আমার জীবন-সঙ্গিনী হইতে আপত্তি করিলে কেন ? (সিদ্দিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া স্নেহসিক্ত স্বরে) আমি নীচ স্বার্থপর নহি ; বলিয়াছি ত, তোমার সুখ-সৌভাগ্যই আমার বাঞ্ছনীয়। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করি। এই মহান্ উদ্দেশ্যে তোমাকে বন্ধনমুক্ত করিতে চাহিতেছি।

সি। যদি আমার সুখ-সন্তোষই তোমার কাম্য হয় তবে আমার বিনীত অনুরোধ, তুমি আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হও, আমি তাহাতেই পরম সুখী হইব।

ল। আমাকে এ কথা বলা বৃথা। আমার আর অন্য বাঞ্ছা নাই ; আমি—

"পরাণ দিয়েছি তারে, তারি তরে রাখিব ;
জন্মান্তরে দেখা হলে তারি হাতে সঁপিব।"

আমার সুখ শান্তি সম্পূর্ণ তোমার হাতে। তুমি বেশ জান, তোমাকে পাইলে আমার—

স্বরগ মুকতি পুণ্য কিছু নাহি প্রয়োজন,
জনম-জনম ধরি তোমারেই কামনা।

সি। তোমার সহধর্মিণী হওয়া সহস্র বার বাঞ্ছনীয়—লক্ষ বার বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এ সৌভাগ্য আমার জন্য নহে। (সাশ্রুনয়নে যুক্তকরে) আমাকে আর ও কথা বলিও না।

ল। (ব্যথিত স্বরে) তাহা হইলে আমি এত কাল পৌত্তলিকের ন্যায় কেবল পাষাণ-প্রতিমার পূজা করিলাম? আমার বিদীর্ণ হৃদয় জিজ্ঞাসা করিতে চাহে—

রমণীরে! বল দেখি, এ জীবনে কখন কি
দারুণ যন্ত্রণা মম উদিয়া স্মরণে,
এক বিন্দু অশ্রু তোর ঝরেছে নয়নে?

তদুত্তরে সিদ্দিকা স্বীয় কণ্ঠস্থিত লকেট হার উন্মোচন করিয়া লতীফের হস্তে দিলেন। লতীফ লকেট খুলিয়া দেখেন—তাঁহারই ফটো। তদ্দর্শনে তিনি বিস্ময়বিমূঢ় হইলেন।

সি। এখন দেখিলে, তোমার চেয়েও পৌত্তলিক আছে।

লতীফ কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তন্মুহূর্তে তথায় তারিণী আসিলেন, সুতরাং আর কিছু বলা হইল না।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

সহযাত্রী

আবার সেই বাষ্পীয় শকটে সিদ্দিকা। আজি কিন্তু স্বদেশ ছাড়িয়া অজ্ঞাত অপরিচিত বিশাল জগতের তরঙ্গে মিশিতে যাওয়া নহে। অদ্য জননী জন্মভূমির স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাওয়া। এ যাত্রাতেও সিদ্দিকা নিরানন্দ। তিনি স্বয়ং ভ্রাতৃবধূকে আসিতে লিখিয়াছিলেন, এবং স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত যাইতেছেন, তবু অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে চলিয়াছেন। এখন সিদ্দিকা যেন স্বর্গ হইতে বিদায় লইলেন। তারিণী-ভবনে আবার কখন আসিতে পারিবেন, কে জানে? তাঁহার নীরব যন্ত্রণা বর্ণনাতীত।

ট্রেনে রশীদা, তাঁহার পুত্র, পরিচারিকা এবং সিদ্দিকা ছিলেন। গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল। তখনও গাড়ী ছাড়িতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল, তাই ঊষা তাঁহাদের নিকট বসিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লতীফ সেই ট্রেনে উঠিলেন। সিদ্দিকা প্রথমে স্বীয় চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না,—ইহাও কি সম্ভব? সম্ভব না হইলেও ত সত্য! লতীফ যে রশীদার সহোদর ভ্রাতা, এ কথা সিদ্দিকার মনেই ছিল না! ঊষা গাড়ী হইতে নামিয়া যাইবার সময় বলিলেন,—

"পদ্মরাগ। মিঃ আল্‌মাস্ তোমার সহযাত্রী।"

ট্রেন ছাড়িলে পর রশীদা সিদ্দিকার প্রতি 'ভালবাসার অত্যাচার' আরম্ভ করিলেন। তিনি খোকাকে মাঝের বেঞ্চে শয়ন করাইয়া তাহার নিকট আয়াকে বসাইলেন। পরে সিদ্দিকাকে বলিলেন,—

"তারিণী-ভবনের ভগিনীগণ তোমাকে 'পদ্মরাগ' বলিয়া ডাকেন কেন? তুমি যে 'আল্‌মাস-বনিতা', সেই জন্যই কি?"

সি। 'জয়নব' নামের জন্য যেমন আমি দায়ী নহি, সেইরূপ 'পদ্মরাগ' নামের জন্যও নহি।

র। তোমার নাম 'পদ্মরাগ' কে রাখিয়াছে?—লতীফ?

সি। আজ্ঞে না। আমি যে দিন প্রথমে মিসিস্ সেনের সম্মুখে আনীতা হই, তখনই তিনি আমায় 'পদ্মরাগ' বলিয়াছিলেন।

র। তবু আমার বলিতে ইচ্ছা করে—

"পদ্মরাগ-আল্‌মাস-কথা জানিল কি ছলে
নামদাত্রী?"

ভাল কথা, তুমি সেই দারুণ দুর্যোগের দিন আমার সঙ্গে না গিয়া এত বিড়ম্বনা ভোগ করিলে কেন ?

সি। আপনি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে পলায়ন করিলেন বলিয়া আমি আপনার সঙ্গিনী হইতে সাহস করি নাই।

র। আমি সে মুখোস-পরা অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে যাইবার সময় তবু নিজের ঘরের দুইজন চাকরানী এবং একজন বিশ্বাসী চাকর সঙ্গে লইয়াছিলাম। তুমি ত তাহাও কর নাই—তুমি যে একেবারে একাকিনী দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলে।

সি। আমার ত দিগ্বিজয়ের ইচ্ছা ছিল না—আমার ইচ্ছা ছিল অন্য প্রকার।

র। কি ইচ্ছা ছিল, শুনি ?

সি। আত্মহত্যা করা।

র। তাহা করিয়া ফেলিলে একরূপ ভালই হইত—সব লেঠা সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইত। অবশ্য, আমি সে পাপ কার্যের অনুমোদন করি না। খোদা না করেন, কাহারও যেন সে দুর্মতি না হয়। যাহা হউক, আল্‌মাসের সহিত তোমার 'রু-নোমাই' (বর-ক'নের শুভদৃষ্টি) কখন এবং কোথায় হইয়াছে ?

লতীফ বলিতে যাইতেছিলেন 'গত সন্ধ্যায় মিসিস্ সেনের ড্রয়িং-রুমে', কিন্তু বলিলেন না। মৃদুহাস্যে রসনা সংযত রাখিলেন। অতঃপর রশীদা বলিলেন,—

"আমার বড় ঘুম পাইতেছে। জয়নু! তুমি ও-পার্শ্বের বেঞ্চে গিয়ে বস, আমি একটু শুই।"

সি। কেন, আপনি গত রাত্রে ঘুমান নাই ?

র। না, জানই ত, নূতন জায়গায় আমার ঘুম হয় না।

সি। আর এই গাড়ীর বেঞ্চখানা বোধ হয় আপনার বহু-পরিচিত জায়গা ?

র। (সহাস্যে) যা, তর্ক করিস্ নে। সর্ এখান হ'তে।

সিদ্দিকা অগত্যা লতীফের সহিত একাসনে বসিলেন। লতীফ জানালা খুলিয়া বহির্জগতের শোভা দেখিতেছিলেন, অথবা অন্যমনস্কভাবে কেবল চাহিয়াছিলেন। লতীফ জানেন, সিদ্দিকার সহিত বাক্যালাপ করিবার সুবিধা হয় ত আর কখনও পাইবেন না। তবে তাঁহার ভগিনীর অনুকম্পায় প্রাপ্ত এ শেষ সুযোগটা বৃথায় নষ্ট করা অন্যায় হইবে। তাই তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সিদ্দিকার নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সিদ্দিকা, তুমি আর কখনও এ পথে চুয়াডাঙ্গায় গিয়াছিলে ?"

সি। আমি এ পথে পূর্বে কোথাও গিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

ল। কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে তোমার কিছু কষ্ট বোধ হইতেছে কি ?

সি। কষ্ট, কলিকাতার জন্য নহে, কিন্তু তারিণী-ভবন ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট হইতেছে।

ল। তা' তুমি ত ইচ্ছা করিলে তারিণী-ভবনে আবার যাইতে পার। কিন্তু—

আবেগে লতীফের কণ্ঠরোধ হইল ; তিনি আত্মদমন-চেষ্টায় তাড়াতাড়ি জানালার দিকে চাহিলেন। তাঁহার অনুচ্চারিত শব্দ কয়টি মূর্তিমান হইয়া সিদ্দিকার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল—"কিন্তু আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না।"

দুঃখের দিন ফুরাইতে চাহে না—সুখের সময় দেখিতে না দেখিতে, সুখানুভব করিতে না করিতে অনন্তে বিলীন হইয়া যায়। ট্রেনের গতি অদ্য লতীফের নিকট অতিশয়—অতিরিক্ত দ্রুত বলিয়া বোধ হইতেছে। সিদ্দিকাও তাহাই ভাবিতেছিলেন—হতভাগা ট্রেনটা একটু ধীরপদ-বিক্ষেপে চলিলে ক্ষতি ছিল কি ?

রশীদা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। তিনি উঠিয়া বসিয়া সিদ্দিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"শুন জয়নু! আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল।"

সি। বলুন।

র। সেই যে বিপদের সময়, তুমি অন্তর্হিতা হইলে পর, বড় দুঃখে ও নৈরাশ্যে জোনাব আলী নানার আনীত অলঙ্কারগুলি ফিরাইয়া দিয়াছি, তিনি তাহা ফর্দের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া লইবার সময় সেই লকেট হারের 'কেস'টা খুলিয়া বলিলেন—"এটা ত খালি।" আমি সে সময় তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিলাম,—"তবে হারটা আমি গিলিয়া ফেলিয়াছি।" তাহার পর বহুদিন পরে আমার মনে পড়িল যে, লকেট হারটা আমি তোমার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর তাহা কি হইল,—তুমি কোথাও রাখিয়াছিলে, না, আমি অন্যমনস্কভাবে কোথাও ফেলিয়া দিয়াছি,—কিছুই আমার মনে পড়ে না। তুমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে পার কি, জয়নু ?

লতীফ চক্ষুভরা 'দুষ্টামী' লইয়া সিদ্দিকার উত্তর শ্রবণের নিমিত্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিদ্দিকা নিরুত্তর রহিলেন ; অধিকন্তু গত সন্ধ্যায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যে দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লতীফকে লকেট দেখাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সিদ্দিকা অত্যন্ত সঙ্কুচিতা ও লজ্জিতা হইলেন। তিনি কিছুতেই লতীফের দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন

না। লতীফ কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তর শ্রবণের আশায় বঞ্চিত হইয়া মুক্ত-বাতায়ন দিয়া মুখ বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে মাঠের দৃশ্য দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু এক একবার 'চুরি করিয়া' সিদ্দিকার লজ্জানম্র পদ্মরাগবৎ আরক্ত বদনখানি দেখিতেছিলেন, আর হয়ত ভাবিতেছিলেন,—

"প্রণয়ের পুরস্কার থাকে যদি অভাগার,
এ রোদন পশে যদি বিধাতার শ্রবণে,
জন্মান্তরে পাব আমি এ রমণী-রতনে।"

আহা! "জন্মান্তর" ত পরের কথা—এখন যে ইহ-জীবনের দেখা-সাক্ষাৎ ফুরাইতে চলিল!—ট্রেন চুয়াডাঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিল আর কি। সত্যই চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশন!!

লতীফ সিদ্দিকার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন। এই তাঁহাদের শেষ দেখা।

—সমাপ্ত—

অবরোধ-বাসিনী

নিবেদন

কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুস সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া "অবরোধ-বাসিনী" রচিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ অধিকাংশ স্থলে হাসিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহাদের মনে সমবেদনার উদ্রেক হইবে এবং আমার বিশ্বাস তাঁহারা 'তাহেরা' মরহুমার অকাল মৃত্যুতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইনস্‌পেক্টর পরম ভক্তিভাজন জ্ঞান-বৃদ্ধ মৌলবী আবদুল করিম সাহেব বি. এ. এম. এল. সি. দয়া করিয়া "অবরোধ-বাসিনী"র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।

হজরত রাবিয়া বসরী বলিয়াছেন, 'ইয়া আল্লাহ্! যদি আমি দোজখের ভয়ে এবাদত করি, তবে আমাকে দোজখে নিক্ষেপ কর; আর যদি বেহেশতের আশায় এবাদত করি তবে আমার জন্য বেহেশত হারাম হউক।" আল্লাহর ফজলে সমাজ-সেবা সম্বন্ধে আমিও এখন ঐরূপ বলিতে সাহস করি।

আমার ত প্রত্যেকটি লোম গুনাহগার; সুতরাং পুস্তকের দোষ-ত্রুটির জন্য এবার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম না।

বিনীতা—

গ্রন্থকর্ত্রী

ভূমিকা

"অবরোধ-বাসিনী" লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তাধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক প্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন ; কিন্তু পাক-ভারতের অবরোধ-বাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ইতিপূর্বে আর কেহ লিখেন নাই।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বারম্বার এই কথাই মনে পড়ে,—আমরা কোথা হইতে আসিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছি! যে মুসলিম সমাজ এককালে সমস্ত জগতের আদর্শ ছিল, সেই সমাজের এক বিরাট অংশ এখন প্রায় সমস্ত জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না।

কোথায় বীরবালা খাওলা ও রাজিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক পুরুষ যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, আর কোথায় বঙ্গীয় মুসলিম নারী চোরের হস্তে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, "অবরোধ-বাসিনী" পাঠে ঘুমন্ত জাতির চিন্তা-চক্ষু উন্মীলিত হইবে।

সর্বশেষে লেখিকাকে এই সৎসাহসের জন্য ধন্যবাদ জানাই। "অবরোধ-বাসিনীর" প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আবদুল করিম (বি. এ., এম. এল. সি.)

অবরোধ-বাসিনী

আমরা বহুকাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি; সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের—বিশেষতঃ আমার কিছুই নাই। মেছোনীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "পচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?" সে কি উত্তর দিবে?

এস্থলে আমাদের ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিব—আশা করি তাঁহাদের ভাল লাগিবে।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়ে মানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ীর চাকরানী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না।

বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশী পর্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন তিনিই তত বেশী শরীফ।

শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারী মেমদের দেখিলে ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করেন। মেম ত মেম—শাড়ী-পরিহিতা খ্রীস্টান বা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখিলেও তাঁহারা কামরায় গিয়া অর্গল বন্ধ করেন।

[১]

সে অনেক দিনের কথা। রংপুর জিলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ নামক গ্রামের জমিদার বাড়ীতে বেলা আন্দাজ ১টা—২টার সময় জমিদার-কন্যাগণ জোহরের নামাজ পড়িবার জন্য ওজু করিতেছিলেন। সকলের ওজু শেষ হইয়াছে, কেবল "আ" খাতুন নাম্নী সাহেবজাদী তখনও আঙ্গিনায় ওজু করিতেছিলেন। আলতার মা বদনা হাতে তাঁহাকে ওজুর জন্য পানি ঢালিয়া দিতেছিল। ঠিক সেই সময় এক মস্ত লম্বাচৌড়া কাবুলী স্ত্রীলোক আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত। হায়, হায়, সে কি বিপদ! আলতার মা'র হাত হইতে বদনা পড়িয়া গেল—সে চেঁচাইতে

লাগিল—"আউ আউ! মরদটা কেন আইল!" সে স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "হেঁ মরদানা! হাম্ মরদানা হায়?" সেইটুকু শুনিয়াই "আ" সাহেবজাদী প্রাণপণে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাঁহার চাচী আম্মার নিকট গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "চাচী আম্মা! পায়জামা পরা একটা মেয়ে মানুষ আসিয়াছে!" কর্ত্রী সাহেবা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে তোমাকে দেখিয়াছে?" "আ" সরোদনে বলিলেন "হাঁ!" অপর মেয়েরা নামাজ ভাঙ্গিয়া শশব্যস্তভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন—যাহাতে সে কাবুলী স্ত্রীলোক এ কুমারী মেয়েদের দেখিতে না পায়। কেহ বাঘ ভালুকের ভয়েও বোধ হয় অমন করিয়া কপাট বন্ধ করে না।

[২]

ইহাও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পাটনায় এক বড় লোকের বাড়ীতে শুভ-বিবাহ উপলক্ষে অনেক নিমন্ত্রিতা মহিলা আসিয়াছেন। অনেকে সন্ধ্যার সময়ও আসিয়াছেন। তন্মধ্যে হাশমত বেগম একজন। দাসী আসিয়া প্রত্যেক পাল্কীর দ্বার খুলিয়া বেগম সাহেবাদের হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া যাইতেছে, পরে বেহারাগণ খালি পাল্কী সরাইয়া লইতেছে এবং অপর নিমন্ত্রিতার পাল্কী আসিতেছে। বেহারা ডাকিল—"মামা! সওয়ারী আয়া!" মামারা মন্থর গমনে আসিতেছে। মামা যতক্ষণে হাশমত বেগমের পাল্কীর নিকট আসিবে ততক্ষণে বেহারাগণ সওয়ারী নামিয়াছে ভাবিয়া পাল্কী লইয়া সরিয়া পড়িল। অতঃপর আর একটি পাল্কী আসিলে মামারা পাল্কীর দ্বার খুলিয়া যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাকে লইয়া গেল।

শীতকাল। যত পাল্কী আসিয়াছে 'সওয়ারী' নামিলে পর সব খালি পাল্কী এক প্রান্তে বট গাছের তলায় জড় করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। অদূরে বেহারাগণ ঘটা করিয়া রান্না করিতেছে। তাহারা বিবাহ বাড়ী হইতে জমকালো সিধা পাইয়াছে। রাত্রিকালে আর সওয়ারী খাটিতে হইবে না। সুতরাং তাহাদের ভারী স্ফূর্তি—কেহ গান গায়, কেহ তামাক টানে, কেহ খেইনী খায়—এইরূপে আমোদ করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল।

এদিকে মহিলা মহলে নিমন্ত্রিতাগণ খাইতে বসিলে দেখা গেল—হাশমত বেগম তাঁহার ছয় মাসের শিশুসহ অনুপস্থিত। কেহ বলিল, ছেলে ছোট বলিয়া হয় ত আসিলেন না। কেহ বলিল, তাঁহাকে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছে—ইত্যাদি।

পরদিন সকাল বেলা যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাগণ বিদায় হইতে লাগিলেন—একে একে খালি পাল্কী আসিয়া নিজ নিজ 'সওয়ারী' লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটি 'খালী' পাল্কী আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার দ্বার খুলিয়া দেখা গেল হাশমত বেগম শিশু পুত্রকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। পৌষ মাসের দীর্ঘ রজনী তিনি ঐ ভাবে পাল্কীতে বসিয়া কাটাইয়াছেন।

তিনি পাল্কী হইতে নামিবার পূর্বেই বেহারাগণ পাল্কী ফিরাইয়া লইয়া গেল—কিন্তু তিনি নিজে ত শব্দ করেনই নাই—পাছে তাঁহার কণ্ঠস্বর বেহারা শুনিতে পায়, শিশুকেও প্রাণপণ যত্নে কাঁদিতে দেন নাই—যদি তাহার কান্না শুনিয়া কেহ পাল্কীর দ্বার খুলিয়া দেখে। কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে আর অবরোধ-বাসিনীর বাহাদুরী কি?

[৩]

প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বের ঘটনা। কয়েক ঘর বঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত জমীদারের মাতা, মাসী, পিসী, কন্যা ইত্যাদি একত্রে হজ করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় ২০।২৫ জন ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় রেলওয়ে ষ্টেশন পৌঁছিলে পর সঙ্গের পুরুষ প্রভুগণ কার্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। বেগম সাহেবা-দিগকে একজন বিশ্বস্ত আত্মীয় পুরুষের হেফাজতে রাখা হয়। সে ভদ্রলোকটিকে লোকে হাজী সাহেব বলিত, আমরাও তাহাই বলিব। হাজী সাহেব বেগম সাহেবাদের ওয়েটিং রুমে বসাইতে সাহস পাইলেন না। তাঁহার উপদেশ মতে বিবি সাহেবারা প্রত্যেকে মোটা মোটা কাপড়ের বোরকা পরিয়া ষ্টেশনের প্লাট-ফরমে উবু হইয়া (Squat) বসিলেন; হাজী সাহেব মস্ত একটা মোটা ভারী শতরঞ্চি তাঁহাদের উপর ঢাকিয়া দিলেন। তদবস্থায় বেচারীগণ এক একটা বোচকা বা বস্তার মত দেখাইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে ঐরূপে ঢাকিয়া রাখিয়া হাজী সাহেব এক কোণে দাঁড়াইয়া খাড়া পাহারা দিতেছিলেন। একমাত্র আল্লাহ্ জানেন, হজযাত্রী বিবিগণ ঐ অবস্থায় কয় ঘন্টা অপেক্ষা করিতেছিলেন—আর ইহা কেবল আল্লাহ্তালারই মহিমা যে তাঁহারা দম আটকাইয়া মরেন নাই।

ট্রেন আসিবার সময় জনৈক ইংরাজ কর্মচারী ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে হাজী সাহেবকে বলিলেন, "মুন্সি! তোমরা আসবাব হিয়াছে হাটা লো। আভি ট্রেন আবেগা—প্লাটফরম পর খালি আদমি রহেগা—আসবাব নেহি রহেগা।" হাজী সাহেব যোড়হস্তে বলিলেন, "হুজুর, ঐ সব আসবাব নাহি—আওরত হায়।"

কর্মচারীটি পুনরায় একটা 'বত্তায়' জুতার ঠোকর৷ মারিয়া বলিলেন, "হা, হা— এই সব আসবাব হাটা লো।" বিবিরা পর্দার অনুরোধে জুতার গুতা খাইয়াও টু শব্দটি করেন নাই।

[৪]

উড়িষ্যার অন্তর্গত রাজকণিকায় একজন ভদ্রলোক চাকুরী উপলক্ষে ছিলেন। বাসায় তাঁহার মাতা, দুইজন ভগিনী এবং স্ত্রী ছিলেন। বর্ষার সময়। তাঁহার বাঙ্গলোয় চারিজন পাখাটানা কুলি পালাক্রমে সমস্ত দিন ও রাত্রি পাখা টানিত। সাহেব টুরে বাহিরে গিয়াছেন, রাত্রিকালে তাঁহার স্ত্রীর কামরায় একজন চাকরাণী শুইয়াছেন। তাঁহার ভগিনীগণ অন্য কামরায় ছিলেন।

সে অঞ্চলে গরমের সময় লোকে বেশী বিছানা ব্যবহার করে না। রাত্রিকালে প্রবল বেগে বৃষ্টি হওয়ায় সাহেবের স্ত্রীর শীত বোধ হইল। তবু তিনি চাকরাণীকে ডাকিয়া পাখা বন্ধ করিতে বলিলেন না। ক্রমে শীত অসহ্য হওয়ায় প্রথমে তিনি বিছানার চাদরখানি গায়ে দিলেন, তাহাতেও শীত না গেলে তিনি বিছানার দরি (শতরঞ্জি) ও সুজনী তুলিয়া গায়ে দিলেন। কিন্তু হতভাগা পাখা-কুলী আরও জোরে পাখা টানিতে লাগিল। তখন অগত্যা বউ বিবি ঐ দরি চাদর সমস্ত গায়ে জড়াইয়া পালঙ্কের নীচে গিয়া শুইলেন।

পরদিন সকালে একজন চাকরাণী কামরায় ঝাটা দিতে আসিয়া পালঙ্কের নীচে সাদা একটা কি দেখিয়া দিল ঝাঁটার বাড়ি—ঝাঁটার চোটে তাড়াতাড়ি বউ বিবি পাশ ফিরিলেন।—বেচারী চাকরাণী যেন মরিয়া গেল।

[৫]

ই. আই. রেলযোগে কোন বেহারী ভদ্রলোক সস্ত্রীক পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছিলেন। তিনি স্ত্রীকে লেডীর কক্ষে না দিয়া নিজের সঙ্গেই রাখিলেন। তাঁহারা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট লইয়াছিলেন। বেগম সাহেবা বোরকা পরিয়াই রহিলেন। এক সময় সাহেব বাথরুমে থাকিতে ট্রেন কোন ষ্টেশনে থামিল। অপর এক যাত্রী কোথাও স্থান না পাইয়া ঐ কক্ষে উঠিয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া একটা জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া রহিলেন। এদিকে পূর্বোক্ত সাহেব বাথরুম হইতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার স্ত্রী অনুপস্থিত। কি করিবেন— তখন চলন্ত ট্রেন। পরবর্তী ষ্টেশনে আগন্তুক ভদ্রলোকটি নামিয়া গেলেন।

আমাদের কথিত সাহেবও নামিয়া ষ্টেশনের পুলিশে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী অমুক ও অমুক ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হারাইয়াছে।

বেচারা পুলিশ বিভিন্ন ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করিল যে কালো বোরকায় আবৃতা এক মহিলার খোঁজ কর। একজন কনেষ্টবল বলিল, "একবার এই গাড়ীখানাই ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখি না। যে বেঞ্চে সাহেব বসিয়াছিলেন, কনেষ্টবল সেই বেঞ্চের নীচে কালো একটা কি দেখিতে পাইয়া টানিয়া বাহির করিবা মাত্র সাহেব চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আরে ছোড় ছোড়—ওহি ত মেরা ঘর হায়।" পরে জানা গেল সেই নবাগত ভদ্রলোককে দেখিয়া ইনি বেঞ্চের নীচে লুকাইয়াছিলেন।

[৬]

ঢাকা জেলায় কোন জমিদারের প্রকাণ্ড পাকা বাড়ীতে দিনে দু'পুরে আগুন লাগিয়াছিল। জিনিসপত্র পুড়িয়া ছারখার হইল—তবু চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব আসবাব সরঞ্জাম বাহির করার সঙ্গে বাড়ীর বিবিদেরও বাহির করা প্রয়োজন বোধ করা গেল। হঠাৎ তখন পাল্কী, বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ে এক সঙ্গে দুই চারিটা পাল্কী কোথায় পাওয়া যাইবে? অবশেষে স্থির হইল যে একটা বড় রঙীন মশারীর ভিতর বিবিরা থাকিবেন, তাহার চারিকোণ বাহির হইতে চারিজনে ধরিয়া লইয়া যাইবে। তাহাই হইল,—আগুনের তাড়নায় মশারী ধরিয়া চারিজন লোক দৌড়াইতে থাকিল, ভিতরে বিবিরা সমভাবে দৌড়াইতে না পারিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া দাঁত, নাক ভাঙ্গিলেন, কাপড় ছিঁড়িলেন। শেষে ধানক্ষেত দিয়া কাঁটাবন দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে মশারীও ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

অগত্যা আর কি করা যায়? বিবিগণ একটা ধানের ক্ষেতে বসিয়া থাকিলেন। সন্ধ্যায় আগুন নিবিয়া গেলে পর পাল্কী করিয়া একে একে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল।

[৭]

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের জনৈক জমীদারের বাড়ীতে বিবাহ হইতেছিল। অতিথি অভ্যাগতে বাড়ী গম্ গম্ করিতেছে। খাওয়া-দাওয়ার রাত্রি ২টা বাজিয়া গিয়াছে, এখন সকলের ঘুমাইবার পালা। কিন্তু চোর চোট্টা-ত ঘুমাইবে না—এই সুযোগ তাহাদের চুরি করার।

সিঁধ কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। একজন চৌকিদার চোরের সাড়া পাইয়া বাড়ীর কর্তাদিগকে সংবাদ দিয়াছে। কর্তারা ছিলেন, পাঁচ ছয় ভাই। তাঁহারা প্রত্যেকে কুঠার হস্তে সে ঘরটার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন চোরের সন্ধানে। চোরকে পাইলে সে-সময় তাঁহারা কুঠার দিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেন। হুঁ—চোরের এত বড় আস্পর্দ্ধা!

ঘরের ভিতর বিবিরা চোরকে দেখিয়া আরও জড়সড় হইয়া চাদর গায়ে দিয়া শুইলেন—একেবারে নীরব, যেন নিঃশ্বাস ফেলিবারও সাহস নাই। বিশেষতঃ 'বেগানা মরদটা' যেন তাঁহাদের নিঃশ্বাসের শব্দও না শুনে। চোর নিঃশঙ্কচিত্তে সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা গহনা পত্র বাহির করিয়া লইল। পরে একে একে প্রত্যেক বিবির হাত পায়ের গহনা খুলিয়া লইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিবিরা তাড়াতাড়ি নাক, কান ও গলার অলঙ্কার খুলিয়া শিয়রে রাখিতে লাগিলেন। ইহাতে চোরের বেশ সুবিধাই হইল—সে আর অনর্থক বেগম খানমদের নাক বা গলা স্পর্শ করিবে কেন? সেই ঘরে একটি ছিল নূতন বউ—সে বেচারী নাকের নথটি ত খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কানের ঝুমকা প্রভৃতি গহনাগুলি পরস্পরে জড়াইয়া বড় জটিল হইয়া পড়িল—কিছুতেই খোলা গেল না। চোর মহাশয় ভদ্রতার অনুরোধে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করার পর কলম-তারাশ ছুরি দিয়া বউ বিবির উভয় কান কাটিয়া লইয়া গহনার পুটুলিতে ভরিয়া সেই সিঁধ-পথে পলায়ন করিল।

ঘরের ভিতর এত কাণ্ড হইয়া গেল—বাহিরে পুরুষগণ কুঠার হস্তে চোরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বিবিরা কেহ টু' শব্দ করিলেন না—পাছে "বেগানা মরদটা" তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনে। চোর নিরাপদে বাহির হইয়া গেলে পর বিবিরা হাউমাউ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাঠিকা ভগিনী! এইরূপ আমরা অবরোধ-প্রথার সম্মান রক্ষা করিয়া থাকি।

[৮]

এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা হাত বাক্সে পুরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সমাগত পুরুষেরা আগুন নিবাইতেছেন। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নীচে গিয়া

বসিলেন। তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না। ধন্য! কুল-কামিনীর অবরোধ!

[৯]

এক মৌলবী সাহেবের মৃত্যু হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং বিধবা অবশিষ্ট ছিলেন। মৌলবী সাহের কিছু রাখিয়া যান নাই, সুতরাং অতি কষ্টে তাঁহার বিধবা সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহের জন্য বহু কষ্টে কতকগুলি অলঙ্কার গড়াইলেন। অলঙ্কারগুলি বেশ ভারী দামের হইল। বিবাহের দুই তিন দিন পূর্বে সিঁধ কাটিয়া চোর গৃহে প্রবেশ করিল। সে ঘরে তিনি একমাত্র দাসীসহ শুইয়াছিলেন। চোরের সাড়া পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চুপি চুপি বাঁদীকে জাগাইলেন। চোর ভাবিল, সর্বনাশ—দেই দৌড়।

কিন্তু চোরের সঙ্গীরা বলিল, আচ্ছা, একটু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখি না কি হয়। হইল বেশ মজা—

বিবি সাহেবার সঙ্কেত মত দাসী একখানা কাপড় দিয়া তাঁহার খাটের সম্মুখে পর্দা টাঙ্গাইয়া দিল। পরে চাবির গোছা দেখাইয়া চোরদিগকে বলিল, "বাপু সকল! তোমরা এদিকে আসিও না, তোমরা যাহা চাও, আমি সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিয়া দিতেছি।" পরে সমস্ত দামী কাপড় ও অলঙ্কার বাহির করিয়া চোরের হাতে দিল। তাহারা গহনা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল,—"নথ কই?—সেটা সিন্দুকে আছে বুঝি?" কর্ত্রীর সঙ্কেত অনুসারে দাসী বলিল, "দোহাই! তোমরা এদিকে আসিও না—আম্মা সা'ব কেবল নথটা রাখিয়াছেন যে পরশু দিন বিয়া—একেবারে কোন গয়না রহিল না—নথটাও না থাকিলে বিয়া হয় কি করিয়া? তা যদি তোমরা চাও, তবে নেও—নথ লও—পর্দার এদিকে আসিও না।"

চোরেরা ভারী খুশী হইয়া পরস্পর গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন রাত্রি তিনটা কি চারিটা। এত সহজে সিদ্ধিলাভ করায় আনন্দের আতিশয্যে তাহারা একটু জোরে কথা কহিয়াছিল। পথে চৌকিদার তাহা শুনিতে পাইয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য তাড়া করে। সকলে পলাইল। একটি চোর হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় চৌকিদার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অগত্যা সে চৌকিদারের সঙ্গে চুরি-করা বাড়ী দেখাইয়া দিতে গেল। ততক্ষণে ভোর হইয়াছে।

চৌকিদার গিয়া দেখে, বিবি সাহেবা তখনও পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হন নাই—"যদি ব্যাটারা আবার আসে"—তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে যে!

দাসীকেও চেঁচামেচি করিতে দেন নাই যে শোরগোল শুনিয়া যদি কোন পুরুষ মানুষ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করে। চোরের হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া তিনি অবরোধ-প্রথার সম্মান রক্ষা করিলেন।

[১০]

কোন জমিদার গৃহিণী ছোট ভাইয়ের বউ আনিবার জন্য ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ী গিয়াছেন। একদিন হঠাৎ গিয়া দেখেন নববধূকে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ ভাত খাওয়াইতেছেন। ভাতের বাসনে একটা কাঁচা মরিচ ছিল। তিনি সরল মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বউ ঝাল খাইতে ভালবাসে নাকি?" বউয়ের ভাবীজান উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বড্ড ঝাল খায়!"

পরে তিনি বউ লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিলেন। পথে তিন চারি দিন নৌকায় থাকা হইল। এই সময়ে তিনি যাহা কিছু রান্না করাইতেন, তাহাতেই অতিরিক্ত ঝাল দেওয়াইতেন। আসল কথা এই যে, বউ মোটেই ঝাল খাইতে অভ্যস্তা নহেন। খাইবার সময় কাঁচা লঙ্কার খোশবু শুঁকিয়া শুঁকিয়া ভাত খাইতেছিল। তাই ঠাট্টা করিয়া তাঁহার ভাবীজান ঝাল খাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। ফলে বেচারীর প্রাণ লইয়া টানাটানি।

ননদ মহাশয় কাঁচা লঙ্কা দিয়া মুড়ি মাখিয়া ভাই-বউকে আদর করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন। বউ-এর দুই চক্ষু বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল— মুখ জিহবা পুড়িয়া যাইত—তবু বড় ননদকে মুখ ফুটিয়ে বলেন নাই যে, তিনি ঝাল খান না!! ও সর্বনাশ। একে নূতন বউ, তাতে বড় ননদ—প্রাণ গেলেও কথা কহিতে নাই।

[১১]

গত ১৯২৪ সনে আমি আরায় গিয়াছিলাম। আমার দুই নাতিনীর বিবাহ এক সঙ্গে হইতেছিল, সেই বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। নাতিনীদের ডাক নাম মঞ্জু ও সবু। বেচারীরা তখন "মাইয়া খানায়" ছিল। কলিকাতায় ত বিবাহের পাত্র ৫।৬ দিন পূর্বে "মাইয়া খানা" নামক বন্দীখানায় মেয়েকে রাখে; কিন্তু বেহার অঞ্চলে ৬।৭ মাস পর্যন্ত এইরূপ নির্জন কারাবাসে রাখিয়া মেয়েদের আধমরা করে।

আমি মজুর জেলখানায় গিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারি না—সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। শেষে এক দিন একটা জানালা একটু খুলিয়া দিলাম। দুই মিনিট পরেই এক মাতব্বর বিবি, "দুলহিন্‌কো হাওয়া লাগেগী" বলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি আর তিষ্টিতে না পারিয়া উঠিয়া আসিলাম। আমি সবুদের জেলখানায় গিয়া মোটেই বসিতে পারিতাম না। কিন্তু সে বেচারীরা ছয় মাস হইতে সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল। শেষে সবুর হিষ্টিরিয়া রোগ হইয়া গেল। এইরূপে আমাদের অবরোধে বাস করিতে অভ্যস্ত করা হয়।

[১২]

পশ্চিম দেশের এক হিন্দু বধূ তাহার শাশুড়ী ও স্বামীর সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। স্নান শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তাহার শাশুড়ী ও স্বামীকে ভিড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু চলিল। কতক্ষণ পরে পুলিশের হল্লা—সেই ভদ্রলোককে ধরিয়া কনষ্টেবল বলে, "তুমি অমুকের বউ ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছ।" তিনি আচম্বিতে ফিরিয়া দেখেন: আ রে! এ কাহার বউ পিছন হইতে তাঁহার কাছার খুঁটি ধরিয়া আসিতেছে!—প্রশ্ন করায় বধূ বলিল, সর্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে—নিজের স্বামীকে সে কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হলদে পাড়ের ধুতি ছিল, তাহাই সে দেখিয়াছে, এই ভদ্রলোকের ধুতির পাড় হলদে দেখিয়া সে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে।

[১৩]

আজিকার (২৮শে জুন, ১৯২৯) ঘটনা শুনুন। স্কুলের একটি মেয়ের বাপ লম্বা চওড়া চিঠি লিখিয়াছেন যে, মোটর বাস তাঁহার গলির ভিতর যায় না বলিয়া তাঁহার মেয়েকে 'বোরকা' পরিয়া মামার (চাকরানীর) সহিত হাঁটিয়া বাড়ী আসিতে হয়। গতকল্য গলিতে এক ব্যক্তি চায়ের পাত্র হাতে লইয়া যাইতেছিল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া হীরার (তাঁহার মেয়ের) কাপড়ে চা পড়িয়া গিয়া কাপড় নষ্ট হইয়াছে। আমি চিঠিখানা আমাদের জনৈক শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া ইহার তদন্ত করিতে বলিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উর্দু ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার অনুবাদ এই:—

"অনুসন্ধানে জানিলাম, হীরার বোরকায় চক্ষু নাই। (হীরাকা বোরকা মে আঁখ নেহি হায়।) অন্য মেয়েরা বলিল, তাহারা গাড়ী হইতে দেখে, মামা প্রায় হীরাকে কোলের নিকট লইয়া হাঁটাইয়া লইয়া যায়। 'বোরকা'য় চক্ষু না থাকায় হীরা ঠিকমত হাঁটিতে পারে না—সেদিন একটা বিড়ালের গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল—কখনও হোঁচট খায়। গতকল্য হীরাই সে চায়ের পাত্রবাহী লোকের গায়ে ধাক্কা দিয়া তাহার চা ফেলিয়া দিয়াছে।"*

দেখুন দেখি, হীরার বয়স মাত্র ৯ বৎসর—এতটুকু বালিকাকে 'অন্ধ বোরকা' পরিয়া পথ চলিতে হইবে। ইহা না করিলে অবরোধের সম্মান রক্ষা হয় না।

[১৪]

প্রায় ২১।২২ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। আমার দূর-সম্পর্কীয়া এক মামী-শাশুড়ী ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিলেন; সঙ্গে মাত্র একজন পরিচারিকা ছিল। কিউল স্টেশনে ট্রেন বদল করিতে হয়। মামানী সাহেব অপর ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকাণ্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেন ও প্লাটফরমের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। স্টেশনে সে সময় মামানীর চাকরানী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হওয়ায় চাকরানী দোহাই দিয়া নিষেধ করিল—"খবরদার। কেহ বিবি সাহেবার গায়ে হাত দিও না।" সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনের সংঘর্ষে মামানী সাহেব পিষিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলেন,—কোথায় তাঁহার 'বোরকা'—আর কোথায় তিনি। স্টেশন ভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিল,—কেহ তাঁহার সাহায্য করিতে অনুমতি পাইল না। পরে তাঁহার চূর্ণপ্রায় দেহ একটা গুদামে রাখা হইল; তাঁহার চাকরানী প্রাণপণে বিনাইয়া কাঁদিল আর তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় ১১ (এগার) ঘন্টা অতিবাহিত হইবার পর তিনি দেহত্যাগ করিলেন। কি ভীষণ মৃত্যু!

* এখনই আষাঢ় মাসের মাসিক "মোহাম্মদী"তে শ্রীমতী আমিনা খাতুনের লিখিত প্রবন্ধের একস্থলে দেখিলাম,—কতক্ষণের জন্য নাক, মুখ, চোক বন্ধ করিয়া বেড়ান (এইরূপ পর্দায় পরপুরুষের ঘাড়ে পড়া সম্ভবপর)—উহা ইসলামের বাহিরের পর্দা।"

[১৫]

হুগলীতে এক বড়লোকের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে এক কামরায় অনেক বিবি জড় হইয়াছেন। রাত্রি ১২টার সময় বোধ হইল, কেহ বাহির হইতে কামরার দরজা ঠেলিতেছে, জোরে, আস্তে—নানা প্রকারে দরজা ঠেলিতেছে। বিবিরা সকলে জাগিয়া উঠিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলেন—নিশ্চয় চোর দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। আর বিবিদের দেখিয়া ফেলিবে। তখন এক জাহাঁবাজ বিবি সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া ফেলিলেন, অবশিষ্ট পুটুলী বাঁধিয়া চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন। পরে বোরকা পরিয়া দ্বার খুলিলেন। দ্বারের বাহিরে ছিল—একটা কুকুরী। তাহার বাচ্চা দু'টি ঘটনাবশতঃ কামরার ভিতর ছিল, আর সে ছিল বাহিরে। বাচ্চার নিকট আসিবার জন্য সেই কুকুরী দরজা ঠেলিতেছিল।

[১৬]

বেহার শরীফের এক বড়লোক দার্জিলিং যাইতেছিলেন; তাঁহার সঙ্গে এক ডজন "মানব-বোঝা" (human-luggage) অর্থাৎ মাসী পিসী প্রভৃতি ৭ জন মহিলা এবং ৬ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের ৫ জন বালিকা। তাঁহারা যথাক্রমে ট্রেন ও স্টীমার বদল করিবার সময় সর্বত্রই পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মণিহারী ঘাট, সক্রিগলি ঘাট ইত্যাদিতে পাল্কী ছিল। বিবিদের পাল্কিতে পুরিয়া স্টীমারের ডেকে রাখা হইত। আবার ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহাদিগকে পাল্কীসহ মালগাড়ীতে দেওয়া হইত। কিন্তু ই. বি. রেলওয়ে লাইনে আর পাল্কী পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা ট্রেনের রিজার্ভ করা সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ীতে বসিতে বাধ্য হইলেন।

শিলিগুড়ি স্টেশনেও পাল্কী বেহারা পাওয়া গেল না। এত বড় বিপদ—বিবিরা দার্জিলিংগের ট্রেনে উঠিবেন কি করিয়া? অতঃপর দুইটা চাদর চারিজন লোকে দুই দিকে ধরিল,—সেই চাদরের বেড়ার মধ্যে বিবিরা চলিলেন। হতভাগা পর্দাধারী চাকরেরা ঠিক তাল রাখিয়া পার্বত্য বন্ধুর পথে হাঁটিতে পারিতেছিল না। কখনও ডাইনের পর্দা আগে যায়, বামের পর্দা পিছনে থাকে; কখনও বামের পর্দা অগ্রসর হয়, আর ডাইনের পর্দা পশ্চাতে। বেচারী বিবিরা হাঁটিতে আরও অপটু—তাঁহারা পর্দা ছাড়িয়া কখনও আগে যান, কখনও পিছে রহিয়া যান। কাহারও জুতা খসিয়া রহিয়া গেল—কাহারও দোপাট্টা উড়িয়া গেল।

[১৭]

প্রায় ১৪ বৎসর পূর্বে আমাদের স্কুলে একজন লক্ষ্ণৌ নিবাসী শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, নাম আখতরজাহাঁ। তাঁহার তিনটি কন্যাও এই স্কুলে পড়িত। একদিন তিনি একালের মেয়েদের নির্লজ্জতার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের মেয়েদের বেহায়াপনার কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কথায় কথায় নিজের বধূ-জীবনের একটা গল্প বলিলেন—"এগারো বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে এক নির্জন কক্ষে থাকিতে হইত। তাঁহার এক ছোট ননদ দিনে তিন চারি বার আসিয়া তাঁহাকে প্রয়োজন মত বাথ-রুমে পৌঁছাইয়া দিত। একদিন কি কারণে সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সংবাদ লয় নাই। এদিকে বেচারী প্রকৃতির তাড়নায় অধীর হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্ণৌ-এ মেয়েকে বড় বড় তামার পানদান যৌতুক দেওয়া হয়। তাঁহার মস্ত পানদানটা সেই কক্ষেই ছিল। তিনি পানদান খুলিয়া সুপারীর ডিবেটা বাহির করিয়া সুপারীগুলি একটা রুমালে ঢালিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি সেই ডিবেটা যে জিনিস দ্বারা পূর্ণ করিয়া খাটের নীচে রাখিলেন, তাহা লিখিতব্য নহে। সন্ধ্যার সময় তাঁহার পিত্রালয়ের চাকরানী বিছানা ঝাড়িতে আসিলে তিনি তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ডিবের দুর্দশার কথা বলিলেন। সে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "থাক, তুমি কেঁদ না; আমি কালই ডিবেটা কালাই (Tinning) করাইয়া আনিয়া দিব। সুপারী এখন রুমালেই বাঁধা থাকুক।"

[১৮]

লাহোরের জনৈক ভুক্তভোগী ডাক্তার সাহেবের রোগিণী দর্শনের বর্ণনা এই—

সচরাচর ডাক্তার আসিলে দুইজন চাকরানী রোগিণীর পালঙ্কের শিয়রে ও পায়ের দিকে একটা মোটা বড় দোলাই ধরিয়া দাঁড়ায়; ডাক্তার সেই দোলাইয়ের একটু ফাঁকের ভিতর হাত দিয়া রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করেন।*

এক বেগম সাহেবা নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। আমি বলিলাম,

* আমাকে জনৈক নন-পর্দা মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, (লেডী ডাক্তারের অভাবে পুরুষ) ডাক্তারকে জিহবা দেখাইতে হইলে আপনি কি করিবেন? দোলাই ফুটা করিয়া তাহার ভিতর হইতে জিহবা বাহির করিয়া দেখাইবেন নাকি। আমি পাঠিকা ভগ্নিদিগকে ঐ প্রশ্নের এবং আমার নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ করি। ডাক্তারকে চোখ, দাঁত এবং কান দেখাইতে হইলে তাঁহারা কি উপায়ে দেখাইবেন?

ফেফড়ার অবস্থা দেখা দরকার ; আমি পিঠের দিক হইতে দেখিয়া লইব। হুকুম হইল, "ষ্টেথিসকোপের নল, যেখানে বলেন, চাকরানী রাখিয়া দিবে।" সকলেই জানেন, ফেফড়া বিভিন্ন স্থান হইতে পরীক্ষা করিলে পর রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমি অগত্যা কর্তার হুকুমে রাজী হইলাম। চাকরানী নলটা দোলাইয়ের ভিতরে বেগম সাহেবের কোমরে নেফার (পায়জামার উপরাংশের) কিছু উপরে রাখিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আশ্চর্য হইলাম যে কোন শব্দ শুনিতে পাই না কেন? দুঃসাহসে ভর দিয়া দোলাই একটু উঠাইয়া দেখিলাম,—দেখি কি নলটা কোমরে লাগান হইয়াছে। আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম।*

[১৯]

জনৈক রেলপথে ভ্রমণকারীর বৃত্তান্তের সারাংশ এই—স্টেশনে টিকিট কেটে মনে মনে একটা হিসেব করলাম। তিনখানা ইন্টার ক্লাসের টিকিটের দরুন দেড় মণ জিনিস নিতে পারবো, কিন্তু আমাদের জিনিস-পত্তর ওজন করলে পাঁচ মণের কম কিছুতেই হবে না। অনেক ভেবে-চিন্তে লগেজ না করাই ঠিক করলাম। মেয়েদের গাড়ীতে জিনিস-পত্তর তুলে দিলে আর কে চেক করতে আসবে?

* * * *

খোকা জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার সঙ্গে কোন জ্যান্ত লগেজ আছে না কি?

আবার আছে না কি! একেবারে এক জোড়া। একে বুড়ি, তায় আবার থুড় থুড়ি।

খোকা বলে—তবেই সেরেছে।

* * * *

যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন বেশ রাত হয়েছে।

অনুমানে বুঝলাম, একটা বড় স্টেশনে গাড়ী থেমে আছে। হঠাৎ মনে হ'ল, বহরমপুর হবে হয়ত। দরজাটা খুলে নামতে যাব, এমন সময় মনে হ'ল যেন শুনতে পেলাম, আমারই নাম ধরে কারা ডাকাডাকি করছে—'ও টুনু—টুনু, এ তো ভারী বিপদে আজ পড়লাম, টুনু রে!'

* ডাক্তার সাহেবের নিজের ভাষায় শুনুন—'লা হাওলা বেলা কু্ওৎ। ময় দিক হো কর উঠ আয়া। আর নওয়াব সাহেব পুছতে হে' কে কেয়া পাতা লাগা? "ময় কেয়া খাক যাতাতা, কে কেয়া পাতা লাগা?"

একে মেয়েলী গলা, তার উপর আবার করুণ। আমি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। দেখলাম, দুই বুড়ী মাটিতে দাঁড়িয়ে মহা কান্নাকাটি শুরু করেছে, আর জিনিসপত্তরগুলোও সব নামানো হয়েছে। চারদিকে তিন চার জন কুলী ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। টি. টি. সি. অর্থাৎ চেকারগুলো রাত্রিবেলা মেয়েদের গাড়ী চেক ক'রে—মালপত্তর সব নামিয়ে দেবে এতো কম অন্যায় কথা নয়। আমি কুলিগুলোকে খুব বকে দিলাম, জিনিস-পত্তর আবার গাড়ীতে তুলে দিতে বললাম। আর একবার কুলিগুলোকে এক চোট বকে দিলাম, এবং টি. টি. সিদের নামে যে রিপোর্ট করতে হবে, সে রকমও অনেক কথা বল্লাম।

ঠাকুরমা কেঁদে বল্লেন, "আরে টুনু, আমরা যে এসে পড়েছি।"

অবশেষে একটা কুলী সাহস করে বল্লে, বাবু ঘাট আ গিয়া।

আমি ঠাকুরমাকে বল্লাম,—তা হলে টি. টি. সি. চেক্ করে নামিয়ে দেয়নি—ঘাটে এসে পড়েছ; সে কথা আমাকে আগে বল্লেই হ'ত, এ জন্য কান্নাকাটি কেন?

[২০]

জনৈক পাঞ্জাবী বেগম সাহেবা নিম্নলিখিত গল্প কোন উর্দু কাগজে লিখিয়াছেন—

আমরা একটা গ্রামে কিছুকাল ছিলাম। একবার তত্রত্য কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গিয়া কুমারী মেয়েদের প্রতি যে অত্যধিক জুলুম হইতে দেখিলাম, তাহাতে আমি প্রাণে বড় আঘাত পাইলাম।

আমরা যথাসময় তথায় পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ীর মেয়েরা কোথায়? শুনিতে পাইলাম, তাহারা সকলে রান্না ঘরে বসিয়া আছে। আমি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, কেবল একা আমাকে সেইখানে ডাকিয়া লওয়া হইল। রান্না ঘরে ভয়ানক গরম আর স্থানও অতিশয় অল্প। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া সেইখানে বসিয়া সেই 'মজলুম' কিন্তু মিষ্টভাষিণী বালিকাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম।

একজন দয়াবতী বিবি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "তোমরা সাবধানে লুকাইয়া উপরে চলিয়া যাও।"

আমি মনে করিলাম, সম্ভবতঃ পুরুষ মানুষদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই সাবধানে লুকাইয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু পরে জানিলাম, এ পর্দা সাধারণ অভ্যাগতা মহিলাদের বিরুদ্ধে ছিল। উক্ত বিবি সাহেবার হুকুমে দুইজন মেয়ে-মানুষ মোটা চাদর ধরিয়া পর্দা করিল, আমরা সেই চাদরের অন্তরাল হইতে উপরে চলিয়া গেলাম।

উপরে গিয়া আমি আরও বিপদে পড়িলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, ছাদের উপর আরামে বসিবার কোন কামরা হইবে, অথবা কমপক্ষে বর্ষাতি চালা হইবে। কিন্তু সেখানে কিছুই ছিল না। একে ত প্রখর রৌদ্র, দ্বিতীয়তঃ বসিবারও কিছু ছিল না। সমস্ত ছাদ জুড়িয়া অর্ধ শুষ্ক ঘুঁটে ছড়ান ছিল ; তাহার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। বহু কষ্টে একজন চাকরানী একটা খাটিয়া আনিয়া দিল, আমরা অগত্যা তাহাতেই বসিলাম। নীচে বাজনা বাজিতেছিল, উৎসব হইতেছিল। কিন্তু অভাগিনী অনূঢ়া বালিকা কয়টি অপরাধিনীর ন্যায় রৌদ্রে বসিয়া ঘুঁটের দুর্গন্ধে হাঁপাইতেছিল। কেহই ইহাদের আরামের জন্য একটুকু খেয়াল করিতেছিল না।

[২১]

বঙ্গদেশের কোন জমিদারের বাড়ী পুণ্যাহের উৎসব উপলক্ষে নাচ গান হইতেছিল। নর্তকীরা বাহিরে যেখানে বিরাট শামিয়ানার নীচে নাচিতেছিল, সে স্থানটা বাড়ীর দেউড়ীর কামরা হইতে দেখা যাইত। কিন্তু বাড়ীর কোনও বিবি সে দেউড়ীর ঘরে যান নাই। নৃত্য দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্য লইয়া বিবিরা ধরাধামে আসেন নাই।

জমিদার সাহেবের একটি তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা ছিল। মেয়েটি দিব্যি গৌরাঙ্গী। তাহাকে আদর করিয়া কেহ বলিত, চিনির পুতুল, কেহ বলিত, ননীর পুতুল। নাম সাবেরা। ভোরের সময় রৌশনচৌকির ভৈরবী আলাপে নিদ্রিত পাখীরা জাগিয়া কলরব আরম্ভ করিয়াছে। সাবেরার 'খেলাইও' (আধুনিক ভাষায় 'আয়া') জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার সাধ হইল, একটু নাচ দেখিতে যাইবে। কিন্তু সাবেরা তখনও ঘুমাইতেছিল। সুতরাং খেলাই সে নিদ্রিতা শিশুকে কোলে লইয়া দেউড়ীর ঘরে নাচ দেখিতে গেল।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়। কর্তা সেই সময় বহির্বাটি হইতে অন্তঃপুরে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সাবেরাকে কোলে লইয়া খেলাই খড়খড়ির

পাখী তুলিয়া তামাসা দেখিতেছিল। তাঁহার হাতে একটা মোটা লাঠি ছিল, তিনি সেই লাঠি দিয়া খেলাইকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। খেলাইয়ের চীৎকারে বিবিরা দৌড়িয়া দেউড়ী ঘরে আসিলেন। এক লাঠি লাগিল সাবেরার উরুতে। তখন কর্তার ভ্রাতৃবন্ধু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ছোট সাহেব, করেন কি! করেন কি! মেয়ে মেরে ফেলবেন?" প্রহারবৃষ্টি তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। জমিদার সাহেব সক্রোধে কহিলেন, "হতভাগী নিজে নাচ দেখবি দেখ না, কিন্তু আমার মেয়েকে দেখাতে আনলি কেন?"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশু ত খেলাইয়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল—সে বেচারী কিছুই দেখে নাই। বাড়ীময় শোরগোল পড়িয়া গেল—সাবেরার দুধের মত শাদা ধবধবে উরুতে লাঠির আঘাতে এক বিশ্রী কালো দাগ দেখিয়া কর্তাও মরমে মরিয়া গেলেন। এইরূপে লাঠির গুতায় আমাদের অবরোধ কারায় বন্দী করা হইয়াছে।

[২২]

শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফরমে ভরা সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোক ট্রেনের অপেক্ষায় পায়চারী করিতেছিলেন। কিছু দূরে আর একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহার পার্শ্বে এক গাদা বিছানা ইত্যাদি ছিল। পূর্বোক্ত ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করায় উক্ত গাদার উপর বসিতে গেলেন। তিনি বসিবা মাত্র বিছানা নড়িয়া উঠিল—তিনি তৎক্ষণাৎ সভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন। এমন সময় সেই দণ্ডায়মান ভদ্রলোক দৌড়িয়া আসিয়া সক্রোধে বলিলেন—"মশায়, করেন কি? আপনি স্ত্রীলোকদের মাথার উপর বসিতে গেলেন কেন?" বেচারা হতভম্ব হইয়া বলিলেন, "মাফ করবেন মশায়। সন্ধ্যার আঁধারে ভালমতে দেখিতে পাই নাই, তাই বিছানার গাদা মনে করিয়া বসিয়াছিলাম। বিছানা নড়িয়া উঠায় আমি ভয় পাইয়াছিলাম যে, এ কি ব্যাপার!"

[২৩]

অপরের কথা দূরে থাকুক। এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার

আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি—অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণ ভয়ে যত্রতত্র—কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।

বাচ্চাওয়ালী মুরগী যেমন আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবা মাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নীচে পলায়, আমাকেও সেইরূপ পলাইতে হইত। কিন্তু মুরগীর ছানার ত মায়ের বুক স্বরূপ একটা নির্দিষ্ট আশ্রয় থাকে, তাহারা সেইখানে পলাইয়া থাকে; আমার জন্য সেরূপ কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থান ছিল না। আর মুরগীর ছানা স্বভাবতঃই মায়ের ইঙ্গিত বুঝে—আমার ত সেরূপ কোন স্বাভাবিক ধর্ম (instinct) ছিল না। তাই কোন সময় চক্ষের ইসারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ না পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরুব্বিগণ, "কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ" ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।

আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সে কলিকাতা থাকাকালীন আমার দ্বিতীয়া ভ্রাতৃবধূর খালার বাড়ী—বোহার হইতে দুইজন চাকরাণী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের 'ফ্রী পাশপোর্ট' ছিল,—তাহারা সমস্ত বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণ ভয়ে পলায়মান হরিণ শিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্রতত্র—কপাটের অন্তরালে কিম্বা টেবিলের নীচে পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটা নির্জন চিল-কোঠা ছিল; অতি প্রত্যুষে আমাকে খেলাই কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত; প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম। বোহারের চাকরাণীদ্বয় সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবার পর অবশেষে সেই চিল-কোঠারও সন্ধান পাইল। আমার এক সহবয়সী ভগিনী-পুত্র, হালু দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে এই বিপদের সংবাদ দিল। ভাগ্যে সেখানে একটা ছাপরখাট ছিল, আমি সেই ছাপরখাটের নীচে গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম—ভয়, পাছে আমার নিঃশ্বাসের সাড়া পাইয়া সেই হৃদয়হীনা স্ত্রীলোকেরা খাটের নীচে উকি মারিয়া দেখে। সেখানে কতকগুলি বাক্স পেটারা, মোড়া ইত্যাদি ছিল। বেচারা হালু তাহার (৬ বৎসর বয়সের) ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সেইগুলি টানিয়া আনিয়া আমার চারি ধার দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিল। আমার খাওয়ার খোঁজ খবরও কেহ নিয়মমত লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিল-কোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকেই ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস

পানি, কখনও খানিকটা 'বিন্নি' (খই বিশেষ) আনিয়া দিত। কখনও বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না—ছেলে মানুষ ত, ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারিদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।

[২৪]

বেহার অঞ্চলে শরীফ ঘরানার মহিলাগণ সচরাচর রেলপথে ভ্রমণের পথে ট্রেনে উঠেন না। তাঁহাদিগকে বনাতের পর্দা ঢাকা পাল্কীতে পুরিয়া, সেই পাল্কী ট্রেনের মালগাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়। ফল কথা, বিবিরা পথের দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা ব্রুকবণ্ড চায়ের মত vacuum টিনে প্যাক হইয়া দেশ ভ্রমণ করেন। কিন্তু এই কলিকাতার এক ঘর সম্ভ্রান্ত পরিবার উহার উপরও টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ীর বিবিদের রেলপথে কোথাও যাইতে হইলে প্রথমে তাঁহাদের প্রত্যেককে, পাল্কীতে বিছানা পাতিয়া, একটা তালপাতার হাত পাখা, এক কুজা পানি এবং একটা গ্লাস-সহ বন্ধ করা হয়। পরে সেই পাল্কীগুলি তাঁহাদের পিতা কিম্বা পুত্রের সম্মুখে চাকরেরা যথাক্রমে—(১) বনাতের পর্দা দ্বারা প্যাক করে; (২) তাহার উপর মোম-জমা কাপড় দ্বারা সেলাই করে; (৩) তাহার উপর খারুয়ার কাপড়ে ঘিরিয়া সেলাই করে; (৪) তাহার পর বোম্বাই চাদরের দ্বারা সেলাই করে; (৫) অতঃপর সর্বোপরে চট মোড়াই করিয়া সেলাই করে। এই সেলাই ব্যাপার তিন চারি ঘন্টা ব্যাপিয়া হয়—আর সেই চারি ঘন্টা পর্যন্ত বাড়ীর কর্তা ঠায় উপস্থিত থাকিয়া খাড়া পাহারা দেন। পরে বেহারা ডাকিয়া পাল্কীগুলি ট্রেনের ব্রেকভ্যানে তুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পর, পুনরায় পুরুষ অভিভাবকের সম্মুখে ক্রমানুয়ে পাল্কী-গুলির সেলাই খোলা হয়। সেলাই খুলিয়া পাল্কীগুলি বনাতের পর্দা ঢাকা অবস্থায় রাখিয়া চাকরেরা সরিয়া যায়। পরে কর্তা স্বয়ং এবং বাড়ীর অপর আত্মীয় এবং মেয়েমানুষেরা আসিয়া পাল্কীর কপাট খুলিয়া মুমূর্ষা বন্দিনীদের অজ্ঞান অবস্থায় বাহির করিয়া যথারীতি মাথায় গোলাপ জল ও বরফ দিয়া, মুখে চামচ দিয়া পানি দিয়া, চোখে মুখে পানির ছিঁটা দিয়া বাতাস করিতে থাকেন। দুই ঘন্টা বা ততোধিক সময়ের শুশ্রূষার পর বিবিরা সুস্থ হন।

[২৫]

"অবরোধ-বাসিনী'র ১১নং প্যারায় লিখিয়াছি যে, আমি গত ১৯২৪ সনে আমার দুই নাতিনের বিবাহোপলক্ষে আরায় গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আরা

শহরটার সেই বাড়ীখানা এবং আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। আমার 'মেয়েকে' (অর্থাৎ মেয়ের মৃত্যুর পর জামাতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে) সেই কথা বলায় তিনি অতি মিনতি করিয়া আমাকে বলিলেন, "আম্মা, আপনি যদি দয়া করিয়া শহর দেখিতে চান, তবে আমরাও আপনার জুতার বরকতে শহরটা একটু দেখিয়া লইব। আমরা সাত বৎসর হইতে এখানে আছি, কিন্তু শহরের কিছুই দেখি নাই।" সদ্যপরিণীতা মজু এবং সবুও সকাতরে বলিল, "হাঁ নানি আম্মা, আপনি আব্বাকে বলিলেই হইবে।"

আমি ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন বাবাজীবনকে একখানা গাড়ী সংগ্রহ করিয়া দিতে বলায়, তিনি প্রতিদিনই অতি বিনীতভাবে জানাইতেন যে, গাড়ী পাওয়া যায় না। শেষের দিন বিকালে তাঁহার ১১ বৎসর বয়স্ক পুত্র আমাদের সংবাদ দিল যে, যদি বা একটা ভাড়াটে গাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু তাহার জানালার একটা পাখী ভাঙ্গা। মজু অতি আগ্রহের সহিত বলিল, "সেখানটায় আমরা পর্দা করিয়া লইব—আল্লার ওয়াস্তে তুমি গাড়ী ফেরত দিও না।" সবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "ভালই হইয়াছে, ঐ ভাঙ্গা জানালা দিয়া ভালমতে দেখা যাইবে।" আমরা যত বারই গাড়ীতে উঠিতে যাইবার জন্য তাড়া দিই, ততবারই শুনি : সবুর করুন, বাহিরে এখনও পর্দা হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ীতে গিয়া দেখি, সোবহান আল্লাহ্! দুই তিন খানা বোম্বাইয়ে চাদর দিয়া গাড়ীটা সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে। জামাতা স্বয়ং গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিলেন, আমরা গাড়ীতে উঠিবার পর তিনি স্বহস্তে কাপড় দিয়া দরজা বাঁধিয়া দিলেন। গাড়ী কিছু দূরে গেলে, মজু সবুকে বলিল, "দেখ এখন ভাঙ্গা জানালা দিয়া।" সেই পর্দার এক স্থলে একটা ছিদ্র ছিল, মজু, সবু এবং তাহাদের মাতা সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, আমি আর সে ফুটা দিয়া দেখিবার জন্য তাহাদের সহিত কাড়াকাড়ি করিলাম না।

[২৬]

আমাদের ন্যায় আমাদের নামগুলি পর্যন্ত পর্দানশীনা। মেয়েদের নাম জানা যায়, কেবল তাহাদের বিবাহের কাবিন লিখিবার সময়। এক মস্ত জমিদারের তিন কন্যার বিবাহ একই সঙ্গে হইতেছিল। মেয়েদের ডাকনাম, বড় গেন্দলা, মেজো গেন্দলা এবং ছোট গেন্দলা—প্রকৃত নাম কেহই জানে না। তাহাদের সম্পর্কের এক চাচা হইলেন বিবাহ পড়াইবার মোল্লা। কন্যাদের বয়স অনুসারে

তিন জন বরের বয়সেরও তারতম্য ছিল। তিন জন বরই বিবাহ কেন্দ্রে অনুপস্থিত। আমরা পাঠিকাদের সুবিধার নিমিত্ত বরদিগকে বয়স অনুসারে ১নং, ২নং এবং ৩নং বলিব।

মোল্লা সাহেবের হাতে তিন বর এবং তিন কন্যার নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তিনি যথাসময় বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে বসিয়া ভ্রমবশতঃ বর ও কন্যাদের নাম গোলমাল করিয়া ১নং বরের সহিত ছোট গেন্দলার বিবাহ দিয়া দিলেন; ৩নং বরের সহিত মেজো গেন্দলার বিবাহ দিলেন। এখন ২নং বরের সহিত বড় গেন্দলার বিবাহের পালা। মেজো ও ছোট গেন্দলার বয়স খুব অল্প,—১১ এবং ৭ বৎসর, তাই তাহারা কোন উচ্চ বাচ্য করে নাই। কিন্তু বড় গেন্দলার বয়স ১৯ বৎসর; সে লুকাইয়া ছাপাইয়া মুরুব্বিদের কথাবার্তা শুনিয়া জানিয়াছিল, তাহার বিবাহ হইবে, ১নং বরের সহিত। আর বরের নামও তাহার জানা ছিল। সুতরাং ২নং বরের নাম লইয়া মোল্লা সাহেব যখন বড় গেন্দলার 'এজেন' চাহিলেন, সে আর কিছুতেই মুখ খোলে না। মা, মাসীর উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও যখন সে কিছু বলিল না, তখন তাহার মাতা আর ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া মোল্লা সাহেবকে বলিলেন, "হাঁ, গেন্দলা 'হু' বলেছে; বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি আর কতক্ষণ হয়রান হবে।" তিনি বলিলেন, আমরা গেন্দলার মুখের 'হু' শুনি নাই, তবে কি আপনার 'হু' লইয়া আপনারই বিবাহ পড়াইব নাকি? তদুত্তরে ক'নের মা তাঁহার পিঠে এক বিরাট কিল বসাইয়া দিলেন। অবশেষে গেন্দলা বেচারী 'হু' বলিল কিনা, আমরা সে খবর রাখি না।

এদিকে যথাসময় টেলিগ্রাফযোগে ৩০ বৎসর বয়স্ক ১নং বর যখন জানিলেন যে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, (১৯ বৎসর বয়স্কা বড় গেন্দলার পরিবর্তে) সর্ব কনিষ্ঠা ৭ম বর্ষীয়া ছোট গেন্দলার সহিত, তখন তিনি চটিয়া লাল হইলেন,—শাশুড়ীকে লিখিলেন কন্যা বদল করিয়া দিতে; নচেৎ তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে জুয়াচুরির মোকদ্দমা আনিবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

[২৭]

প্রায় ১০।১১ বৎসরের ঘটনা। বলিয়াছি ত বেহার অঞ্চলে বিবাহের তিন মাস পূর্বে 'মাইয়া খানায়' বন্দী করিয়া মেয়েদের আধমরা করা হয়। ও কখনও ঐ বন্দীশালায় বসিবার মেয়াদ,—যদি বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা হইয়া বিবাহের তারিখ পিছাইয়া যায় তবে বৎসর কালও হয়; এক বেচারী সেইরূপ ছয় মাস পর্যন্ত

বন্দিনী ছিল। তাহার স্নান, আহার প্রভৃতির বিষয়েও যথাবিধি যত্ন লওয়া হইত না। একেই ত বিহারী লোকেরা সহজে স্নান করিতে চায় না, তাহাতে আবার 'মাইয়া খানার' বন্দিনী মেয়েকে কে ঘন ঘন স্নান করাইবে? ঐ সময় মেয়ে মাটিতে পা রাখে না—প্রয়োজন মত তাহাকে কোলে করিয়া স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার নড়াচড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সমস্ত দিন মাথা গুঁজিয়া একটা খাটিয়ার উপর বসিয়া থাকিতে হয়, রাত্রিকালে সেখানেই শুইতে হয়। অপরে মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস খাওয়ায়, অপরে 'অবখোরা' ধরিয়া পানি খাওয়াইয়া দেয়। মাথার চুলে জটা হয়, হউক—সে নিজে মাথা আঁচড়াইতে পারিবে না। ফল কথা, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাহাকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যাহা হউক, ছয় মাস অন্তর সেই মেয়েটির বিবাহ হইলে দেখা গেল, সর্বদা চক্ষু বুজিয়া থাকার ফলে তাহার চক্ষু দুইটি চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

[২৮]

বহুকালের ঘটনা। বহু পুণ্যফলে আরবদেশীয় কোন মহিলা কলিকাতায় তশরীফ আনিয়াছিলেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু বলিতে শিখিয়াছিলেন। যখন দলে দলে বিবিরা পাল্কীযোগে তাঁহার জেয়ারত করিতে আসিতেন, তিনি পাল্কী দেখিয়া হয়রান হইতেন যে এ 'আজাব' কেন?

একদিন পূর্ববঙ্গের এক বিবি আসিয়াছিলেন। আরবীয়া মহিলা কুশল প্রশ্ন প্রসঙ্গে আগন্তুক বিবির স্বামীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দান কালে বাঙ্গাল বিবি মাথার ঘোমটা টানেন আর বলেন, "তানি ত বালই আছেন। তানার আবার কি অইব? তানি ত বালই আছেন।" বেচারী আরবীয়া বিবি বুঝিতেই পারিলেন না যে, স্বামীর কুশল বলিবার সময় ঘোমটা টানার প্রয়োজন হইল কেন?

আরবীয়া বিবি বাঙ্গালার বিবিদের পাল্কীতে উঠা ব্যাপারটা কৌতুকের সহিত দাঁড়াইয়া দেখিতেন। একদিন এক বোরকা-পরিহিতা পাল্কিতে উঠিলেন, তাঁহার কোলে দুই বৎসরের শিশু, সঙ্গে পানদান, একটা বড় কাঠের বাক্স, একটা কাপড়ের গাঁঠরী এবং এক কুজা পানি। পাল্কিটার বেতের ছাউনি ভাঙ্গা ছিল, তাহা পূর্বে কেহ লক্ষ্য করে নাই। বেহারাগণ যখন পাল্কী তুলিল, অমনি মড় মড় করিয়া পাল্কীর বেত্রাসন ভাঙ্গিতে লাগিল। পাল্কীর দুই পার্শ্বে দুইজন বরকন্দাজ চলিয়াছে—তাহারা শিশুটিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবজাদা, মড় মড় শব্দ

করে কি ?" কিন্তু পাল্কী হইতে কোন উত্তর আসিল না।—একটু পরে গেট পার হইয়া পাল্কীটা অত্যন্ত হাল্‌কা বোধ হওয়ায় বেহারাগণ থমকিয়া দাঁড়াইল। ওদিকে ভাঙ্গা পাল্কী গলাইয়া বোরকা-পরা বিবি ছেলেকে আকড়িয়া ধরিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছেন ; গাঁঠরী, পানদান সব ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। কুজা ভাঙ্গিয়া পানি পড়িয়া তিনি ভিজিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু তবু মুখে বলেন নাই—"পাল্কী থামাও।" কলিকাতার রাস্তায় এই ব্যাপার।—বেচারী আরবের বিবি তাড়াতাড়ি চাকরানী পাঠাইয়া বিবিটিকে আনাইয়া বলিলেন, "বিবি, পাল্কীর এমন তামাসা দেখিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।"

[২৯]

একবার আমি কোন একটি লেডীজ কনফারেন্স উপলক্ষে আলীগড়ে গিয়াছিলাম। সেখানে অভ্যাগতা মহিলাদের নানাবিধ বোরকা দেখিলাম। একজনের বোরকা কিছু অদ্ভুত ধরণের ছিল। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহার বোরকার প্রশংসা করায় তিনি বলিলেন,—"আর বলিবেন না—এই বোরকা লইয়া আমার যত লাঞ্ছনা হইয়াছে।" পরে তিনি সেই সব লাঞ্ছনার বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা এই :—

তিনি কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ী শাদীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে (বোরকা-সহ) দেখিবা মাত্র সেখানকার ছেলেমেয়েরা ভয়ে চীৎকার করিয়া কে কোথায় পালাইবে, তাহার ঠিক নাই। আরও কয়েক ঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার স্বামীর আলাপ ছিল, তাই তাহাকে সকলের বাড়ীই যাইতে হইত। কিন্তু যতবার যে বাড়ী গিয়াছেন, ততবারই ছেলেদের সভয় চীৎকার ও কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন। ছেলেরা ভয়ে থর থর কাঁপিত।

তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি পাঁচ জনে বোরকা-সহ খোলা মোটরে বাহির হইলে পথের ছেলেরা বলিত, "ও মা! ওগুলো কি গো ?" একে অপরকে বলে, "চুপ কর!—এই রাত্রিকালে ওগুলো ভূত না হয়ে যায় না।" বাতাসে বোরকার নেকাব একটু আধটু উড়িতে দেখিলে বলিত—"দেখ্ রে দেখ্! ভূতগুলার শুঁড় নড়ে! বাবা রে! পালা রে!

তিনি এক সময় দার্জিলিং গিয়াছিলেন। ঘুম স্টেশনে পেঁৗছিলে দেখিলেন, সমবেত জনমণ্ডলী একটা বামন লোককে দেখিতেছে—বামনটা উচ্চতায় একটা ৭৷৮ বৎসরের বালকের সমান, কিন্তু মুখটা বয়োঃপ্রাপ্ত যুবকের, মুখ-ভরা দাড়ী

গোঁফ। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, জনমণ্ডলীর কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দিকে। দর্শকেরা সে বামন ছাড়িয়া এই বোরকা-ধারিণীকে দেখিতে লাগিল।

অতঃপর দার্জিলিং পৌঁছিয়া তাঁহারা আহারান্তে বেড়াইতে বাহির হইলেন, অর্থাৎ রিক্‌শ গাড়ীতে করিয়া যাইতেছিলেন। 'মেলে' গিয়া দেখিলেন, অনেক ভীড়; সেদিন তিব্বত হইতে সেনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য লোকের ভীড়। তাঁহার রিক্‌শখানি পথের এক ধারে রাখিয়া তাঁহার কুলিরাও গেল,—তামাসা দেখিতে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখেন, দর্শকেরা সকলেই এক একবার রিক্‌শর ভিতর উকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছে।

তিনি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলে পথের কুকুরগুলা ঘেউ ঘেউ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিত। দুই একটা পার্বত্য ঘোড়া তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে সওয়ার-শুদ্ধ লাফালাফি আরম্ভ করিত। একবার চায়ের বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, তিন চারি বৎসরের এক বালিকা মস্ত ঢিল তুলিয়াছে, তাঁহাকে মারিতে। *

একবার তাঁহার পরিচিতা আরও চারি পাঁচজন বিবির সহিত বেড়াইবার সময় একটা ক্ষুদ্র ঝরণার ধারে কঙ্করবিশিষ্ট কাদায় সকলেই বোরকায় জড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। নিকটবর্তী চা বাগান হইতে কুলিরা দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের তুলিল; আর স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনায় বলিল, "একে ত জুত্তা পরেছ, তার উপর আবার ঘেরাটোপ,—এ অবস্থায় তোমরা গড়াইবে না ত কি করিবে?" আহা! বিবিদের কারচুবি কাজ করা দো-পাট্টা কাদায় লতড়-পতড়, আর বোরকা ভিজিয়া তর-বতর।

কেবল ইহাই নহে, পথের লোক রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিত,—"চুপ কর, ঐ দেখ মক্কা মদিনা যায়,—ঐ!—ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ী,—ওরাই মক্কা মদিনা!!"

[৩০]

কোন একটি কুলে শীলে ধন্য সৎপাত্রের সহিত এক জমিদারের বয়োপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ ঠিক হইয়াছিল। কি কারণে বরের পিতার সহিত কন্যাকর্তার

---

* বাঙ্গালী ও গুর্খায় প্রভেদ দেখুন; যৎকালে বাঙ্গালী ছেলেরা ভয়ে চীৎকার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া পলাইত, সে সময় গুর্খাশিশু আত্মরক্ষার জন্য ঢিল তুলিয়াছে সে ভয়াবহ বস্তুকে মারিতে।

ঝগড়া হওয়ায় বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতে পাত্রী যারপরনাই দুঃখিতা হইল।

কন্যার পিতা তাড়াতাড়ি অন্য বর না পাইয়া নিজের এক দুরাচার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বসিলেন। সে বেচারী তাহার খুড়তাতো ভাইয়ের কুকীর্তির বিষয় সমস্তই অবগত ছিল,—কত দিন সে নিজেই ঐ মাতালটাকে তেঁতুলের শরবত খাওয়াইয়া এবং মাথায় জল ঢালিয়া তাহার মাতলামী দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং এই বিবাহে তাহার ঘোর আপত্তি ছিল।

কিন্তু পাত্রী ত মূক,—তাহার বাক্‌শক্তি থাকিয়াও নাই। তাহার একমাত্র সম্বল নীরব রোদন। তাই সে কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু নিষ্ঠুর পিতামাতার ভ্রূক্ষেপ নাই,—তাঁহারা ঐ মাতালের সহিত তাহার বিবাহ দিবেনই দিবেন। এইরূপেই আমাদের কাঠমোল্লা শ্রেণীর মুরুব্বিগণ শরিয়তের গলা টিপিয়া মারিয়া ইসলাম ও শরিয়ত রক্ষা করিতেছেন।

বিবাহ-সভায় বসিয়া পাত্রী কিছুতেই 'হু' বলিতেছিল না। মাতা, পিতামহী প্রভৃতির অনুনয়, সাধ্য-সাধনা, মিষ্ট ভর্ৎসনা,—সবই সে দুই চক্ষের জলে ভাসাইয়া দিতেছিল। অবশেষে একজনে অতর্কিতে কন্যাকে খুব জোরে চিমটি কাটিল; সেই আঘাতে সহসা "উহু!" বলিয়া সে কাতর ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই "উহু" কে "হু" বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। সোবহান্ আল্লাহ্! জয়, অবরোধের জয়!

[৩১]

একবার কোন স্থলে চলন্ত ট্রেনে মেয়েমানুষদের কক্ষে একটা চোর উঠিল। চোর বহাল তবিয়তে একে একে প্রত্যেকের অলঙ্কার খুলিয়া লইল; কিন্তু লজ্জায় জড়সড় লজ্জাবতী অবলা সরলা কুলবালাগণ কোন বাধা দিলেন না। তাঁহারা সকলে ক্রমাগত ঘোমটা টানিতে থাকিলেন। "তওবা! তওবা! কাহাঁ সে মর্দুয়া আ গয়া!" বলিয়া কেহ কেহ বোরকার নেকাব টানিলেন। পরে চোর মহাশয় ট্রেনের এলার্মের শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়া নির্বিঘ্নে নামিয়া গেল।

[৩২]

ভাংনীর জমিদার সাহেবের ডাক নাম,—ধরুন,—বাচ্চা মিয়া। তাঁহার পত্নীর নাম হাসিনা খাতুন। হাসিনার পিতার বিশাল সম্পত্তি,—অগাধ টাকা।

একবার বাচ্চা মিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আমার টাকার দরকার, আজই তোমার পিতার নিকট পত্র লিখাইয়া টাকা আনাইয়া দাও।" যথাসময়ে টাকার পরিবর্তে তথা হইতে মিতব্যয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতার ন্যায় পত্র আসিল।

বাচ্চা মিয়ার শ্বশুর অনেকবার জামাতাকে টাকা দিয়াছেন। এখন টাকা দানে তাঁহার অরুচি জন্মিয়া গিয়াছে। তাই কন্যাকে টাকা না পাঠাইয়া উপদেশ পাঠাইলেন। ইহাতে বাচ্চা মিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীর 'নাইওর' (পিত্রালয়) যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

এক দিকে পিতামাতা কাঁদেন, অপর দিকে হাসিনা নীরবে কাঁদেন—পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ আর হয় না। কিছুকাল পরে হাসিনার ভ্রাতা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন।

তিনি সোজা ভাংনী না গিয়া পথে দুই ক্রোশ দূরে ফুলচোক নামক গ্রামে তাঁহার মাসীমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ভাংনীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি অপরাহ্নে তথায় যাইবেন।

যাহাতে ভ্রাতা ও ভগিনীতে দেখা না হইতে পারে, সে জন্য বাচ্চা মিয়া এক ফন্দী করিলেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে, তাঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য ফুলচৌকী হইতে লোক আসিয়াছে। হাসিনা স্বামীর চালবাজী জানিতেন, সহসা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, অদ্য অপরাহ্নে তাঁহার ভাই সা'ব আসিবেন।

বাচ্চা মিয়া পুনরায় কহিলেন, "ভাই সা'বের মাথা ধরিয়াছে, তিনি আজ আসিতে পারিবেন না। সেই জন্য খালা আম্মা ইয়ার মাহমুদ সর্দারকে পাঠাইয়াছেন আমাদের লইয়া যাইতে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস না কর ত চল দেউড়ী ঘরে গিয়া স্বকর্ণে সর্দারের কথা শুন।"

তদনুসারে দেউড়ী ঘরের দ্বারের বাহিরে ইয়ার মাহমুদকে ডাকিয়া আনা হইল। ঘরের ভিতর হইতে বাচ্চা মিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়ার মাহমুদ! তুমি এখন ফুলচৌকী হইতে আইস নাই?" সে উত্তর করিল, "হাঁ, হুজুর! আমিই খবর নিয়া আসিয়াছি—" বাচ্চা মিয়া তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া তাহাকে আর বেশী কিছু বলিতে দিলেন না।

হাসিনা হাসি-খুশী, মাসীমার বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার জন্য বানাতের ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কী সাজিল, তাঁহার বাঁদীদের জন্য খেরুয়ার ওয়াড় ঘেরা গোটা আষ্টেক ডুলী সাজিল, বাচ্চা মিয়াঁর মেয়ানা (খোলা পাল্কী বিশেষ)

সাজিল। আর্দালী, বরকন্দাজ, আসাবরদার, সোটাবরদার ইত্যাদিসহ তাঁহারা বেলা ১টার সময় রওয়ানা হইলেন।

পথে যখন হাসিনা বুঝিতে পারিলেন যে, দুইখানি ডিঙ্গী নৌকা জুড়িয়া তার উপর তাঁহার পাল্কী রাখিয়া নদী পার করা হইতেছে, তখন তিনি রোদন আরম্ভ করিলেন যে, ফুলচৌকী যাইতে ত নদী পার হইতে হয় না—আল্লা রে, আল্লাহ্! সা'ব তাঁহাকে এ কোন জায়গায় আনিলেন!! পাল্কীতে মাথা ঠুকিয়া কান্না ছাড়া অবরোধ-বাসিনী আর কি করিতে পারে?

[৩৩]

প্রায় ১৮ বৎসর হইল, কলিকাতায় একটা দেড় বৎসর বয়স্ক শিশুর জ্বর হইয়াছিল। তাঁহাদের অবরোধ অতি কঠোর,—তাই অতটুকু মেয়েকেও কোন হি-ডাক্তার দেখিতে পাইবেন না, সুতরাং শি-ডাক্তার আসিয়াছেন। বাড়ী ভরা যে স্ত্রীলোকেরা আছেন, তাঁহাদের একমাত্র 'শরাফত' ব্যতীত আর কোন গুণ নাই। তাঁহারা লেডী ডাক্তার মিস গুপ্তকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মিস গুপ্ত দেখিয়া শুনিয়া রোগী-মেয়েকে গরম জলে স্নান করাইতে চাহিলেন।

শি-ডাক্তার মিস গুপ্ত চাহেন গরম জল,—বিবিরা দেখেন একে অপরের মুখ! তিনি চাহেন ঠাণ্ডা জল,—বিবিরা বলেন, "বাপ্ রে! ঠাণ্ডা জলে স্নান করালে মেয়ের জ্বর বেড়ে যাবে।" ফল কথা, বেচারী মিস গুপ্ত সে দিন কিছুতেই তাঁহাদিগকে নিজের বক্তব্য বুঝাইতে পারিলেন না। তিনি বাহিরে আসিয়া কর্তার নায়েব সাহেবকে সমস্ত বলিয়া বিদায় হইবার সময় বলিলেন, তিনি এ বাড়ীতে আর আসিবেন না। নায়েব সাহেব অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে ১৬৲ ফী গছাইয়া দিয়া পর দিন আবার আসিতে বলিলেন।

পরদিন আবার শি-ডাক্তার মিস গুপ্তকে লইয়া বাড়ীর গিন্নীদের গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। বে-গতিক দেখিয়া নায়েব সাহেব তাঁহার পরিচিতা জনৈকা মহিলাকে আনিয়া মিস গুপ্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বীণাপাণি (নায়েব সাহেবের প্রেরিতা সেই বাঙ্গালী মহিলা) আসিয়া দেখেন, লেডী ডাক্তার রাগিয়া ভূত হইয়া আছেন। আর সমবেত বিবিরা দাঁড়াইয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতেছেন,—তাঁহাদের মুখে ধান দিলে খই ফোটে। শেষে মিস গুপ্ত গর্জন করিয়া বলিলেন, "ময়ঁ তামাসা দেখ্‌নে নেহী আয়ী হোঁ।"

বীণাপাণি চুপি চুপি বিবিদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কি? তাঁহারা বলিলেন, বুঝিতে পারি না,—তিনি তোয়ালে চাহেন, টব চাহেন, কিন্তু আমরা যাহা দেই, তাহাই দূরে ছুঁড়িয়া ফেলেন।

পরে তিনি মিস গুপ্তকে তাঁহার বিরক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাতের ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি। আধ ঘন্টার উপর হয়ে এ'ল, এখন পর্যন্ত মেয়েকে স্নান করাবার জন্য কোন জিনিস পেলুম না।" বীণা সভয়ে বলিলেন, "উহারা যে জিনিস দেন, তাই নাকি আপনি পছন্দ করেন না?"

মিস গুপ্ত বলিলেন, কি করে পছন্দ করব বলুন দেখি? আমি চাই একটা বাথ-টাব, তাতে বসিয়ে শিশুকে স্নান করাব, ওঁরা দেন আমাকে এতটুকু একটা একসেরা ডেকচি—কাজেই আমি ছুঁড়ে ফেলেছি। আপনি বলুন, এতটুকু ডেকচির ভিতর আমি শিশুকে বসাই কি ক'রে? আমি চাই নরম পুরাতন কাপড়, শিশুর গা মুছে দেবার জন্য, ওঁরা দেন আমাকে নূতন খস্‌খসে তোয়ালে,—কাজেই আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আমাকে ঐশ্বর্য দেখান যে, নূতন তোয়ালে আছে। এঁরা মনে করেন যে, এঁরা পীর—তাই everybody should worship them।

শেষে বীণা সমস্ত জিনিস যোগাড় করিয়া দিয়া শিশুকে স্নান করাইতে মিস গুপ্তের সাহায্য করিলেন। তখন রাগ পড়িয়া গিয়া তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল; বিবিরাও নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

[৩৪]

শুনিয়াছি বঙ্গদেশের কোন শরীফ খান্দানের বাড়ীর নিয়ম এই যে, বিবাহের সময় কন্যাকে 'হুঁ' বলিয়া এজেন দিতে হয় না। মেয়ের কণ্ঠস্বরের ঐ 'হুঁ' টুকুই বা পর-পুরুষে শুনিবে কেন? সেই জন্য বিবাহ-সভায় মোটা পর্দার একদিকে পাত্রীর উকিল, সাক্ষী, আত্মীয়স্বজন এবং বর-পক্ষের লোকেরা থাকে, অপর পার্শ্বে কন্যাকে লইয়া স্ত্রীলোকেরা বসে। পর্দার নীচে একটা কাঁসার থালা থাকে,—থালার অর্ধেক পর্দার এপারে, অপর অর্ধাংশ পর্দার ওপারে থাকে।

বিবাহের কলেমা পড়ার পর কন্যার কোন সঙ্গিনী বা চাকরাণী একটা সরোতা (যাঁতী) সেই থালার উপর ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দেয়—যাঁতীটা সশব্দে পুরুষের দিকে গিয়া পড়িলে বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়িল। লক্ষ্ণৌ-এর এক বিবির সহিত আমার আলাপ আছে। একদিন তাঁহার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছি; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সপ্তম বর্ষীয় পুত্র দুষ্টামী করায় তিনি তাহাকে "হারামী—" বলিয়া গালি দিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। ছেলে পলাইয়া গেলে পর আমি তাঁহাকে বিনা সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গালি তিনি কাহাকে দিলেন,—ছেলেকে, না ছেলের মাতাকে? তিনি তদুত্তরে সহাস্যে বলিলেন যে, বিবাহের সময় যদিও তিনি বয়োপ্রাপ্তা ছিলেন তথাপি কেহ তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করে নাই। বিবাহ মজলিসে তিনি 'হুঁ' 'হাঁ' কিছুই বলেন নাই; জবরদস্তী তাঁহার শাদী দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার "সব বাচ্চে হারামজাদে!"

[৩৫]

মরহুম মৌলবী নজীর আহমদ খাঁ বাহাদুরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত দিল্লী গদরের সময় অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের দুর্দশার বর্ণনা হইতে অংশ বিশেষের অনুবাদ এই:

রাত্রি ১০টার সময় আমার ভাইজানকে কাপ্তেন সাহেবের প্রেরিত লোকটি বলিল যে, আমরা রাত্রি ২টার সময় বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিব। আপনাদের বাড়ীর নিকটেই তোপ লাগান হইয়াছে। অতএব, আপনারা আক্রমণের পূর্বেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন। এ সংবাদ শুনিবা মাত্র আমাদের আত্মা শুকাইয়া গেল। কিন্তু কোন উপায় ছিল না!

শেষে আমরা পদব্রজে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলাম। সে দিনের দুঃখের কথা মনে হইলে এখনও মনে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। এক কর্ত্রী সাহেবা সমস্ত ধন-দৌলত ছাড়িয়া পানদান সঙ্গে লইয়া চলিলেন। হতভাগীদের মোটেই হাঁটিবার অভ্যাস নাই—এখন প্রাণের দায়ে হাঁটিতে গিয়া কাহারও জুতা খসিয়া রহিয়া গেল, কাহারও ইজারবন্দ পায়ে জড়াইয়া গেল; সে দিন যাঁর পায়জামার পাঁয়চা যত বড় ছিল, তাঁহারই হাঁটিতে তত অধিক কষ্ট হইতেছিল। ভাইজান সে সময় তিক্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের বলিতেছিলেন, "কমবখতিরা আরও দুই থান নয়নসুখের পায়জামা বানাও। লাহোরের রেশমী ইজারবন্দ আরও জরির ঝালর লাগাইয়া লম্বা কর!"

বেচারারা বাজারের পথে চলিলেন; ভাগ্যে রাত্রি ছিল, তাই রক্ষা! অর্থাৎ আমাদের তৎকালীন দুর্গতি দেখিবার জন্য লোকের ভিড় হয় নাই। আহা রে!

সকলের পা ফুলিয়া ভারী হইল যেন এক এক মণ,—দুই পা চলেন আর হোঁচট খান, বার বার পড়েন। একজন পথে বসিয়া একেবারে এলাইয়া পড়িলেন যে, আর তিনি হাঁটিতে পারিবেন না। কেবল পায়ে ব্যথা নয়, আমাদের সর্বাঙ্গে বেদনা হইয়া গেল। বেচারী বিবিদের লাঞ্ছনার অবধি ছিল না।

কিছুদূর যাইয়া দেখি, হাজার হাজার গোরা আর শিখ সৈন্য সারি বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহা দেখিবা মাত্র ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। আরও চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়া পড়িলাম।

অবশেষে বহু কষ্টে কিছুদূর গিয়া ভাইজান চারটা গাধা সংগ্রহ করিলেন। শেষে গাধায় উঠিয়া বিবিরা রক্ষা পাইলেন।

[৩৬]

শীতকাল। মাঘ মাসের শীত। সেই সময় কোথা হইতে এক ভালুকের নাচওয়ালা গ্রামে আসিল। গ্রামে কোন নূতন কিছু আসিলে প্রথমে তাহাকে জমীদার বাড়ীতে হাজিরা দিতে হয়। তদনুসারে ভালুকওয়ালা জমীদার বাড়ীতেই অতিথি হইয়াছে। প্রশস্ত দালানের উত্তর দিকের মাঠে প্রত্যহ ভালুকের নাচ হয়,—গ্রামশুদ্ধ লোকে আসিয়া নাচ দেখে। কিন্তু বাড়ীর বউ ঝী সে নাচ দেখা হইতে বঞ্চিতা।

ছোট ছেলেরা এবং বুড়ী চাকরাণীরা আসিয়া গিন্নীদের নিকট গল্প করে,—ভালুকে খেমটা নাচ নাচে; থমকা নাচ নাচে। এমন করিয়া ভালুকওয়ালার সঙ্গে কুস্তি লড়ে; এমন করিয়া পাছাড় ধরে।—ইত্যাদি। এইসব গল্প শুনিয়া শুনিয়া কর্তার দুইজন অল্পবয়স্কা পুত্রবধূর সাধ হইল যে, একটু নাচ দেখিবেন। বেশী দূর যাইতে হইবে না, ছোট বউবিবির কামরার উত্তর দিকের জানালার ঝরোকা (খড়খড়ির পাখী) একটু তুলিলেই সুস্পষ্ট দেখা যায়।

যেই বধূদ্বয় ঝরোকা তুলিয়াছেন, অমনি তাঁহাদের চারি বৎসর বয়স্কা ননদ জোহরা দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল যে, সেও দেখিবে। একজন তাহাকে কোলে তুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন। জোহরা কখনও বাড়ীর উঠানে নামিয়া কুকুর বিড়াল পর্যন্ত দেখে নাই,—এখন দেখিল একেবারে ভালুক। ভালুক কুস্তি লড়িতেছিল, তাহা দেখিয়া জোহরা ভয়ে চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ভালুকের নাচ দেখা মাথায় থাকুক—এখন জোহরাকে লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

জোহরার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু তাহার ভয় গেল না। রাত্রিকালে হঠাৎ চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে থর থর কাঁপে। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া সুদূর সদর জেলা হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে ডাক্তার আনিতে হইল। ডাক্তার সাহেব সকল অবস্থা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শিশু কোন প্রকারে ভয় পাইয়াছিল না কি? কথা গোপন থাকে না, জানা গেল ভালুকের নাচ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল।

এদিকে কর্তা সন্ধান লইতে লাগিলেন, জোহরাকে ভালুক-নাচ দেখাইল কে? খেলাই আন্না প্রভৃতি সকলে একবাক্যে অস্বীকার করিল যে, তাহারা সাহেবজাদীকে ভালুকের নাচ দেখায় নাই। অবশেষে জানা গেল, বউ বিবিরা দেখাইয়াছেন। তখন তাঁহার ক্রোধ চরমে উঠিল। জোহরা মরে মরুক, তাহাতে কর্তার তত আপত্তি নাই; কিন্তু এই যে বাড়ীময় রাষ্ট্র হইল যে, তাঁহার পুত্রবধূগণ বেগানা মরদের তামাসা দেখিতে গিয়াছিলেন তিনি এ লজ্জা রাখিবেন কোথায়? ছি! ছি! ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সিভিল সার্জন ডাক্তারও শুনিয়া মৃদু হাসিলেন যে, বউয়েরা ভালুকের নাচ দেখিতে গিয়াছিলেন।

লাজে খেদে ক্রোধে অধীর হইয়া কর্তা বধূদের তলব দিলেন। মাথায় একহাত ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বধূদ্বয় লজ্জায় অভিমানে থর থর কাঁপিতেছিলেন, (সেই মাঘ মাসের শীতেও) ঘামিতেছিলেন, আর পদতলস্থিত পাথরের মেঝেকে হয় ত বলিতেছিলেন:—

"ওমা বসুন্ধরা! বিদর গো ত্বরা—
তোমাতে বিলীন হই!"

তাই ত, পর্দানশীনদের ধরাপৃষ্ঠে থাকিবার প্রয়োজন কি? দন্ত কড়মড় করিয়া,—"বউমা'রা শুন ত—" বলিয়াই অতি ক্রোধে কর্তার বাক্‌রোধ হইল। তখন তাঁহার "গোস্বায় অজুদ কাঁপে, আঁখি হইল লাল"—তিনি বউমাদের বিনা লুণে চিবাইয়া খাইবেন, না, আস্ত গিলিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না!

[৩৭]

একবার পশ্চিম দেশ হইতে ট্রেন হাবড়ায় আসিবার সময় পথে বালী ষ্টেশনে তিন জন বোর্কাধারিণী লোক স্ত্রীলোকদের কক্ষে উঠিল। কক্ষে আরও অনেক মুসলমান স্ত্রীলোক ছিল। ট্রেন ছাড়িলে পরও তাহারা সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল যে, নবাগতা তিনজন বোর্কার নেকাব (মুখাবরণ) তুলিল না। তখন তাহাদের

মনে সন্দেহ হইল যে, ইহারা না জানি কি করিবে। আর তাহারা লম্বাও খুব ছিল। খোদা খোদা করিয়া লিলুয়া ষ্টেশনে ট্রেন থামিলে যখন মেয়ে টিকেট কালেক্‌টার তাহাদের কামরায় আসিলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে ঐ বোর্কা-ধারিণীদের বিষয় বলিল। টিকেট কালেক্‌টার তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহাদের এক জন ষ্টেশনের বিপরীত দিকে ট্রেনের জানালা দিয়া লাফাইয়া পলাইয়া গেল; তিনি "পুলিশ—পুলিশ" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে এক জনকে ধরিয়া নেকাব তুলিয়া, দেখেন,—তাহার মুখে ইয়া দাড়ি,—ইয়া গোঁফ! তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য! বোর্কার ভিতর দাড়ি গোঁফ!"

[৩৮]

আমার পরিচিতা জনৈকা শি-ডাক্তার মিস শরৎকুমারী মিত্র বলিয়াছেন, "বাবা! আপনাদের—মুসলমানদের বাড়ী গেলে আমাকে যা নাকাল হতে হয়! না পাওয়া যায় সময়মতো একটু গরম জল, না পাওয়া যায় এক খণ্ড নেকড়া!"

একবার তাহাকে বহুদূর হইতে একজন ডাকিতে আসিয়া জানাইল যে, বউ-বেগমের দাঁতে ব্যথা হইয়াছে। তিনি যথাসম্ভব দাঁতের ঔষধ এবং প্রয়োজন বোধ করিলে দাঁত তুলিয়া ফেলিবার জন্য যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখেন, দাঁতে বেদনা নহে,—প্রসব বেদনা! তিনি এখন কি করেন? ভাগলপুর শহর হইতে জমগাঁও চারি ক্রোশ পথ। এতদূর হইতে আবার সেই একই ঘোড়ার গাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব; কারণ ঘোড়া ক্লান্ত হইয়াছে। জমগাঁও শহরতলী,—পাড়া গ্রামের মত স্থান, সেখানে ঘোড়ার গাড়ী কিম্বা পাল্কী পাওয়া যায় না।

কোন প্রকারে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিয়া তৎকালীন উপযোগী যন্ত্রপাতি লইয়া পুনরায় জমগাঁও যাইতে যাইতে রোগিণীর দফা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা। মিস মিত্র সে বাড়ীর কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে অনর্থক ডাকা হইল কেন? উত্তরে কর্ত্রী বলিলেন, "পুরুষ চাকরের দ্বারা ডাক্তারণীকে ডাকিতে হইল, সুতরাং তাহাকে দাঁতে ব্যথা না বলিয়া আর কি বলিতাম? তোবা ছিয়া! মর্দ্দুয়াকে ও-কথা বলিতাম কি করিয়া? আপনি কেমন ডাক্তারণী যে, লোকের কথা বুঝেন না?"

[৩৯]

সমাজ-আমাদিগকে কেবল অবরোধ-কারাগারে বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। হজরতা আয়শা সিদ্দিকা নাকি ৯ বৎসর বয়সে বয়োপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন; সেই জন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ, উচ্চৈস্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ান লাফান ইত্যাদি সবই নিষেধ। এক কথায়, তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচী-কর্ম করিতে থাকিবে,—নড়িবে না। এমন কি দ্রুতগতি হাঁটিবেও না।

কোন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি আট বৎসরের বালিকা একদিন বিকালে উঠানে আসিয়া দেখিল, রান্নাঘরে চালে ঠেকান একটা ছোট মই আছে। তাহেরার (সেই বালিকা) মনে কি হইল, সে অন্যমনস্কভাবে ঐ মইয়ের দুই ধাপ উঠিল। ঠিক সেই সময় তাহার পিতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্যাকে মইয়ের উপর দেখিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার হাত ধরিয়া এক হেচকা টানে নামাইয়া দিলেন।

তাহেরা পিতার অতি আদরের একমাত্র কন্যা,—পিতার আদর ব্যতীত অনাদর কখনও লাভ করে নাই; কখনও পিতার অপ্রসন্ন মুখ দেখে নাই। অদ্য পিতার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ও রূঢ় হেচকা টানে সে এত অধিক ভয় পাইল যে, কাঁপিতে কাঁপিতে বে-সামাল হইয়া কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলিল।

অ-বেলায় স্নান করাইয়া দেওয়া হইল বলিয়া এবং অত্যধিক ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল বলিয়া সেই রাত্রে তাহেরার জ্বর হইল। একে বড় ঘরের মেয়ে, তায় আবার অতি আদরের মেয়ে, সুতরাং চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। সুদূর সদর জেলা হইতে সিভিল সার্জন ডাক্তার আনা হইল। সেকালে (অর্থাৎ ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে) ডাক্তার ডাকা সহজ ব্যাপার ছিল না। ডাক্তার সাহেবের চতুর্গুণ দর্শনী, পাল্কী ভাড়া, তদুপরি বত্রিশজন বেহারার সিধা ও পান তামাক যোগান—সে এক বিরাট ব্যাপার।

এত যত্ন সত্ত্বেও তৃতীয় দিনেও তাহেরার জ্বর ত্যাগ হইল না। ডাক্তার সাহেব বে-গতিক দেখিয়া বিদায় হইলেন। পিতার রূঢ় ব্যবহারের নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তর দিয়া তাহেরা চিরমুক্তি লাভ করিল। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।)

[৪০]

এক ধনী গৃহে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ধূমধাম হইতেছিল। বাড়ীভরা আত্মীয় কুটুম্বিনীর হট্টগোল—কিছুরই অভাব নাই। নবাগতদিগের জন্য অনেক নূতন চালাঘর তোলা হইয়াছে। একদিন ভরা সন্ধ্যায় কি করিয়া একটা নূতন খড়ের ঘরে আগুন লাগিল। শোরগোল শুনিয়া বাহির হইতে চাকর-বাকর, লোকজন আসিয়া দেউড়ীর ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিল, আর বারম্বার হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, পর্দা হইয়াছে কিনা,—তাহারা অন্দরে আসিতে পারে কি না? কিন্তু অন্তঃপুর হইতে কে উত্তর দিবে? আগুন দেখিয়া সকলেরই ভ্যাবা-চেকা লাগিয়া গিয়াছে। এদিকে আগুন-লাগা ঘরের ভিতর বিবিরা বলাবলি করিতেছেন যে, প্রাঙ্গণে পর্দা আছে কিনা,—কোন ব্যাটা ছেলে থাকিলে তাঁহারা বাহির হইবেন কি করিয়া?

অবশেষে এক বুড়া বিবি ভয়ে জ্ঞানহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আরে ব্যাটারা! আগুন নিবাইতে আয় না! এ সময়ও জিজ্ঞাসা—পর্দা আছে কিনা?"

তখন সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আগুন নিভাইতে আসিল। কিন্তু আগুন-লাগা ঘরের বিবিরা বাহিরে যাইতে গিয়া যেই দেখিলেন, প্রাঙ্গণ পুরুষ মানুষে ভরা, অমনি তাঁহারা পুনরায় ঘরে গিয়া ঝাঁপের অন্তরালে লুকাইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ গোটা কয়েক সাহসী তরুণ যুবক বিবিদের টানা হেঁচড়া করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। নচেৎ তাঁহারা সেইখানে পুড়িয়া পসেন্দা কাবাব হইতেন!

[৪১]

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর গত ১৩৩৫ সনে লিখিয়াছেন:—সেকালের পর্দা।—আমি যে সময়কে সেকাল বলিয়াছি তা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগ নয়, কিন্তু সে আমাদের যৌবনকালের কথা—এই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময় আমরা পর্দার যে রকম কঠোর, তথা হাস্যকর ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম, সে সকল দৃশ্য এখনও আমার চোখের সম্মুখে ছবির মত জাগিয়া আছে। তারই গুটি কয়েক দৃশ্যের সামান্য বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিব।

সেই সময় একদিন কি জন্য যেন হাবড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলাম। আমি তখন কলেজে পড়ি। ষ্টেশনের প্লাটফরমে গিয়ে দেখি কয়েকজন বরকন্দাজ যাত্রীর ভীড় সরিয়ে পথ কর্চ্ছে। এগুতে সাহস হোল না; হয়ত কোন রাজা-মহারাজা

গাড়ীতে উঠবেন, তারই জন্য তার সৈন্য সামন্ত নিরীহ যাত্রীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে! এই ভেবে রাজা-মহারাজার আগমন-প্রতীক্ষায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিন চার মিনিট হয়ে গেল, রাজা আর আসেন না। শেষে দেখি কিনা—একটা মশারি আস্‌ছেন। মশারির চার কোণা চারজন সিপাহী ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। আমি ত এ দৃশ্য দেখে অবাক্—এ ব্যাপার ত পূর্বে কখনও দেখি নাই। আমার পাশেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এমন ক'রে একটা মশারি যাচ্ছে কেন?" তিনি একটু হেসে বল্লেন, "আপনি বুঝি কখনও মশারির যাত্রা দেখেন নাই? দেখছেন না কত সিপাহী সান্ত্রী যাচ্ছে। বিহার অঞ্চলের কোন্ এক রাজা না জমিদারের গৃহিণী ঐ মশারির মধ্যে আবরু রক্ষা ক'রে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন। বড় মানুষের বৌ কি আপনার আমার সুমুখ দিয়ে আর দশ জনের মত যেতে পারেন; তাঁরা যে অসূর্যম্পশ্যা!" এই বলেই ভদ্রলোকটি হাসতে লাগলেন। আমি এই পর্দার বহর দেখে হাস্য সংবরণ করতে পারলাম না। হাঁ, এরই নাম পর্দা বটে—একেবারে মশারি যাত্রা।

আর একবার কি একটা যোগ উপলক্ষে গঙ্গা-স্নানের ব্যবস্থা ছিল। লোক সমারোহ দেখবার জন্য এবং এ বৃদ্ধ বয়সে ব'লেই ফেলি, গঙ্গাস্নান ক'রে পাপ মোচনের জন্যও বটে, বড়বাজারে আদ্য-শ্রাদ্ধের ঘাটে গিয়েছিলাম। তখন শীতকাল, স্নানের সময় অপরাহ্ন পাঁচটা।

ঘাটে দাঁড়িয়ে লোক-সমারোহ দেখছি, আর ভাবছি এই দারুণ শীতের মধ্যে কেমন ক'রে গঙ্গাস্নান ক'রব। এমন সময় দেখি ঘেরাটোপ আগাগোড়া আবৃত একখানি পাল্কী ঘাটে এল। পাল্কীর চার কোণ ধ'রে চারজন আর্দালী, আর পাল্কীর দুই দুয়ার বরাবর দুইটি দাসী। বুঝতে বাকী রইল না যে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহিণী বা কন্যা বা পুত্রবধূ স্নান করতে এলেন। বড় মানুষের বাড়ীর মেয়েরা এমন আড়ম্বর ক'রেই এসে থাকেন, তাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নেই।

কিন্তু তারপর যা দেখলাম, হাস্যরসের এবং করুণ-রসের একেবারে চূড়ান্ত। আমি মনে করেছিলাম, গঙ্গার জলের কিনারে পাল্কী নামানো হবে এবং আরোহিনীরা অবতরণ ক'রে গঙ্গাস্নান ক'রে আসবেন। কিন্তু, আমার সে কল্পনা আকাশেই থেকে গেল। দেখলাম বেহারা সায় আর্দালী দাসী দুইটি—পাল্কী নিয়ে জলের মধ্যে নেমে

গেল। যেখানে গিয়ে পাল্কী থাম্‌লো, সেখানে বোধ হয় বুক-সমান জল। বেহারারা তখন পাল্কীখানিকে একেবারে জলে ডুবিয়ে তৎক্ষণাৎ উপরে তুললো এবং তারপরেই পাল্কী নিয়ে তীরে উঠে এসে, যেভাবে আগমন, সেইভাবেই প্রতিগমন। আমার হাসি এলো পাল্কীর গঙ্গাস্নান দেখে; আর মনে কষ্ট হ'তে লাগল, পাল্কীর মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অবস্থা স্মরণ ক'রে। এই শীতের সন্ধ্যায় পাল্কীর মধ্যে মা-লক্ষ্মীরা ভিজে কাপড়ে হি-হি ক'রে কাঁপছেন। এদিকে তাঁদের স্নান। হোলো, তা তো দেখতেই পেলাম। এরই নাম পর্দা।—

সেন মহাশয় পাল্কীর 'গঙ্গাস্নান' দেখিয়া হাসিয়াছেন। আমরা শৈশবে চিলমারীর ঘাটে 'পাল্কীর ব্রহ্মপুত্রনদের স্নান' শুনিয়া হাসিয়াছি। পরে ভাগলপুরে গিয়া পাল্কীর রেল ভ্রমণের বিষয় শুনিয়াছি।

একবার একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া নব-বিবাহিতা বালিকার শ্বশুরবাড়ী যাত্রা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে জুন মাসে রৌদ্র কিরূপ প্রখর হয়, তাহা সকলেই জানেন।

জুন মাসে দিবা ৮ ঘটিকার সময় সে বালিকা নববধূকে মোটা বেনারসী শাড়ী পরিয়া মাথায় আধ হাত ঘোমটা টানিয়া পাল্কীতে উঠিতে হইল। সেই ঘোমটার উপর আবার একটা ভারী ফুলের 'সেহরা' তাহার কপালে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পরে পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া জরির কাজ করা লাল বানাতের ঘেরাটোপ দ্বারা পাল্কী ঢাকা হইল। সেই পাল্কী ট্রেনের ব্রেকভ্যানের খোলা গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থায় দগ্ধ ও সিদ্ধ হইতে হইতে বালিকা চলিল তাহার শ্বশুর-বাড়ী—ঘশিদী!!

[৪২]

সেদিন (৭ই জুলাই ১৯৩১ সাল) জনৈক মহিলা নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটি বলিলেন:—

বহু বর্ষ পূর্বে তাঁহার সম্পর্কের এক নানিজান পশ্চিম দেশে বেড়াইতে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যথাসময়ে টেলিগ্রাফযোগে তাঁহার কলিকাতায় পৌঁছিবার সময় জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন তুফানে সমস্ত টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল এবং কলিকাতার রাস্তায় সাঁতার-জল ছিল। সুতরাং এখানে কেহ নানিজানের টেলিগ্রাম পাই নাই এবং হাবড়া ষ্টেশনে পাল্কী লইয়া কেহ তাঁহাকে আনিতেও যাই নাই।

এদিকে যথাসময়ে নানিজানের রিজার্ভ-করা গাড়ী হাবড়ায় পৌঁছিল, সকলে নামিলেন, জিনিসপত্রও নামান হইল; কিন্তু পাল্কী না থাকায় নানিজান বোর্কা পরিয়া থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই নামিতে সম্মত হইলেন না। অনেকক্ষণ সাধ্য-সাধনার পর নানা সাহেব ভারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তবে তুমি এই ট্রেনেই থাক, আমরা চলিলাম।' বেগতিক দেখিয়া নানিজান মিনতি করিয়া বলিলেন, "আমি এক উপায় বলিয়া দিই, আপনারা আমাকে সেইরূপে নামান।" উপায়টি এই যে, তাঁহার সর্বাঙ্গে অনেক কাপড় জড়াইয়া তাঁহাকে একটা বড় গাঁটরীর মত করিয়া বাঁধিয়া তিন চারি জনে সেই গাঁটরী ধরাধরি করিয়া টানিয়া ট্রেন হইতে নামাইল। অতঃপর তদবস্থায় তাঁহাকে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

[৪৩]

এক বোর্কাধারিণী বিবি হাতে একটা ব্যাগ-সহ ট্রেন হইতে নামিয়াছেন। তাঁহাকে অন্যান্য আসবাব-সহ এক জায়গায় দাঁড় করাইয়া তাঁহার স্বামী কার্যান্তরে গেলেন। কোন কারণবশতঃ তাঁহার ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। এদিকে বিবি সাহেবা দাঁড়াইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া এবং শরীরের কম্পন দেখিয়া ক্রমে লোকের ভীড় হইল। লোকেরা দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গের লোকের নাম বলুন ত, আমরা তাঁহাকে ডাকিয়া আনি।" তিনি একবার আকাশে সূর্যের দিকে ইসারা করেন আর একবার হাতের ব্যাগ তুলিয়া দেখান। ইহাতে উপস্থিত লোকেরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হাসিতে হট্টগোল বাধাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি হাঁফাইতে হাঁফাইতে সেখানে দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? ভীড় কেন?" ঘটনা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার নাম 'আফতাব বেগ', তাই আমার বিবি সূর্যের দিকে ইসারা করিয়া দেন আর হাতের বেগ (ব্যাগ) দেখাইয়াছেন।"

[৪৪]

জনাব শরফুদ্দীন আহমদ বি. এ. (আলীগড়) আজিমাবাদী নিম্নলিখিত ঘটনাত্রয় কোন উর্দু কাগজে লিখিয়াছেন। [আমি তাহা অনুবাদ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।] যথা :

গত বৎসর পর্যন্ত আমি আলীগড়ে ছিলাম। যেহেতু সেখানকার ষ্টেশন বিশেষ একরূপ জাঁকজমকে ই. আই. আর. লাইনে অদ্বিতীয় বোধ হয়, সেই জন্য আমি প্রত্যহই পদব্রজে ভ্রমণের সময় ষ্টেশনে যাইতাম। সেখানে অন্যান্য তামাসার মধ্যে অনেকগুলি ১৩শ শতাব্দীর বোর্কা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আর খোদা মিথ্যা না বলান, প্রত্যেক বোর্কাই কোন না কোন প্রকার কৌতুকাবহ ছিল। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি ঘটনা এখানে বিবৃত হইল।

প্রথম ঘটনা এই যে, একদিন আমি আলীগড় ষ্টেশনের প্লাট-ফরমে পায়চারি করিতেছিলাম, সহসা পশ্চাৎদিক হইতে আমার গায়ে ধাক্কা লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম যে, এক বোর্কাধারিণী বিবি দাঁড়াইয়া আছেন; আর আমাকে শাসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মিয়া দেখে চলেন না?" তাঁহার কথায় আমার প্রবল হাসি পাইল, কারণ তিনি ত আমার পশ্চাতে ছিলেন, সুতরাং দেখিয়া চলা না চলার দায়িত্ব কাহার, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমি তাঁহাকে কেবল এইটুকু বলিলাম, "আপনি মেহেরবাণী করিয়া বোর্কার জাল চক্ষের সম্মুখে ঠিক করিয়া নিন" এবং হাসিতে হাসিতে অন্যত্র চলিলাম।

[৪৫]

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, একদিন আবার আমি কতিপয় বন্ধুর সহিত আলীগড় ষ্টেশনে তামাসা দেখায় মশগুল ছিলাম। এমন সময় আমাদের সন্নিকটে একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আবার কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম, কোন শিশু আমাদের অতি নিকটে চেঁচাইতেছে। কিন্তু এদিক সেদিক দেখিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার বন্ধুরা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যেহেতু বোর্কা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাই আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। শেষে দেখি কি, এক বোর্কাধারিণী বিবি যাইতেছেন, তাঁহারই বোর্কার ভিতর হইতে শিশুর রোদনের শব্দ আসিতেছে:

ঘটনা ছিল এই যে, বিবি সাহেবা শিশুকে বোর্কার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; সে গরমে অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছিল। তাই কেহ শিশুকে দেখিতে পায় নাই, কেবল কান্না শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। আমি বন্ধুদের ঐ তামাসা দেখাইয়া দিলাম। আর হাসিতে হাসিতে আমাদের যে কি দশা হইল, তাহা আর কি বলিব?

[৪৬]

আমি পূর্বের ন্যায় আবার একদা আলীগড় ষ্টেশনের প্লাট-ফরমে পায়চারি করিতেছিলাম। সম্মুখে এক "সফেদ গোল" (সাদা দল) আসিতে দেখিলাম। নিকটে আসিলে দেখিলাম, আগে আগে এক প্রবীণ ভদ্রলোক এক হাতে পানদান অপর হাতে পাখা লইয়া আসিতেছেন ; তাঁহার পশ্চাতে কয়েকটি বোর্কাধারিণী পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া মিলিত হইয়া আসিতেছেন। এই কাফেলাটি অধিক দূরে না যাইতেই এক মাল-ঠেলা গাড়ীর সম্মুখীন হইল। উহার সহিত টক্কর খাইয়া এক বিবি যেই পড়িলেন, অমনি সমস্ত পার্টি তাঁহার সহিত গড়াইল।

সন্ধ্যার সময়, গাড়ী আসিতেছিল, যাত্রীদের হাঙ্গামা ছিল—এমত স্থলে প্লাট-ফরমের উপর ঐরূপ আশ্চর্য জিনিস পড়িয়া থাকিতে দেখিলে কে না অগ্রসর হইয়া দেখিবে? অতি শীঘ্র বেশ একটা ভীড় জমা হইল। প্রত্যেকই ভূপতিতাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল ; কিন্তু স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে কে? সঙ্গের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির জন্য আরও দুঃখ হইতেছিল ; বেচারা একা, আর এই বিপদ! শেষে আমি বলিলাম, "হজরত! আপনিই উহাদের তুলুন না ; দেখুন তো বিবিদের কোথাও আঘাত লাগে নাই ত?"

বেচারা যখন তাঁহাদের তুলিতে লাগিলেন, আমি দেখিলাম যে বিবিরা আপন আপন বোর্কা পরস্পরের বোর্কার সহিত বাঁধিয়া লইয়াছিলেন এবং অগ্রবর্তিণীর বোর্কার দামন ধরিয়া সকলেই চক্ষু বুঝিয়া চলিতেছিলেন। এখন আমার সম্মুখে এই সমস্যা ছিল যে, অগ্রবর্তিণীর বিবি এই মাল-ঠেলা গাড়ী দেখিলেন না কেন যে, এ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল? আমি তাঁহার বোর্কার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার বোর্কার জাল,—যাহা চক্ষের সম্মুখে থাকা চাই, তাহা মাথার উপর পিছনে সরিয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, বিবি সাহেবা কেবল আন্দাজে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন।

এখন অবস্থা এই হইয়া দাঁড়াইল যে, বেচারা 'বড়ে মিয়াঁ' একজনকে উঠাইতে গেলে অপর সকলের উপরই টান পড়ে,—সুতরাং প্রথম বিবি আবার সেই টানে 'বড়ে মিয়াঁ'র হাত-ছাড়া হইয়া যান। এইরূপে অনেক টানা হেঁচড়ার পরে বিবিরা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন।

[৪৭]

কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে :

"কাব্য উপন্যাস নহে, এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে, ইহা প্রকৃত ভবন।"

প্রায় তিন বৎসরের ঘটনা, আমাদের প্রথম মোটর বাস প্রস্তুত হইল। পূর্বদিন আমাদের স্কুলের জনৈকা শিক্ষয়িত্রী, মেম সাহেবা মিস্ত্রীখানায় গিয়া বাস দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মোটর ভয়ানক অন্ধকার*** "না বাবা! আমি কখনও মোটরে যা'ব না।" বাস আসিয়া পৌঁছিলে দেখা গেল,—বাসের পশ্চাতে দ্বারের উপর সামান্য একটু জাল আছে এবং সম্মুখ দিকে ও উপরে একটু জাল আছে। এই তিন ইঞ্চি চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা জাল দুই টুকরা না থাকিলে বাসখানাকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' বলা যাইতে পারিত।

প্রথম দিন ছাত্রীদের নূতন মোটরে বাড়ী পোঁছান হইল। চাকরাণী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—গাড়ী বড্ড গরম হয়,—মেয়েরা বাড়ী যাইবার পথে অস্থির হইয়াছিল। কেহ কেহ বমি করিয়াছিল। ছোট মেয়েরা অন্ধকারে ভয় পাইয়া কাঁদিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন ছাত্রী আনাইবার জন্য মোটর পাঠাইবার সময় উপরোক্ত মেম সাহেবা মোটরের দ্বারের খড়খড়িটা নামাইয়া দিয়া একটা রঙীন কাপড়ের পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন। তথাপি ছাত্রীগণ স্কুলে আসিলে দেখা গেল,—দুই তিন জন অজ্ঞান হইয়াছে, দুই চারিজনে বমি করিয়াছে, কয়েক জনের মাথা ধরিয়াছে, ইত্যাদি। অপরাহ্নে মেম সাহেবা বাসের দুই পাশের দুইটি খড়খড়ি নামাইয়া দুই খণ্ড কাপড়ের পর্দা দিলেন। এইরূপে তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যায় আমার এক পুরাতন বন্ধু মিসেস মুখার্জি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। স্কুলের বিবিধ উন্নতির সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—'আপনাদের মোটর বাস ত বেশ সুন্দর হইয়াছে। প্রথমে রাস্তায় দেখে আমি মনে করেছি যে, আলমারী যাচ্ছে না কি—চারিদিকে একেবারে বন্ধ, তাই বড় আলমারী বলে ভ্রম হয়। আমার ভাইপো এসে বল্লে, "ও পিসীমা! দেখ, সে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকূপ) যাচ্ছে।" তাই ত, ওর ভিতর মেয়েরা বসে কি ক'রে?'

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে চারি পাঁচ জন ছাত্রীর মাতা দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন, "আপকা মোটর ত খোদা কা পানাহ্! আপ লাড়কীয়ো কো জীতে

জী কবর মে ভর রহি হয়ঁ।" আমি নিতান্ত অসহায়ভাবে বলিলাম, কি করি, এরূপ না হইলে ত আপনারাই বলিতেন, "বে পর্দা গাড়ী।" তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তব কেয়া আপ জান মারকে পর্দা করেঙ্গী? কালসে হামারী লাড়কীয়াঁ স্কুল মে নেহী আয়েঙ্গী।" সে দিনও দুই তিনটি বালিকা অজ্ঞান হইয়াছিল। প্রত্যেক বাড়ী হইতে চাকরাণীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল যে, তাহারা আর মোটর-বাসে আসিবে না।

সন্ধ্যার পর চারিখানা ঠিকানা-রহিত ডাকের চিঠি পাইলাম। ইংরাজী চিঠির লেখক স্বাক্ষর করিয়াছেন, "Brother-in-Islam." বাকী তিনখানা উর্দু ছিল—দুইখানা বেনামী আর চতুর্থখানায় পাঁচ জনের স্বাক্ষর ছিল। সকল পত্রের বিষয় একই—সকলেই দয়া করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ কামনায় লিখিয়াছেন যে, মোটরের দুই পার্শ্বে যে পর্দা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতাসে উড়িয়া গাড়ী বে-পর্দা করে। যদি আগামীকল্য পর্যন্ত মোটরে ভাল ব্যবস্থা না করা যায়, তবে তাঁহারা ততোধিক দয়া করিয়া 'খবিছ' 'পলীদ' প্রভৃতি উর্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করিবেন এবং দেখিয়া লইবেন, এরূপ বে-পর্দা গাড়ীতে কি করিয়া মেয়েরা আসে।

এ তো ভারী বিপদ,—

"না ধরিলে রাজা বধে,—ধরিলে ভুজঙ্গ।"

রাজার আদেশে এমন করিয়া আর কেহ বোধ হয়, জীবন্ত সাপ ধরে নাই। অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষ হইতে বলিতে ইচ্ছা করিল,—

"কেন আসিলাম, হায়! এ পোড়া সংসারে,
কেন জন্ম লভিলাম পর্দা-নশীন ঘরে।"

—সমাপ্ত—

ভ্রাতা-ভগ্নী

সাধারণতঃ দুই মতের লোক দেখা যায়। একদল উন্নতি চাহে, পরিবর্ত্তন চাহে; অপর দল বলে, "আমাদের যাহা আছে, তাহাই থাকুক, পরির্ত্তবনের কাজ নাই।" প্রথমোক্ত দলকে আমরা উদার মতাবলম্বী এবং শেষোক্তকে রক্ষণশীল বা গোঁড়া বলিব। অধিক স্থলে আমাদের ভ্রাতৃগণ উদার মতাবলম্বীএবং ভগ্নীদল রক্ষণশীল হইয়া থাকেন। ক্রমে কালের বিচিত্র গতির আবর্ত্তনে এখন কোন কোন স্থলে তাহার বিপরীত অবস্থাও দেখা যায়। অর্থাৎ ভ্রাতা সেই "সেকেলে গোঁড়া" আর ভগ্নী নব-বিভায় আলোকিতা।

এ প্রবন্ধে আমাদের সমাজের কোন কোন ক্ষতের উল্লেখ দেখিয়া যেন ভ্রাতৃ-সমাজ ক্ষুণ না হন; কারণ, বলিয়াছি ত, নালী-ঘায় অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন।* কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা চিকিৎসা করিতে বসিয়াছি। আমরা কেবল রোগ দেখাইয়া দিতেছি,—যাঁহারা সমাজের হাকিম (সমাজ-সংস্কারক) চিকিৎসা করিবেন তাঁহারাই।

"আগুন লেগেছে ঘরে,
আমি শুধু এনেছি সংবাদ। সুখ-নিদ্রা
দিয়েছি ভাঙ্গায়ে।"

আমাদের কার্য কেবল ঐ পর্যন্ত।

এখন আসুন, পাঠিকা। আমরা এইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া কাজেব, সিদ্দিকা ও সুফিয়ার কথোপোকথন শুনি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, ইঁহাদের কে রক্ষণশীল এবং কে উদার মতের পক্ষপাতী।

কাজেব যেন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি তর্জন গর্জন করিয়া বলিলেন,—"তোমার পত্রের ভাবে বোধ হইতেছিল যে, অনাহারে বিবস্ত্রাবস্থায় নিতান্ত যন্ত্রণার সহিত ভাইয়েরা মাতাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, আর তুমি একমাত্র মায়ের সুসন্তান—কাণ্ডাকাণ্ড (।)-জ্ঞানশূন্যা হইয়া মায়ের উদ্ধারের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ।"

সিদ্দিকা। আমার পত্রের ভাষা এক প্রকার এবং ভাব অন্য প্রকার ছিল, তাহা জানিতাম না। তোমরা ভাষা ছাড়িয়া কেবল ভাবটা পাঠ করিয়াছ,

* বিশেষতঃ নানা কারণে বাধ্য হইয়া ঐসকল পূঁতিগন্ধময় দুরারোগ্য ক্ষতের উল্লেখ করা গেল। ভ্রাতৃ-সমাজই আমাদিগকে ও-সব বলিতে বাধ্য করিয়াছেন। "শুনা'লে শুনিতে হয়।"

বেশ। কিন্তু আমি জানি, আমার ভাব, ভাষা, অক্ষর, স্বাক্ষর—সবই আমার নিজের এবং একই প্রকার। আমি তো আর নিজের ভাব ভ্রাতার ভাষায় কন্যার হস্তাক্ষরে লিখাইয়া মাতার দ্বারা স্বাক্ষর করাই না। তবে আমার চিঠির ভাব ও ভাষার প্রভেদ হইবে কেন?

কাজেব সিদ্দিকার কথার উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"মায়ের কি এমন কষ্ট হইয়াছে? আজ ২০ বৎসর যাবত এই কুপুত্রেরা মায়ের ভরণপোষণের ভার বহন করিয়া আসিতেছে। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে যদবধি তোমার বিবাহ হইয়াছে, তুমিই বা কি এমন স্বর্ণ ঢালিয়া দিয়াছ?"

সিদ্দিকা। আমি স্বর্ণ ঢালিয়া দিব কোথা হইতে, ভাই? আমার শ্বশুর শাশুড়ী কি মস্ত জমিদারী ছাড়িয়া মরিয়াছেন?

কাজেব। যদি কিছু করিতেই পার না, তবে আর বৃথা কল্পনা খরচ কর কেন? আর এই এক বৎসরের মধ্যে এত কি পরিবর্তন হইল যে, তুমি এমন বেহায়া বেগয়রতের (লজ্জাহীনার) মত মামাতো ভাইয়ের নিকট সহসা পত্র লিখিলে?

সি। এই এক বৎসরের মধ্যে মাতার অসুখ বৃদ্ধি হইল; এই এক বৎসরের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত মাতার অন্যত্র যাওয়া আবশ্যক হইল, কারণ ডাক্তার বলিয়াছেন, এ রোগের ঔষধ নাই, কেবল পশ্চিমাঞ্চলে কতক দিন থাকিলেই আরোগ্য হইবেন, তাই "কাণ্ডাকাণ্ড" জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। আর মামাতো ভাইকে পত্র লিখা যে "বেহায়া বেগয়রতের" (নিতান্ত লজ্জাহীনার) কাজ, তাহা জানিতাম না। আমি ত সকলকে সহোদরের মত জ্ঞান করি। যদি তোমাকে পত্র লিখা দোষণীয় না হয়, তবে তাঁহাকে পত্র লিখিলে দোষ হইবে কেন?

কাজেব। এতদিন যে তুমি তাদৃশ্য সুশিক্ষা পাইয়াছিলে না এবং আজিকাল যেরূপ স্বাধীনতা ও উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহাও করিয়াছিলে না, তখন মায়ের খবরগিরী কে করিত? তখন কি অবস্থা ছিল?

এবার সুফিয়া উত্তর দিলেন, "যখন তোমরা শিশু ছিলে ও মাতার ভরণ-পোষণের ভার বহনে অসমর্থ ছিলে, তখন কি অবস্থা ছিল? তোমাদের ন্যায় সুপুত্রের দল যদি জন্মগ্রহণ না'ই করিত, তথাপি মাতার দিন কাটিত কি না? তোমরা যেমন বড় হইয়া মাতার ভার লইয়াছ, তদ্রূপ এখন আমরাও বড় হওয়াতে আমাদেরও কর্তব্য হইয়াছে মাতৃচরণ-সেবা করা। মানুষ জন্মিলে

তাহার কাজও জন্মে, কেহ না জন্মিলেও তাহার জন্য জগতের কিছু ঠেকিয়া থাকে না।

কাজেব। যদি এমনই কোন কষ্ট তোমাদের কল্পনা-অনুযায়ী তোমরা গড়াইয়া নিয়া থাক, তবে যৎকিঞ্চিৎ টাকা দান করিলেই ত হইত। টাকা হইলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, আর টাকা পাইয়া মা আপন খাওয়া-পরার যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারিতেন না?

সুফিয়া। ভ্রাতার গৃহে থাকাকালীন মাকে টাকা পাঠাইতাম কিরূপে? গৃহস্বামী টাকা ফেরৎ দিতেন যে? যে বাটীতে অবলাদের নামের চিঠি মারা যায়, সে বাটীতে কি টাকা নিরাপদে মায়ের হাতে পড়িত? আর, ভাই! টাকা হইলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, এ-কথা তোমরা বেশ জান, তাই অবলার হাতে এক পয়সা থাকিতে দাও না। আমার বেশ মনে আছে, কি কি কৌশলে তোমরা মায়ের নিকট হইতে এক একটি পয়সা দুহিয়া বাহির করিয়া লইতে। সম্ভবতঃ হাতে দু'পয়সা রাখিবার অভিপ্রায়েই স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার ব্যবহার করে। কিন্তু, হায় কপাল। ললনারা কেবল জড় স্বর্ণের বোঝা বহন করেন; অলঙ্কার ভাঙ্গিবার বা বিক্রয়ের ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। তোমাদের ইচ্ছামত তোমরা এক একটি অলঙ্কার মোচন করিয়া বাঁধা দাও—যাহা ইচ্ছা কর। তোমাদের ৫০৲ টাকার আবশ্যক হইলে আমাদের ৫০০৲ টাকার গহনা সুদের চাপায় মারা যায়। বল ত ভাইয়া। মায়ের অতগুলি অলঙ্কারের শ্রাদ্ধ কাহারা করিয়াছে?— তোমরা। পুরুষ প্রভুরা!! স্বর্ণভার বহন করে অভাগিনী অবলারা, আর স্বর্ণ ভোগ করে ভাগ্যবান সবলেরা। টাকা হইলে কি না পাওয়া যায়? তাই অন্তঃপুরে বন্দিনীদের হাতে টাকা থাকিতে দেওয়া হয় না।

সি। কিরূপে মাতার হাত খালি করিতে হয়, তাহা পুত্রেরা বেশ জানেন; কিরূপে ধনবতী শাশুড়ীকে জবদ করিয়া তাঁহার সর্বস্ব হস্তগত করিতে হয়, তাহা জামাতারা বেশ জানেন। কিরূপে বিধবা ভগ্নীকে সর্বস্বান্ত করিতে হয়, সে কৌশলও ভ্রাতৃবৃন্দ অবগত আছেন। এমন কি মৃত ভ্রাতার সম্পত্তির শেষ কণাটুকুও করায়ত্ত করিবার জন্য ভ্রাতারা অনেক সময় অসহায়া ভ্রাতৃবধূকে নিকাহ্(বিবাহ)-ও করিয়া থাকেন।

কা। ওঃ, বুঝিলাম। মায়ের সেরূপ কোন কষ্টের জন্য তোমরা অস্থির হও নাই, তোমরা নিজেরা যেরূপ স্বাধীন, মাতাকেও তদ্রূপ স্বাধীনতা দিবার জন্যই বোধ করি এত ব্যস্ত! স্নেহের ও মাতৃভক্তির মাত্রাটা একটু কম রাখাই ভাল। তোমরা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছ বলিয়া তোমাদের পক্ষে অনেক কাজই শোভা

পায়, কিন্তু মুসলমান—(সগর্বে) যাহারা মুসলমান শাস্ত্রের নিয়ম মত চলিতে বাধ্য ও তদ্রূপ চালচলনকে ঘৃণা করে না, তাহারা ত সহসা তোমাদের অনুকরণ করিতে অক্ষম।

সি। যাহারা তোমার মত মুসলমান, তাহারা মুসলমান নামের যোগ্য কি না, পূর্বে তাহার মীমাংসা হওয়া চাই। কেবল গো-মাংস ভক্ষণই মুসলমানের চিহ্ন নহে। তোমার বর্ণিত "মুসলমান" নামধারী ব্যক্তিরা কোন মন্দ কাজ করিতে বাকী রাখে নাই; মিথ্যা বলা, পরস্বাপহরণ করা, জাল-জুয়াচুরি করা—নানা প্রকার অসাধু ব্যবহার করা ত প্রায় তাহাদেরই নিত্যকর্ম। তাহাদের মুসলমান বলিলে পবিত্র "মুসলমান" শব্দটি কলঙ্কিত হয়।

সুফিয়া। ভাই! তোমার আদর্শ একদল মুসলমান এমন আছেন যে, তাঁহারা কোরান শরীফের এক পৃষ্ঠা দেখিয়াছেন, অপর পৃষ্ঠা দেখেন নাই। তাঁহারা "সুরা নেসার" ৩৪শ আয়েত দেখিয়াছেন, "সুরা নূর" ২য় এবং "সুরা মায়দা"র ৯১ আয়েত দেখেন নাই।।

সি। ঐ "সুরা নেসা"রই ২৪শ আয়েতের প্রথমাংশ দেখিয়াছেন, শেষাংশ দেখেন নাই। *

সু। ঠিক তাঁহারা করিতে না পারেন, এমন কোন কুকাজ নাই—তাঁহারা শব দ্বারা সম্পত্তি লিখাইয়া লইতে পারেন! তাঁহাদের কৌশলে দুই দিনের মৃতদেহ জবানবন্দী দেয়!

সি। আর যদি সেই "—" শাখা নদীটার বাক্‌শক্তি থাকিত, তবে সে বলিতে পারিত, (২০।৩০ বৎসর পূর্বে) সে কত লোককে গোপনে নরহত্যা করিয়া তাহার গর্ভে শব ডুবাইতে দেখিয়াছে; আর কত অসহায় ব্যক্তি

* (১) সুরা 'নেসার' উক্ত আয়েতের অর্থ এই—"পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্তৃত্ব রাখে, ঈশ্বর তাহাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন বলিয়া" ইত্যাদি।

(২) সুরা "নূরের" ঐ অংশে কুপথগামীদের প্রতি একশত কশাঘাতের বিধান আছে।

(৩) সুরা "মায়দার" ঐ আয়েতের অনুবাদ এই—"মদ্য ও দ্যূত ক্রীড়াতে তোমাদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন এবং তোমাদিগকে ঈশ্বর-স্মরণ ও উপাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখা শয়তান ইহা ভিন্ন ইচ্ছা করে নাই, অনন্তর তোমরা কি (সুরাপান হইতে) নিবৃত্ত হইবে ?"

(৪) এবং সুরা "নেসা"র ২৪শ আয়েতের প্রথমাংশ এই—

তাহার তটস্থিত অরণ্যে নৈশ অন্ধকারে প্রাণবায়ু হারাইয়াছে। আর বলিতে পারিত, সে কত হতভাগ্যের মৃত্যুকালীন আর্তনাদ শুনিয়াছে—

সু। (ভ্রাতার প্রতি) সেই হত্যাকাণ্ডগুলির অধিকাংশই তোমার তথাকথিত "মুসলমান"দের দ্বারা সম্পাদিত।

কা। কোন্ শাখা নদীর তীরে নরবলি দেওয়া হইত? আমি ত জানি না।

সি। জান না? বুকে হাত দিয়া দেখ ত? স্থানটার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে হইবে না কি? "গোষ্ঠীর নিকট ফষ্টী" * করিতে নাই; এই নীতিবাক্য মনে রাখিও।

সু। যাঁহারা উক্ত প্রকারে "মুসলমান শাস্ত্রের নিয়ম" প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদের অনুকরণ করিবেন কিরূপে?

সি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমরা তাদৃশ কপটাচারী "মুসলমান" নহি। গলার জোরে তোমরা আমাদিগকে "নাস্তিক" "কাফের"—যাহাই বল না কেন, "নরহন্তা" বা "গুপ্তঘাতক" বলিতে পার না।

কা। (সিদ্দিকার কথায় কর্ণপাত না করিয়া) তোমরা যেমন মক্কা মদীনা বেড়াইতে গিয়া উষ্ট্রারোহণ, গর্দভারোহণ—কিছুই বাকী রাখ নাই, মুসলমান অশিক্ষিতা কুলরমণীগণের পায়ের জড়তাই আজিও ভাঙ্গে নাই—

সু। (স্বগত) এখন "মুসলমান রমণীর" পালা। (প্রকাশ্যে) তোমার আদর্শ কতকগুলি অশিক্ষিতা মুসলমান কামিনীর পায়ের জড়তা ভাঙ্গে নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ঐ জড়িত পদে এমন এক এক লম্ফ দিয়াছেন যে, তাহাতে, তাঁহাদের পদচাপে সমাজের অস্থিপুঞ্জ চূর্ণ হইয়াছে। কেহ বা ঐ জড়িত পদে এক লাফে পবিত্র "জেনানা" ত্যাগ করিয়া কুপথে দাঁড়াইয়াছেন। তাদৃশ অশিক্ষিতা রমণীর প্রশংসা করা তোমাকেই সাজে।

কা। দেখ সুফিয়া। আমাকে বেশী রাগাইও না। মনে রাখিও, মাতাকে বৎসর বৎসর দেশ-বিদেশের হাওয়া খাওয়াইবার জন্য তোমরা দুই ভগ্নী

"এবং সধবা নারী (অবৈধ, কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার করিয়াছে, তাহাকে (অর্থাৎ দাসদাসীর দলকে!) তোমাদের সম্বন্ধে লিপি করিয়াছেন;" আর শেষাংশ এই—"এ সকল ব্যতীত তোমাদের জন্য বিধি হইয়াছে যে, তোমরা আপন ধন দ্বারা (কাবিন যোগে) সুরক্ষক অব্যভিচারী হইয়া (বিবাহ) অন্বেষণ কর, অনন্তর * * * তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত যৌতুক রূপে দান কর।"

*** ইহা পূর্ববঙ্গের প্রচলিত কথা।**

যেরূপ ব্যবস্থা করিতে চাও—মায়ের কুপুত্র কয়টির—এই অশিক্ষিত বর্বরদের জীবনে অথবা নিতান্ত পক্ষে যে কয় দিন তাহাদের তত্ত্বাবধানে মাতা আছেন, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের এ সাধ পূর্ণ হওয়া কঠিন, বরং অসম্ভব।

সু। মাতাকে তোমরা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে যাইতে দিবে না, বেশ। মাতার অসুখে তোমরা আর ব্যথিত হইবে কেন? প্রবাদ আছে, "পুত্রের স্নেহ ততদিন পর্যন্ত, যে পর্যন্ত সে স্ত্রীলাভ না করে, আর কন্যার স্নেহ কখনও হ্রাস হয় না।" তোমরা এখন ক্ষমতাশালী বড়লোক,—তোমাদের নিকট মাতা একজন সামান্য "অবোধ মেয়ে মানুষ" মাত্র। এবং তোমাদেরই আশ্রিতা। আর আমাদের জন্য মাতা তুলনা-উপমা-রহিতা—স্বর্গের আশীর্বাদ বিশেষ। এই মাতৃপ্রেম আমাদিগকে ঈশ্বর-প্রেমের নমুনা দেখায়। আমরা মাতৃচরণে চিরকাল শিশু থাকি; চিরকাল তাঁহার চরণ-ছায়ার প্রত্যাশিনী। চিরদিন তাঁহার আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করি। তাই ইচ্ছা করি, মাতা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকুন। আর সে-বার তোমাকে নিতান্ত কাতরভাবে লিখিয়াছিলাম, "মাতা অত্যন্ত পীড়িত আছেন, তুমি দেখ গিয়া। * * * বৃদ্ধা মাতা কতদিনই বা বাঁচিবেন—।" তাহা শুনিয়া তোমার হৃদয় দ্রব হয় নাই, বরং শুষ্ক ভাষায় উত্তর লিখিয়াছিলে, "আমার এখন তহসিলের সময়—এক পদ নড়িবার যো নাই।" ধন্য পুত্র-হৃদয়। তোমরা মাতার মৃত্যু কামনা কর, যেহেতু তাহা হইলে মাতার "ভরণ পোষণের ভার" হইতে রক্ষা পাইবে। আমরা মাতাকে "তত্ত্বাবধানে" রাখিব এরূপ আস্পর্ধা করি না,—কেবল মাতৃচরণ সেবা করিতে চাহিয়াছিলাম। আর চাহিয়াছিলাম, ধর্মপরায়ণা পুণ্যবতী জননীকে অপবিত্রা পিশাচীদের সংস্রব হইতে দূরে রাখিতে। ভাই! অন্তঃপুরের উদ্দেশ্য ত এই যে, সংসারের অপবিত্রতা হইতে কুল-ললনাবৃন্দকে সুরক্ষিতা রাখা? কিন্তু পবিত্র অন্তঃপুরেও যদি পিশাচিদের অবারিত গতি থাকে, তবে কুলবালারা কোথায় লুকাইবে? কি তামাসাই হয়, যখন মাতা "মগ্‌রেবের" নমাজ পড়িতে (সন্ধ্যাকালীন উপাসনা করিতে) দাঁড়ান—আর বৈঠকখানা হইতে সেতার-সংযোগে পিশাচি-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত তাঁহার কর্ণকুহরে সুধা ঢালিতে থাকে!! আমাদের এখানে মাতা ওরূপ কুৎসিত গান শুনিতে পাইতেন না যে! সেই জন্য তোমরা সুপুত্রেরা তাঁহাকে "তত্ত্বাবধানে" রাখিয়া তাদৃশ সঙ্গীত শ্রবণ হইতে বঞ্চিতা করিতে চাও না। বেশ! বেশ!!

কা। তা পুত্র-ভবন পবিত্র হউক, অপবিত্র হউক, মাতা তাহা ত্যাগ করিয়া জামাতৃ-ভবনে থাকিতে পাইবেন না, এ-কথা নিশ্চয় জানিও। পুত্র জীবিত থাকিতে তিনি জামাতৃ-অন্ন গ্রহণ করিবেন কেন?

সিদ্দিকা। থাক, জামাতৃ-গৃহে তাঁহার পদধূলি দিবার আবশ্যক নাই। ঈশ্বর-কৃপায় তোমরাই দীর্ঘজীবি হইয়া মায়ের "অভিভাবক" থাক।

কা। তোমার পত্র পাঠ করিয়া বাস্তবিকই বড়ই কষ্ট হইয়াছিল—

সি। (স্বগত) আবার ঐ একই কথা। (প্রকাশ্যে) পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেই বালাই যাইত।

কা। পত্র ধ্বংস করিলে কি স্মৃতিও ধ্বংস হইত? বোধ হয় আমাদের বংশের উপর খোদাতালার নিতান্তই "গজব" (ক্রোধ, আক্রোশ বা অভিশাপ) পড়িয়াছে যেজন্য এ বংশের পুত্রগুলি এইরূপ অশিক্ষিত ও বর্বর এবং কন্যা-গুলি এক একটি নক্ষত্র। নচেৎ এই ত হাসেদ ভাইয়ের পাঁচ পাঁচটি ভগ্নী অত বড় শহরে বিলাত-ফেরতা এবং সুশিক্ষিতা অবস্থাপন্ন স্বামীদের সঙ্গে অনায়াসে প্রকৃত মুসলমানের ঘরের কুল-কন্যাদের মত সংসার করিতেছে; আজিও একটি মেয়েও সুশিক্ষিতা স্বাধীন *১ bright star (উজ্জ্বল নক্ষত্র) সাজে নাই।

সি। হাসেদ ভাইয়ার ভগ্নীরা উজ্জ্বল নক্ষত্র সাজেন নাই, বেশ ভাল কথা। কিন্তু তাঁহাদের বংশের পুত্রেরা বিষদানে পিতৃহত্যা করিয়া এবং কন্যারা গোপনে নানা কাণ্ড করিয়া সমাজে কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। যাক্ ভাই! অন্য লোকের পারিবারিক কথায় আমাদের কাজ নাই,—তুমি তাহাদের নাম সগর্বে, সগৌরবে উল্লেখ করিলে, তাই আমিও দু'কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

কা। (ভগ্নীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) খোদাতালার নিকট আরাধনা করি যে, তিনি যেন এই পরিবারের অশিক্ষিত বর্বর পুরুষগুলিকে অচিরে ধ্বংস করিয়া ফেলেন, যে তাহারাও উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঝকঝকিতে চক্ষু ধাঁধা হইয়া মুখ ছাপাইয়া না বেড়ায়—

সি। উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঝক্ঝকিতে চক্ষে ধাঁধা লাগিবে কেন? চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছিল সেই দিন—যেদিন ফাসেদ ভাইয়ের স্ত্রী ও শ্যালিকাদিগকে মেলায় দেখিয়াছিলে—

সু। আর সেই মেলায় দুলাভাইকে*২ তাহাদের সম্মুখে দেখিয়া মুখ লুকাইয়াছিলে। একদিকে ফাসেদ ভাই ভাবির * নিকট হইতে দশ হাত দূরে

*১ কাজেব ক্রোধভরে কথায় কথায় বেচারী বঙ্গভাষার মণ্ডপাত করিতেছেন। পাঠিকা "কাণ্ডাকাণ্ড", "সুশিক্ষিত অবস্থাপন্ন", "মেয়ে সুশিক্ষিতা (স্ত্রীলিঙ্গ) স্বাধীন (পুংলিঙ্গ)" ইত্যাদি কতই মজার কথা শুনিতে পাইতেছেন।

*২ ভগ্নিপতিকে "দুলাভাই" বলা হয়।

* "ভাবি" ভ্রাতৃবধূ।

সরিয়া দাঁড়াইলেন, অপর দিকে তুমি পলায়নের পথ খুঁজিতেছিলে। "যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানে রাত হয়"—দুলাভাইয়ের নিকট তুমি সর্বদা ফাসেদ ভাইয়ের শ্বশুরালয়ের পর্দার খুব প্রশংসা করিতে কি না!

কা। (সলজ্জভাবে) এসব আজগুবি কথা তোমরা কোথায় শুনিয়াছ ?

সু। দুলাভাই নিজে বলিয়াছেন।

কা। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিয়া থাকিবেন।

সি। আর এক কথা মনে পড়িল। তুমি যে আমাদের মক্কাশরীফ ভ্রমণের কথা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছ, তাহার উত্তর দিতে ভুলিয়াছিলাম।

কা। প্রত্যেকটা কথার উত্তর না দিলে কি তোমাদের মানহানি হইবে ?

সি। মানহানি হইবে না বটে; কিন্তু এখন আর সেদিন নাই যে আমরা তোমাদের চাবুক নীরবে পরিপাক করিব—

সু। বাস্তবিক এখন আর সেদিন নাই।

কা। সুফিয়া! তুমি আর ক্ষীরে লুন দিও না। তোমরা দুইজন—আমি একা!

সু। তুমি একাই আমাদের দু'জনের সমান।

কা। হায়! এখন আর সেদিন নাই যে! আচ্ছা সিদ্দিকা! আমাদের চাবুক পরিপাক করিবে না ত কি করিবে? তোমরাও আমাদের চাবুক মারিবে না কি ?

সি। না, চাবুক মারিব না—রোদনই করিব; তবে প্রভেদ এই যে, পূর্বে নীরবে রোদন করিতাম, এখন উচ্চকণ্ঠে রোদন করিব, যাহাতে বাহিরের লোকের দয়া উদ্রিক্ত হয়! —যাহাতে জগৎ আমাদের দুঃখে সহানুভূতি করিতে পারে!

কা। বেশ! কাঁদ—

সি। আমরা ত যাহা হউক, মদীনা শরীফে উষ্ট্রারোহণে "থপ্ থপ্" করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। আর যাঁহারা এদেশের অন্তঃপুরের জানালা হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া পথিককে নাকের নোলক, মুখের ঝলক দেখাইয়া থাকেন,—শিবিকা ছাড়া একপদ নড়েন না, অথচ মোটা দোহারা পর্দায় বড় বড় ছিদ্র করিয়া ফেলেন, তাহারা বুঝি প্রচলিত অবরোধ-প্রথার মানরক্ষা করেন? কেমন?

সু। মনে পড়ে, মৌলবী নইমুদ্দীন সাহেব প্রণীত "জোব্দাতল মসায়েলে" পাঠ করিয়াছি,—"গহনার ঝনঝনিতে আমার নমাজই যেন কেমন কেমন হইল।।"

তোমরা মনে কর, গোপনে কোন কাজ করিলে দোষ হয় না। আর চতুষ্প্রাচীরের ভিতর কয়েদ থাকার সহিত "মুসলমান শাস্ত্রের" সংশ্রব কি? কোন মুসলমান-প্রধান দেশেই ত ঈদৃশ অন্তঃপুর প্রথা নাই—এই ভারতে ও-প্রথা হইয়াছে কেবল অবলা-পীড়নের উদ্দেশ্যে। মক্কাশরীফে কি শিবিকা আছে? সে দেশে "উল্টা গাধা" ছাড়া আর বাহন কই?

কা। কি বলিলে?—অবরোধ-প্রথা শাস্ত্রের বিধান নহে? তোমরা কোরান শরীফ দেখাইয়া এ-কথা প্রমাণিত করিতে পার?

সি। অবশ্য পারি। কিন্তু আমাদের কথা প্রমাণের পূর্বে তোমরা প্রমাণিত কর—ভারতের বর্তমান পর্দা কোরান শরীফের অনুমোদিত। আমাদের ত রাঙা চক্ষু দেখাইয়া চুপ করাইতে পার; কিন্তু গত অক্টোবর মাসের (১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের) "দি ইণ্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন" ("ভারত ললনার পত্রিকা") দেখ নাই? মাননীয় মীর সুলতান মহিউদ্দীন সাহেব বাহাদুর ৫০০.০০ টাকা পুরস্কার দিবেন, যদি কেহ বর্তমান অবরোধ-প্রথাকে কোরান শরীফের বিধান বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন। তিনিই প্রকৃত বাহাদুর। ভাই! তুমিই কেন পুরস্কারটা নিতে চেষ্টা কর না? ঐ পত্রিকায় সৈয়দ সাজ্জাদ হায়দার সাহেবের এবং মীর্জা আবুল ফজল সাহেবের পর্দা সংক্রান্ত মন্তব্যগুলিও দয়া করিয়া পাঠ কর। ঐ কৃত্রিম অন্তঃপুর-বন্ধন মোচন হইলে সমাজে অবাধে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে। তখন এ শিক্ষার গতিরোধ করা অসম্ভব হইবে।

কা। যদি আমাদের গায়ে জোর থাকে, তবে প্রাণপণে স্ত্রীশিক্ষার গতিরোধ করিবই। অন্ততঃ আমার কন্যাদিগকে আমি পড়াইব না। তোমাদের পড়াইয়া যথেষ্ট কর্মফল পাইলাম। আর না—এ নেড়ামাথা লইয়া বেলতলায় আর যাইব না!

সি। বেলতলায় যাইতে হইবেই। গত কার্তিক মাসের "নবনূর" পত্রিকায় "আধুনিক শিক্ষা" দেখ নাই? মাননীয় লেখক ভ্রাতাটি ঠিক বলিয়াছেন, "ভারতীয় মহিলাকুলের ইউরোপীয় শিক্ষালাভে বিষময় ফল" ফলিতে পারে; (আমরা ইহা স্বীকার করি না) কিন্তু নীলকণ্ঠের ন্যায় সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে।" বুঝিলে?

কা। তোমরা এখন স্বাধীনতার চূড়ায় উঠিয়াছ, কাজেই ধরাখানা সরা হেন দেখ। আহা! এখন মনে হইলে গা শিহরিয়া ওঠে। যখন তোমাদের সহকারে সেই অন্তঃপুরে মাতাকে এই নিষ্ঠুর ভ্রাতারা কয়েদ

রাখিয়াছিল, তখন একটু স্বাধীনতার নিঃশ্বাস দিয়া সংবাদ লয়, এমন লোকও ছিল না ! হায় ! এমন দিনও গিয়াছে !

সি। ঠিক ত, সকলেরই সুদিন কুদিন চলিয়া যায়—পড়িয়া থাকে না। আমারও মনে হইলে হৃৎকম্প হয়, যখন পিতার নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া তুমি দারুণ অভিমানে বিষভক্ষণ করিয়াছিলে। হায় ! তোমারও তেমন দিন গিয়াছে,—যেদিন পিতা স্বয়ং গৃহস্বামী ছিলেন, আর তোমরা সকলে তাঁহার অধীন ও আশ্রিত ছিলে ! "আমার বাটী" বলিতে সে সময় তোমাদের এক ইঞ্চ (কিংবা এক অঙ্গুলি) পরিমাণ ভূমিও ছিল না। কালের বিচিত্র গতি !—

কা। কেন, তোমরা কি এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলে ? সেই বৃহৎ অট্টালিকা নামতঃ "পিত্রালয়" ছিল বটে, কিন্তু এই ভ্রাতাদের নিজ ব্যয়ে ও যত্নে রক্ষিত হইত। ধর্ম ও স্বভাব কুকুর, কুকুরীকেও শিক্ষা দেয় যে কোন অবস্থায় নিজের benefactorকে (উপকারী ব্যক্তিকে) ত্যাগ করিও না। কিন্তু ধন্য স্বাধীন চিন্তা ! তুমি সকলই অবহেলা করিতে পার।

সু। বিধবা মাতাকে শিশু কন্যাসহ নিজ ব্যয়ে রক্ষা করিয়াছ, ইহার ন্যায় অসাধারণ উপকারের কাজ যেন আর কেহই করে না ! পিতা থাকিলে আমরা তোমাদের গলগ্রহ হইতাম কেন ? আর "স্বাধীন চিন্তা" কিসে কুকুরীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা কৃতঘ্ন হইল ? তোমাদের ন্যায় মহা অনুগ্রাহকের আমরা কি অপকার করিয়াছি ? তোমরা যে অন্নবস্ত্র দিয়া, বাটীতে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করিয়াছ, সেজন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকি ; আর কত প্রশংসা চাও ? যদি বল ত নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এই বলিয়া ঢোল পিটাই—

"আমরা বেনিফেক্‌টর ক' ভাই—*
মাতাকে অন্ন দিয়াছি সবাই।
আমাদের গুণের নাই ক তুলা,
শৈশবে ভগ্নীর টিপি নাই গলা !
আমরা মহা-উপকারী ক' ভাই—" !

বাস্তবিক, শিশুকালে আমাদের গলা টিপিয়া পাতকুয়ায় ফেলিয়া দিলেই পারিতে ; অন্তঃপুরের ভিতর ফৌজদারী আপদ ত ঢুকিতে পারিত না ! পিতৃ-হীনা অসহায়া কনিষ্ঠাকে প্রতিপালন করিয়াছ, সে-কথা সগর্বে মুখে আনিলে ?

---

* 'আমরা বিলাত ফেরতা ক' ভাই
সাহেব সেজেছি সবাই'— এই গানের অনুকরণ।

এই ত আমাদের বালক চাকরটা যাহা কিছু উপার্জন করে, সব ছোট ভাই ভগ্নীকে খাওয়ায়। ইহার পিতামাতা নাই; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও শিশু তিনটিকে অধিক সাহায্য করে না। হেদায়েত এগার বৎসর বয়:ক্রম হইতে যাহা উপার্জন করিতেছে, সব ছোট ভাই ভগ্নীর নিমিত্ত ব্যয় করিতেছে। এখন ইহার বয়স ১৬ বৎসর; এবার কয় মাসের বেতন জমা করিয়া বড় ছুঁড়িটার বিবাহ দিয়াছে। ১৬ বৎসরের বালক যেরূপ আত্মত্যাগ করিতে পারে; এতটা কি তোমরা আমাদের জন্য করিয়াছ? কই, হেদায়েত ত মনে করে না যে, 'ভগ্নীকে বিবাহ দিয়া চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধিলাম' বরং নিজের একটা গুরুতর কর্তব্য সাধন করিয়াছে, এই মনে করে। ইহাকে (কাপড় প্রস্তুত করা ব্যতীত) একটি পয়সা নিজের জন্য ব্যয় করিতে দেখি না। এখন কি এই অসভ্য; অশিক্ষিত, ছোট জাতীয় (জোলা তাঁতি) বালকদের নিকট আমাদের উচ্চবংশজাত, সেন্ট জেভিয়ার কলেজের ছাত্ররা—সুসভ্য (৫০ বৎসরের।) প্রবীন মিয়াঁ বাবুরা ভদ্রতা শিখিবেন?

কাজেব এখন পুনরায় অন্তঃপুর কয়েদের কথা তুলিলেন,—

"আর এক কথা, তোমরা দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র মাতাকে অন্তঃপুর কয়েদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মামাতো ভাইকে চিঠি না লিখিয়া মেঝে ভাইকে লিখ নাই কেন? তোমরা ত তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি কর, কারণ তিনি বিলাত-ফেরতা—সাক্ষাৎ উদারতার প্রতিমূর্তি।"

সি। তিনি যদি পত্রের উত্তর দিতেন, তবে আর দুঃখ ছিল কি?

কা। হুঁ—! তুমি যেমন বিষমুখী। মুখ নহে—যেন ছুরী, ক্ষুর। ঐ মুখের গুণে কেহ তোমায় দেখিতে পারে না।

সি। সত্য কিঞ্চিৎ কটু শুনায়, তাই বলিয়া মধুমাখা মিথ্যা বলিতে শিখিব না। না, ভাই! মুখের দোষ নহে, অন্য কারণ থাকিতে পারে। বিলাত-ফেরতা লোকেরা অবলার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবেন না, ইহা অসম্ভব। চিঠির উত্তর দিতে শিখেন না তবে তাঁহারা বিলাতে গিয়া কি শিখেন?

সু। তিনি হয়ত অবলাকে চিঠির উত্তর পাইবার উপযুক্ত মনে করেন না।

সি। সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু আক্ষেপ এই, তাঁহাদের ন্যায় উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত লোকেরাও স্ত্রীজাতির উপকারের নিমিত্ত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম স্বার্থত্যাগ করিতে চাহেন না।

সু। পরের উপকারের প্রত্যাশাই বা কর কেন? "বাহুবলই বল"—আত্মনির্ভরতা চাই। যতদিন অভাগিনী যুক্তিজ্ঞানহীনা অবলা সরলাগণ নিজের

ভালমন্দ বুঝিতে সক্ষম না হন, ততদিন তাঁহাদের উপকার করিতে গেলেও বেশী ফল হইবে না।

সি। আমি এই বিষয়ে তোমার সহিত একমত হইতে পারি না। অবলা সরলাগণ যুক্তিজ্ঞানহীনা নহেন—তাঁহারা বুঝেনও সব ; কিন্তু প্রভুদের অত্যাচারে মাথা তুলিতে পারেন না — মাথা তুলিতে অক্ষম বলিয়াই বুঝিয়াও অবোঝের ন্যায় নীরব থাকেন। এবং সময় সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুদের "হাঁ" তে "হাঁ" মিশাইয়া থাকেন।

কা। প্রভুদের অত্যাচারে মাথা তুলিতে পারে না, এ কথা বল কেন? "বরং তোমাদের কেহ একটুকু মাথা উঠাইলে আমরা তাঁহাকে আকাশে চড়াইতে চেষ্টা করি * * * * পণ্ডিতা রমাবাই কতগুলি সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়া দেশটাকে যে তোলপাড় করিয়াছিলেন—" *

সি। পণ্ডিতা রমাবাইকে মাথায় তুলিয়াছিলে, যেহেতু তিনি তোমাদেরই শিখান বুলি মুখস্থ করিয়াছিলেন। যতদিন তোমাদের পালিতা সারিকা তোমাদেরই শিখান বুলি বলিবে—"পড় বাবা মতীজান,"—ততদিন ত তাহাকে আদর করিবেই ; মাথায় তুলিবেই। যেদিন সে "পড় বাবা মতীজান" না বলিয়া আর কিছু বলে, সেদিন আর নিস্তার কই ?

কা। আমরা ললনা-পীড়ন ছাড়া আর কিছুই করি নাই কি ? তাজমহল, মতি মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করি নাই কি ?

সি। এক তাজমহলের জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। এখন জিজ্ঞাসা করি, তাজমহলের সংখ্যা কত ? কয়টা তাজমহল এ বঙ্গদেশে আছে ?

সু। বঙ্গে বহুসংখ্যক প্রপীড়িতা ললনার উদ্দেশ্যে অনেক মহল হইতে পারিত। তবে কথা এই যে, তাদৃশ অসহায়া মহিলাবৃন্দের সমাধির উপর "অবলা-পীড়নের" স্মৃতি রক্ষার্থে কোন "পয়জার-মহল" নির্মিত হয় নাই !! যাহা হউক, ইহাকে আর কি বলিব, আমাদের বিলাত-ফেরতা মেজে ভাইও যখন এমন গোঁড়া হইয়াছেন।

সি। বেচারা বিলাত-ফেরতা ভাইয়ের দোষ দিব কি,—তিনি ঐ কোরান শরীফের এক পৃষ্ঠাদর্শী মুসলমানদের দলে মিশিয়া 'শিভালরী' (অবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন) ভুলিয়াছেন। অন্ধভাবে গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছেন।

* গত কার্ত্তিক মাসের "নবনূর" দ্রষ্টব্য।

সু। তাই বটে। এ স্থলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই হাসির গানটা আমার মনে পড়ে,—

"ভেসে যাব যাব হচ্ছি ফাউল ও বিফের বন্যায় *১
এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গোটা কত কন্যায়।
ছেড়ে দিলেম পথটা বদলে গেল মতটা
অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরি মত বদলায়!"

কাজেব। বিলাত-ফেরতাই হও আর আমেরিকা-ফেরতাই হও, দেশ-কালের নিয়ম-অনুসারে চলিতেই হইবে। এক এক দেশের এক এক পদ্ধতি। এক দেশের রীতি অন্য দেশে চলিবে না। 'ইংলণ্ডে প্রতি গৃহে অগ্নিকুণ্ড বারমাস প্রয়োজন — ভারতে কঠোর শীতকালেও তাহার ততটা আবশ্যক মনে হয় না।" *২

সি। তাই না কি? "ভারত" অর্থে কেবল কলিকাতা বুঝায় নাকি? দার্জিলিং, শিমলা, মুলতান, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে *৩ "কঠোর শীতকালেও অগ্নিকুণ্ডের ততটা আবশ্যক মনে হয় না?"

কা। শিমলা, কাশ্মীর শীতপ্রধান স্থান বটে, কিন্তু হিমালয় পর্বতটা ভারতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

সি। বটে! যে হিমালয়কে অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই হিমাদ্রিকে — সেই ভারতের আরাধ্য দেবতাকে আজি তুমি বিনাদোষে ভারত হইতে নির্বাসিত করিলে? আচ্ছা, বৃদ্ধ হিমালয়কে না হয় তাড়াইলে; কিন্তু আমাদের লাহোর এবং দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি নগরের প্রতি তোমার কি ব্যবস্থা? এগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত কিনা?

কা। ও-সব নগরে ইংলণ্ডের মত শীত হয় না।

সি। ঠিক ইংলণ্ডের মত না হইলেও অগ্নিকুণ্ডের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক বুড়ী খাটিয়ার নীচে "আঙ্গেটি" (কাঠ কয়লার আগুন, তুষ ও ঘুঁটেপূর্ণ হাঁড়ি বিশেষ) রাখিয়া শয়ন করে। একবার ঘুঁটের গন্ধে বিরক্ত হইয়া কোন বুড়ীকে আঙ্গেটি দূর করিতে বলিয়াছিলাম। সে বলিল, "আমার আঙ্গেটিকে দূর করা

*১ "ফাউল ও বিফের বন্যায়," অর্থাৎ মুরগী ও গো-মাংসের বন্যায়।

*২ গত আশ্বিন মাসের 'নবনূর' দ্রষ্টব্য।

*৩ শিমলা হইতে এ বৎসর (অর্থাৎ ১৩১১ সালে) শীতের জুলুমে লোকে পলায়ন করিয়াছে; কাশ্মীরের পথঘাট তুষারাবৃত।

যে কথা, আমাকে এ বাড়ী হইতে তাড়ানোও সেই কথা।" বাস্তবিক শয়নকক্ষে (কেবল কয়লার আগুনের) একটি আঙ্গেটি না রাখিলে ভাল মতে নিদ্রা হয় না — যেন রক্ত পর্যন্ত শীতল হইয়াছে, এইরূপ মনে হয়। তুমি বোধ হয় কেবল কলিকাতার শীত (temperature) দেখিয়া সমগ্র ভারতের ভাগ্য নির্ণয় করিয়াছ।

সু। হাঁ, তাহাই করিয়াছেন। ভাই। তুমি ভুট্টার গাছ দেখিয়াছ? ভুট্টা গাছে নানা রঙের ফুল হয়; ইহার পাতা ছাঁটিয়া তোমাদের ইলেকট্রিক পাখার ফলা (blade) প্রস্তুত হয়! আর ইহার গুঁড়ির কাঠে তোমাদের আরাম কেদারা তৈয়ার হয়।

কা। (সহাস্যে) ওগো। তোমরা মহাপণ্ডিত — ভূগোল, খগোল, অম্বুদ (উদ্ভিদ) বিদ্যা, রসায়নাদি সমস্ত বিদ্যা তোমাদের কণ্ঠস্থ। তোমাদের মত পণ্ডিতের সহিত তর্ক করা আমার ভারী অর্বাচীনতা। ক্ষমা কর পণ্ডিত মহাশয়।

সি। কটু বলিলে বা বিদ্রূপ করিলে তর্ক হয় না। যদি তর্কে না পার, যথাবিধি পরাজয় স্বীকার কর।

কা। (সরলভাবে সিদ্দিকার কথার উত্তর না দিয়া) মহাপণ্ডিতই হও, আর যাহাই হও, তোমরা আমাদের সমতুল্য হইতে পারিবে না — কখনই না।

সু। সমতুল্য কেন, আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

কা। তা কি হয়? "মানবের মানসিক বল তাহার brain-এর (মস্তিষ্কের) উপর নির্ভর করে। পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের ব্রেন ওজন ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের ব্রেন অনেক পরিমাণে অধিক।"

সি। তা হউক। বড় বস্তুতে সারভাগ অল্প থাকে। ছোট বস্তু অধিক সারবান হয়। এই দেখ না, রাশিয় কতা বড় মস্ত, আর জাপান কত ক্ষুদ্র — শেষে পোর্ট আর্থার কে লইল? প্রকৃত বীর — প্রকৃত যোদ্ধা কে?

কা। এই রুশ-জাপানের যুদ্ধটা না হইলে তুমি ছোট বড়র দৃষ্টান্ত কোথায় পাইতে?

সি। দৃষ্টান্তের অভাব হইত? — নিত্য প্রকৃতি চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছে। এই দেখ ছোট মরিচ (লঙ্কা) ও বড় মরিচ — একটা ধান মরিচে যত ঝাল হয়, তিনটা বড় মরিচে তত হয় না।

কা। তা' ঝালের পরিমাণ — বিষের পরিমাণ ত তোমাদের ভাগেই বেশী পড়িয়াছে। ক্রূর বুদ্ধি, কূটনীতি, কপটতা, ছলনা — এই সব উপাদানেই

ত তোমরা গঠিতা। যত দুষ্কর্মের মূল কারণ তোমরা।

সি। হাঁ, যত সব প্রসিদ্ধ ডাকাত আমরাই; যত জালিয়াত, সিদ্ধহস্ত জুয়াচোর, রাজবিদ্রোহী, সব আমরাই। জেলে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোকই পচে। নমরুদ, ফেরাউন এবং সুবিখ্যাত তাস্তিয়া ভীলও স্ত্রীলোক ছিল!!

কা। দুষ্কর্মে স্ত্রীলোকের হাত প্রকাশ্যে না থাকুক, মূলে তাহারা থাকে। "স্বর্গোদ্যানে তোমরাই আমাদের পতনের পথপ্রদর্শক ছিলে, ট্রয় সমরের তোমরাই নায়িকা ছিলে, লঙ্কাকাণ্ড তোমাদেরই পদানুসারে ঘটিয়াছিল, কারবালার সে ভীষণ কাণ্ডেও তোমরাই অভিনেত্রী ছিলে"। *

সি। হাঁ, মাবিয়ার কন্যার সহিত হজরত আলীর কন্যার যুদ্ধ হইয়াছিল। আর সেনাপতি ছিলেন হজরতা শহরবানু!!

কা। "স্ত্রীলোক যে unreasonable (যুক্তিজ্ঞানহীনা) ইহা তাহাদের প্রকৃতি।" তোমরা প্রতি কথায় যুক্তিহীনতার পরিচয় দাও। পুরুষ জাতি স্বভাবতঃই যুক্তিশক্তিবিশিষ্ট।

সু। ঠিক। তাই লঙ্কাকাণ্ডে সীতাদেবীকে অভিনেত্রী বলিয়া তুমি হঠাৎ সমস্ত যুক্তিশক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিলে! ভাই। একটা উদাহরণ শুন, আমার হাঁপানী রোগ আছে, ডাক্তার আমাকে কলা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মর্তমান কলা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমি গোটা কত কলার শ্রাদ্ধ করিলাম — অতঃপর আমার হাঁপানী বৃদ্ধি হইল! এখন বল ত, হাঁপানী বৃদ্ধির জন্য কে দোষী হইবে? আমি, না কলা?

কা। তুমি দোষী হইবে, কারণ লোভ সম্বরণ করিতে পার নাই।

সি। দোহাই তোমার যুক্তির! — সব দোষ কলার!! কারণ, কলা সীতাদেবী, সুফিয়া রাবণ। ভাইয়া! তোমার যুক্তির বলিহারী যাই!!

কা। আচ্ছা, এ-কথা এখন থাকুক। ছোট বড় সম্বন্ধে আর কি উদাহরণ দিতে পার?

সি। অনেক দিতে পারি; — বঙ্গদেশে বেল ফুল বড় বড় হয়, পশ্চিমাঞ্চলে ছোট হয়। কিন্তু বঙ্গীয় ফুল (বড় ব্রেন) অপেক্ষা পশ্চিমে ফুলে (ছোট ব্রেনে) গন্ধ বেশী থাকে।

কা। তা থাকিতে পারে, আমি জানি না।

সি। আচ্ছা, বড় লেবু অপেক্ষা ছোট কাগজি লেবু ভাল, এ-কথা স্বীকার কর?

* গত আশ্বিন এবং কার্তিক মাসের 'নবনূর' দ্রষ্টব্য।

কা। হাঁ, আমরা বাতাবী লেবু, তোমরা কমলা লেবু।

সি। অবশ্য। বড় ব্রেন মিশ্রী, গুড়; ছোট ব্রেন স্যাক্‌সিন, স্যাকারিন।*

কা। আজি যথেষ্ট বকিলাম, এখন উঠি।

সু। কিন্তু তুমি যথেষ্ট পরাজয় স্বীকার কর নাই।

কা। তাহা করিবও না। আমাদের গায়ে জোর বেশী।

ঐ পর্যন্ত বলিয়াই কাজেব প্রস্থান করিলেন।

সুফিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, — "আমাদের রসনায় জোর বেশী — !"

কাজেব হয়ত তাহা শুনিলেন না।

তবে ভগ্নী পাঠিকা! আমরাও এখন বিদায় হই।

'নবনূর'
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সন।

* "স্যাক্‌সিন" ও "স্যাকারিন" অত্যন্ত মিষ্ট চিনি বিশেষ। সাধারণ চিনি অপেক্ষা ইহা ১৬ গুণ (অথবা তদপেক্ষাও) অধিক মিষ্ট।

তিন কুড়ে

বাল্যকালে গল্প শুনেছিলাম,—এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর বাড়ীতে ছিল তিন জন কুড়ে। তারা কোন কাজ করত না, কেবল দিন রাত শুয়ে থাকত। রাজবাড়ীর লঙ্গরখানা থেকে কেউ দয়া ক'রে দু'টি চারটি ভাত এনে দিলে, তারা সেইখানে শুয়ে শুয়েই খেয়ে নিত। এই রকমে তাদের অলস জীবন কাটিয়ে দিয়ে তারা কোন রকমে বেঁচে ছিল। কিছু দিন পরে রাজবাড়ীর অন্যান্য চাকররা মনে করলে, "বাঃ, এ'ত বেশ মজা। এ কুড়েরা কোন কাজ করে না, তবু নিয়ম মত দু'বেলা খেতে পাচ্ছে, তবে আমরা এত খেটে মরি কেন? চল, আজ থেকে আমরাও কুড়ে হলুম।" বাস্? এই না বলে তারা সবাই শুয়ে পড়লো।

এদিকে রাজা বাহাদুর দেখলেন, এ ত বড় বিপদ! এখন যে সমস্ত বাড়ী-ঘর কুড়েতে ভরে গেছে! এতগুলি কুড়েকে লঙ্গরখানা থেকে কাহাঁতক খাওয়াবেন? আর খাওয়াতে চাইলেও এখন লঙ্গরখানার ভাত রাঁধে কে? সবাই ত 'কুড়ে' হয়ে পড়ে আছে। তিনি তখন মন্ত্রীকে ডেকে মন্ত্রণা চাইলেন যে, কি করা যায়? মন্ত্রী মশাই বল্লেন, "তাই ত; আমার আসনখানাও আর কেউ ঝেড়ে মুছে দিচ্ছে না।" (রাজার সিংহাসন ত কেউ মুছতই না, তবে মন্ত্রী মশাইকে চাকররা একটু আধটু ভয় করত।) "আচ্ছা মহারাজ! আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এক্ষুনি প্রতিকার করছি।"

এই না বলে মন্ত্রী মশাই তখনই একজন খয়েরখাহ চাকরকে হুকুম দিলেন, "দে বেটা কুড়ে-বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে।" অমনি বাড়ীময় চারিদিকে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সেখানে যত কুড়ে ঘুমিয়ে ছিল, তারা সবাই ধড়মড় করে জেগে উঠে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলে। কিন্তু সেই যে পূর্বের তিন কুড়ে ছিল, তারা তখনও উঠল না। যখন তাদের মাথার কাছে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো সেই তীব্র উত্তাপে কাতর হয়ে একজন অপর একজনকে বল্লে—

১ম কুড়ে। দ্যাখ হে ভাই! আজ রবি কত জ্বলে?

২য় কুড়ে। কেই আংখি খোলে?

৩য় কুড়ে। ঘন ঘন রা' কাড়িস্ না, বাই বান খেলে।

অবশেষে রাজা যখন দেখলেন যে, এরা হচ্ছে আসল কুড়ে — এদের সাহায্য না করলে এরা পুড়ে কাবাব হবে ; তখন তিনি লোক-লস্করকে হুকুম দিলেন, ওদের ধরাধরি করে বের করতে। সেপাই সন্তরীরা তাদের টেনে হিচড়ে নিয়ে একটা নিরাপদ পথের ধারে শুইয়ে দিলে।

শুনতে পাই, বাঙ্গালা মুলুকে নাকি প্রায় পৌণে তিন কোটি মুসলমানের বাস। এঁরা সেই তিন কুড়ে, — নড়াচড়া, চলাফেরা কিছু করেন না ; কেবল কুম্ভকর্ণের মত শুয়ে শুয়ে ঘুম পাড়েন। গত এপ্রিল মাসে যখন কলকাতায় — তথা সারা বাঙ্গালায় দাঙ্গা হাঙ্গামার আগুন ভীষণ বেগে জ্বলে উঠল, তখন যেখানে যত নকল 'কুড়ে' ছিল, তারা সবাই গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠে উন্নতির চেষ্টায় লেগে গেল, কিন্তু আমরা তিন কোটি কুড়ে সেই পূর্বের মতই পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছি। 'স্যার' অমুক দয়া করে দু' চারটা চাকুরি জুটিয়ে দিবেন, শেঠ অমুক খয়রাত ফাণ্ড থেকে কিছু দান করবেন — তাতেই কোন রকমে আমাদের দিন কেটে যাবে। তারপর গোনা দিন কয়টা শেষ হলে পরকালে বেহেস্ত ত আমাদের জন্যই রিজার্ভ হয়ে আছে। সেখানে আমরা ছাড়া আর কে যাবে ? চার দিনের দুনিয়া, ইহাকে চায় কে ? কোন মতে ভবনদী পার হ'লেই অনন্ত-কালের জন্য অফুরন্ত বেহেস্ত আর অসংখ্য হুরী !!

গত ২৯শে নবেম্বর একজন বোম্বাইয়ের মহিলা আমাদের স্কুল দেখতে এসেছিলেন। কতক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখার পর তিনি আমায় বল্লেন, "মাফ করবেন, আপনাদের বাঙ্গালী মুসলমানের মত অকর্মণ্য এবং জুয়াচোর আর কোথাও নেই। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মতওয়াল্লিরা টাকা ভেঙ্গে আত্মসাৎ করেন। এই ত গত ইলেকশনের সময় একজন মোটা গোছের মতওয়াল্লি দশ হাজার টাকার মদ কিনে খেলেন ও বন্ধুদের খাওয়ালেন।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি।—যদি আপনি এই কথা বলছেন, তবে আমাকেও অনুমতি দিন, বোম্বেয়ে লোকের কথা কিছু বলি। শেঠ ছোটানী খিলাফত ফাণ্ডের ১৬,০০,০০০৲ টাকা—

বোম্বেয়ে মহিলাটি আমার কথায় বাধা দিয়ে শেঠ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করে যা বল্লেন, তা'তে আমি বেশ বুঝলুম, শেঠ সাহেব হুজুগে পড়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই টাকাগুলো নষ্ট করেছেন। তারপর তিনি পুনরায় মাফ চেয়ে

আমাকে জুতা মারতে আরম্ভ করলেন ; যথা—

বোম্বেয়ে মহিলা ।—দেখুন, আমি নিজের জাতের বড়াই করতে চাই না ; তবে বাস্তব ঘটনার কথা বলছি। এত বড় কলকাতা শহরের বাঙ্গালী মুসলমানদের কয়টা প্রতিষ্ঠান — মোসাফেরখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি আছে ? এখানে যা কিছু আছে, সব বোম্বাইয়ে এবং দিল্লীওয়ালা সওদাগরদের। সব চেয়ে বড় মসজিদটা — যেটাকে বাঙ্গালার গবর্নর বাহাদুর নত-মস্তকে মেনে নিয়েছেন, সেটাও বাঙ্গালীদের নয়। এখানে দশটা এতিম-খানা হলেও সকল দুঃস্থ গরীবের অভাব মোচন হত না — তবু সে স্থলে যে একটা মাত্র আছে, তাও বোম্বেয়ে লোকদের দ্বারা পরিচালিত। * * * কি লজ্জার বিষয়, এই কলকাতায় বাঙ্গালী মুসলমান মেয়েদের জন্য এমন একটা বালিকা-স্কুল নাই, যা'তে তারা বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারে। এই ধরুন না, আপনাদের এই স্কুলটা — ষোল বৎসর হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত এটাকে না পারলেন হাই-স্কুল করতে, না পারলেন বোর্ডিং হাউস খুলতে। †

আমি।—এখানকার মেয়েরা একটু বড় হলেই পর্দার অনুরোধে তাদের বাপ মা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন। হাই-স্কুলে পড়বে কে ?

বো — ম। মাফ করবেন, অমন কথা বলবেন না। মেয়েরা লরেটা, কনভেন্ট, ডায়োসেসন এবং অন্যান্য অ-মুসলিম স্কুলে যেয়ে প্রকৃত ধর্মভাবের মাথা খাচ্ছে। এই ত দু' বছর হ'ল, আপনাদের গ্রামের একটি মেয়ে কোন মুসলমানের বাড়ীতে বা বোর্ডিং হাউসে স্থান না পেয়ে নিতান্ত দীনভাবে বহু কষ্টে বেথুন কলেজে আশ্রয় নিয়ে, বি. এ. পাশ করলে। * * * আর পর্দার কথা বলছেন ? — পর্দা আমাদের বোম্বাইয়ে যথেষ্ট আছে। নাই — বরং আপনাদেরই। সকল রকম অধিকার বঞ্চিতা হয়ে চার দেওয়ালের মাঝ-খানে বন্দিনী হয়ে থাকার নাম পর্দা নয়। আপনারা কোরান শরীফ পড়েন কি ? না শুধু তাবিজ (হেমায়েল শরীফ) করে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন ? * * *

ফল কথা, আমি উক্ত বোম্বেয়ে মহিলার কথা-কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়লুম। কিন্তু জানি না, উপরোক্ত কথার খোঁচায় আসল তিন (কোটি) কুড়ের গায়ের কোথাও একটু আঁচড় লাগবে কিনা !!

বার্ষিক সওগাত, ১৩৩৩

---

† আপাততঃ চল্লিশ জন বাঙ্গালী শিক্ষার্থিনী ছাত্রী পাইলে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা স্কুলে বাঙ্গলা শাখা খোলা যাইবে।

পরী টিবি

মসুরী পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া এই সুন্দর সুদৃশ্য ক্ষুদ্র পাহাড়টুকুর নাম না শুনিয়াছে, এমন কে আছে? ইহাকে ইংরাজীতে "Witches Hill" বলে। এই পাহাড়ের ইংরাজী ও দেশী নামে চমৎকার সাদৃশ্য দেখা যায়। "পরীটিবি" শুনিলেই সেই শৈশবকালীন শ্রুত রূপকথার দৈত্য, পরী এবং পরীস্থানের কথা মনে পড়ে। আর "Witches Hill"-এর অর্থও "যাদুকরীর পাহাড়"। সুতরাং এই নামের কারণ অনুসন্ধান করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই মনে জাগরূক হয়।

উপরোক্ত ভাবের আবেশে একদিন আমি বন্ধুবর মিঃ শফীকের সহিত মহা তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলাম। তর্কের বিষয় ছিল এই যে, উক্ত উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ে কখনও দৈত্য-পরী অবস্থান করিত কিনা। এবং এখনও কি পরী-টিবিতে পরী বাস করে? অনেকক্ষণ তর্কের পর ধার্য হইল যে, আগামী-কল্য অতি প্রত্যুষে পরীটিবিতে বেড়াইতে যাওয়া হউক এবং এমন কোন অন্ধকার গুহার অন্বেষণ করা যাউক যদ্দ্বারা পরীস্থানে যাইবার পথ পাওয়া যায়।

পরদিন শফীক ও আমি প্রাতঃকালে ৫টার সময় পকেট ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে বিভিন্ন টিলা অতিক্রম করিয়া পরীটিবিতে পরীস্থানের কল্পনা করিতে করিতে রকউড কলেজের সন্নিহিত রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। আকাশ পরিষ্কার ছিল — একখণ্ড মেঘও ছিল না। আমরা এই হাজার দেড় হাজার ফিট উচ্চতায় দাঁড়াইয়া দৈত্যকুলের সম্মুখীন হইতে ও আবশ্যক হইলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। আমার বন্ধুটি (শফীক) স্বভাব-কবি, তিনি পথে কল্পিতা পরীদের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

রকউড কলেজের পশ্চাৎ দিক অতিক্রম করিয়া শেষে আমরা সেই সুউচ্চ পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া পড়িলাম। এই স্থান হইতে খাড়া চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। উঁচু নীচু আঁকাবাঁকা পথে ১৫ মিনিট পর্যন্ত উঠিবার পর ক্লান্তি বোধ হওয়ায় আমরা বিশ্রামার্থে থামিলাম। স্থানটি অতি সুন্দর। চতুষ্পার্শ্বস্থিত দৃশ্যাবলী অত্যন্ত মনোহর। চতুর্দিকে হরিৎ দূর্বাক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল, — পঞ্চাশ গজ দূরে পাদপ শ্রেণী ছিল। সেখানে গিয়া আমরা গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া সিগারের ধূম পান করিতে করিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আমার সিগারেট তখনও খাওয়া শেষ হয় নাই, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কেহ আসিয়া হাত দিয়া আমার চক্ষু ঢাকিল। আমি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "শফীক! তুমি কি ছেলেমী কর। এই কি তামাসা করিবার —" আমার মুখের কথা শেষ না হইতেই কিছু দূরে শফীকের কণ্ঠস্বর শুনিলাম, — "you are a fool শহীদ।" আমাকে "ফুল" বলা শফীকের উচিত কি অনুচিত তাহা ভাবিবার সময় ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, শফীকও ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। সর্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি যাহার প্রতি পড়িল, তাহা পঞ্চ পরীর একটি গুচ্ছ ছিল — সত্যিকার পরী। ঠিক তেমনই অবয়ব, তেমনই পোষাক,— যেরূপ গল্পে পাঠ করিয়াছি এবং ছবিতে দেখিয়াছি। নানাবিধ পরীর গল্পে এবং সেক্সপিয়ারের "Mid summer night's dream"-এ যাহা পাঠ করিয়াছি— সেই দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে আসিতে' বারম্বার চক্ষু রগড়াইয়া ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, "হে আল্লাহ্। ইহা স্বপ্ন দেখিতেছি, না আমি জাগ্রত।" *

ইতিমধ্যে জনৈকা পরী অগ্রসর হইয়া ইংরাজীতে দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল — "আপনারা এমন অসাবধানভাবে পরীস্থানের মহারাজা বখ্‌তু আজম শাহ-এর রাজ্যের অন্তর্গত উপত্যকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন কেন? আপনারা কি জানেন না যে, এ-স্থানটি আমাদের রাজকুমারী 'মমতাজ গুল'-এর বেড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে? তিনি মহারাজা বখ্‌তু আজম এবং মহারানী "মিহির গুল"-এর একমাত্র কন্যা।"

আমি ও শফীক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখ দর্শন করিতে লাগিলাম। ইংরাজী ভাষায় কথা বলে, এ কেমন পরী? আর ইহাদের এশিয়াই নামই বা কেন? হঠাৎ মনে পড়িল, পরীগণ সকল প্রকার ভাষা জানে। আর সম্ভবতঃ আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া আমাদের সম্বন্ধে ইহাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। আমি শশব্যস্তে টুপী খুলিয়া ইংরাজী ধরনে অভিবাদন করিয়া উত্তর দিলাম,— "সুন্দরী মহিলা! আমার বন্ধু মিষ্টার শফীক এবং আমি আপনাদের দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি এবং আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম যে, আমরা অজ্ঞাতসারে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করিয়াছি।

* পরীচিবিতে যাত্রার প্রারম্ভে শফীক বলিয়াছিলেন যে, আমরা দৈত্যদের সম্মুখীন হইতে এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলাম। এখন মাত্র পাঁচ জন পরীকে দেখিয়াই হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। দৈত্যের সহিত যুদ্ধ ত অনেক দূরের কথা।

যদি জানিতাম যে, এস্থান কাহারও নিজস্ব, তাহা হইলে কখনই এদিকে আসিতাম না, যদিও তাহাতে আমরা আপনাদের সহিত আলাপ করিবার সুখে বঞ্চিত থাকিতাম। যদি আপনাদের সঙ্গে রাজকুমারী মমতাজ গুল উপস্থিত থাকিয়া থাকেন, আমরা উভয়ে তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি,—যাহা প্রকৃত ভদ্রলোকের করা উচিত।"

প্রথমা পরী উত্তর দিল, — "এখন আপনারা এত সহজে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। রাজকুমারী এখানে উপস্থিত নাই ; কিন্তু অতি নিকটেই একটা পাহাড়ের উপর বিশেষ একটা সাম্বৎসরিক উৎসব করিতেছেন। আপনাদের উভয়কে তথায় যাইতে হইবে। রাজকুমারী স্বয়ং বিচার করিয়া যাহা বিবেচনা করিবেন, তাহাই মানিতে হইবে।"

আমরা উভয়ে একবাক্যে বলিয়া উঠিলাম "রাজী।" শাস্তির ভয় অপেক্ষা পরীদের উৎসব দেখিবার আগ্রহই বলবতী হইয়াছিল।

পরীগণ অগ্রসর হইয়া আমাদের চক্ষে রুমাল বাঁধিতে লাগিল, "ভদ্রলোকের ন্যায় আপনারা সসম্মানে শপথ করুন যে, পথে যাইবার সময় আপনারা কিছু দেখিতে চেষ্টা করিবেন না।" আমরা তাহাই করিলাম। এখানে আমাদের যাত্রা এইরূপে আরম্ভ হইল যে, এক পরী আমার দক্ষিণ হস্ত এবং অন্য পরী আমার বাম হস্ত ধরিয়াছিল, — সম্ভবতঃ এইরূপে দুই পরী শফীককেও ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমি কিছুই দেখি নাই, — কারণ দেখিবার অনুমতি ছিল না।

আমার বড় আশ্চর্য বোধ হইতেছিল যে, এ কেমন পরী যে উড়ে না এবং আমাদিগকেও উড়াইয়া না লইয়া পায়ে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। শরতের এই পরিষ্কার আকাশে উড়িতে বেশ লাগিত। কিন্তু কিছু বলিবার সাহস হইল না। কারণ ভয় ছিল যে, কোন প্রকার আপত্তি আমাদের শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া দিবে। প্রায় দশ মিনিট পরে সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, এখন আমরা রাজকুমারীর উৎসব-গৃহের নিকটে আসিলাম।

ক্রমে সঙ্গীত-ধ্বনি নিকটবর্তী হইলে উভয় পরী— যাহারা মুনকীর-নকীরের মত আমার দক্ষিণ ও বামে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে — আমার চক্ষু হইতে রুমাল খুলিল। দেখিলাম, অতি অপূর্ব দৃশ্য। পঁচিশ-ত্রিশজন পরী নানা রঙের পরিচ্ছদে সুশোভিতা হইয়া অতি নিপুণতার সহিত আধুনিক ইংরাজী নৃত্য "কন্ট্রেয়েট" নাচিতেছিল। তাহাদের মধ্যে হরিদ্বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া

একজন অসামান্যা রূপসী বালিকা ছিলেন। তাঁহার মাথায় মুকুট ছিল, যাহা মরকত-মণি দ্বারা ভূষিত বলিয়া মনে হইল। আলোক-রশ্মি সেই মণি-মাণিক্য-শোভিত মুকুটে পড়িয়া এক অভিনব আলোক-রাজ্য রচনা করিয়াছে। এদিকে তিন চারিজন পরী ধরাসনে বসিয়া বেহালা, সেতার, বাঞ্জো এবং ক্লারিওনেট বাজাইতেছিল। শফীক ও আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া এই সব দেখিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গিনী পরীগণও নৃত্যে যোগদান করিল।

পাঁচ ছয় মিনিট পর্যন্ত আমরা মুগ্ধ নেত্রে ঐ দৃশ্য দেখিবার পর কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য নৃত্যগীত থামিল। আমাদের সঙ্গে যে পরীরা আসিয়াছিল, তাহাদের একজন রাজকুমারীর দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল। তিনি মৃদুহাস্যে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ;—"আপনারা ভারী অন্যায়, এমন কি বড় ভারী অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন ; ইহার শাস্তিও তদ্রূপ কঠোর হইবে। অর্থাৎ আপনাদিগকে আমাদের সঙ্গে নাচিতে হইবে।"

চার্জ ফ্রেম করা ও সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা উভয়ে কাঠ হইয়া গেলাম। আমাদের জন্য এ শাস্তি বাস্তবিকই কঠোর ছিল। কারণ আমরা নাচিতে জানিলে ত নাচিব? আমি তাড়াতাড়ি সবিনয় করপুটে বলিলাম, —"সুন্দরী রাজকুমারী মমতাজগুল! আমার বন্ধু এবং আমি বড় দুঃখিত যে, আমরা নাচিতে জানি না। কিন্তু আমার বন্ধু গানে ওস্তাদ। আপনি যদি অনুমতি করেন, ত আমরা পালাক্রমে গাহিতে পারি।"

আমার কথায় পরিগণ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রাজকুমারী ভাল গান শুনিবার আশায় আমাদিগকে অগ্রিম ধন্যবাদ দিয়া ফেলিলেন। অতঃপর শফীক ও আমি বাদ্যকারিণী পরীদের নিকট গিয়া বসিলাম এবং পালাক্রমে হাফেজ, গালেব, খসরু এবং মীর সাহেবের কয়েকটা গজল গাহিলাম। প্রত্যেকটি গানের সমাপ্তিতে পরীগণ অতি জোরে করতালি দিতেছিল। অবশেষে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং আমি বলিলাম, — "মাননীয়া রাজকুমারী! এখন আমরা বিদায় হই।"

তখন সমস্ত গীত-বাদ্য থামিয়া গেল। রাজকুমারী সুমধুর মৃদু হাস্যে বলিলেন,—"মেসার্স শাহীদ এণ্ড শফীক! আমি মমতাজগুল এবং উপস্থিত পরীবৃন্দ আপনাদের উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনারা অতি সুন্দর গানে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা কি এখনও

রকউড কলেজের ছাত্রীবৃন্দকে এই সুন্দর ছদ্মবেশ ধারণের ও 'ফ্যান্সি ড্রেস পিক্‌নিক'-এর জন্য শুভইচ্ছা (মোবারকবাদ) জ্ঞাপন করিবেন না?" ইহা শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিলেন।

দ্বিতীয়বার আমরা পরস্পরের মুখ অবলোকন করিলাম — ইহারা তবে পরী নয় — সত্যিকার মানুষ। পরে আমরাও প্রাণ ভরিয়া উচ্চহাস্য করিলাম। পরে আমি বলিলাম, — "আমরা আপনাদিগকে একবার নয়, শত সহস্র বার মোবারকবাদ জানাইতেছি। আমরা আপনাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, আমাদের পরীচিবি ভ্রমণকে আপনারা আমাদের আশার অতিরিক্ত মনোরম করিয়া দিলেন।"

পরে আমি যখন আমাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলাম, তখন তাহারা খুব হাসিলেন। অতঃপর সকলের সহিত করমর্দন করিয়া এবং পুনরায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা বিদায় হইলাম॥ *

সওগাত
কার্তিক, ১৩৩৩

* কোন একখানি উর্দু পত্রিকা হইতে অনূদিত। — লেখিকা।

বলিগর্ত

(নির্জলা সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

কলেজ বন্ধ হইয়াছে। গরমের ছুটি। বারান্দায় বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি — কমলা দিদি হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আসিলেন। কমলা দেবী কংগ্রেস সেবিকা, চরকা ও খদ্দর প্রচার তাঁহার ব্রত। তাঁহার সঙ্গে জাহেদা বিবি নাম্নী একজন মুসলিম মহিলাও আসিয়াছেন। কমলা একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়াই বলিলেন, —"সব দেশ জয় করিয়াছি, এখন চল বলিগর্তে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে আবার কোথায়?"

জাহেদা উত্তর দিলেন, "সে আমার মামার বাড়ী, মামা নেই, এখন মামাতো ভাইদের রাজত্ব।"

আমি। বেশ ত, খুব সহজেই চরকার প্রচলন করিতে পারিবেন।

কমলা। ও হো! তুমি যত সহজ মনে করিয়াছ, তাহা নয়। সে গ্রাম অত্যন্ত দুর্গম, তাহার উপর সেখানে জাহেদার প্রবেশ নিষেধ।

আমি। তার অপরাধ?

কমলা। আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, একটু লেখাপড়া জানে, খদ্দর পরে, নিরামিষ খায়।

আমি। তা হ'লে নাই বা গেলে বলিগর্তে। বিশেষতঃ যাঁর মামাতো ভাই-এর বাড়ী, তাঁরই যখন প্রবেশ নিষেধ।

কমলা। তা কি হয়? আমি যে কমলা — সর্বত্র আমার অবারিত দ্বার। বিশেষতঃ ঐ প্রবেশ নিষেধ বলিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে। আর তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।

আমি। না ভাই। তোমরাই যাও।

কমলা। আ রে! তুমি না গেলে আমাদের আমোদ ভাল জমিবে না। চরকা চালাইতে পারিলে মিসিস্ খট্-খটেদের হাতের তৈরী সূতায় প্রস্তুত প্রথম খদ্দরখানা তোমাকে দিব। বলিগর্তের জমীদার খাঁ বাহাদুর কশাই-উদ্দীন খট্-খটের দেওয়ান মিস্টার জাহেরদার ফর্‌ফরে এখন কলিকাতায় আছেন। চল, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া আসি। ওঠ বীণা! লক্ষ্মীটি। চল শীগ্‌গীর।

অগত্যা আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিস্টার ফর্ফরের বাসায় গেলাম। তাঁহার আর দুইটি ভাইও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত আদর আপ্যায়নে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আমি মনে মনে আশ্চর্য হইলাম যে, এত আদর-যত্ন পাইয়াও কেন জাহেদা বিবি বলেন যে, মামাতো ভাই-এর বাড়ীতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ। হাঁ, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এই দেওয়ান মিস্টার জাহেরদার ফর্ফরে জমীদারের সহোদর এবং অপর দুই ভদ্রলোক তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই। ইঁহারা কেহই জমীদারীর অংশ পান নাই, মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

জাহেদা বলিগর্তে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র মিঃ ফর্ফরে প্রাণ খুলিয়া বলিলেন, — "হাঁ বুবু! চল। তোমার মামার বাড়ী, তুমি আমাদের নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখ? তুমি যখন বলিবে, আমি স্বয়ং আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব, আমি নিজে না আসিতে পারিলে ইহাদের (ভাইদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) দুই জনের এক জনকে পাঠাইয়া দিব। তুমি কখন যাইবে, বল? তুমি যে মুহূর্তে সংবাদ দিবে, তখনই ইহাদের কেহ আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে।

জাহেদা।—ভাই! আমি ত একা যাইব না; এই কমলা দিদি এবং বীণাপানি দেবীও আমার সঙ্গে যাইবেন। আমাদের সকলের পাথেয় ···

মিঃ ফর্ফরে।—কোন চিন্তা নাই, বুবু! তুমি দ্বিধা-সঙ্কোচ করিও না। চলুন সকলে, আমাদের মাথায় থাকিবেন। আপনাদের দেখিলে ভাই সাহেব অত্যন্ত সুখী হইবেন।

অতঃপর আমরা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মিঃ ফর্ফরে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। তিনি গুপ্তপুর জেলার টাউনে থাকেন। গুপ্তপুর হইতে বলিগর্ত চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরে। বলিগর্তে মিঃ খট্খটেকে এখনও আমাদের বিষয় জানান হয় নাই; জাহেদা মিঃ ফর্ফরের সঙ্গেই পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। যাইবার তারিখ ঠিক করিয়া জাহেদা বিবি মিঃ ফর্ফরেকে কোন ভাইকে পাঠাইতে লেখায় তিনি উত্তর দিলেন যে, তাহারা উভয়ে বলিগর্তে চলিয়া গিয়াছে, বকর-ঈদের পূর্বে ফিরিবে না; বিশেষতঃ এ সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় আছে। তাই খাঁ বাহাদুর খট্খটে কাহাকেও ঘরের বাহির হইতে দিবেন না। জাহেদা যদি অপর কাহারও সহিত গুপ্তপুর যান, তবে তিনি তথা হইতে সহজেই তাঁহাদিগকে বলিগর্তে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাঁহারা গেলে খট্খটে ভাই সাহেব বড়ই সুখী হইবেন।... ...

পরে জাহেদা লিখিলেন যে, পাথেয় পাইলে তাঁহারা রওয়ানা হইতে পারেন। উত্তর আসিল যে, তাঁহার ন্যায় দরিদ্র লোক অত টাকা কোথায় পাইবেন?

তবে খাঁ বাহাদুর খট্‌খটে ইচ্ছা করিলে ৫০০৲ টাকাও দিতে পারেন। যাহা হউক, জাহেদা ভাবিলেন, বলিগর্তে পৌঁছিলে আর টাকার অভাব হইবে না।

যথাসময় আমরা যাত্রা করিলাম। গুপ্তপুর যাইবার পূর্বে পথে বিষ্ণুগঞ্জে এক বন্ধুর বাড়ীতে এক সপ্তাহের জন্য অতিথি হইলাম। বিষ্ণুগঞ্জ হইতে গুপ্তপুর মাত্র ৮-১০ মাইলের পথ। লোকে দৈনিক দুই তিন বার যাতায়াত করে। বিষ্ণুগঞ্জে অবস্থিতি কালে আমরা জানিতে পারিলাম, মিঃ ফর্‌ফরে নিজকে বড়ই বিপন্ন মনে করিতেছেন; আর আমরা যাহাতে বলিগর্তে যাইতে না পারি, তজ্জন্য প্রাণপণে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লজ্জায় জাহেদা বিবির মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু কমলা বলিলেন,— "কিছুতেই ছাড়িব না — বলিগর্তে নিশ্চয়ই যাইব, যাই আগে গুপ্তপুরে। মিঃ ফর্‌ফরে তাঁহার ভ্রাতার এত প্রশংসা করিয়াছেন—এহেন ধার্মিক সাধক মহাপুরুষকে একবার দেখিতেই হইবে।"

অতঃপর আমরা গুপ্তপুরে গেলাম। কিন্তু জাহেদা বিবি আমাদের লইয়া অন্যত্র গেলেন — মিঃ ফর্‌ফরের বাড়ী যাইতে দিলেন না। দুই তিন দিন পরে ভদ্রতার অনুরোধে মিঃ ফর্‌ফরে আমাদের বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া দুই দিনের জন্য লইয়া গেলেন। তথায় মিঃ ফর্‌ফরে এবং তাঁহার স্ত্রী ডালিমকড়া আমাদিগকে বলিগর্ত সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা এই, —

এখন বলিগর্তে যাইবার কোন পথ নাই — খানা, ডোবা ইত্যাদি কাদায় পূর্ণ। জল প্রচুর নহে বলিয়া নৌকা চলিতে পারে না। পথ শুষ্ক এবং সমতল নহে বলিয়া পাল্কী ও মোটর চলিতে পারে না। পথের কোন স্থান আবার পাহাড়ের মত উচ্চ। লোকে গৌরীশঙ্কর আরোহণের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এখন কেহই বলিগর্তে অবতরণের চেষ্টা করিতে সাহস পায় না। সে অনেক কষ্ট— অনেক কষ্টে জেলে ডিঙ্গী বা অপর কোন বাহনে বলিগর্তের পত্রাদি শহরে আইসে। আপনারা পথের অত কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিবেন না। আর যদিই বহু কষ্ট করিয়া যান, তবে থাকিবেন কোথায়?

খাঁ বাহাদুর খট্‌খটের বিশাল প্রাসাদে ছাগল, গরু, ভেড়া, মুরগী ইত্যাদি

থাকে। অঙ্গনে দিনে দুপুরে সর্প-বৃশ্চিক কিল্‌বিল্‌ করে। সন্ধ্যার পরে এক জাতি পতঙ্গ উড়ে — তাহারা এমন দংশন করে— উঃ। হাত পা ফুলিয়া যায় আর চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে প্রাণ যায়। খাঁ বাহাদুর মশারির ভিতর বসিয়া ভাত খান— এই ত অবস্থা। আর তিনি স্বয়ং দোতলায় থাকেন। দোতলায় বেশী কামরা নাই যে, আপনাদের স্থান দিতে পারিবেন। তাঁহার তিন জন স্ত্রী তিন স্যুট ঘর দখল করিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই দোতলায় একরূপ বন্দী অবস্থায় থাকেন। মিঃ খট্‌খটেকে একটা চেয়ারে বসাইয়া বহির্বাটিতে লইয়া যাওয়া হয়। চাকরেরা তাঁহাকে চেয়ারে বহিয়াই ইতস্তত: লইয়া বেড়ায় — তিনি স্বয়ং কখনও মাটিতে পা রাখেন না। পাছে সাপে কামড়ায়! মিঃ খট্‌খটে পরম ধার্মিক— দিবানিশি কোরআন, হাদীস, তফসীর এবং তস্‌বীহ্‌ লইয়াই থাকেন — জমিদারী না দেখিলেই নয়, তাই অতটুকু সাংসারিক কাজ করেন। মুসলমান ধর্মীয় শাস্ত্রে সুদ প্রদান করা এবং গ্রহণ করা উভয়ই সমান পাপ। দরিদ্র প্রজাবৃন্দ অন্যত্র টাকা ধার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধার করে। তিনি অতি উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করেন; কারণ শাস্ত্রে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ; সুতরাং ধর্ম বিনিময়ে সুদ লইতে হয়; ধর্ম কি এমন সস্তা যে, তাহা অল্প মূল্যে বিক্রয় করা যায়? তাঁহার বাড়ীর সকলেই — বাঁদী, গোলাম পর্যন্ত অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক। তাহারা হাদীসের অতি অস্পষ্ট কিম্বদন্তীও অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন। কবে কোন্‌ কাফের জিহ্বা চাঁচিয়া কুল্লি করিয়াছিল, সেইজন্য সে বাড়ীর কেহ মুখ ধুইবার সময় জিব-ছোলা দ্বারা জিব পরিষ্কার করেন না।

জেহাদের পুণ্য অর্জনের নিমিত্ত তাঁহারা বাড়ীর দাসী এবং প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া নির্মমভাবে প্রহার করেন। পাঠিকা শুনিয়া আশ্চর্য হইতে পারেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আমলেও বহু দেশে "দাসী" আছে? ঐ সব দাসী প্রকাশ্য হাটে বাজারে ক্রীতা হয় নাই; ইহারা দরিদ্র প্রজার ঘর হইতে ছলে বলে কৌশলে ধরিয়া আনা দাসী। এইরূপে বাড়ীর বিবিগণ বাঁদী মারিয়া এবং খাঁ বাহাদুর প্রজা ঠেঙ্গাইয়া জেহাদের পুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন। কালে ভদ্রে যদি কোন দাসী কোন প্রকারে পায়খানার নর্দমা গলাইয়া পলায়ন করে, তবে তাহাতে খাঁ বাহাদুর বাঁদী "আজাদ" (অর্থাৎ মুক্তিদান) করার পুণ্য লাভ করেন।

পুণ্যশ্লোক খাঁ বাহাদুর অবরোধ প্রথারও ঘোর পক্ষপাতী। একবার

চিকিৎসার নিমিত্ত তিনি গুপ্তপুরে সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার কিশোরী বিধবা ভগিনী এবং কতিপয় ভাগিনেয়ী আবদার করিল যে, তাহাদিগকে একবার বাড়ীর মোটর গাড়ীতে করিয়া গুপ্তপুর শহরটা দেখাইয়া আনিতে হইবে। অগত্যা মোটর গাড়ীটা মোটা বোম্বাই চাদরে সম্পূর্ণ জড়াইয়া তাহার ভিতর বিবিদের বসাইয়া সমস্ত শহর ঘুরাইয়া আনা হইল। বেচারীগণ আবছায়ার মত সামান্য সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় নাই। তথাপি মিঃ খট্‌খটে তাহাদিগকে বলিলেন, "দেখ তোমরা মোটরে বেড়াইতে গিয়া অসংখ্য পুরুষের মুখ দেখিয়াছ সে জন্য এখনই আমার সম্মুখে 'তওবা' (অনুতাপ) কর এবং প্রতিজ্ঞা কর জীবনে আর কখনও মোটরে উঠিতে চাহিবে না।"

মিঃ জাহেরদার ফর্‌ফরে খাঁ বাহাদুর খট্‌খটের সহোদর ভাই কিনা, তাই তিনিও পরম ধার্মিক। শরিয়তের অতি তুচ্ছ কিম্বদন্তীও তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। তাঁহার মতে মানুষের ফটো তোলা ভয়ানক পাপকার্য। তিনি গুপ্তপুরের একটি অনাথ আশ্রমের সেক্রেটারী হইয়া বহু পুণ্য (ছোট লোকে বলে বহু টাকা) অর্জন করিতেছেন। আমরা পরম্পরে শুনিতে পাইলাম, একদা তিনি উক্ত অনাথ আশ্রমে বঙ্গের লাট বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লাট বাহাদুর বিদায় হইলে পর তাঁহার কতিপয় বন্ধু লাট সাহেবের সহিত তাঁহাদের একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করায় মিঃ ফর্‌ফরে বলিলেন, "তাই ত ভাই, এমন প্রয়োজনীয় কথাটা আমাকে একটু পূর্বে স্মরণ করাইয়া দিলে না। সমস্ত কার্যই হইয়া গেল, শুধু এই অত্যাবশ্যক কাজটি বাদ পড়িল। আজ এই মস্ত ভুলটার জন্য আমার কিরূপ আক্ষেপ হইতেছে, তাহা আমি কথায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না।" তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে জনৈক দুষ্টবুদ্ধি লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপস্থিত সমস্ত ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এতদিন আমরা জানিতাম যে, আমাদের বন্ধুবর মিঃ ফর্‌ফরের মতে মানুষের ফটো তোলা বেজায় অমার্জনীয় পাপ। কিন্তু আমাদের সে বন্ধুবরের মতেই দেখিতেছি যে, লাট সাহেবের ফটো তোলায় কোন পাপ নাই, বরং উহাতে পুণ্যার্জনই হয়।" (সকলের হাস্য।) নিমন্ত্রণের দিন লাট সাহেব মিঃ ফরফরের কাজের প্রশংসা করিয়া দু'ছত্র লিখিয়া গেলেন। মিঃ ফর্‌ফরে সেই দু'ছত্রের দম্ভে ফুলিয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেলেন। তিনি শুধু ফুলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বরং তিনি সেই দু'ছত্র লেখা অবলম্বনে একখানি

৮।১০ পেজী বই ছাপাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। অতঃপর সেই বই প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতে তাঁহার দুই দিন অফিস কামাই হইল। তিনি সকলের নিকট বলিতে লাগিলেন; "ম্যাজিষ্ট্রেট ? .... সে ত একজন petty officer। কমিশনর?...... সে ত একজন নগণ্য চাকর। আমি কি উহাদিগকে 'কেয়ার' করি? বরঞ্চ তাহারাই আমার সম্মান করিতে বাধ্য, কারণ আজকাল আমার পত্র-ব্যবহার (communication) স্বয়ং লাট বাহাদুরের সঙ্গে হয়।" ইত্যাদি।

মিঃ খট্‌খটে পুরুষের জন্য চারি বিবাহ করা অতি প্রয়োজনীয় "সুন্নত" মনে করেন; আর হিন্দুয়ানী সকল প্রথাকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু নিজের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বিধবা ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাবে এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, "আমরা যখন হিন্দুর দেশে আছি, তখন তাহাদের আচার নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য। কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিধবার বিবাহ হয় না।" ইত্যাদি।

খাঁ বাহাদুর স্বয়ং তিন স্ত্রীর ভার বহন করিতেছেন; চতুর্থ স্ত্রীর স্থান রিজার্ভ করা ছিল, একটি অসামান্য রূপসী জমিদার-কন্যার জন্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন দিন তিনি সুরার মত্ততায় বোতল হস্তে গুপ্তপুরের পথে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকেরা সেই কথাটুকু উপরোক্ত জমিদার-গৃহিণীকে বলিয়া দেয়। ফলে সে বিবাহ ফস্‌কাইয়া গেল। আজ পর্যন্ত তাঁহার চতুর্থা স্ত্রীর পদটা শূন্যই আছে; যেহেতু এখন (তিনি ব্যাধি-ভোগে চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায়) আর কোন 'চোক খাগী' তাঁহাকে কন্যা দানে সম্মত নয়।

খাঁ বাহাদুর খট্‌খটের ভুরি ভুরি গুণের মধ্যে একতম গুণ এই যে, তিনি অত্যন্ত বন্দোবস্তী লোক। বর্ষার সময় চা'ল, ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বাজারে সহজপ্রাপ্য নয় বলিয়া তিনি পূর্বেই সমস্ত জিনিস পর্যাপ্ত ক্রয় করিয়া রাখেন। ধান এত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে যে, পরে ধানের গাছ্ গজাইয়া সে গোলাটাই ধানের ক্ষেত হইয়া যায়। পেঁয়াজ ও নারিকেল গাছে দালানের প্রায় প্রত্যেক কামরাই পরিপূর্ণ। আলুর গাছ্‌গুলি ক্রমশঃ লতাইয়া মিঃ খট্‌খটের দোতালা পর্যন্ত উঠিয়াছে।

বলিগর্তের "ডব্লিউ. সি" (পায়খানা) সম্বন্ধে ভগিনী ডালিমকড়া (মিসিস্ ফর্‌ফরা) যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা নিতান্ত রুচি-বিরুদ্ধ বলিয়া

তৎসম্বন্ধে আমরা মসি কাগজ নষ্ট করিলাম না।

মিঃ খট্‌খটে সম্প্রতি আজরাইল নামক জনৈক হাকীমের চিকিৎসাধীন আছেন। হাকীম সাহেব প্রতি সপ্তাহে ২০০৲ টাকা দর্শনী পাইয়া থাকেন। শুনিয়াছি, এই চিকিৎসার ফলে খাঁ বাহাদুর অতি দ্রুতগতি 'মোকাম মাহ্‌মুদা' (স্বর্গের সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠের) দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার দ্রুত আরোগ্য কামনা করিয়া মিষ্টার ও মিসিস্‌ ফর্‌ফরার নিকট বিদায় লইয়া আসিলাম।

গাড়ীতে উঠিতে কমলা দিদি বলিলেন, "আচ্ছা দাদা! অপেক্ষা করুন! বলিগর্ত্তে যাইবার পথ যদি ধরাধামে না পাই, তবে কিছু কাল পরে আমরা এরোপ্লেন-যোগে আসিয়া একেবারে খাঁ বাহাদুর মিষ্টার কশাই-উদ্দিন খট্‌খটের দোতালার ছাদের উপর নামিব।"

নওরোজ
আশ্বিন, ১৩৩৪
মাসিক মোহাম্মদী
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

পঁয়ত্রিশ মণ খানা

কিছু দিন হইল মাসিক "সওগাত"-এর কোন সংখ্যায় "আশরাফ ও আতরাফ" শীর্ষক একটি ছবি দেখিয়াছিলাম। ছবির বিষয় এই যে, আশরাফ ঘৃণায় নাক সিটকাইয়া আতরাফকে বলিতেছেন,—"তুমি দূরে থাক, আমার নিকট আসিও না।" আশরাফের এই ব্যবহারে বড্ড রাগ হইল—এত বড় আস্পর্ধা! মানুষকে ঘৃণা! ইচ্ছা হইল, তখনই আশরাফদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দেই। কিন্তু তাহাতে একটু অসুবিধা ছিল। অসুবিধা এই যে, আমি নিজে আশরাফ-এর তালিকায় নাম লিখাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং জেহাদ ঘোষণা করিলে যদি প্রথম তরবারি আমারই গলায় পড়ে তবে সে সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা-আকাঙ্খা সবই সাফ হইয়া যাইবে।

তখন আমার চেষ্টা হইল, আশরাফদের গর্ব খর্ব করিয়া তাহাদিগকে আতরাফের সংগে একাসনে বসাইয়া এক পংক্তিতে ভোজন করান যায় কিনা। তাহাতেও ছিল একটা বাধা। তাহা এই যে, সেরূপ ভোজের আয়োজন করিতে হইলে আমাকেই গাঁটের পয়সা খরচ করিতে হয়। আমি স্বয়ং উভয় দলকে নিমন্ত্রণ করিলে তবে ত তাহাদের একাসনে বসাইতে পারি? কিন্তু শুকুর আলহামদু লিল্লাহ্! একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। ১১ই শরীফের দিন (অর্থাৎ রবিউস্‌সানি চাঁদের ১১ই তারিখে) মল্লিকপুরে বড় ধুমধামের সহিত মৌলুদ শরীফের ভোজ হইয়া থাকে। মল্লিকপুর কলিকাতা হইতে রেলযোগে মাত্র অর্ধ ঘন্টার পথ। কলিকাতা হইতে পীর, ফকীর, আতরাফ, আশরাফ ইত্যাদিতে ট্রেন বোঝাই-করা লোকে সেখানে যায়। দিনের সময় মৌলুদ শরীফ শ্রবণ ও বিনা পয়সায় ভোজন আর রাত্রিকালে আতসবাজী দর্শন—সুতরাং মল্লিকপুর সে সময় লোকে লোকারণ্য। গত ১১ই শরীফের দিন আমিও গেলাম।

মৌলুদ শরীফ শ্রবণের পালা নির্বিঘ্নে নীরবে শেষ হইল--এখন ভোজের পালা। আয়োজনকারী মতওয়াল্লিগণ পাকা মুসলমান—তাঁহারা আতরাফ ও আশরাফ নির্বিশেষে শুধু এক পংক্তিতে নয়—একাসনে, শুধু একাসনেও নয়—

এক বাসনে ভোজন করেন। আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এইরূপ একটা একাকার মিলনের দৃশ্য দেখাই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাহবা! শুধু মেথর-চামারে এবং ভদ্রলোকে নয়—স্ত্রী-পুরুষেও অবাধ মিশামিশি। অবশ্য হিংস্থটে আশরাফ্ ললনাগণ নিজেদের একঘরে করিয়া দোতলায় চিকের অন্তরালে লুকাইয়াছিলেন।

মন-ভরা ডেগের পর ডেগ নাচিতেছে; বাবুর্চিগণ সকলকে দুই হাতে খানা বিতরণ করিতেছে। তথাপি আতরাফ্ নরনারী গৃধিনী-শকুনির মত ডেগের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দু'হাতে খানা লুট করিতেছে। খানা লুকাইয়া রাখিবার পাত্র — পায়খানার বদনা, পুরাতন টিন ও পরিত্যক্ত মাটির হাঁড়ি! শেষে বাবুর্চিগণ ক্লান্ত হইয়া দোহাই দিল যে, মতওয়াল্লি সাহেবগণ আসিয়া না দাঁড়াইলে তাহারা ডেগের ঢাকনা তুলিবে না। তাঁহারা আসিয়া পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ডেগ ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাড়াহুড়া খাইয়া পুরুষেরা সরিয়া পড়িল। কিন্তু আতরাফ্ বীর নারীগণ মতওয়াল্লিদের বগলের নীচ দিয়া যাইয়া যে কোন নোংরা বাসনে ডেগের খানা লুটিতে লাগিল। এক একবার খাদেমগণ তাহাদের বাসন কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে—বীরবালা আবার সেই কাদামাখা বাসন কুড়াইয়া লইয়া খানায় ডুবাইয়া দিতেছে!!

তাহার পর দোতলার চিকের অন্তরালের দৃশ্য দেখুন। তখন ভরা বর্ষাকাল—সুতরাং কাদার অভাব নাই। আতরাফ্ কুল কামিনীগণ নোংরা কাদামাখা পায় আশরাফ্ বিবিদের হাত-পা, কাপড়, বোর্কা মাড়াইয়া তাঁহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহাদের নগ্ন শিশুগণ যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে—কিন্তু কেহ একটু আপত্তির 'উঁহু' পর্যন্ত বলিতেছেন না; কারণ, অদ্য এমন মোবারক দিন—১১ই শরীফ। এক একবার সিঁড়ির উপর ইতর-ভদ্র—সকল প্রকার পুরুষ মানুষেরা আসিয়া বিবিদের একনজর দেখিয়া যাইতেছে—ইহাতেও কাহাকেও আপত্তি করিতে দেখিলাম না। (বিবাহ বাড়ীতে এবং মহররমের সময় ইমামবাড়ায় বিবিরা পুরুষদের ধাক্কা-ধাক্কিও খাইয়া থাকেন, ইহাতে "মোল্লা-ই-পর্দার" অবমাননা হয় না।) অতঃপর ভোজনের পালা। আতরাফ্ কামিনীগণ যথাসাধ্য পোলাও, কালিয়া, কাবাব, রুটি, জরদা, ফিরনী লুটিয়া লইবার পর এখন উপরে আসিয়া বিবিদের সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া গেল। সকলে একাসনে বসিয়া একই বাসনে বসিয়া খাইবে। বড় বড় সেনীতে

৩৫—

মধ্যস্থলে খানিকটা খানা—সেই সেনীর এক একটির চারিদিকে ঘিরিয়া চার-পাঁচজন করিয়া খাইতে বসিয়াছে। জানি না, ইহা সেই কাদামাখা বাসনের লুট-করা খানার অবশিষ্ট খানা, না অপর কোন সদ্য তৈয়ার খানা ছিল। যাহা হউক, খাওয়া আরম্ভ হইল—ছেলেদের নোংরা হাত, কাহারও নাক বাহিয়া শ্লেষ্মা পড়িতেছে, কাহারও কান বাহিয়া পুঁজ পড়িতেছে, কেহ খাইতে খাইতে হাঁচিতেছে, কেহ কাশিতেছে। সোবহান আল্লাহ! আতরাফ্ ও আশরাফের কি অপূর্ব মিলন!! ছেলেদের মূত্রত্যাগেরও বিরাম নাই। এইরূপে হাঁচি ও কাশির মধ্যে খানা খাওয়া শেষ হইল।

শুনিয়াছি, এইরূপ ভোজনের ফলে 'ময়মন' বিবিরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ছয়-সাত মাস রোগ ভোগ করিয়া থাকেন। রোগ ভোগ না করিলেই আশ্চর্যের বিষয় হইত। অনেকে যে ছয় মাস পরে সারিয়া উঠেন, তাহাও কপালের জোর বলিতে হইবে।

রাত্রি ১১টা পর্যন্ত মিলন-উৎসব এবং আতসবাজী দেখিয়া আমি স্টেশন অভিমুখে চলিলাম। পথে কয়েকজন মতওয়াল্লি সাহেবের সহিত দেখা হইল; তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলেন,— "দেখিয়ে না, পঁয়ত্রিশ মণ খানা ইস্তরেহ সে লুট হো গয়া; ইস্ ওয়াক্ত হাম্ লোগোঁকো ওয়াস্তে, এক চাওল বাকী নেহী রহা! আব খানা ফের পাকে গা, তব হাম্ লোগোঁকো নসীব হোগা।"

আমি শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া আর অধিক দূর যাইতে পারিলাম না,—বড্ড ক্লান্ত ছিলাম। মওলা আলীর দরগাহে আসিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িলাম, দরগাহ্ওয়ালা তাড়া দিয়া বলিল, "এটা হোটেল নয়; যাও ইটালী বাজারের বারান্দায় শোও গে।" আমি বলিলাম, "না বাপু! আমি আর উঠিতে পারিব না—বিশেষতঃ আমার পেটে তখন পঁয়ত্রিশ মণ খানার বোঝা; তাহা লইয়া আমি একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছি।" যাহা হউক, দরগাহ্ওয়ালার সহিত কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর আমি সেইখানে শুইয়া পড়িলাম। মল্লিকপুরের কথাই ভাবিতে ভাবিতে চাহিয়া দেখি কি,—

(১) এক বিরাট মিছিল যাইতেছে; হাতি-ঘোড়া, আসা-বরদার, সোটা-বরদার, তাহাদের হাতে সোনার আসা ও সোটা। হাতির উপর জড়াও হাওদা, তাহাতে জরির পোশাক পরা এক সুপুরুষ ছিলেন; হাতির উপর আরও অনেক জরীর পোশাক পরা লোক ছিলেন। (২) তাহার পর আর এক মিছিল—ইঁহারা উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় খুব জমকাল পোশাক পরিয়া সওয়ার

ছিলেন, ইঁহাদের সঙ্গে চাঁদির আসা ও সোটা ছিল। অতঃপর ৩নং মিছিল, ইঁহাদের পোশাক সাদাসিধে ছিল, ঘোড়াগুলিও দুর্বল (নেহরু-মিছিলের ঘোড়ার মত) 'মর কটুয়া'। সঙ্গে বরকন্দাজ আর আসা-সোটাও নাই। অনন্তর দেখি (৪) এক ব্যক্তি সামান্য ময়লা পোশাক পরিয়া একটা আধমরা ঘোড়ায় চড়িয়া অতি ধীরে ধীরে একা যাইতেছেন। তাঁহার চেহারা অতি সুন্দর, কিন্তু মনে হইল যেন তিনদিনের উপবাসী। (৫) সর্বশেষে দেখি, এক বৃদ্ধ ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় পরিয়া পদব্রজে যাইতেছেন—"জীর্ণ-শীর্ণ, রুগ্নকায়, মলিন বদন; শতগ্রন্থি বাসে করি অঙ্গ আবরণ।" মনে হইল, তিনি কোন দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ হইতে আসিয়াছেন, হয়ত মাসাধিককাল হইতে অন্ন জোটে নাই। তিনি অতি কষ্টে খালি পায় রেল লাইনের বন্ধুর পথে চলিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মল্লিকপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

সকলে অদৃশ্য হইলে আমি একজন পথিককে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, ১নং মিছিলে গেলেন দেশের যত পীর-মোরশেদ যথা—গাজী, মাদার, সত্যপীর ইত্যাদি। দেশের লোকে তাঁহাদের পূজা করে, এইজন্য তাঁহাদের এত সমৃদ্ধি। তাঁহারা তাই হীরা জওয়াহেরাতে সাঁতার দেন। ২ নং মিছিলে যত আউলিয়া ছিলেন, দেশের লোকে তাঁহাদের পূজা করে; দেখ না, এখানে এক দরগাহ, সেখানে এক দরগাহ, তবে প্রথমোক্তদের চেয়ে একটু কম। ৩ নং মিছিলে ছিলেন যত পয়গাম্বর; তাঁহাদের ত এদেশের লোকে তত মানে না, তাই তাঁহাদের ঘোড়াগুলি দানা পায় না। ৪ নং ব্যক্তি একা যাইতেছিলেন, তিনি ছিলেন আমাদের আখেরী জামানার পয়গাম্বর মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হিস্ সালাম। তাঁহাকে ত এ-দেশের লোকে মানে না, তাই তিনি খাইতে-পরিতে পান না। ৫ নং লোকটি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ মিয়া (নাউজ বিল্লাহি মিন্‌হা)। সে বেচারাকে ত আমরা ভুলিয়াও কখনও মনে করি না, কাজেই তাঁহার এইরূপ দৈন্য। আমি অবাক হইয়া আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতে ছিলাম, এমন সময় আজান-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল—"আল্লাহু আকবর।" আমি জাগিয়া দেখি, সেই বারান্দায় মাটিতে শুইয়াই আছি। তাই ত, মওলা আলী দরগাহে শুইয়া ছিলাম বলিয়া পীর-পয়গাম্বরদের স্বপ্নে দেখিলাম।

মাসিক মোহাম্মদী
চৈত্র, ১৩৩৫

বিয়ে-পাগলা বুড়ো*

শুনিয়াছি, সারদা বিল পাসের সঙ্গে সঙ্গে "কচি মেয়ের সহিত বুড়ো বরের বিবাহ নিষিদ্ধ" বলিয়া আর একটি বিল পাস হইবার কথা ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিল পাশ হইলে শরিয়তের নামে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হইত কিনা, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। অদ্য দুই তিন জন বিয়ে-পাগলা বৃদ্ধের বিবাহের ইতিহাস পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিব। আশা করি, ইহা পাঠে তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

১

পূর্ববঙ্গের একটি পল্লীগ্রামে একজন সত্তর বর্ষীয় বর ক্রমে সাতজন বিবিকে নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিয়া অষ্টমবার বিবাহ করিতে চাহিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকেরা বেচারার দুর্ণাম রটনা করিয়াছিল যে, বুড়াটা বউ-খেকো; কাজেই আর কেহ তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত হয় না। মাতবর সাহেব বৃদ্ধ হইলেও বিবিধ খেজাবের কল্যাণে তাঁহার মাথার চুল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল; দাড়ি-গোঁফ কলপ-রঞ্জিত করিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণ মুখশ্রী বেশ সুন্দর করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নগদ টাকাও যথেষ্ট আছে। বাক্স-ভরা রূপার গয়না, একটা সোনার সিঁথি এবং হলুদী মাক্‌ড়ী, সিন্দুক-ভরা কাপড়, তবু কোন হতভাগা তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত নয়।

অবশেষে পাড়ার কতিপয় যুবকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহারা বহু কষ্টে একটি পাত্রী ঠিক করিয়া মাতবর সাহেবকে জানাইল যে, কুমারী মেয়ে পাওয়া গেল না; একটি বাল-বিধবা আছে। বয়স একটু বেশী, ২২।২৩ বৎসর, আর একটু হৃষ্ট-পুষ্ট লম্বা গোছের মেয়ে। তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা ভালই, কুমারী যখন পাওয়া যায় না, তা আর কি করা।"

ঘটকেরা বলিল, "বিধবা বটে, তবে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, ছয়মাস পরেই বিধবা হইয়াছিল। তদবধি পিতামাতার অন্ন ধ্বংস করিতেছে; এখন মুরুব্বিরা তাহাকে পাত্রস্থা করিতে চায়। যদি আপনি পছন্দ না করেন, এ তবে সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।"

* অবিকল সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সোৎসাহে বলিলেন, "না, না, এ-সম্বন্ধ ছাড়া হইবে না। বয়স একটু বেশী হওয়ায় সুবিধাই হইবে, ভালমতে ঘর গেরস্তি করিতে পারিবে।"

যথাকালে মাতবর সাহেব বরবেশে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। বিবাহ বেশ ঘটা করিয়া হইতেছে। ঘটকেরা তাহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া খুব ধুমধামের সহিত আয়োজন করিয়াছে।

ক'নের সম্পর্কের এক নানী এবং পাড়ার ছেলের দল বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া আচার-পদ্ধতি পালন করিতেছে—এ নিয়ম, সে নিয়ম, নিয়ম আর শেষ হয় না। ছোকরাগুলি মুখ টিপিয়া হাসে, আর ফিস্ ফিস্ করিয়া নানীবিবির সহিত কথা কহিয়া সেই উপদেশ-মত কাজ করে। বরের সম্মুখে বড় মোটা খেরুয়ার পর্দা, সেই পর্দার অপর পার্শ্ব হইতে স্ত্রীলোকদের চাপা হাসি শোনা যাইতেছে। বর অধীরভাবে শুভদৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; বিলম্বের জন্য মনে মনে গ্রাম্য আচার-পদ্ধতির মুণ্ডপাত করিতেছেন। তিনি পার্শ্বোপবিষ্ট ক'নের অলঙ্কারের মৃদু ঝনঝনি শুনিতেছেন; আর সতৃষ্ণ নয়নে ক'নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পাত্রীর হাত-পা সব মোটা বানারসী শাড়ীতে ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না; কেবল ক্রেপের ওড়নার ভিতর হইতে বাদলা জড়ানো স্থূল ও সুদীর্ঘ চুলের বেণী দেখা যাইতেছে। চুলের বেণীটা ক'নের পিঠ বাহিয়া ফরাশের উপর পড়িয়াছে। বৃদ্ধ মনে মনে ভারী সন্তুষ্ট যে, আর কিছু না হইলেও আমার বউ যেন কেশর-রানী! এ গ্রামে এমন ঘন লম্বা চুল আর কার আছে?

অনেকক্ষণ প্রাণঘাতী ধৈর্যের পর দর্পণ আসিল, এখন শুভদৃষ্টি। অবগুণ্ঠন তুলিবার সময় পর্দার অপর পার্শ্বস্থিত চাপা হাসি কলহাস্যে পরিণত হইল, এদিকে বৃদ্ধ চমকাইয়া উঠিলেন;—বউএর মুখে ইয়া দাড়ী, ইয়া গোঁফ! বউ খিল খিল করিয়া হাসিয়া এক টানে মাথার পরচুলাটা খুলিয়া বরের সম্মুখে রাখিল। হতভম্ব বর তখন দাড়ি-গোঁফশোভিত ক'নেকে চিনিলেন যে, সে তাহার সম্পর্কের নাতি কালুমিয়া। সে দন্ত বিকাশ করিয়া বলিল, "নানা ভাই! শ্যাষে আপনে আমাইরে বিয়া করলেন?" মাতবর সাহেব অতি ক্রোধে কি বলিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, "তোমরা যে এমন নাদান, তা জানতাম না।" আর সক্রোধে সেই বাদলা জড়ানো সুন্দর বেণীটাকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন। পরে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

২

পাটনায় এক ৬৫/৭০ বৎসরের কাজী সাহেব ক্রমাগত কয়েকটি স্ত্রী বিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করিতে চেষ্টা করিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও "জরু-খাওকা" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সহজে আর জরু ধরিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহার মেহদী-রঞ্জিত দাড়ির জালে কোন সুন্দরীই ধরা পড়িল না।

অবশেষে কয়েকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপরোক্ত কাজী সাহেবের জন্য ঘটকালী করিবার নিমিত্ত আসরে নামিলেন। কন্যা সহজে পাওয়া যায় না; কারণ শহরে যে কয়টি বিবাহ-যোগ্যা পাত্রী ছিল, তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বহু অর্থব্যয়ে একজনের ১০ম বর্ষীয়া কন্যা সংগ্রহ করা গিয়াছে। কন্যা-পক্ষকে ছয় সাত মাস পর্যন্ত অনেক পর্বী-তেহারী দিতে হইল; চাকরদের বখশিশ দিতে হইল।

এই প্রকারের অনেক খরচ-পত্র, কাণ্ড-কারখানার পর কোন এক শুভ দিনে বিবাহের তারিখ ধার্য হইল। যথাকালে বর প্রাঙ্গণে শামিয়ানার নীচে আনীত হইলেন। এই বিবাহ-সভায়ও এ রছম সে রছম নানাবিধ মেয়েলী রছম (অর্থাৎ স্ত্রী-আচার) শেষ হইলে পর বর ক'নের শুভদৃষ্টি হইবার সময় প্রভাত হইয়া গেল। বর সানন্দে দেখিলেন, বালিকা বধূর কপালে নানাবিধ রঙ্গের চাঁদ-তারা চুমকি আঁটা হইয়াছে, গাল দুটি আফ্‌সা জড়িত হইয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে। সে কি সুন্দর। বধূর সৌন্দর্য উথলিয়া পড়িতেছে। পাটনার নিয়ম-অনুসারে ক'নেকে একজন মিরিয়াসিন* কোলে তুলিয়া লইয়া বাসর-ঘরে চলিল, বরের আচকানের সম্মুখের দামনের সহিত ক'নের বানারসীর দোপাট্টার এক কোণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। বর সেই গ্রন্থি ধরিয়া ধীরে ধীরে পাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সহসা পাত্রী মিরিয়াসিনের কোল হইতে লাফাইয়া নামিয়া দিল দৌড়। বেচারা কাজী সাহেবের হাতে ক'নের ওড়নার কোণের গ্রন্থি ছিল, সুতরাং অগত্যা তাহাকেও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে হইল। দৌড়াইবার নির্দিষ্ট পথ পূর্ব

* মিরিয়াসিন এক প্রকার গায়িকা বিশেষ; ইহারা পুরুষের মজলিসে গীতিবাদ্য করে না। কেবল মেয়ে-মহলে বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া নাচগান করে এবং বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে স্ত্রী-আচার পালন করে।

হইতেই ঠিক করা ছিল; তদনুসারে পায়ের অলঙ্কারসমূহ ছড়া, মল, ঘুঙুর, পরিছম, পা-জেব ইত্যাদি ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল, বাহিরের পুষ্করিণীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া,—সেখানে রাখাল ছোকরাগুলি করতালি দিয়া তাহাদের পিছু পিছু ছুটিল। পরে বাগানে দৌড়াইতে গেল, সেখানে মালীরা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতঃপর পাত্রী গেল নহবৎখানায়, সেখানে বাজনদারেরা তবলা সারেঙ্গী বাজাইয়া গান করিতেছিল। তাহারা করতালি দিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিল, "বাঃ বেটি বাঃ! দৌড়তি হুয়ী দুল্‌হিন্‌ তোমহে মোবারক বড়ে মিয়াঁ! আজী ভাগতী হুয়ী দুল্‌হিন্‌ তোমহে মোবারক বড়ে মিয়াঁ!!"

চারিদিকে খুব খানিকটা চক্কর দিয়া ক'নে গিয়া উঠিল কর্তার বৈঠকখানায়। সেখানে অনেক সাহেব-সুবো অভ্যাগত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হাসিয়া আকুল—লুটাপুটি। তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাত্রী একে একে তাহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। বানারসী শাড়ী দোপাট্টা সব খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল যে, একটি দিব্যকান্তি বালক!! আহা বেচারা কাজী সাহেব!

৩

ভাগলপুরের এক স্টেশন-মাস্টার বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র ইত্যাদি বর্তমানেও পঞ্চম বার বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি এখন স্টেশন-মাস্টারের কাজ হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি মুজফ্‌ফরপুরের অধিবাসী। বহুকাল ভাগলপুরে ছিলেন বলিয়া সেখানকার লোকেরা তাহাকে বিলক্ষণ চিনে এবং তাঁহাকে স্টেশন-মাস্টার বলিয়া ডাকিতেই ভালবাসে।

মুজফ্‌ফরপুরে খাঁ সাহেবের পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। স্ত্রী-পুত্র সেইখানেই থাকে। তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার সময় ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছিল। সুতরাং তাহাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর সময় মেয়েরা বিবাহিত ছিল, কিন্তু ছেলেদের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং ছেলেদের বিয়ে-থা দিবার সময় কুটুম্ব সাক্ষাতের সমাদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবার জন্য নিতান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের গৃহ যখন বধূ, জামাতা, বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র, দৌহিত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ সেই সময় তাঁহার তৃতীয় খানম দেহত্যাগ করিলেন। এবার তাঁহার

বন্ধুরা বলিলেন, "দুই-চার বৎসর পরে পৌত্রের বিবাহ দিয়া বধূ আনিবেন, নিজে আর বিবাহ করিবেন না।" কিন্তু খাঁ সাহেব বলিলেন, "ঘর সামলাইবে কে? বড় বউ, মেজ, সেজ এবং ছোট বউ এরা তিন চারি বা ততোধিক সন্তানের মাতা হইয়াছে সত্য; কিন্তু হাজার হউক তবু তাঁহারা ছেলে মানুষ বই ত নয়। এত বড় সংসার দেখিবে কে?" বন্ধুদের সহানুভূতি না পাইয়া শেষে তিনি অতি গোপনে এক দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে পত্নীরূপে ঘরে আনিলেন। বউয়েরা সে সময় পিত্রালয়ে গিয়াছিল, বাড়ীতে কেহ ছিল না।

বউয়েরা বাড়ীতে আসিয়া জানিতে পারিল যে, তাহাদের নতুন শাশুড়ী আসিয়াছেন। তাহাদের দেখিয়া শাশুড়ী তাড়াতাড়ি কামরার দ্বারে অর্গল দিলেন। বউয়েরাও আড়ি পাতিয়া রহিল। যেই একবার দ্বার খুলিল, অমনি সেজ বউ একেবারে শাশুড়ীকে কোলে তুলিয়া আনিয়া বারান্দায় তক্তপোষের উপর বসাইয়া দিল। ছেলেমেয়ের দল দুলাইন দেখিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল, এ বলে "দুলাইন দাদী", ও বলে "দুলাইন নানী।"

ফল কথা, চতুর্থা খানম মোটেই ঘর সংসার দেখেন না, কেবল পৌত্রী দৌহিত্রীদের সঙ্গে তাশ খেলে আর গল্প করে। এই জন্য খাঁ সাহেবকে পঞ্চম বার বিবাহ করিতে হইতেছে। পোড়া মুজফ্ফরপুরে বিবাহের সুবিধা না হওয়ায় তিনি সহানুভূতি ও সহৃদয়তা, দু'ই পাইলেন।

যথাসময় খাঁ সাহেবের বিবাহ হইয়া গেল, শুভদৃষ্টিও হইল। বাসর-ঘরে পাত্রীকে লইয়া যাওয়া মাত্র তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। সেবা শুশ্রূষার জন্য স্ত্রী লোকেরা আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, কাজেই খাঁ সাহেবকে বাহিরে যাইতে হইল।

খাঁ সাহেব কয়েক দিন শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া শেষে অন্যত্র বাসা লইলেন। ইতোমধ্যে তিনি আর একবারও নববধূকে দেখিতে পান নাই, কারণ সর্বক্ষণ হাকীম, ডাক্তার ও স্ত্রীলোকদের ভিড় থাকিত।

অবশেষে স্থির হইল যে, দুলাইনের পারিবারিক হাকীমের চিকিৎসা হইবে। সেজন্য প্রতিদিন সকালে হাকীম সাহেবের নিকট বধূর কারুরা * পাঠাইতে হইবে। চাকর-বাকর ঠিকমত কথা শুনে না, কারুরা নিয়মমত হাকীমের নিকট প্রেরিত না হওয়ায় রোগ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অগত্যা খাঁ সাহেব নিজেই

* কারুরা—মূত্র। আর যে কাচের পাত্রে এ জিনিসটা পরীক্ষার নিমিত্ত রাখা হয়, তাহাকে কারুরা বলে।

প্রতিদিন সকালে আসিয়া কারুরা লইয়া হাকীম সাহেবের নিকট যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে।

হাকিম সাহেব প্রত্যহ স্মিতমুখে ৫৲ দর্শনী লইয়া কারুরা দেখিতেন। আর দুলাইনের আরোগ্য বিষয়ে খাঁ সাহেবকে আশ্বাস দিয়া নানাবিধ দুর্মূল্য ফল—যথা, আঙ্গুর, বেদানা, বিহী—বিশেষতঃ যে সকল ফল তখন ভাগলপুরে পাওয়া যাইত না, তাহারই ব্যবস্থা করিতেন। খাঁ সাহেব জগৎ ছানিয়া সেই সব ফল পথ্য আনাইয়া শ্বশুর বাড়ীতে হাজির করিতেন।

এইরূপে প্রায় দুই মাস অতীত হইলে একজন চাকর একটু রুক্ষ্মভাবে খাঁ সাহেবকে বলিল, "কি আপনি রোজ রোজ কারুরা লইতে আসেন? এখানে আর কারুরা নাই, আমাদের সকলেরই কারুরা পরীক্ষা করা হইয়া গিয়াছে। আর দরকার নাই।" তিনি তখন একবার অন্দরে গিয়া দুলাইনকে দেখিতে চাহিলে, সে বলিল, তাঁহার দুলাইন বলিয়া কোন পদার্থ এ বাড়ীতে নাই।

এ কথা শুনিয়া খাঁ সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি আত্মসংযম করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে যে গোন্দম রঙের ভোলী ভোলী পেয়ারী সুরত দেখিয়াছি, সে কে?" উত্তর হইল, "সে বাজারের অমুক নর্তকী ছিল, সেদিন সে ভাড়ায় আসিয়াছিল—চলিয়া গিয়াছে।"

খাঁ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জনৈক উকিলের নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন যে, এইসব বেঈমান দাগাবাজদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা করা যায় কিনা। উকিল সাহেব সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনার লাঞ্ছনা যথেষ্ট হইয়াছে; এখন আদালতে নালিশ করিয়া আরও খানিকটা লাঞ্ছনা কিনিয়া অর্থ নষ্ট করিতে চাহেন কি? আপনি বরং ভালয় ভালয় দেশে ফিরিয়া যান।"

বৃদ্ধ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "জরা খেয়াল করনে কি বাত—মেরা চার হাজার রুপেয়া বরবাদ হুয়া—কোয়ী হাতভী না আয়ী, আওর মালাউন বদ বখ্‌তোঁনে মুঝসে নওকরোঁকো কারুরা তক ঢোলায়া! হু—হু—হু!!"

মাসিক মোহাম্মদী
পৌষ, ১৩৩৭

ক বি তা

সূচী

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	বাসি ফুল	...	...	৫৫৭
২।	শশধর	...	...	৫৬০
৩।	নলিনী ও কুমুদ	...	...	৫৬২
৪।	কাঞ্চনজঙ্ঘা	...	...	৫৬৫
৫।	সওগাত	...	...	৫৬৭
৬।	আপীল	...	...	৫৬৮
৭।	নিরুপম বীর	...	...	৫৭০

বাসি ফুল

"পিসীমা! তোমার তরে আনিয়াছি ফুল,"
এত বলি' আসি' ছুটি' হাতে দিল ফুল দু'টি
চেয়ে' দেখি, আনিয়াছে দু'টি বাসি ফুল।

"পিসীমা! তোমারি তরে এনেছি এ-ফুল।"
সকালে কাননে গিয়ে বাসি ফুল কুড়াইয়ে
পিসীমারে দিতে এসে হাসিয়ে আকুল।

"পিসীমা! তোমার তরে আনিয়াছি ফুল।"
শুনে সে বচন-সুধা দূরে গেল তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য একাকার হয়ে গেল ভুল!

মরি! সে স্বর্গের শিশু মরতে অতুল!—
তাহারে স্মরিয়া তাই আপনা ভুলিয়া যাই,
কোন্ বিধি গ'ড়েছিল সে ননী পুতুল?

কি দিয়ে কে গ'ড়েছিল সে প্রেম-মুকুল?
ইন্দ্রধনু-বর্ণ দিয়ে চন্দ্রিকা-লাবণ্য নিয়ে
পারিজাত-গন্ধ দিয়ে মানিক অতুল?

ললিত রাগিণী নহে তার সমতুল,—
নহে সুখস্বপ্ন-সম, নহে ধন-রত্ন-সম,—
সে ত নহে বসোরার গোলাপ-মুকুল!

তুলনার উপযুক্ত নহে—সে অতুল!
তার সেই উপহার, কি দিব তুলনা তার?
কোটি কোহিনূর নহে তার সমতুল।

প্রেমের সে উপহার জগতে অতুল।
কোথা পাব সে আদর? কোথা সেই স্নেহ-স্বর,
হৃদয়-জুড়ান সেই সোহাগ অমূল?

স্নেহের শিশির-মাখা সেই বাসি ফুল।
অমিয়া ঢালিয়া বুকে কে আর সহাস্য মুখে
কহিবে, "পিসিমা! ধর, আনিয়াছি ফুল।"

"পিসিমা! তোমারি তরে এনেছি এ-ফুল।"
সেই কথা পুনরায় শুনিতে পরান চায়,—
কোথা সে বালক মোর প্রেমের পারুল?

ভূতলে চামেলী জুঁই নহে অপ্রতুল,—
আছে কত পুষ্পলতা, শুধু নাই সেই কথা,—
"পিসিমা! তোমারে দিতে আনিয়াছি ফুল।"

সেই কথা শুনিতে এ পরান ব্যাকুল।
বাজে কি স্বরগ-পুরে গন্ধর্বের বীণা-সুরে
"পিসিমা! তোমারি তরে এনেছি এ-ফুল?"

কি দিলে আবার পাব স্নেহের পুতুল?
কোন্ যজ্ঞ-তপস্যায় বাঁচিয়ে সে পুনরায়
হাসিয়ে আমারে দিবে দু'টি বাসি ফুল?

সে স্নেহ আদর কেন জগতে দুর্মূল?
রত্ন-প্রসবিনী ধরা বিবিধ রতনে ভরা,
তথাপি মিলে না হেথা দু'টি বাসি ফুল!

বিধি সর্বশক্তিমান, নিতান্ত এ ভুল।
নতুবা শকতি তার নাই কেন পুনর্বার
ফিরাইয়ে দিতে মোর সে প্রেম-পুতুল?

বিধি সর্বশক্তিমান, ইহা নহে ভুল ;—
নতুবা আর কে পারে সমাহিত করিবারে
অমন স্বরগ-শিশু, বিশ্বে যে অতুল ?

পাব না প্রাণের ধন, পাব না সে ফুল।
আর শুনিবে না প্রাণ সে ললিত কণ্ঠতান—
প্রেমের পীযূষ-ভরা রাগিণী মঞ্জুল।

শুধু স্মৃতি-কুঞ্জে ফুটে আছে 'বাসি ফুল'
সে মুখের স্মৃতি-সুখ ভরিয়ে রেখেছে বুক,
অঙ্কিত সে চিরতরে, হইবে না ভুল।

নবনূর
ফাল্গুন, ১৩১০ সন।

শশধর

কি ভাবিছ শশধর! বসি' নীলাসনে?
কি রেখেছ শশধর! হৃদয়ে গোপনে?
লু'কাতে পারোনি তাহা প্রভূত যতনে, আহা!
দেখা যায় কালো ছায়া ও চাঁদ-বদনে।
কি ভাবিছ শশধর! বসি যোগাসনে?

পুষিছ হৃদয়ে তুমি প্রেমের অনল?
পুড়িয়ে হয়েছে কালো তাই হৃদিতল।
না বুঝে' অবোধ নরে কত অনুমান করে,
অথবা অমিয়া ভ্রমে ভীষণ গরল
হৃদয়ে পুরিয়া— মুখে হাসিছে কেবল।
নীরবে দগধ হও, নীরবে যাতনা সও,
নীরবে নীহার-রূপে ঝরে আঁখিজল।
পুষিছ হৃদয়ে শশি, প্রেমের অনল।

দু'টি সান্ত্বনার কথা তোমারে যে বলে,
নাই কি এমন কেহ বিশ্ব-ভূমণ্ডলে?
এত তারা আছে, কেহ তোমারে করে না স্নেহ?
তাই তুমি, শশধর! বসিয়া বিরলে,
নিশীথে জুড়াও প্রাণ ভিজি' আঁখিজলে।
এ নিঠুর চরাচর শুনে না কাতর স্বর,—
ঢালে না করুণা-বারি যবে প্রাণ জ্বলে।
দু'টি সান্ত্বনার কথা কেহ নাহি বলে।

কি দেখিছ, শশধর! আমার হৃদয়?
তোমারি কলঙ্ক-সম অন্ধকারময়!

শুধু পাপ, তাপ, ভয়, শোকে পূর্ণ এ-হৃদয়,
এ নহে উজ্জ্বল শুভ্র সরলতাময়।
কি দেখিবে, শশধর, এ পোড়া হৃদয়?

এ নহে কোমল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুনির্ম্মল,—
এ হৃদয়ে স্তরে স্তরে তীব্র হলাহল!
নৈরাশ্য বেদনা শত, কালানল-শিখা কত,
কি ক'রে দেখাব, শশি! তোমা সে-সকল?
এ নহে পবিত্র রম্য স্বচ্ছ সুনির্ম্মল!

তোমার কলঙ্ক, শশি! মুছিবে কেমনে?
যাবে না কলঙ্ক তব কোন শুভক্ষণে
ও-কলঙ্ক হৃদি 'পরে র'বে যুগ-যুগান্তরে;
তাই বুঝি ভাব সদা বসি' যোগাসনে—
আঁধার কালিমা-রেখা মুছিবে কেমনে?

নবনূর
চৈত্র, ১৩১০ সন।

নলিনী ও কুমুদ

নলিনী।

দুর্ব্বল হৃদয় পারে না বহিতে দারুণ যন্ত্রণা হেন;
জীবন-সর্ব্বস্ব হারায়েছি যদি, পরান যায় না কেন?
শরীর-পিঞ্জরে এ প্রাণ-বিহগ থাকিতে চাহে না আর,
এস মৃত্যু! ত্বরা কর বিদূরিত দুঃসহ জীবন-ভার।

কুমুদ।

সখি! কি অপূর্ব্ব শোভা স্বভাবের, দেখ দেখি, খোল আঁখি

নলিনী।

দেখেছি অনেক, কি দেখিব আর, এখন মরণ বাকি।

কুমুদ।

কৌমুদী-স্নাত বিশ্ব-চরাচর। যেন ডুবিয়াছে সব
রজত-সাগরে। এ পূর্ণিমা-শশী, আ মরি! কি অভিনব!
কোথা বা মালঞ্চে মধুর হাসিছে আনন্দে শতেক ফুল;
সুধাকর প্রেম-সুধা পান হেতু ব্যাকুল চকোর-কুল।
কোথা বা অলক ধীরে আসি' চাহে ঢাকিতে বিধুর মুখ,
অপ্রতিভ শশী কহিবেন, "এ কি!" তাহে মেঘ পাবে সুখ।
আসীন পূর্ণেন্দু তারকা-খচিত নীলাম্বর-সিংহাসনে,
হেরি এ মনোজ্ঞ অপরূপ শোভা কত ভাব হয় মনে।

নলিনী।

দেখ সখি তুমি পরান ভরিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি;
মম এ নয়ন দৃষ্টিশক্তিহীন, অধর ভুলেছে হাসি।
দগ্ধ হৃদয়ে এখন কেবল মরণ-আকাঙ্ক্ষা জাগে,
সুখ-সাধময় জীবন আমার ছিল কতক্ষণ আগে।

যখন অরুণ দিয়েছিল দেখা জীবন-প্রভাতে মম
সে-সময় মনে হয়েছিল ধরা নন্দনকানন-সম।
শ্যামলা ধরণী প'রেছিল দীপ্ত কনক কিরণ-বাস,
শিশির-আপ্লুতা কিশোরী বল্লরী ছড়াত হীরক-ভাস।
পূরব-গগনে বালার্কের বিভা হেরি' নরনারীগণ
নব আশা ল'য়ে হৃদয়ে নবীন উৎসাহে বাঁধিয়া মন
অদৃষ্টের স্রোতে সন্তরিতে পুনঃ অগ্রসর হয় ভবে।
নিরাশ-যামিনী হইলে প্রভাত আশা কেন নাই হবে?
কলকণ্ঠে পাখী গাহিত হরষে, ফুটিত মুকুল কত;
ফুল্ল সূর্যমুখী হয়েছিল সুখ-সোহাগের ভারে নত।
ভ্রমর-গুঞ্জনে কত না শুনেছি আশার মোহিনী বাণী,
রচি' কল্পনায় প্রসূন-রাজত্ব তাহাতে ছিলাম রাণী।
অর্ধ-নিমীলিত নয়নে দেখেছি সুখের স্বপন শত,
ভাবিতাম, ধন্য অবনী ভিতরে কে আছে আমার মত?

কুমুদ।

এই দেখ সখি! এখন ত আছে তেমনি উৎফুল্ল ধরা;
তবু কেন তুমি ভাব মন-দুঃখে: প্রকৃতি বিষাদে ভরা?

নলিনী।

ভাস্করের সনে গেছে অস্তাচলে জীবন-আনন্দ মম,
ছিল যে সরসী সুখের আলয়, এবে কারাগার-সম
দিতেছে যন্ত্রণা; এ-জগতে আর থাকিতে বাসনা নাই।
জাগিয়া সহিয়া অশেষ যাতনা এখন ঘুমাতে চাই।

কুমুদ।

আহা! সখি, তুমি পূর্ণিমা-নিশির শোভা দেখে হ'তে সুখী
পারিলে না, তাই এ সুখ-জগতে তুমি অপ্রসন্ন-মুখী।

নলিনী।

প্রফুল্লতা আসে আপনি আননে হৃদি উল্লসিত হ'লে,
ডাকিতে হয় না তা'রে সবিনয়ে ; রবি-তাপে যথা গলে
আপনি তুষার, আয়াস করিয়া গলাতে হয় না তা'রে।
তুমি চাহ বালা, নিরানন্দ জনে ভাসাতে আনন্দ-ধারে ;
অয়ি সুখময়ি ! বুঝিতে পার না নৈরাশ্য কাহারে বলে ;
কেমন সে-জ্বালা যাহাতে আমার মরম অন্তর জ্বলে।

কুমুদ।

তা হলে ভগিনি ! চাহি না বুঝিতে তোমার প্রাণের জ্বালা
ভাবি, শশধরে দিব উপহার কোন্ ফুলে গাঁথি' মালা !

নলিনী।

হায় যম ! আর কতক্ষণ হবে অপেক্ষা করিতে মোরে ?
দেখি, পাই কি না শান্তি-বারিকণা ডুবিলে এ সরোবরে !!

নবনূর
আষাঢ়, ১৩১১

কাঞ্চনজঙ্ঘা

কুজ্ঝটিকা মাত্র নাই গগন-মণ্ডলে ;
এ-সময় কাঁদম্বিনী কোথা গেছে চলে ?
পেয়ে দিব্য অবসর মেঘমুক্ত দিবাকর
সগর্বে আসীন হয়ে সুনীল অম্বরে
ছড়াইছে হাসি' হাসি' উজ্জ্বল কিরণরাশি,
ভাসাইছে জ্যোতিঃধারে বিশ্ব-চরাচরে।
পেয়ে' সে প্রখর কর হাস্যময় চরাচর
কিরণ-ঝলকে যেন হাসিছে পুলকে
জীবজন্তু, নর, দেব ভূলোকে দ্যুলোকে।
এদিকে একটি দু'টি বনফুল আছে ফুটি',
ওদিকে চায়ের ফুল মাধুরী ছড়ায়।
বহে মৃদু সমীরণ করে স্নিগ্ধ প্রাণ মন,
বসন্তের গন্ধ যেন তাহে পাওয়া যায়!
সাগর-লহরী-প্রায় স্তরে স্তরে শোভা পায়
ভূধর-তরঙ্গমালা ত্রিদিকে বিস্তৃত ;
কেবল দক্ষিণ দেশে অতি অপরূপ বেশে
হরিৎ প্রান্তরখানি রয়েছে নিদ্রিত।
পূর্বের পর্বতখানি আপনারে শ্রেষ্ঠ জানি'
গৌরব-গরবে যেন চুম্বিছে গগন।
পশ্চিমের উপত্যকা দাঁড়ায়ে রয়েছে একা
বুকে ল'য়ে গোটা কত সুরম্য ভবন।
ওকি ও অনেক দূরে উত্তর-গিরির চূড়ে
স্তূপাকার মুক্তা হেন ও কি দেখা যায় ?
ও বুঝি কাঞ্চনজঙ্ঘা ? তাই ত কাঞ্চনজঙ্ঘা!
কি হেতু 'কাঞ্চন' নাম কে দিল উহায় ?
ও ত স্বর্ণবর্ণ নয়, মুক্তা-নিভ সমুদয়
ধবল তুষার-স্তম্ভ অতি মনোহর।
মরি! কিবা সমুজ্জ্বল রবি-করে ঝলমল
করে! কত মনোরম প্রাণমুগ্ধকর!

শ্যামল ভূধররাজি যেন গো ভূপতি সাজি'
কাঞ্চনে মুকুট-রূপে পরেছে মাথায় !
এমন ভূষণ পেয়ে গিরিরাজ ধন্য হ'য়ে
প্রণমিছে নতশিরে কাঞ্চনের পা'য় !
নির্মল তুষার গ'লে কাঞ্চনের পদতলে
বহিছে নীহার-নদী কত না সুন্দর !
কে যাবে ও-হিমদেশে কে কহিবে দেখে এসে'
সে কেমন রম্যস্থান—সৌন্দর্য-আকর ?
না জানি কতই তাহা বিমল শীতল, আহা !
তাই বলি, ও-কাঞ্চন ভূতলে অতুল,
যশস্বী উহারে পেয়ে হ'ল গিরিকুল।

কিন্তু সেই মহাকবি আঁকিয়া এমন ছবি
আপনি অদৃশ্য হয়ে আছেন কোথায় ?
পরস্পরে তরুলতা কহিছে তাহারি কথা
যেন বলিতেছে : "বিভু এই ত হেথায় !"
সেদিকে ফিরালে আঁখি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি
বিভু যেন স'রে যান মরীচিকা-প্রায় !
কিন্তু সে চরণ-রেখা সর্বত্রই যায় দেখা,
কুসুম-সৌরভে তাঁর গন্ধ পাওয়া যায়।
(ভাব-চক্ষু আছে যার দেখিতে কি বাকি তার ?
সে মুদ্রিত চক্ষে তাঁর দরশন পায়।)
অস্ফুট নীরব স্বরে প্রকৃতি প্রচার করে,—
"শিল্পীর মহিমা শিল্প আপনি জানায় !"

নবনূর
পৌষ, ১৩১১

"ঈগেল্‌স্ ক্রেগ্" নামক পর্বত-শিখর হইতে মধ্যাহ্নে (আকাশ নির্মল থাকিলে) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেরূপ দেখায় তদবলম্বনে রচিত। গিরি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' প্রায় সর্বদা মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে; সুতরাং তাহার দর্শন-লাভ সাধারণ ব্যাপার নহে।

সওগাত

জাগো বঙ্গবাসি !
দেখ, কে দুয়ারে
অতি ধীরে ধীরে করে করাঘাত।

ঐ শুন শুন !
কেবা তোমাদের
সুমধুর স্বরে বলে : "সুপ্রভাত!"

অলস রজনী
এবে পোহাইল,
আশার আলোকে হাসে দিননাথ।

শিশির-সিক্ত
কুসুম তুলিয়ে
ডালা ভরে নিয়ে এসেছে "সওগাত"।

সওগাত
১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

আপীল

কারো আছে জমিদারী,
কেহ বা উপাধিধারী,—
বাঙ্গালা বিহারে মোরা যত কিছু ধারী,—
সকলে মিলিয়া এই আবেদন করি।—

প্রাণে মরি সেও ভাল,
শতবার মৃত্যু ভাল,
লাঙ্গুল-বিরহ কিন্তু সহিতে না পারি।
বোম্বাই নগরে ধাম,
'ভারত সময়' নাম—
শ্বেতাঙ্গ পত্রিকা এক রাগিয়াছে ভারী,
মহাক্রোধে করেছে সে এ হুকুম জারি,—
"যত মূক ভদ্র* পাও,
লাঙ্গুল কাটিয়া দাও।
তা হ'লে হইবে দণ্ড উচিত সবারি।"

"বোবার অরাতি নাই"—
এই সত্য জানি তাই
নীরব ছিলাম মোরা ল্যাজ-প্রাপ্তগণ।
একি শুনি অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রপাত—
মৌন দোষে হবে না কি লাঙ্গুল কর্তন।
এস তবে সহচর,
সপ্তমে তুলিয়া স্বর
উচ্চকণ্ঠে করি আজি সবারে জ্ঞাপন,
আমরা করিনি কভু আইন লঙ্ঘন।

Moderates, who are keeping silence ought to be deprived of their titles.

কোথা কোন্ দুরাচার
'সিডিসন' পরচার
করে, তার শিরে হোক এই অশনি পতন।
কোথা কে বিদ্রোহী জন,
কর এবে সম্বরণ
লেখনী, রসনা আর স্বরাজ-স্বপন ;
করিও না অপব্যয় অমূল্য জীবন।

স্বাক্ষর—
যত ভূমি-অধিকারী।
যে ক'টি লাঙ্গুল-ধারী।
যার আছে জমিদারী।
যত সভ্য অনাহারী।

সাধনা
ফাল্গুন, ১৩২৮

নিরুপম বীর

বিচারক বলে, "কানাই তোমার
গলায় পড়িবে ফাঁসি!"
শুনি' শ্যামলাল বেপরোয়া ভাবে
হাসিল ঘৃণার হাসি।
রাখিতে পরের পরান যে জন
দেয় নিজে বলিদান,
সে কি বিচলিত ফাঁসির আদেশে?
মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞান।

এ মর-জগতে কানাইয়ের তুল
কে আছে কোথায় আর?
শ্যামের গরিমা অতুল অতুল
তুলনা নাই যে তার!
মরিয়া কানাই হইবে অমর
সাধ্য কি বধে তারে?
মৃণ্ময় দেহ এক শুধু শ্যাম
ছিল বাঁধা সংসারে;
ত্যজি' সে পিঁজর চলিল কানাই,
এবে শত কোটি শ্যাম
ভারত-গগনে দেখা দিবে পুনঃ।
(ধন্য তোমার নাম!)

শ্যাম-ঋণ-পাশে রয়েছে যে বাঁধা
সকল বঙ্গবাসী,
অনেকে তাদের করিল প্রণতি
শ্যামে কারাগারে আসি'।

জগতে শ্যামের বিপুল আদর
হ'ল না বর্ত্তমানে,—
যদিও ভকতি নীরব প্রবাহ
বহে বাঙ্গালী প্রাণে।
যত কৃতঘ্ন হোক সংসার
তবু এ কানাই-স্মৃতি
ভারত-হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে
জাগরূক র'বে নিতি।
বীর সন্তান জাগিয়া প্রভাতে
স্মরিবে কানাইনাম;
প্রাতঃস্মরণীয় কানাই মোদের,
বল বল "বন্দে শ্যাম।"

ধূমকেতু
১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা,
৫ আশ্বিন, ১৩২৯

SULTANA'S DREAM

1908

SULTANA'S DREAM

One evening I was lounging in an easy chair in my bed-room and thinking lazily of the condition of Indian womanhood. I am not sure whether I dozed off or not. But, as far as I remember, I was wide awake. I saw the moonlit sky sparkling with thousands of diamond-like stars, very distinctly.

All on a sudden a lady stood before me; how she came in, I do not know. I took her for my friend, Sister Sara.

"Good morning," said Sister Sara. I smiled inwardly as I knew it was not morning, but starry night. However, I replied to her, saying, "How do you do?"

"I am all right, thank you. Will you please come out and have a look at our garden?"

I looked again at the moon through the open window, and thought there was no harm in going out at that time. The men-servants outside were fast asleep just then, and I could have a pleasant walk with Sister Sara.

I used to have my walks with Sister Sara, when we were at Darjeeling. Many a time did we walk hand in hand and talk light-heartedly in the Botanical gardens there. I fancied, Sister Sara had probably come to take me to some such garden, and I readily accepted her offer and went out with her.

When walking I found to my surprise that it was a fine morning. The town was fully awake and the streets alive with bustling crowds. I was feeling very shy, thinking I was walking in the street in broad daylight, but there was not a single man visible.

Some of the passers-by made jokes at me. Though I could not understand their language, yet I felt sure they were joking. I asked my friend, "What do they say?"

"The woman say that you look very mannish."

"Mannish?" said I, "What do they mean by that?"

"They mean that you are shy and timid like men."

"Shy and timid like men?" It was really a joke. I became very nervous, when I found that my companion was not Sister Sara, but a stranger. Oh, what a fool had I been to mistake this lady for my dear old friend, Sister Sara.

She felt my fingers tremble in her hand, as we were walking hand in hand.

"What is the matter, dear, dear?" she said affectionately.

"I feel somewhat awkward," I said in a rather apologising tone, "as being a purdahnishin woman I am not accustomed to walking about unveiled."

"You need not be afraid of coming across a man here. This is Ladyland, free from sin and harm. Virtue herself reigns here."

By and by I was enjoying the scenery. Really it was very grand. I mistook a patch of green grass for a velvet cushion. Feeling as if I were walking on a soft carpet, I looked down and found the path covered with moss and flowers.

"How nice it is," said I.

"Do you like it?" asked Sister Sara. (I continued calling her "Sister Sara," and she kept calling me by my name.)

"Yes, very much; but I do not like to tread on the tender and sweet flowers."

"Never mind, dear Sultana; Your treading will not harm them; they are street flowers."

"The whole place looks like a garden," said I admiringly. "You have arranged every plant so skilfully."

"Your Calcutta could become a nicer garden than this, if only your countrymen wanted to make it so."

"They would think it useless to give so much attention to horticulture, while they have so many other things to do."

"They could not find a better excuse;" said she with smile.

I became very curious to know where the men were. I met more than a hundred women while walking there, but not a single man.

"Where are the men?" I asked her.

"In their proper places, where they ought to be."

"Pray let me know what you mean by 'their proper places'."

"O, I see my mistake, you cannot know our customs, as you were never here before. We shut our men indoors."

"Just as we are kept in the Zenana?"

"Exactly so."

"How funny," I burst into a laugh. Sister Sara laughed too.

"But dear Sultana, how unfair it is to shut in the harmless women and let loose the men.'

"Why? It is not safe for us to come out of the zenana, as we are naturally weak."

"Yes, it is not safe so long as there are men about the streets, nor is it so when a wild animal enters a market-place."

"Of course not."

"Suppose, some lunatics escape from the asylum and begin to do all sorts of mischief to men, horses and other creatures, in that case what will your countrymen do?"

"They will try to capture them and put them back into their asylum."

"Thank you! And you do not think it wise to keep sane people inside an asylum and let loose the insane?"

"Of course not!" said I laughing lightly.

"As a matter of fact, in your country this very thing is done! Men, who do or at least are capable of doing no end of mischief, are let loose and the innocent women shut up in the zenana! How can you trust those untrained men out of doors?"

"We have no hand or voice in the management of our social affairs. In India man is lord and master. He has taken to himself all powers and privileges and shut up the women in the zenana."

"Why do you allow yourselves to be shut up?"

"Because it cannot be helped as they are stronger than women."

"A lion is stronger than a man, but it does not enable him to dominate the human race. You have neglected the duty you owe to yourselves and you have lost your natural rights by shutting your eyes to your own interests."

"But my dear sister Sara, if we do everything by ourselves, what will the men do then?"

"They should not do anything, excuse me; they are fit for nothing. Only catch them and put them into the zenana."

"But would it be very easy to catch and put them inside the four walls?" said I, "And even if this were done, would all their business, political and commercial—also go with them into the zenana!"

Sister Sara made no reply. She only smiled sweetly. Perhaps she thought it useless to argue with one who was no better than a frog in a well.

By this time we reached sister Sara's house. It was situated in a beautiful heart-shaped garden. It was a bungalow with a corrugated iron roof. It was cooler and nicer than any of

our rich buildings. I cannot describe how neat and how nicely furnished and how tastefully decorated it was.

We sat side by side. She brought out of the parlour a piece of embroidery work and began putting on a fresh design.

"Do you know knitting and needle work?"

"Yes; we have nothing else to do in our zenana."

"But we do not trust our zenana members with embroidery!" she said laughing, "as a man has not patience enough to pass thread through a needlehole even!"

"Have you done all this work yourself?" I asked her pointing to the various pieces of embroidered teapoy cloths.

"Yes."

"How can you find time to do all these? You have to do the office work as well? Have you not?"

"Yes. I do not stick to the laboratory all day long. I finish my work in two hours."

"In two hours! how do you manage? In our land the officers, magistrates,—for instance, work seven hours daily."

"I have seen some of them doing their work. Do you think they work all the seven hours?"

"Certainly they do!"

"No, dear Sultana, they do not. They dawdle away their time in smoking. Some smoke two or three choroots during the office time. They talk much about their work, but do little. Suppose one choroot takes half an hour to burn off, and a man smokes twelve choroots daily; then you see, he wastes six hours every day in sheer smoking."

We talked on various subjects; and I learned that they were not subject to any kind of epidemic disease,—nor did they suffer from mosquito-bites as we do. I was very much astonished to hear that in Lady-land no one died in youth except by rare accident.

"Will you care to see our kitchen?" She asked me.

"With pleasure," said I, and we went to see it. Of course the men had been asked to clear off when I was going there. The kitchen was situated in a beautiful vegetable garden. Every creeper, every tomato plant was itself an ornament. I found no smoke, nor any chimney either in the kitchen,—it was clean and bright; the windows were decorated with flower garlands. There was no sign of coal or fire.

"How do you cook?" I asked.

"With solar heat," She said, at the same time showing me the pipe, through which passed the concentrated sunlight and heat. And she cooked something then and there to show me the process.

"How did you manage to gather and store up the sun heat?" I asked her in amazement.

"Let me tell you a little of our past history then. Thirty years ago, when our present Queen was thirteen years old, she inherited the throne. She was Queen in name only, the Prime-minister really ruling the country."

"Our good Queen liked science very much. She circulated an order that all the women in her country should be educated. Accordingly a number of girls' schools were founded and supported by the Government. Education was spread far and wide among women. And early marriage also was stopped. No woman was to be allowed to marry before she was twenty-one. I must tell you that, before this change we had been kept in strict-purdah."

"How the tables are turned," I interposed with a laugh.

"But the seclusion is the same," she said. "In a few years we had separate Universities, where no men were admitted."

"In the capital, where our Queen lives, there are two Universities. One of these invented a wonderful baloon, to

which they attached a number of pipes. By means of this captive baloon which they managed to keep afloat above the cloud-land, they could draw as much water from the atmosphare as they pleased. As the water was incessantly being drawn by the University people no cloud gathered and the ingenious Lady Principal stopped rain and storms thereby."

"Really ! Now I understand why there is no mud here !" said I. But I could not understand how it was possible to accumulate water in the pipes. She explained to me how it was done ; but I was unable to understand her, as my scientific knowledge was very limited. However, she went on,—

"When the other University came to know of this, they became exceedingly jealous and tried to do something more extraordinary still. They invented an instrument by which they could collect as much sun-heat as they wanted. And they kept the heat stored up to be distributed among other as required.

"While the women were engaged in scientific researches, the men of this country were busy increasing their military power. When they came to know that the female Universities were able to draw water from the atmosphere and collect heat from the sun, they only laughed at the members of the Universities and called the whole thing 'a sentimental nightmare' !"

"Your achievements are very wonderful indeed ! But tell me, how you managed to put the men of your country into the zenana. Did you entrap them first ?"

"No".

"It is not likely that they would surrender their free and open air life of their own accord and confine themselves within the four walls of the zenana ! They must have been overpowered."

"Yes, they have been !"

"By whom ?— by some lady-warriors, I suppose ?"

"No, not by arms."

"Yes, it cannot be so. Men's arms are stronger than women's".

"Then ?"

"By brain."

"Even their brains are bigger and heavier then women's. Are they not ?"

"Yes, but what of that ? An elephant also has got a bigger and heavier brain than a man has. Yet man can enchain elephants and employ them, according to their own wishes."

"Well said, but tell me please, how it all actually happened. I am dying to know it !"

"Women's brains are somewhat quicker than men's. Ten years ago, when the military officers called our scientific discoveries 'a sentimental nightmare', someoof the young ladies wanted to say something in reply to those remarks. But both the Lady-Principals restrained them and said, they should relpy, not by word, but by deed, if ever they got the opportunity. And they had not long to wait for that opportunity."

"How marvellous !" I heartily clapped my hands.

"And now the proud gentlemen are dreaming sentimental dreams themselves.

"Soon afterwards certain persons came from a neighbouring country and took shelter in ours. They were in trouble having committed some political offence. The king who cared more for power than for good government asked our kind-hearted Queen to hand them over to his officers. She refused, as it was aginst her principle to turn out refugees. For this refusal the king declared war against our country.

"Our military officers sprang to their feet at once and marched out to meet the enemy.

"The enemy however, was too strong for them. Our soldiers fought bravely, no doubt. But in spite of all their bravery the foreign army advanced step by step to invade our country.

"Nearly all the men had gone out to fight; even a boy of sixteen was not left home. Most of our warriors were killed, the rest driven back and the enemy came within twenty-five miles of the capital.

"A meeting of a number of wise ladies was held at the Queen's palace to advice and to what should be done to save the land.

"Some propsed to fight like soldiers; others objected and said that women were not trained to fight with swords and guns; nor were they accustomed to fighting with any weapons. A third party regretfully remarked that they were hopelessly week of body."

"If you cannot save your country for lack of physical strength, said the Queen, try to do so by brain power".

"There was a dead silence for a few minutes. Her Royal Highness said again, 'I must commit suicide if the land and my honour are lost."

"Then the Lady Principal of the second University, (who had collected sun-heat), who had been silently thinking during the consultation, remarked that they were all but lost; and there was little hope left for them. There was however, one plan which she would like to try, and this would be her first and last efforts; if she failed in this, there would be nothing left but to commit suicide. All present solemnly vowed that they would never allow themselves to be enslaved, on matter what happened."

"The Queen thanked them heartily, and asked the Lady Principal to try her plan."

"The Lady Principal rose again and said, 'before we go out the men must enter the zenanas. I make this prayer for the sake of purdah.' 'Yes, of course', replied Her Royal Highness."

"On the following day the Queen called upon all men to retire into zenanas for the sake of honour and liberty.

"Wounded and tired as they were, they took that order rather for a boon ! They bowed low and entered the zenanas without uttering a single word of protests. They were sure that there was no hope for this country at all.

"Then the Lady Principal with her two thousand students marched to the battle-field, and arriving there directed all the rays of the concentrated sun-light and heat towards the enemy.

"The heat and light were too much for them to bear. They all ran away panic-stricken, not knowing in their bewilderment how to counteract that scorching heat. When they fled away leaving their guns and other ammunitions of war, they were burnt down by means of the same sun-heat.

"Since then no one has tried to invade our country any more.'

"And since then your country-men never tried to come out of the zenana ?"

"Yes, they wanted to be free. Some of the Police Commissioners and District Magistrates sent word to the Queen to the effect that the Military Officers certainly deserved to be imprisoned for their failure ; but they never neglected their duty and therefore they should not be punished and they prayed to be restored to their respective offices.

"Her Royal Highness sent them a circular letter intimating to them that if their services should ever be needed they would be sent for, and that in the meanwhile they should remain where they were.

"Now that they are accustomed to the purdah system and have ceased to grumble at their seclusion, we call the system 'Murdana' instead of 'zenana'."

"But how do you manage" I asked Sister Sara, "to do without the Police or Magistrates in case of theft or murder ?"

"Since the 'Murdana' system has been established, there has been no more crime or sin ; therefore we do not require a Police-man to find out a culprit, nor do we went a Magistrate to try a criminal case."

"That is very good, indeed. I suppose if there were any dishonest person, you could very easily chastise her. As you gained a decisive victory without shedding a single drop of blood, you could drive off crime and criminals too without much difficulty !"

"Now, dear Sultana, will you sit here or come to my parlour ?" she asked me.

"Your kitchen is not inferior to a queen's boudoir !" I replied with a pleasant smile, "but we must leave it now ; for the gentlemen may be cursing me for keeping them away from thier duties in the kitchen so long." We both laughed heartily.

"How my friends at home will be amused and amazed, when I go back and tell them that in the far-off Ladyland, ladies rule over the country and control all social matters, while gentlemen are kept in the Murdanas to mind babies, to cook and to do all sorts of domestic work ; and that cooking is so easy a thing that it is simply a pleasure to cook !"

"Yes, tell them about all that you see here."

"Please let me know, how you carry on land cultivation and how you plough the land and do other hard manual work."

"Our fields are tilled by means of electricity, which supplies motive power for other hard work as well and we employ it for our aerial conveyances too. We have no rail road nor any paved streets here."

"Therefore neither streets nor railway accidents occur here," said I. "Do not you ever suffer from want of rainwater ?" I asked.

"Never since the 'water baloon' has been set up. You see the big baloon and pipes attached thereto. By their aid we can draw as much rain water as we require. Nor do we ever suffer from flood or thunderstorms. We are all very busy making nature yield as mucn as she can. We do not find time to quarrel with one another as we never sit idle. Our noble Queen is exceedingly fond of Botany; it is her ambition to convert the whole country into one grand garden."

"The idea is excellent. What is your chief food ?"

"Fruits."

"How do you keep your country cool in hot weather ? We regard the rainfall in summer as a blessing from heaven."

"When the heat becomes unbearable, we sprinkle the ground with plentiful showers drawn from the artificial fountains. And in cold weather we keep our room warm with sun-heat."

She showed me her bathroom, the roof of which was removable. She could enjoy a shower bath whenever she liked, by simply removing the roof (which was like the lid of a box) and turning on the tap of the shower pipe.

"You are a lucky people !" ejaculated I. "You know no want. What is your religion, may I ask ?"

"Our religion is based on Love and Truth. It is our religious duty to love one another and to be absolutaly truthful. If any person lies, she or he is———."

"Punished with death ?"

"No; not with death. We do not take pleasure in killing a creature of God,—specially a human being. The liar is asked to leave this land for good and never to come to it again."

"Is an offender never forgiven ?"

"Yes, if that person repents sincerely."

"Are you not allowed to see any man, except your own relations ?"

"No one except sacred relations."

"Our circle of sacred relations is very limited to, even first cousins are not sacred."

"But ours is very large ; a distant cousin is as sacred as a brother."

"That is very good. I see Purity itself reigns over your land. I should like to see the good Queen, who is so sagacious and far-sighted and who has made all these rules."

"All right," said Sister Sara.

Then she screwed a couple of seats on to a square piece of plank. Tc this plank she attached two smooth and well-polished balls. When I asked her what the balls were for, she said, they were hydrogen balls and they were used to overcome the force of gravity. The balls were of different capacities to be used according to the different weights desired to be overcome. She then fastened to the air-car two wing-like blades, which, she said, were worked by electricity. After we were comfortably seated she touched a knob and the blades began to whirl, moving faster and faster every moment. At first we were raised to the height of about six or seven feet and then off we flew. And before I could realize that we had commenced moving we reached the Garden of the Queen.

My friend lowered the air-car by reversing the action of the machine, and when the car touched the ground the machine was stopped and we got out.

I had seen from the air-car the Queen walking on a garden path with her little daughter (who was four years old) and her maids of honour.

"Halloo ! you here !" cried the Queen addressing Sister Sara. I was introducad to Her Royal Highness and was received by her cordially without any ceremony.

I was very much delighted to make her acquaintance. In course of the conversation I had with her, the Queen told me that she had no objection to permitting her subjects to trade

with other countries. "But," she continued, "no trade was possible with countries where the women were kept in the zenanas and so unable to come and trade with us. Men, we find, are rather of lower morals and so we do not like dealing with them. We do not covet other people's land, we do not fight for piece of diamond though it may be a thousant-fold brighter than the Koh-i-Noor, nor do we grudge a ruler his Peacock Throne. We dive deep into the ocean of knowledge and try to find out the precious gems, which Nature has kept in store for us. We enjoy Nature's gifts as much as we can."

After taking leave of the Queen, I visited the famous Universities, and was shown over some of their manufactories, laboratories and observatories.

After visiting the above places of interest we got again into the air-car, but as soon as it began moving I somehow slipped down and the fall startled me out of my dream. And on opening my eyes, I found myself in my own bed-room still lounging in the easy-chair !!

পরিশিষ্ট

রোকেয়া-পরিচিতি

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
বেগম রোকেয়ার সাহিত্য-কীর্তি	...	...	৫৯১
আবদুল কাদির			
মিসেস্ আর. এস. হোসেন	...	...	৫৯৬
অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম.এ.			
"মতিচূর"	...	...	৫৯৭
আবুল হুসেন এম.এ., এম.এল্.			
Sultana's Dream	...	...	৬০০
আবুল হুসেন এম.এ., এম.এল্.			
"মতিচূর"	...	...	৬০৩
মিসেস্ এম্. রহমান			
দরদী আত্মা	...	...	৬০৪
কবি শাহাদাৎ হোসেন			
দুঃসাহসিকা	...	...	৬০৭
কবি গোলাম মোস্তফা			

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য-কীর্তি

আবদুল কাদির

আধুনিক কালের গোড়ার দিকের বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনা অনেকখানিই প্রতিক্রিয়ামূলক। মীর মোশাররফ হোসেন হইতে আরম্ভ করিয়া মিসেস্ এম্. রহমান পর্যন্ত মুসলমানের সাহিত্য-চর্চা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অসামান্য কিছু নয়; তবে সে-সাহিত্যে প্রতিবাদ ছাড়াও এমন সৃষ্টি কিছু আছে, যাহাকে অনবদ্য না হইলেও সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। তবু এ-কথা অসত্য নহে যে, সে-সাহিত্যের মূলে সাহিত্যিক প্রেরণার চাইতেও বড় জিনিস ছিল 'আমরাও আছি' এই মনোভাব। হিন্দু সাধকদের সৃষ্টি-চাঞ্চল্যে সচেতন হইয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি-মাহাত্ম্য প্রচার-কল্পে একালের প্রথম দিকের মুসলিম সাহিত্যিকরা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মীর মোশাররফ হোসেন 'জঙ্গনামা'-র উপর ভিত্তি করিয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' লেখেন; নবীনচন্দ্রের অনুবর্তিতায় কায়কোবাদ এবং হেমচন্দ্রের অনুভাবে শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক্ কাব্য-সাধনায় অগ্রসর হন। এই সমস্ত রচনায় বাংলার পরিবেষ্টনের প্রভাব— নৈতিক ও সাংসারিক জীবনের বেদনা— কোনো রূপলাভ করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। 'বঙ্গবিধবা'-র হাহাকার মোজাম্মেল হকের অন্তরে অপূর্ব বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ স্বসমাজের অজ্ঞানতা ও অপ্রেমের খবরদারি তাঁহার মধ্যে বিশেষ-কিছু নাই। আসলে হিন্দু মনীষীরা পর্যাপ্তরূপে যাহা পরিবেশন করিতেছিলেন, মুসলমান সাহিত্যিকরা সে-সবকেই সাহিত্য-সাধনার সহজ উপাদান করিয়া লইয়াছিলেন,— আর অত্যন্ত অনায়াসে মুসলিম সাধনার যাহা পাওয়া যায়, তাহাই নিজেদের চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় স্বরূপ দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। পরিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্কবিচ্যুত এই যে সাহিত্য, ইহার একটা সুফল হইল এই যে, এ-দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাহার রসগ্রহণে ও অভিনন্দনে অগ্রসর হইতে বেশী বেগ পাইল না।

অবশ্য সেই সাহিত্যিকরা যে সমস্যা একেবারে বোঝেন নাই তাহা নহে। কোরবানী সম্পর্কে কথা বলিতে গিয়া মীর মোশাররফ হোসেন তাঁর স্বসম্প্রদায়ের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। সহজ সৌন্দর্য-দৃষ্টিসম্পন্ন কবি কায়কোবাদ হিন্দু ও মুসলমানকে

সাম্প্রদায়িক মানুষ-রূপে না দেখিয়া স্বাভাবিক মানুষ-রূপে দেখিবার যে-প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তার ফলে স্বসমাজের নিকট হইতে কম গঞ্জনা লাভ করেন নাই। বিশেষতঃ, 'সমাজ ও সংস্কারক'-রচয়িতা পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন ও 'অনল-প্রবাহে'র কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'প্যান ইসলাম'-আদর্শের আলোকে নব-উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে গিয়া স্বসমাজের অন্তহীন দুর্গতির দিকেও দৃষ্টি দিয়াছিলেন। অবশ্য এ-কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা যায় যে, সৈয়দ শিরাজী, মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ সমাজের জন্য কল্যাণায়োজনের চেষ্টায় মৌলানা মনিরুজ্জামানেরই সহযাত্রী। সুদ-সমস্যা, নারী-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, কৃষক-সমস্যা, দেশ-মুক্তি-সমস্যা, ভাষা-সমস্যা ইত্যাদি নিয়া মৌলানা মনিরুজ্জামান যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করিয়াছিলেন— সেকালের সমস্যা-সাহিত্যে তার রূপরেখা অভিযোগ ও অভিমানের আবেগ-বাহুল্য নিয়া ফুটিয়া আছে।

ইঁহাদের রচিত সাহিত্যে বৃহত্তর দেশের সমস্যা সম্পর্কে দায়িত্বহীনতা, ধ্যানীর ঔদাসীন্যের চাইতে প্রতিবাদের বিক্ষুব্ধতা, এ-সমস্ত দোষ-ত্রুটিই হয়ত ইহার দিকে দেশবাসীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু হিন্দু প্রতিভার অনুবর্তনে বা চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়ায় নহে, আধুনিক বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বেগম রোকেয়া নিজের ব্যক্তিত্ব ও বেদনার রসে সাহিত্য-সৃষ্টিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অবরুদ্ধ মুসলমান অন্তঃপুরে এহেন শাণিতবুদ্ধি প্রেমপরায়ণা রুচিসুন্দর প্রতিভার আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ব্যাপার। হিন্দু ও মুসলমানকে তিনি কবি কায়কোবাদের মতোই সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছিলেন; অধিকন্তু তিনি ছিলেন পরিপার্শ্বের সন্ততি। কোনো মত-বিশ্বাসের অন্ধ-উত্তেজনায় তিনি দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দেন নাই; ইসলামকে তিনি মনুষ্যত্ব-সাধনার এক চমৎকার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম অর্থে তিনি আল্লাহ্‌র অনুধ্যানই বুঝিয়াছিলেন। 'পিপাসা'-প্রবন্ধে কারবালা-কাহিনী ব্যাখ্যান করিয়া শেষে বলিয়াছেন: "এ-হৃদয়ের পিপাসা তুচ্ছ বারি-পিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম-পিপাসা। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকলে পিপাসী— ঐ বাঞ্ছনীয় প্রেমময়ের প্রেম-পিপাসী।"

তাঁহার চারিপাশের যে-সমাজ— অবরোধবন্দিনী নিগৃহীতা নারী-সমাজ, তাহারই অজ্ঞানতা ও নির্জীবতার বেদনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। "আমাদের এ বিশ্বব্যাপী দাসত্বের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি?"— এই প্রশ্নের অন্তরালে যে দাহ, তাহার তীব্রতা তাঁহার সমস্ত রচনায় সঞ্চারিত হইয়া আছে।

নারী-বিদ্বেষী শপেনহর্ বলিয়াছেন : One need only look at a woman's shape to discover that she is not intended for either too much mental or too much physical work. কিন্তু বেগম রোকেয়া বলিয়াছেন— "স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে ; তাই বলিয়া পুরুষ প্রভু হইতে পারে না।" The soul of a woman has something obscure and mysterious in it— এই কথা তিনিও যে জানিতেন, তাহা "কুসুমের সৌকুমার্য হরিণের কটাক্ষ নিদ্রার মোহ ইত্যাদি তেত্রিশটি উপাদানে ললনা নির্মিত হইয়াছে"—উক্তিতেই বুঝা যায় ; কিন্তু নারীর সেই আত্মিক প্রকৃতির বিশ্লেষণে অগ্রসর না হইয়া সামাজিক জীবনের ক্রমভঙ্গতার দিকেই তিনি অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। "বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন বই আর কিছু নয় ;"— নারীর এই আত্মার দাসত্ব স্খালনের জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন : "অলঙ্কারের টাকা দ্বারা জেনানা-স্কুলের আয়োজন করা হউক।" স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা যথাযোগ্যরূপে হইলেই নারীর উন্নতি অনিবার্য হইবে ; তার কুসংস্কারপ্রিয়, রক্ষণশীল অথচ ফ্যাশনবিলাসী, আবেগপ্রধান প্রকৃতি প্রকৃতিস্থতা লাভ করিবে ; Complete equality with man makes her quarrelsome, a position of supremacy makes her tyrannical, এই দুর্নাম ঘুচিয়া যাইবে ; এই সহজ অথচ সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল। "আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক্ সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি।" সুতরাং পুরুষ-প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আক্রোশ অশোভন নয়। "আপনারা মহম্মদীয় আইনে দেখিতে পাইবেন যে, বিধান আছে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে ; এ নিয়মটী কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ।" পুরুষ কর্তৃক "অর্দ্ধাঙ্গী"র দাবী সম্পর্কে এই উপেক্ষা দেখিয়া তিনি দুঃখ-ক্ষোভে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন— "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব।" আর্থনৈতিক দিক দিয়া নারীর স্বাবলম্বনকেই তিনি মুক্তির অন্যতম উপায় মনে করিয়াছিলেন।

'মতিচুর' ১ম ও ২য় খণ্ড, Sultana's Dream, 'পদ্মরাগ', 'অবরোধ-বাসিনী' প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থে তাঁর জীবনের ঐকান্তিক স্বপ্ন অভিনব রূপ লাভ করিয়া আছে। 'মতিচুর' ২য় খণ্ডে সৌরজগৎ, ডেলিশিয়া-হত্যা, জ্ঞান-ফল, নারী-সৃষ্টি, নার্স নেলী, মুক্তি-ফল প্রভৃতি গল্প ও রূপকথা আছে। মেরী করেলির Murder of Delicia উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত গল্পটিতে তিনি

দেখাইয়াছেন যে, পুরুষ-শাসিত সমাজে সভ্যদেশেও নারীর দুঃখের অবধি নাই; আর 'নার্স নেলী'তে গৃহের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি দিতে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অন্যান্য গল্পগুলিতে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। 'জ্ঞান-ফল' রূপকথাটি আদম-হাওয়ার কাহিনী নিয়া রচিত; আদি-পুরুষ বলিতেছেন: 'কি আপদ! আমি রমণীকে রাখিতেও চাহি না, ফেলিতেও পারি না।' তদবধি নারী অভিশাপ-রূপে পুরুষের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে— তাঁর এই cynical মন্তব্য দুঃসহ বেদনা হইতেই উদ্ভূত।

তাঁর Sultana's Dream ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা—'নারীস্থানের' এক অদ্ভুত পরিকল্পনা। সেখানে নারীর বাহুবলে নয়, মস্তিষ্ক-বলে পুরুষ পরাস্ত; নারী-প্রতিষ্ঠিত সেই স্বপ্ন-সমাজে পুরুষ minor— 'মর্দ্দানা'বাসী। নারীর এবম্বিধ বিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কার-রূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গেল।"

'মতিচূর' ১ম খণ্ডে 'বোরকা' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন: "অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নাই।...এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি?...অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে— নৈতিক।...বোরকা জিনিষটা মোটের উপর মন্দ নহে।...উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই।... পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় না। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব।"

তাঁর 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে ৪৭টি অবরোধ-সম্পর্কিত দুর্ঘটনার উপাদেয় কাহিনী আছে—অতুলনীয় শ্লেষ ও লিপিকুশলতার সঙ্গে তিনি সেগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে নারী Humourist বিরল, সেদিক দিয়া 'অবরোধবাসিনী' উল্লেখনীয় কিছু নিশ্চয়ই। তিনি পর্দা চাহিয়াছেন, কিন্তু তার বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন নাই; বলিয়াছেন: "ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম করিতে হইবে।" তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের উদ্দামতার চাইতে এই যে সংযম ও মমত্ববোধের প্রাচুর্য্য, তার মূলে রহিয়াছে তাঁর নারীপ্রকৃতি। অবশ্য পর্দা বলিতে যে তিনি নারীর সবল ব্যক্তিত্বই বুঝিতেন তার ইঙ্গিত নিম্নোক্ত ছত্রটিতে আছে: "বর্ত্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন, তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে?"

তাঁর "পদ্মরাগ" উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা কিন্তু বলিতেছে: "আমি আজীবন...নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ

করিব।... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী-জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; *সংসার-ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।"—সিদ্দিকা* গ্রন্থকর্ত্রীর মানস-সৃষ্টি—এক জ্বলন্ত অগ্নিকণা। এমিয়েল্ বলিয়াছেন: A woman places her ideal in the perfection of love and a man in the perfection of justice.—পুরুষের সমাজ যখন বিচারবিমুখ তখন পুরুষের কাছে চিত্তসমর্পণ করিতে নারীর পরাঙ্মুখ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও সিদ্দিকার এই বিদ্রোহ বা আত্মত্যাগ সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই, চিরন্তন নারী-প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়—তার প্রমাণ: স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে তবু তার সাশ্রুনয়নে শোনা:

"স্বরগ মুকতি পুণ্য কিছু নাহি প্রয়োজন,
জনম জনম ধরি' তোমারেই কামনা।"

পদ্মরাগের 'তারিণী-ভবনের' পরিকল্পনা পাশ্চাত্ত্যের দাতব্য চিকিৎসালয় বা হিন্দুর আশ্রম হইতে ধার করা নয়, এই পুস্তকের পটভূমিতে রহিয়াছে তাঁর জীবনেরই স্বপ্ন। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল্ গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্বপ্নের কিছু বাস্তব রূপ দিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 'পদ্মরাগে'-র অনেক ঘটনাই তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। এ সমস্ত রচনায় সহজ সরল অকৃত্রিম বেদনার যে সাবলীল প্রকাশ, তার ভঙ্গীতে রহিয়াছে তাঁর স্বকীয়তা। মেটারলিঙ্ক্ 'নারী-প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন: Theirs are still the divine emotions of the first days, and thc sources of their being lie deeper far than ours, in all that was illimitable.

মাসিক মোহাম্মদী
মাঘ, ১৩৩৯

মিসেস্ আর. এস্. হোসেন

কাজী আবদুল ওদুদ

মিসেস আর. এস্. হোসেন আমাদের সমাজে একটি জ্যান্ত মানুষ। আমার মনে হয়, তাঁর 'মতিচুর' তাঁর স্কুলের চাইতে মোটেই কম গৌরবের নয়।

বাস্তবিকই মিসেস আর. এস. হোসেন একজন সত্যিকার সাহিত্যিক। তাঁর একটা বিশিষ্ট Style আছে; সেই Style-এর ভিতর দিয়ে ফুটেছে তাঁর তীক্ষ্নদৃষ্টি আর কাণ্ডজ্ঞান, আর বেদনা-ভরা অথচ মুক্তি-অভিসারী মন। অবশ্য compromise-ও তাঁর জীবনে ও রচনায় কম নেই; কিন্তু সে compromise ফন্দিবাজের compromise নয়, সে compromise তাঁর নারীর নমনীয়তা ও স্নেহ— বড় স্বাভাবিক।

জীবিত ও মৃত বুড়োদের মধ্যে সত্যিকার মুসলমান সাহিত্যিক সংখ্যায় অতি অল্প— মীর মোশার্‌রফ হোসেন, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন, কায়কোবাদ, কাজী ইমদাদুল হক ও মিসেস আর. এস. হোসেন। এঁদের মধ্যে কাল মিসেস্ আর. এস. হোসেনকে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দেবে। শুধু মুসলমান সাহিত্যিক-দের মধ্যে নয়, গোটা বাংলার নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে মিসেস্ আর. এস. হোসেনের স্থান অতি উচ্চে— সর্বোচ্চে কিনা, তা এখন পুরোপুরি বলতে পারছি না, কিন্তু সময় সময় তাই মনে হয়। এমন একটা মার্জিত অথচ প্রতিভা-দীপ্ত চিত্ত বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য না হলেও সুপ্রাপ্য নয়।

মাসিক সওগাত
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

"মতিচুর"*

আবুল হুসেন

আমাদের দুর্গতির আরম্ভ যে কোথায়, তাহাই লেখিকা তাঁহার প্রাঞ্জল, সুরুচি-সদ্ভাবপূর্ণ, দৃষ্টান্ত-বহুল সরল অকপট মাধুর্যময় রচনা দ্বারা দেখাইতে যাইয়া স্বকীয় বেদনার অনুভূতিকে প্রতি ছত্রে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখিকা বঙ্গীয় মোসলেম নারী-সমাজের আদর্শ। তাঁহার অবরুদ্ধা অবলা ভগিনীগণের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান, শিক্ষা, নীতি, কর্ম ও স্বাধীনতায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুরুষের নিদারুণ স্বার্থপরতা, শাসন-নীতি ও কঠোর পশুশক্তির ফলে নারীকে যে কিরূপ জঘন্য জীবন-যাপন করিতে হইতেছে, আর তাহাতে যে সমাজ ও দেশের কত অকল্যাণ ও অনর্থ ঘটিতেছে, তাহাই অতি সংযত ভাষা ও কোমল শ্রদ্ধার সহিত লেখিকা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পুরুষ প্রকৃত সৌভাগ্য-সম্পদ্ ও সুখ চাহিলে, তাহার মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞানকে মঙ্গলের পথে চালিত করিতে হইলে, নারীকেও সমভাবে জ্ঞান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অর্জন করিতে হইবে। লেখিকা নারী-সুলভ সঙ্কোচের সহিত পুরুষের দোষ দেখাইয়াছেন।

পুস্তকে তিনি পুরুষের বিরুদ্ধে এমন কিছুই বলেন নাই, যাহাতে পুরুষেরা আপত্তি করিতে পারে। আমার মনে হয়, পুরুষের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে তদপেক্ষা আরও অধিক কষাঘাত করা উচিত ছিল। কিন্তু লেখিকার মাহাত্ম্য ঐ স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে বেশী; তিনি ভগিনীগণের ত্রুটিই বেশী করিয়া দেখাইয়াছেন,— পুরুষকে কেবল অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

আজ ভারতের নারী-সমাজ এত অবনতির অতল তলে পড়িয়া গিয়াছে কেন? তাহার একমাত্র কারণ পুরুষ; পুরুষ নিজের সুখ-স্বার্থের ষোল আনা

*মতিচুর, প্রথম খণ্ড। মিসেস্ আর. এস্. হোসেন প্রণীত। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—সাখাওয়াৎ মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল, ৮৬/এ, সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম। ১০১ পৃষ্ঠা। মূল্য ।১০ পাঁচ সিকা।

পুরা মাত্রায় আদায় করিয়া লইয়া, নারীর ঘর শূন্য করিয়া দিয়াছে। ইহা পশুশক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন। নারীকে অজ্ঞ, মূর্খ ও প্রিয়বস্তুটি করিতে গিয়া পুরুষ যে কি বিষম ফল লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা আজও তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

নারী মাতৃরূপিণী। এক জননী একশত শিক্ষকের অপেক্ষা অনেক বড়। জননী গৃহের সর্বময় কর্ত্রী। তিনি গৃহের রাণী। আর গৃহই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম শিক্ষাক্ষেত্র। এই গৃহে শিশু যে আদর্শ-শিক্ষা, সংস্কার, ধারণা ও কল্পনা প্রাপ্ত হয়, তাহা যাবজ্জীবন তাহার চরিত্র, মন ও কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহাতে আর দ্বিমত হইতে পারে না। এমত অবস্থায় গৃহ-জননী জ্ঞানে-গুণে বিভূষিতা না হইলে শিশু তথা ভবিষ্যৎ মানুষকে কে গঠন করিবে? উত্তম স্বাস্থ্য, শরীর ও মন প্রাপ্ত হইতে হইলে সু-নারী আবশ্যক। এই সরল কথাটি যে আজও কেহ বুঝিতে চাহিতেছেন না কেন, মাননীয়া মিসেস্ হোসেন সেই চিন্তায় আকুল হইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি নারীর সুখ-স্বার্থ ফিরাইতে চাহিয়া যে পুরুষের উন্নতির পথ কত উন্মুক্ত করিতে যাইতেছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট ভবিষ্যতে পুরুষ-সমাজ, বিশেষতঃ বঙ্গীয় মোসলেম পুরুষ সমাজ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। পুস্তকখানি নারীকে তাহার ক্ষতস্থান চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে, তাহার আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবে, শৃঙ্খলা ও জ্ঞানের মর্যাদা বুঝাইয়া দিবে, স্বামীকে প্রভু বলিতে ভুলাইবে, স্বাধীনতা দ্বারা দাম্পত্য-জীবনের মাধুরী ও আনন্দ যে কত গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা অজ্ঞ নারীকে বুঝাইয়া দিবে; এবং অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে নারী যে সংস্কার-জ্ঞান পুতুল-ঘরের মধ্য হইতে বহন করিয়া আনে— স্বামীকে দেবতা-জ্ঞানে অন্ধ পূজার উপহার দিতে শিখে, তাহা ভুলাইয়া দিয়া, মার্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও আত্মার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা শিখাইয়া দিবে। মিসেস্ হোসেন 'সুগৃহিণী,' 'গৃহ,' 'অর্ধাঙ্গী' ও 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে নারীর সুজ্ঞান কিরূপে জন্মিতে পারে, তাহা দেখাইতে গিয়া চমৎকার সফলতা লাভ করিয়াছেন।

অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বোরকা' ও 'নিরীহ বাঙালী' পড়িতে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। 'বোরকা'র নূতন অর্থ বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া, লেখিকা আমাদের অনেক কৌতূহলের তুষ্টিসাধন করিয়াছেন। হয়ত আমি তাঁহার সকল কথায় সায় দিতে পারি না; তবে তাঁহার নূতন অর্থ বেশ লাগিয়াছে।

'পিপাসা' প্রবন্ধে ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণু চরাচর জীবাণু-জীবের মধ্যে খোদা-প্রাপ্তির পিপাসা বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া লেখিকা অসীমের জন্য স্বীয় তৃষ্ণার পরিচয় দিয়াছেন। সে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক কথা।

আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
কার্তিক, ১৩২৮ সন।

SULTANA'S DREAM

আবুল হুসেন

Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন) প্রথম সংস্করণ ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য আমাদের সমাজ যে, পুস্তকখানি এখনও দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দেখিতে পায় নাই। ইহা ছাড়া দুঃখের বিষয়, এত দিনের মধ্যেও পুস্তকখানি সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনাও করেন নাই। সেদিন ৩৮-পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া বিস্ময়-রসে যেমন আপ্লুত হইয়াছি, তেমনি লেখিকার উদ্দেশ্যে শত সালাম প্রেরণ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। তাঁহার মতো চিন্তাশীলা নারী প্রকৃতই, নারী জাতি কেন, সমগ্র মানব জাতির গৌরবের পাত্রী।

Sultana's Dream পড়িলে ডাক্তার গালিভারের লিলিপুট দেশের ঘটনা মনে পড়ে। Sultana একজন অবরুদ্ধা নারী। গৃহের চতুষ্কোণ হইতেছে তাঁহার বিচরণ ও কর্মক্ষেত্র,—সূর্যের আলোক, চাঁদের কিরণ ও প্রকৃতির মুক্ত নির্মল বায়ু তাঁহার পক্ষে হারাম—তাহা ভোগ করিবার জন্য এতটুকু অধিকার তাঁহার ছিল না। বিশ্বের ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ্ ও সৌভাগ্য তাঁহার পদতলে ছিল; কিন্তু সেগুলিকে একান্ত করিয়া ভোগ করিবার স্থান ছিল ঐ অর্গলবদ্ধ অন্তঃপুর। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন: তিনি তাঁহার ভগিনী সারার মতো এক অপরিচিতা নারীর সঙ্গে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ফুল-বাগান দেখিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে আসিয়া কত না সঙ্কোচ ও ত্রস্ত ভীতির পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু উক্ত নারী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে-স্থানকে তাঁহারা Ladyland বলেন,—সেখানে পুরুষেরা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, আর নারীগণ বাহিরে সংসার-কর্ম নির্বাহ করিয়া চলে। সেই অপরিচিতা নারীকে সুলতানা 'ভগিনী সারা' বলিয়া ডাকিতেছেন। 'ভগিনী সারা' সুলতানাকে নারীগণের স্বরচিত স্বাধীন স্বচ্ছ নির্মল পারিজাত-কানন দেখাইতেছেন। সুলতানা প্রথম প্রথম পুরুষের ভয়ে আনন্দের সহিত সে-সমস্ত ভোগ করিতে পারিতেছেন

না। পরে 'সারা' নানা প্রকার নিদর্শন দেখাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে, সেখানে বাহিরের রাস্তায় পুরুষের বাহির হইবার অধিকার নাই। সে-দেশ নারীর—পুরুষ নারীর কথায় ওঠে, নারীর কথায় বসে। নারীর রচিত আইন পুরুষকে পরিচালিত করিতেছে। নারীগণের অসাধারণ জ্ঞান-প্রতিভার বিকাশ সেই Lady land-এ কিরূপ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া সুলতানা নিজের আত্মার মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয় অনুভব করিয়া অতিশয় উৎফুল্ল হইতেছেন। পুরুষগণকে কিরূপে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছেন, কিরূপে 'জেনানা'র পরিবর্তে 'মর্দানা'-র প্রবর্তন সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শ্রবণ করিয়া সুলতানা অবাক্ হইতেছেন।

পুরুষের পশুশক্তিকে দমন করিয়া নারীর আভ্যন্তরীণ ঐশী-শক্তিকে প্রখরতর করিতে পারিলে এই দুনিয়াতে যে স্বর্গ-সুষমা রচনা করা যায়, তাহাই এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া আমার বিশ্বাস। ভগিনী সারার Lady land-এ কোনো কুৎসিৎ আচরণ ও নীতিবিগর্হিত কর্ম কেহ করিতে পারে না। সেখানে পুলিশ নাই। সে একেবারে সত্য ও ভালবাসার রাজ্য। বস্তুতঃ, নারীজাতি সত্য ও ভালোবাসার সাক্ষাৎ প্রতিমা-স্বরূপ হইতে পারেন, যদি তাঁহাদের মন ও মস্তিষ্কের যাবতীয় শক্তিকে সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদানে স্ফূর্তিলাভ করিতে দেওয়া হয়। তাহা হইলে আমাদের নারীজাতি পুরুষের পার্শ্বে নন্দনকানন ও ঐ Lady land-এর পারিজাতে-'বাগ' প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

Sultana's Dream-এর মধ্যে পুরুষকে অবরুদ্ধ করিবার একমাত্র হেতু : আমাদের নারীজাতির দাসত্ব, অর্থাৎ পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরতা। পুরুষ না হইলে আমাদের নারী একেবারে অকর্মণ্য ও অসহায়, মূর্খ ও অজ্ঞ বলিয়া সে পুরুষের উপর তাহার জীবনের মাত্র অস্তিত্বটুকুর জন্য নির্ভরশীলা, এ-কথা কেবল পুরুষের দ্বারাই নিখিল বিশ্বে ঘোষিত হইয়াছে, এবং সেই ঘোষণা দ্বারা নারীও তাহার শক্তি আছে এ-কথা বিশ্বাসই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে নারী যে ক্ষমতাপন্ন, সে যে পুরুষের মতো, এমন কি তদপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাবতী হইতে পারে—তাহার শক্তিকে জাগ্রত করিলে যে প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া পুরুষের বিন্দুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকে সে দুনিয়ার বুকে নির্মল সৌন্দর্য, সম্পদ্ ও কল্যাণের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা ঐ Lady land-এর নারীদের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত দ্বারা মিসেস আর্. এস্. হোসেন অতি

অসহায়া বঙ্গীয়া নারী-হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যে বোধ করি এই Sultana's Dream রচনা করিয়াছেন।

পুস্তিকাখানি যেরূপ সুমার্জিত বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় লেখা, সেরূপ ভাষা আয়ত্ত করা আমাদের অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকের পক্ষে কঠিন। আশা করি, Sultana's Dream-এর পাঠকগণ স্ব-স্ব পরিবারের নারীগণকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন।

মিসেস্ আর্. এস্. হোসেন এই Sultana's Dream দ্বারা নারীকে তাহার অপরিসীম ক্ষমতায় বিশ্বাস জন্মাইতে পারিয়া, সত্য-সত্যই সমাজের বিপুল কল্যাণের ইঙ্গিত করিতে পারিয়াছেন।*

সাধনা
অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সন।

*Sultana's Dream: মিসেস্ আর. এস. হোসেন প্রণীত। প্রকাশক: এস্. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং; ৫৪ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৮ পৃষ্ঠা; মূল্য চারি আনা।

"মতিচুর"

মিসেস এম্‌· রহমান

বল 'মতিচুর!' তুমি জানিলে কেমনে
নারীর প্রাণের জ্বালা? কোন্‌ শক্তি বলে
প্রবেশ করেছ তুমি বঙ্গ-ললনার
হৃদয়ের মাঝে, যেথা শুধুই বেদনা,—
দগ্ধক্ষত চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়া
দেখালে জগৎজনে আঁখিজল দিয়ে?
বেদনায় অত্যাচারে রক্ত-রাঙ্গা প্রাণ,
তার কি সান্ত্বনা ওরে শুধুই রোদন?
জাগ্রত হইতে হ'বে সকল নারীর
আপনারে করিবারে সফল সার্থক;
বিদ্রোহের শিখা দিয়ে পুড়াইতে হ'বে
মানুষের অবিচার, সকলের পাপ;
গঠন করিতে হ'বে নূতন ভারত—
মুক্ত হ'য়ে নারী আজি বাঁচাবে জগৎ।

আনিয়াছে 'মতিচুর' বসন্ত-উষায়
নব-জীবনের গান, নূতন আলোক।
অবরোধে নারী হেথা চির-গৃহহীনা,—
দাঁড়াবার নাই ঠাঁই এতটুকু তার।
কুমারীর বলিদান দেখিবে কি, হায়!
এস তবে আজি ওগো এই বাঙ্গালায়;
নির্ম্মম সমাজ-রূপ অত্যাচারী-হাতে
নারীর এখানে হয় জীবন্ত সমাধি!

শ্মশানের ছবি তুমি, ওগো 'মতিচুর!'
আহত প্রাণের গীত বেদনা-বিধুর।*

সহচর
আষাঢ়, ১৩২৯।

*মিসেস আর. এস্‌. হোসেন সাহেবা প্রণীত 'মতিচুর' পড়িয়া।

দরদী আত্মা

শাহাদাৎ হোসেন

রাতের বোরকা তখনো খসেনি, মিনারে মোয়াজ্জিন
সুবে-উম্মেদ তখনো ঘোষেনি—জাগেনি কো আরেফিন।
নিঁদ-মহলার বন্ধ দুয়ারে তখনো স্বপন-দ্বারী
আগুলি' আগল তন্দ্রা-বিভোল ছিটায় রঙের ঝারি।
কুলায়-নিলয়ে কল-বিহঙ্গ তখনো কূজনহারা,
উদয়-অচলে জড়ায়ে কুহেলী রূপালী তিমির-পারা।
সহসা বজ্র-নিপাতে ফাটিল ক্রন্দন-কলরোল—
বাংলা মায়ের দুলালী রোকেয়া ছেড়ে' গেছে মা'র কোল!
মুরছি' পড়িল গুণ্ঠিত উষা প্রাচী'র তোরণ-মূলে,
ফাটা-কলিজার তাজা খুন-ধারা ছুটিল উদয়-কূলে।
দীর্ণকণ্ঠে মোয়াজ্জিনের ক্রন্দন হাহাকারে
আকাশ-রন্ধ্রে কাঁপিল আজান আর্ত বেদনা-ভারে।
কোটি কণ্ঠের আহাজারি রোল মাতমের হাহাকার
শূন্য বিমান কাঁপায়ে ধ্বনিল, অশ্রুর পারাবার
দুলিয়া উঠিল নব-কারবালা-প্রান্তর-বুকে আজ;
নিরমম কাল হরিল মায়ের মাথার মানিক-তাজ।

সে যে নারী-মণি আলোর নায়িকা তিমির-পন্থে জ্বলি,'
লক্ষ্যের পথে দেখালো আলোক শত বাধা পথে দলি'।
কুশ-কন্টক কাটিয়া রচিল কুসুমের পথ-রেখা,
বুকের শোণিত-আখরে লিখিল যুগের জীবন-লেখা।
যুগ-যুগান্ত বন্দিনী নারী রুদ্ধ প্রাচীর-পুরে
ফরিয়াদ করে ঊর্ধ্বে চাহিয়া আর্ত করুণ সুরে।
সপ্ত তবক আসমান ভেদি' সে কাঁদন করুণার
আরশ কাঁপায়ে তুফানে জাগালো রহমের পারাবার।

মাভৈঃ-মন্ত্রে বরাভয় ঘোষি', প্রাচী'র উদয়-মূলে
মুক্তির দূতী নামিল রোকেয়া যুগের কেতন তুলে'।
অশ্রু-সায়রে হাসির কমল ফুটিল ক্রন্দসীর,
খসিয়া পড়িল অবরোধ-রোধে জুলুমের জিঞ্জীর।
পিঞ্জরে-বাঁধা গতিহারা পাখী চাহিল সমুখে ফিরে,'
ক্ষরিত কিরণে দাঁড়ালো আসিয়া মুক্ত আলোর তীরে।
লাজ-সঙ্কোচে চির-আনমিতা সাহসে তুলিল শির,
কুণ্ঠিত ভাষা মুক্তি-মুখর—কণ্ঠে বন্দিনীর।
ধ্বসিয়া পড়িল আলো-সংঘাতে অন্ধ-সংস্কার;
গলিত শবের পচা কঙ্কালে জীবনের সঞ্চার।
জড়ে জাগরণ, মূক সে মুখর, অসহায়া দুর্ব[illegible]
পুঞ্জিত ব্যথা-শতদলে জাগে সাহসিকা কুণ্ডলা।
বিস্ময়-হত হেরিল মানব নবযুগ-অভিযান—
বিজয়-মন্ত্রে ফুটিল দীপকে রুদ্ধ ব্যথার গান।

কাঁদে মজ্‌লুমা ব্যথার কমল অশ্রু-সায়র-তীরে
শত বন্ধনে বাঁধা জালেমের জুলুমের জিঞ্জিরে,—
দেখেছিলে তুমি দরদী আম্মা মমতার আঁখি তুলে';
ক্ষুব্ধ বেদনে তুফানে দরিয়া জাগিল মরম-কূলে।
জাগর-শঙ্খে যুগের জননী জাগাইলে আহ্বান—
রুদ্ধ প্রাচীর সে-অবরোধের ভেঙে' চুরে' খান্‌খান্‌।
ছোটে বন্দিনী শৃঙ্খল ছিঁড়ি' তোমার পতাকা-মূলে
নব-প্রভাতের অরুণ-আলোকে জ্ঞান-সিন্ধুর কূলে।
দীপ্ত দীপিকা জ্বালিলে মরমে, শিখা সে বহ্নিমান্‌
ভস্মিত পাপ অজ্ঞতা-তাপ—জুলুমের অবসান।
অলখে' বসিয়া মারণ-অস্ত্র হানিল তোমার বুকে,
কুসুমের ঘাত সহিলে জননী অবহেলে হাসি-মুখে।
ক্ষুব্ধ গরজে উগরিল বিষ পয়োমুখ বিষধর
গণ্ডুষে শুষি' দিলে নাগবালা বরাভয় মন্তর।

শত প্রলয়ের ঝঞ্ঝার মাঝে অশনি-করকা-পাতে
হিমগিরি-সম অটল অচল দুর্যোগ-সংঘাতে।
তব বর্তিকা দেখায়েছে পথ—দেখাবে ভবিষ্যতে
নব-আলোকের সন্ধানী অয়ি! প্রাচী'র উদয়-পথে।

গেছ যদি যাও—দরদী আত্মা, আলোকের পথ বাহি'
কোটি নমিতার অবহেলিতার অশ্রু-সলিলে নাহি'।
যে-লোকে প্রয়াণ আজিকে তোমার—এই করো ফরিয়াদ-
ধরার ধূলায় যে-ভিত্ গড়িলে—পাকা হয় বুনিয়াদ।

মাসিক মোহাম্মদী
মাঘ, ১৩৩৯ সন।

দুঃসাহসিকা

গোলাম মোস্তফা

আঁধার রজনী, নিদ্রিত পুরী, নাহি জন-কোলাহল ;
মরণ-তন্দ্রা বিছায়েছে তা'র শিথিল নীলাঞ্চল।
দুর্যোগ-রাতি, নিভিয়া গিয়াছে শিয়রের দীপশিখা ;
ঘরে ঘরে আজি জাগিতেছে শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা।
এ গভীর রাতে কে তুমি জননী, কল্যাণ-দী[illegible]ল'
এই বাংলার নিঁদ-মহলার তিমির-দুয়ারে এলে [illegible]
মৃত্যু-মলিন আঁধার-কক্ষে করিলে আলোকপাত,
অভয়-মন্ত্র ফুকারি' কণ্ঠে দ্বারে দিলে করাঘাত ?
আকুল আবেগে ডাকিয়া কহিলে নিদ্রিত সন্তানে—
"ওরে ওঠ্ তোরা, ঘুমাস্ নে আর, জেগে ওঠ্ নব প্রাণে।
দিবসে আলোর দীপালি জ্বালিয়া রাতে কি ঘুমাবি আজ ?
কান পেতে শোন্—বাহিরে বিশ্বে চলিছে কুচ্‌কাওয়াজ।
দলে দলে ওই চলে বীরদল জ্বালিয়া মশাল-বাতি,
নব-প্রভাতের আশায় তাহারা পোহাইছে দুখ-রাতি।
তোরাও আয় রে, যোগ দে' সে নব-জীবনের সাধনায়,
নিদ্রা মিথ্যা, ভুলিস্ নে আর মিছে তার ছলনায়।"

সাড়া দিল না কো কেহ সেই ডাকে—সে আকুল আহ্বানে,
জননী টানিছে এক দিকে, আর মরণ ওদিকে টানে।
কেহ জাগে, কেহ জাগিয়া ঘুমায়, কেহ ধীরে মেলে আঁখি,
ধিক্কার দেয় কেহ জননীরে ঘুমঘোরে থাকি' থাকি'।
সন্তান ভোলে জননীরে, তবু জননী ভোলে কি তায় ?
প্রাণ কাঁদে তার স্নেহ-মমতায়—কল্যাণ-কামনায়।

তাই কি জননী বিপুল ব্যথায় ভরিল তোমার প্রাণ ?
ভুলে গেলে তুমি আমাদের যত অনাদর অপমান।
শুচিসুন্দর শুভ্রবসনা তপস্বিনীর প্রায়
বসিলে গহন রাতের আঁধারে আলোর তপস্যায় ?
ঘুমায় পুত্র, ঘুমায় কন্যা,—সজাগ প্রহরী-সম
দরদী জননী শিয়রে জাগিয়া। দৃশ্য এ অনুপম।

জননী তোমার সে-মহাসাধনা বিফল হয় নি আজ.
জেগেছি আমরা, লভেছি চেতনা, পরেছি নূতন সাজ।
এই [illegible]া কোথা তুমি আজ ? জেগে দেখি তুমি নাই।
তোমা[illegible]ভাব সবার হৃদয়ে বেদনা হানিছে তাই।
নয়ন ভরিয়া তোমারে আজিকে দেখিতে পরাণ চায়,
শত শ্রদ্ধায় সারা প্রাণ আজি লুটাতে চায় ও-পা'য়।
কুন্ঠিত অবগুন্ঠিত ওই বোরকায়-ঢাকা মুখ
খুলে ফেল মা গো। দেখিয়া মোদের ভ'রে যাক সারা বুক।

আজি আলোকের উৎসব চলে মোদের ভুবন ভরি',
সেই উৎসব-মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরণ করি।
হে চির-দরদী। ওই বুকে তব কোথা পেলে এত ব্যথা ?
হেরেমের তলে কেমনে পশিল আলোকের এ-বারতা ?
কণ্টক-ভরা বন্ধুর পথ, তিমির-গহন রাতি,
নিষেধের শত বাধা-বন্ধন, সাথে নাই কেহ সাথী,
তবু সেই পথে বাহির হইলে, ওগো দুঃসাহসিকা।
জাগাতে তোমার প্রিয় সন্তানে, হাতে ল'য়ে দীপশিখা।
না-চলা পথের অগ্রপথিক, ওগো নারীকুল-রাণী।
চির-দুর্জয় সাহসেরে তব আজিকে ধন্য মানি।
এই যে অসীম আলোর পিয়াসা, এই যে আত্মত্যাগ,
মুক্তির লাগি এই কুতূহল—এ গভীর অনুরাগ,—

ইহারে আমরা সারা প্রাণ দিয়া অভিনন্দিত করি ;
এরি লাগি' আজ চিত্ত মোদের গৌরবে ওঠে ভরি' ।

শা'জাহান গেছে রাখিয়া ধরায় প্রেমের 'তাজমহল'—
অমর করিয়া রেখেছে প্রিয়ার বিরহ-অশ্রুজল ;
তুমি রেখে গেলে বাংলার বুকে নূতন 'নূরমহল'—
পতির পুণ্য স্মৃতি-মন্দির শুভ্র-সমুজ্জ্বল ।
শা'জাহান চেয়ে বড় তুমি প্রেমে, পুণ্যে ও গরিমায়,
হার মেনে যায় তাঁহার 'তাজ' যে এ-তা[illegible]লনায় ।
সে তো সম্রাট, সীমা নাহি তার বিত্ত-সামগ্রী[illegible]
তুমি যে রিক্তা, বুকের রক্তে গড়েছ এ-মন্দির ।
বাংলার যদি কোথাও মোদের তীর্থক্ষেত্র থাকে,
সে হবে তোমার এই মন্দির—রেখে গেলে তুমি যা'কে ।
এইখানে আসি' যুগে যুগে মোরা নোয়াব মোদের শির,
তোমার পুণ্য স্মৃতিরে স্মরিয়া ফেলিব অশ্রুনীর ।

জননী, তোমারে দেখি নাই মোরা, শুনিয়াছি শুধু বাণী ;
শরীরিণী ছিলে, অথবা ছিলে না—আজি বিস্ময় মানি ।
মনে হয় যেন তনু-ঢাকা দূর চাতক-পাখীর প্রায়
তুমি এসেছিলে মোদের গগনে গান শুনাইতে, হায় ।
তুমি যেন কোন গগন-পারের স্বপন-দেশের মেয়ে,
এসেছিলে নেমে ঈদের চাঁদের রজত-তরণী বেয়ে' ।
ফিরদৌস্ হ'তে নিয়ে এসেছিলে নূরের দীপ্ত শিখা,
সেই নূর দিয়ে দূর ক'রে গেলে মৃত্যুর মরীচিকা ।
মানবীর রূপে তুমি আল্লার মূর্ত আশীর্বাদ ;
তুমি না আসিলে ঘুচিত কি এই জড়তা ও অবসাদ ?

হে জননী ! চির-অনুপমা তুমি পুণ্যে ও মহিমায়,
তুমি আমাদের খালেদা খানম নব্য এ-বাঙলায় ।
চাঁদ সুলতানা তুমি এ-যুগের, অসীম সাহস প্রাণে
একা দাঁড়াইয়া যুঝিয়াছ তুমি আঁধারের অভিযানে ।
তাপসী 'রাবেয়া', তারও চেয়ে তুমি সাধনায় যে গো দড়,
ধর্মের চেয়ে জ্ঞানের সাধনা সহস্র গুণ বড় ।
তুমি আমাদের নূতন 'খোদেজা'—সর্বপ্রথমা নারী,
আলোর অমিয় পান করিল যে ভরিয়া হৃদয়-ঝারি ।
আজিকে মোদের নব-প্রগতির জয়-যাত্রার ভালে
পরাইয়া [illegible] তুমি রাজটিকা রহিয়া অন্তরালে ।
[illegible]ীর [illegible] পেয়েছিল প্রাণ ইসলাম দুনিয়ায়,—
মোরাও লভিব নব প্রাণ তব স্পর্শের মহিমায় ।

আজি মনে পড়ে, জীবনের তব অস্ত-সন্ধ্যাবেলা
ব্যোমযানে তুমি উঠেছিলে—করি' সব বাধা অবহেলা ।
কী খেয়াল তব জেগেছিল মনে, হেরেম-বাসিনী নারী,
তব তিরোধানে এখন সে-কথা বুঝিতে আমরা পারি ।
শিল্পী যেমন শিল্প রচিয়া দূর হ'তে চেয়ে' দেখে—
তুমি সেই মতো তব কীর্তির নিয়ে এলে ছবি এঁকে' ।
দেখে এলে অতি-উর্ধ্ব হইতে মেলি' তব দু'নয়ন—
এসেছে মোদের জাতির জীবনে কতটুকু স্পন্দন ।
নব-প্রভাতের অরুণ-আলোর চল-চরণের ধ্বনি
আকাশের পথে কর্ণে তোমার ওঠেছিল কি গো রণি' ?
শুনেছিলে কি গো নবীন যুগের জয়যাত্রার ভেরী,
বুঝেছিলে কি গো—প্রভাতের আর অধিক নাহি ক দেরী ?
পৌঁছায়ে দিয়ে নিখিল জাতিরে প্রভাতের দরজায়
দিবসের আলো না ফুটিতে তাই চ'লে গেলে কি গো, হায় !
আজি বাংলার মুসলিম যে গো হয়েছে মাতৃহীন,
বেদনায় শোকে সবার চিত্ত তাই আজি গমগীন্ ।

যাও মাতঃ, তব পুণ্য স্মিরিতি চিরকাল র'বে মনে,
শক্তিরূপিনী তুমি বিদ্যুৎ জাতির জড়-জীবনে।
নাই বা থাকিলে তুমি দুনিয়ায়, ক্ষতি কি তাহাতে আর ?
তুমি বেঁচে র'বে মোদের খেয়ালে অলক্ষ্যে সবাকার।

নব-প্রভাতের অরুণ-আলোকে জাগিব আমরা যবে
মুখর হইবে মোদের ভবন আনন্দ-কলরবে,
বোন এসে যবে মধুর হাসিয়া দাঁড়াবে ভাইয়ের পাশে,
সঙ্গিনী যবে চলিবে সঙ্গে অপূর্ব উল্লাসে,
শীতের কুহেলী-পর্দা ঠেলিয়া নব-বসন্ত য[illegible]
আসিবে মোদের জীবন-কুঞ্জে অপরূপ গে[illegible]
নব-জীবনের স্পন্দনে যবে ভ'রে যাবে সারা প্রাণ,
বুলবুল যবে গাহিবে আবার মাতায়ে গুলিস্তান,
সেই পুলকের মাঝারে, জননি, তোমারে আমরা পা'ব,
সেই দিন সবে প্রাণ খুলে মোরা তোমার মহিমা গা'ব

মাসিক মোহাম্মদী
মাঘ, ১৩৩৯।